সূচীপত্র

ভূমিকা

রহস্যের রোমাঞ্চবিতান মগ্নমৈনাক চেতনায় জীবনের আদিগন্ত ব্যাপ্ত। শুধু কৈশোর কেন, শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্যের বারাণসী অবধি তার দৃপ্ত পদ-সঞ্চার। আকাশ ও মাটি, ভূমা ও ভূমির রাখীবন্ধনে তা উদ্বাহু, তরুণ গরুড়ের পক্ষবিধূননের আবেগে তা স্পন্দমান। জীবনের প্রথম ক্ষণটিতে আলোকোন্মীল চেতনায় বিস্ময়রসের যে পরশ-রভস ঝংকার দিয়ে ওঠে, সারাজীবন ধরে তারই বিচিত্র সুরে-ছন্দে তরংগিত হয়। সাধে কি সংস্কৃত আলংকারিক বলেন : বিস্ময়ই একমাত্র স্থায়ী ভাব, আর অদ্ভুতই একমাত্র রস? সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এমন কোন নিরুত্তাপ যুগ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যখন মানুষের মনে বিস্ময়ের আধিপত্য ছিল না। শৃংগার হাস্য করুণ প্রভৃতি গোষ্ঠীজীবন-মথিত সামাজিক রস। কিন্তু, মানুষ যেখানে তার নিজের একান্ততায় বিবিক্ত, সেখানে বিস্ময়ের একতারাটি হৃদয়ের সমস্ত আসর জুড়ে রাজবেশে সমাসীন। তার প্রকাশের ভঙ্গীটি হয়তো যুগে যুগে পাল্টে গেছে, প্রকৃতির ঘটেছে রূপান্তর। মুগ্ধ বিস্ময়, বিপন্ন বিস্ময়, আত্মস্থ বিস্ময়, প্রত্যাবৃত বিস্ময়—বিস্ময়ের বিশ্বরূপ। বিস্ময় যেখানে স্বাদময়, সেখানে মধু-দৃষ্টি; যেখানে বিশ্বসঞ্চারের আবেগে বিকীর্ণ, সেখানে ঋত-চেতনা; আর যেখানে মননের পক্ষপুটে নিলীন, সেখানে জিগীষা ও আত্ম-প্রসারণের এষণা। ঋগ্বেদের সূক্তে সূক্তে এই বিস্ময়ের দীপালিকা! এই বিস্ময়-বোধ থেকেই দেশে দেশে রহস্য-সাহিত্যের উচ্চকিত আবির্ভাব।

কিন্তু, রহস্য-সাহিত্য আর রহস্য-উপন্যাস এক কথা নয়। উপন্যাস আধুনিক সভ্যতার অবদান। রহস্য-উপন্যাসের আখ্যানাংশটুকু কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে অসুলভ নয়। আমাদের দেশের কথাসরিৎসাগর দশকুমারচরিত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় তার স্বাক্ষর সুবিন্যস্ত। পাশ্চাত্যের Arthurian Legends-ও একই সাক্ষ্য বহন করছে। আর শুধু কি তাই? একটু অনুচ্চ কণ্ঠে বলা যেতে পারে, Shakes-peareএর Macbeth বা Sophoclesএর Aedipus the rex কি crime-story ছাড়া অন্য কিছু? অভিজাত সমালোচকের মুখব্যাদানকে উপেক্ষা করেই স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, অতএব রহস্য-উপন্যাসের আখ্যানাংশটি সুপ্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছিল; তবে তার পরিবেষণের রীতিটি ছিল আলাদা; অতএব স্বাদও ছিল বিলক্ষণ। কিন্তু নতুন একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের আবির্ভাবে তার সাজ-বদল হয়ে গেল। অবশ্য প্রকল্পটিকেও সর্বাংশে যথার্থ বলে স্বাগত করা যায় না। কারণ এই জাতীয় চরিত্রের পদধ্বনিও প্রাচীন সাহিত্যে একেবারে অশ্রুত নয়। কিন্তু তাই বলে রাজপুত্তুর আর পক্ষিরাজ ঘোড়া বা ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথাকে এ সাহিত্যের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি বলে কল্পনা করা যায় না। কল্পনার শূন্যগর্ভ মেঘের ভেলা থেকে মাটির কাছাকাছি এসে বাস্তবের উপল-

বন্ধুর পথের ধূলায় অভিষিক্ত না হলে সার্থক রহস্য-উপন্যাস—'দূর অস্ত'। ওসব রূপকথা আমাদের দীর্ঘদিনের পরবশতার গ্লানিময় দায়ভাগ। কল্পনার অশ্ব-ক্ষুরাহত পথে কিরীটী রায়ের সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অবাস্তব। সে যাই হোক, রহস্য-রোমাঞ্চের একটি ধারা ক্রম-উপচীয়মান বেগে যে আমাদের সাহিত্যে বহমান ছিল, তা জোর করেই বলা যায়।

তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই ঃ প্রত্যাবৃত্ত বিস্ময়ের ফলে জিগীষা ও আত্ম-প্রসারণের এষণায় রহস্য-উপন্যাসের আবির্ভাব। এই এষণা আত্মবৃত্ত হলে পাই 'শেষের কবিতা' ও 'শেষ প্রশ্ন'এর epigram-ঘেঁষা উক্তিপ্রবাহ। আর নিজেকে বস্তুবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে অর্থাৎ বহির্বৃত্ত হলে রহস্য-উপন্যাসের রাজপথ রচিত হয়। কবিগুরুর 'বীরপুরুষ' কবিতাটিকে এ দুয়ের মধ্যবিন্দুতে স্থাপন করা যায়। রহস্য-উপন্যাসকে যেমন একদিকে উপন্যাস হতে হবে, তেমনি আবার নিজের গোত্র-স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখার জন্য রহস্যের, শুধু বাতাবরণ নয়, রংমহল রচনা করতে হবে; এবং এই দুই উপাদান ও উপকরণের আনুপাতিক সংশ্লেষসৌষম্যে তাকে রহস্য-উপন্যাসের রসসিদ্ধি আয়ত্ত করতে হবে। এ হয়তো ক্ষমতা এবং অক্ষমতার (স্বেচ্ছাকৃত?) এক দুরন্ত লড়াই। পুলকিত বিস্ময়ের বেদীমূলে নতনেত্র কথাশিল্পের বিমুগ্ধ অঞ্জলি, ভীরু দীপশিখার মতো।

সেই 'নীলবসনা সুন্দরী'র যুগ থেকে, ব্যোমকেশের ডায়েরীর পাতা বেয়ে, কিরীটীর কিরীটশীর্ষে আরূঢ় হয়ে কাল অনেকখানি প্রাগ্রসর হয়েছে। ব্যোমকেশের চতুর্মাত্রিক স্থিতিস্থাপকতা আর কিরীটীর অসমমাত্রিক সূচ্যগ্রতায় দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন অনপেক্ষিত। কিরীটী রায়ের স্রষ্টার বাহাদুরি পর্যালোচনাই এখন প্রাসঙ্গিক।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত! একদা যুদ্ধের ডাক্তার! স্যার্ আর্থার কোনান ডয়েলও একদা যুদ্ধের ডাক্তার ছিলেন। এই আপাতসাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু কোনান ডয়েলের বিশাল ব্যাপ্তি এবং জটিল ঘটনাবর্ত রুদ্ধার্গল বাঙালী জীবনে অনাগত বলেই সাহিত্যে তার প্রতিভাস প্রত্যাশিত নয়। তবু একথা দ্বিধাহীন চিত্তেই বলা যায় ঃ নীহাররঞ্জন সার্থকনামা রহস্য-ঔপন্যাসিক; শুধু তাই নয়; তিনি ভবিষ্যের পথিকৃত। তাঁর সৃষ্টির অজস্রতায় আঙ্গিকের নব নব বৈচিত্র্য শ্বেত রক্ত নীল পীত পাপড়ির পুলকে প্রস্ফুট। তাঁর কাহিনী-বিবৃতির শিল্পবৈদগ্ধ্য বারে বারে নব নব খাতে প্রবাহিত হয়। কাহিনীর বক্তা কোথাও কিরীটী স্বয়ং, কোথাও প্রতিনায়ক, কোথাও কোন সহযোগী, কোথাও বা কোন অবান্তর ব্যক্তি। এর উপরে আছে আবার স্বাগত ভাষণ; তার ফলে পাঠকের রহস্যসন্ধানী চিন্তাসূত্রটি ছিন্ন হয় এবং হত্যারহস্য আরো দুরবগাহ হয়ে পড়ে। Stream of consciousness রীতির চকিত স্পর্শে কোন কোন স্বগতোক্তি অপূর্ব চর্বণাময় এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আবার যেখানে কিরীটীর অগোচরে কাহিনীর বিবৃতি, সেখানে পাঠক স্বভাবতই মনে করে ঃ আমি কিরীটীর চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছি। কিন্তু

পরমুহূর্তেই সে ভুল ভেঙে যায়। এ তো আলেয়ার আলো-র ভ্রান্তি নয় ; এ বিদ্যুদাহত ভ্রান্তি। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যায়, এই আঙ্গিক বৈচিত্র্য একটা বহিরঙ্গ প্রসাধনকলা মাত্র নয় ; তা 'অপৃথগ্‌যত্নর্নিবর্ত্ত্য', তা তাঁর শিল্পের সঙ্গে যুগনদ্ধ। বস্তুত কৃত্রিম প্রকরণ-সর্বস্বতা, cheap stunt বা শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাবার ভণ্ডামি তাঁর অনায়ত্ত। মানুষ হিসেবে তিনি যেমন সহজ-সরল এবং Protocol-কলায় অকুশলী, শিল্পী হিসাবেও তিনি তাঁর সেই স্বভাব-বৃত্তিকে অতিক্রম করেন নি।

আর এখানেই তাঁর শিল্পসাধনার মৌল রহস্য—এই অকৃত্রিমতা, যা তাঁর লেখনীতে এনেছে ঝর্ণাধারার স্বতঃ-স্ফূর্তি। কী আত্মসমাহিত অতন্দ্র আবেগে তিনি পাতার পরে পাতা লিখে যান ! অথচ তাঁর অজস্র রচনা-সম্ভারে পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্র খুব সহজলভ্য নয়। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর তাঁর পরিকল্পনাবৃত্তি ও পর্যবেক্ষণশক্তি। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ঘটনার পারম্পর্য-বিন্যাসে অপূর্ব নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছে তাঁর কাহিনী-সম্ভারে। উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই পরিবেশ-চিত্রণকে যে পাঠক অবজ্ঞা করবে, রহস্যসন্ধানে কিরীটীর অনুষাত্রিক হওয়া তার পক্ষে দুরাশা মাত্র।

মনের অতল গভীরে যে নিরুদ্ধ বাসনার বিলোল কটাক্ষ পলকে প্রলয় ঘটাতে পারে, তার রেখাচিত্র অংকনে তাঁর সাবলীলতা উল্লেখ্য। তাঁর উপন্যাসে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে মুখ্যত তিনটি পথে,—নারীপ্রেম, অর্থলালসা এবং প্রতিহিংসা-প্রবণতা। তবু প্রেম-সংঘর্ষ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে একটা উত্তেজক পৃষ্ঠপট রচনা করেছে। এই প্রেম-কাহিনীর জটিলাবর্তই তাঁর রচনাকে যথার্থ উপন্যাসের সূতিকাগারে পেঁৗছে দেয়। এই সব প্রেমোপাখ্যান যেমন একটি suspense সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে, তেমনি অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্নিগ্ধতার প্রলেপ দিয়েছে। এই স্নিগ্ধতা ডাঃ গুপ্তের উপন্যাসের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গেই তাঁর চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্যের কথাও এসে পড়ে। গৌণ চরিত্রের বিচিত্র মিছিলের কথা এখানে নাই বা বললাম। শুধু কিরীটী রায় বা কালোভ্রমর নয়, প্রতিটি মুখ্য চরিত্র তাদের প্রাতিস্বিক আকৃতি ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে স্পষ্টরেখ। নিষ্ঠুর হত্যাকারী হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা পাঠকের সমবেদনা থেকে বঞ্চিত নয়। 'পাপকে আমি ঘৃণা করি, পাপীকে নয়'—লেখকের অধিকাংশ গ্রন্থেই যেন এই কথাটি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। এখানেই লেখকের রচনার মৌল স্নিগ্ধতা গুহাহিত। আর ঠিক এখানেই তাঁর রচনা-সম্ভারের সামাজিক মূল্য। তাঁর এই নৈতিকতা ও স্বাচ্ছন্দ, মোটেই কষ্টার্জিত নয়। নিতান্ত বেরসিক ছাড়া অন্য কেউ তাঁর রচনা পড়ে অসামাজিক প্রবণতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হবে না। সহজাত এই সামাজিক দায়িত্ব বোধের জন্য তিনি পাঠকসমাজের ধন্যবাদার্হ।

এবারে তাঁর সৃষ্টির গভীর নেপথ্যসঞ্চারী দুই একটি প্রবণতার কথা উল্লেখ

করছি। তাঁর নিগূঢ় চেতনায় তিনি একজাতীয় শিশুমনস্কতার ক্রীড়নক, যা তাঁকে আঁকড়ে ধরার উৎসাহ দেয়, এগিয়ে চলার পাথেয় যোগায় না। নারীর প্রেমিকা রূপের চেয়েও জননীর ভাবমূর্তি তাঁর কল্পনাকে বেশি উদ্দীপিত করে। আর সে জননী যদি বঞ্চিতা নির্যাতিতা হন? তাহলে তাঁর হৃদয় তীব্র ব্যথায় ঝংকার দিয়ে ওঠে। তাই তাঁর সাহিত্যে নর-নারীর যৌন লিপ্সার স্নিগ্ধ দাম্পত্যজীবনে পরিণতির চিত্র একান্ত বিরল। সে অনুপাতে শুভ্রবসনা জননীর স্নেহমূর্তিখানি অনেক বেশি জায়গা জুড়ে তাঁর সাহিত্যে দীপ্যমান। তাঁর সাহিত্যে যেখানে অসাফল্য, প্রেমচেতনার এই কুণ্ঠিত সঞ্চারই সেখানে শিল্পসৃষ্টির অনেকটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পূর্বোক্ত শিশুমনস্কতার ফলেই হয়তো তাঁর রচনায় **high seriousness**এর ছাপ ততো স্পষ্ট নয়। ভাষার সাবলীল গতিধর্মিতা তাঁর সাহিত্যের একটি প্রধান গুণ হয়েও এই উত্তানধর্মিতাকে করেছে উচ্চারিত।

কিরীটী অমনিবাস-এর নবম খণ্ডের ভূমিকা লিখতে বসে উপরের কথাগুলো বলা প্রয়োজন ছিল। কাঞ্চন-কৌলীন্যের সঙ্গে সারস্বত-কৌলীন্যের সহজাত বিরোধ কল্পনা করে যাঁরা হীনমন্যতার গ্লানি থেকে মুক্তির আস্বাদ পান, সেই সব বয়স্ক লোক গুপ্তধন হাত থেকে ফসকে গেলে দুঃখিত হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট, এ অভিযোগ সহজেই উত্থাপন করা চলে। রসিক পাঠক বরঞ্চ ব্যর্থ প্রেমের খণ্ডিত চিত্রগুলির জন্য হা-হুতাশ করতে পারেন। বস্তুত নীহাররঞ্জনের শিল্পী-মানসের গভীরে একটি দ্বন্দ্বের রূপরেখা সুস্পষ্ট ঃ—কাকে অর্ঘ্য দেবো? সে কি প্রেমিকা? না, স্নেহময়ী জননী? ক্ষুব্ধ পাঠকের তাই বারে বারে মনে হয়, কী যেন ফুটি-ফুটি করে ঝরে গেল। এই ব্যথার স্বাক্ষরটুকু একাধারে তাঁর সাহিত্যের সাফল্য ও অসাফল্যের পাণ্ডুলিপি।

নবম খণ্ডে দুটি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট ঃ 'ছায়াকুহেলী' আর 'কালোহাত'। 'কালো-হাত'-এর কাহিনীর সূত্রপাত মধুপুরে, আর পরিণতি কলকাতায়। স্বদেশী যুগের একটি বিপ্লবী সংঘের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের জীবনে আদর্শের ক্রমিক অপহ্নবের পথে পারস্পরিক সম্পর্কের যে জটিল আবর্ত ফেনিল হয়ে ওঠে, তারই পৃষ্ঠপটে এই কাহিনীর বিস্তার। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যে সর্ববিধ আদর্শের জড় মুখোশকে কী ভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে, তার অপূর্ব স্বরলিপি এই গ্রন্থে। চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত, তেমনি আচারে ও মানসে সংগতিপূর্ণ। মিসেস্ চৌধুরী অর্থাৎ সুমিত্রাই এ গ্রন্থের মৌল প্রেরণা। মাতৃত্ব প্রেমিকাত্ব এবং পত্নীত্বের যে ত্রিকোণ দ্বন্দ্বে তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, তাই উপন্যাসটির প্রাণরস যুগিয়েছে। মৃণালিনীও পাঠকের গভীর সমবেদনার অংশীদার। আর অনিল চাটুজ্যের প্রহেলিকাময় চরিত্রটিও শিল্প-সৌকুমার্যের স্বাক্ষর বহন করে। লেখক কাহিনীটিকে বলেছেন ঃ Comedy of Errors, অন্য দিক থেকে উপন্যাসটিকে শংকিত চিত্তের সত্য গোপনের ট্র্যাজেডি বলে চিহ্নিত করা যায়।

'ছায়াকুহেলী'তে নরহরি সরকারের অবৈধ প্রেমের প্রচ্ছদ অনিরুদ্ধ ও তরুণের

অর্থগৃধ্নুতার নাগপাশে বন্দিনী শীলার প্রেমচেতনার শরশয্যা। অন্তিম পর্বে অ্যাটর্নী প্রতাপের তীক্ষ্ণ নখরাঘাত শীলার প্রেমার্তির উপরে চরম লাঞ্ছনা হেনে তাকে বিবাগী করেছে। অবৈধ প্রেমের নির্মম পরিণতির এক রক্তঝরা দলিল এই উপন্যাসটি। এ উপন্যাসে suspenseএর মাত্রাধিক্য লক্ষণীয়। অতএব 'ছায়াকুহেলী' নামটি গভীর অর্থবহ। হত্যাবর্জিত অথচ রসোত্তীর্ণ রহস্য-উপন্যাসের এটি একটি সার্থক নিদর্শন। সত্যসন্ধানী লেখকের শিবচেতনার শৈল্পিক ক্রম-পরিণতির মনোজ্ঞ স্বাক্ষর উপন্যাসটিতে বিধৃত।

ডাঃ গুপ্ত বাঙালী-অবাঙালী অগণিত জনসাধারণের দরবারে সুদীর্ঘ একটি যুগ অতিক্রম করে আজও অকুণ্ঠ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তাঁর সুবিপুল সাহিত্যের ডাইনে-বাঁয়ে চারিদিকে যে প্রমাথী চরিত্রগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অভিন্নদোসর কিরীটী রায় কি তাদের সবাইকে পর্যুদস্ত করেছে? সংশয় জাগে।

মনে পড়ে, শ্রদ্ধেয় প্র· না· বি· কোথায় যেন লেখেন: 'আমার এই ভূমিকাটি ঘুষ, বাকিটা ঘুষি'। আমার এই ভূমিকাটি কিন্তু ঘুষ না হলেও ঘুষি, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সহৃদয় পাঠক কী বলেন?

ডঃ শ্রীননীলাল সেন, এম্. এ., ডি. লিট.
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

কালোহাত

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

বসন্ত তখনও আসে নি। তবে মাঝে মাঝে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং বিলীয়মান শীতের শেষ আমেজটুকু ঝরাপাতার বিদায়গীতির সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে যাচ্ছে যেন যাবার আগের শেষ কথাটিই।

দীর্ঘদিনের একটানা পরিশ্রমে শরীর ও মন দুটোই ক্লান্ত। তিন মাসের ছুটি নিয়েছিলাম, তাও ফুরিয়ে এল। ভেবেছিলাম এই তিন মাসের ছুটিতে কত জায়গায়ই না ঘুরব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া হয় নি। আজ-কাল করে করে ঘুরে বসে অর্থাৎ লাইব্রেরী ঘরে বসে বসেই বই পড়ে দিন কাটছিল। এবং অখণ্ড ঐ অবসরে বই পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত বোধ করি, আরাম-চেয়ারটার উপরে গা ঢেলে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি—আর মনে পড়ে কত কথাই। মানুষের জীবনটা কি বিচিত্র! জীবনের রং-বেরঙের কত খেলা নিত্য চলেছে কত ভাবে! অবিশ্যি এর একটা ধরাবাঁধা গতি আছে, যেটা গড্ডালিকা প্রবাহের মতই চলে। মাঝে মাঝে দু-চারটে বুদবুদ জাগে কিন্তু ওই পর্যন্তই। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে হয়।

ওহে সুব্রতচন্দ্র!

চমকে মুখ তুলে তাকালাম, দেখি বন্ধুবর কিরীটী হাস্যমুখে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

কিরীটী—আয় বোস্!

কিরীটী হাসতে হাসতে এসে সামনের একখানা চেয়ার অধিকার করে বসল।

তারপর—কি সংবাদ?

সংবাদ—সংবাদ আর কী! শুয়ে বসে কাটাচ্ছি।

অর্থাৎ হাতে এত প্রচুর সময় যে, মনে হচ্ছে যেন কাটতেই চাইছে না, তাই তো?

কতকটা তাই বটে। মৃদু হেসে জবাব দিই।

তবে চল্ আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি।

কোথায়? আবার বিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

চল্ই না। বসেই তো আছিস। কিরীটী বলে।

আপত্তি নেই, কিন্তু কোথায়?

মধুপুর। কিরীটী বলে।

মধুপুর?

হ্যাঁ, শোন্ সু, আজকের ডাকে হঠাৎ একটা চিঠি পেয়েছি, এই সেই চিঠি। বলতে বলতে কিরীটী পাঞ্জাবির নিচের পকেটের ভিতর হাত চালিয়ে একটা সাদা রঙের বেশ পুরু ও শৌখিন মুখখোলা খাম বের করে আমার হাতে দিল, দেখ, পড়্!

কার চিঠি ? প্রশ্ন করি।

পড়েই দেখ্ না। উপন্যাস পড়ে শেষ করবার আগেই শেষের পরিচ্ছেদটা পড়ে নেওয়া, স্কুলের মেয়েদের মত কৌতূহল কেন ?

মৃদু হেসে চিঠিখানা খুলে ফেললাম।

খামের মধ্যে পুরু সাদা লেটার পেপার, উপরে নীল রঙের কালিতে মনোগ্রাম S. C.।

প্রিয় কিরীটীবাবু,

আপনাকে আমি চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। কিন্তু আমি আপনার কথা বহু শুনেছি, চাক্ষুষ আপনাকে না দেখলেও। আমার নাম সন্তোষ চৌধুরী। একটা বিশেষ কারণে আপনার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছি। বিশ্বাস করুন, আমার জীবন অত্যন্ত বিপন্ন। আপনার সাহায্য আমার একান্ত দরকার। এই চিঠি পাওয়া মাত্রই দেরি না করে কোন্ ট্রেনে আসছেন জানিয়ে নিচের ঠিকানায় 'তার' করবেন। স্টেশনে আমি আমার গাড়ি পাঠাব। যা আপনার পারিশ্রমিক তার অতিরিক্তই দেব। আশা করি অবিলম্বে যাত্রা করবেন। সাক্ষাতে সব কথা হবে। ইতি—

২১শে ফাল্গুন, '৪২ ভবদীয়
মাধবী ভিলা সন্তোষ চৌধুরী
মধুপুর

চিঠিটার আগাগোড়া পড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চিঠিটা কিরীটীর হাতে ফেরত দিতে দিতে বললাম, বুঝলাম।

যাবি নাকি ?

কিন্তু কী ব্যাপার তা না জেনেই—আপত্তি নেই !

ব্যাপার না জেনেই যে যাচ্ছি ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা কিছু কিছু যেন অনুমান করতে পারছি। তা হলে তোকে খুলেই বলি। যাব আমি মনস্থির করেছি দুটো কারণে—প্রথমতঃ চিঠিটা ভাল করে পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবি, লেখার আগাগোড়া কালি খুব স্পষ্ট, কিন্তু শেষের দুটো লাইন অস্পষ্ট। যাতে করে মনে হয়, যে চিঠি লিখেছে সে ইচ্ছা করেই চিঠির লেখাগুলো আগাগোড়া ব্লট করতেই ভুলে গেছে। তাই শুধু নয়, কলমে যে কালি ফুরিয়ে এসেছিল, সেদিকেও তার নজর দেবার মত মনের অবস্থা হয়তো ছিল না। তাড়াতাড়ি কোনমতে নামটা সই করেই চিঠিটা যেন পোস্ট করেছে। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করে দেখ্ চিঠিটার লেখা সর্বত্র সমান নয়, কোথাও মোটা কোথাও সরু। নিবের আগায় ময়লা ছিল, সেটা লেখকের মনের বিচলিত অবস্থারই সাক্ষ্য দেয়, তাছাড়া মনে হয়, যে চিঠি লিখেছে সে জানে যে, ঐ সামান্য ইঙ্গিতেই আমার মন অবিলম্বে আকৃষ্ট হবে, কেননা কতখানি মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকলে লোকে চিঠি লিখে ব্লট করতে ভুলে যায় ও লেখা অসমান হয় তা আমি জানি। চিঠি লেখবার সময় ভদ্রলোকের নার্ভ ঠিক ছিল না। তাছাড়া

এর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার আছে। দেখতে চাই সত্যি-সত্যিই অনেক দিনের বিশ্রামে আমার মস্তিষ্কের শ্বেত স্নায়ুকোষগুলি শুকিয়ে গেছে কিনা। কৃষ্ণা বলে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আর সে কিরীটী নেই। Degenerated fossile, জানে না যে সিংহ চিরদিনই সিংহ, বয়স হলেও সিংহত্ব তার ঘোচে না। কিন্তু এহ বাহ্য। যাবি তো ওঠ্।

উঠব মানে!

মানে দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। ওঠ্।

সত্যি-সত্যিই এখুনি এই মুহূর্তেই যেতে হবে নাকি?

নিশ্চয়ই।

অগত্যা না ওঠা ছাড়া আর উপায়ই বা কী!

যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে এসে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম।

॥ দুই ॥

পাঞ্জাব এক্সপ্রেস যখন মধুপুরে এসে দাঁড়াল বেলা তখন প্রায় পড়ে এসেছে।

আমরা দুজনে ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফরম পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু সন্তোষ চৌধুরীর প্রেরিত গাড়ি কই!

মনটা একটু দমে গেল।

খানদুই ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তারই একটা নির্দেশ করে কিরীটী বললে, চল্ ওই পুষ্পকরথেই আরোহণ করা যাক, প্রতিশ্রুত রথ যখন আসে নি!

ব্যাপার কী বল্ তো? তুই কি wire করিস নি?

নিশ্চয়ই করেছিলাম। যুদ্ধের সময় নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে, চল্ চল্, আর দেরি করা উচিত নয়, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

কিরীটীর মধ্যে যেন একটা বেশ চঞ্চলতাই অনুভব করি। আশ্চর্য! কিন্তু কেন?···

একটা গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, গাড়োয়ান কোচবক্স থেকে নেমে এসে বললে, কোথায় যাবেন কর্তা?

সন্তোষ চৌধুরীর বাড়ি 'মাধবী ভিলা' কোথায় জান? কিরীটী প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে অত বড় ধনী লোকের বাড়ি চিনি না? এ শহরে কে না চেনে 'মাধবী ভিলা'? সেই তো বাহান্নবিঘায় তার বাড়ি।

বটে! বেশ, তবে সেইখানেই যেতে চাই। নিয়ে যেতে পারবে?

আসুন। কেন পারব না? এখুনি পৌছে দেবো। আসুন।

আসুন তো, কিন্তু গাড়িখানার চেহারা দেখে আমার কিন্তু বিশেষ ভরসা হচ্ছিল না। তবু যেতে যখন হবেই, গাড়িতে দুজনে উঠে বসলাম। গাড়োয়ান মুখে একটা বিচিত্র শব্দ করে কলির পক্ষীরাজ-যুগলের পিঠে চাবুকের আঘাত হানল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

সহসা গাড়ির প্রবল ঝাঁকুনিতে শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলি যেন একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল।

নাতিপ্রশস্ত কাঁচা সড়ক। চক্রের ঘর্ষণে ঘর্ষণে রাস্তার লাল ধুলোর আবীর ছড়িয়ে এগিয়ে চলল আমাদের পুষ্পকরথ।

কিরীটীর দিকে একবার তাকালাম, চোখ বুজে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে আপন মনে একটা বর্মা চুরুট টানছে। একান্ত নির্লিপ্ত। বুঝলাম দেহটা গাড়ির মধ্যে থাকলেও মনটা তার এ পৃথিবীর মাটিতে আর নেই এবং এখন তার সঙ্গে কোন কথাবার্তা চালাতে যাওয়াও বৃথা।

অতএব! আমি গাড়ির জানালাপথে দৃষ্টি মেলে বসে রইলাম।

বিলীয়মান সূর্যের স্তিমিত আলোয় শহরখানি যেন ম্লান ও বিধুর হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই।

কলকাতার বাইরে এখানে শীতের আমেজটুকু বেশ আরামদায়কই মনে হচ্ছিল। তাছাড়া এখানে কলকাতার চাইতে শীতও বেশী। বাহান্নবিঘা এককালে ফুলের জন্য খুব বিখ্যাতই ছিল।

এখনও সেই অতীতের স্মৃতি ভাঙা আসরের বুকে জেগে রয়েছে।

চলমান গাড়ির খোলা জানালাপথে সহসা সামনের একখানা বাগানবাড়ির গেটের দিকে নজর পড়তেই আমি চমকে উঠলাম।

একটি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণ যুবক গেটের রেলিংয়ের উপরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি তার রাস্তার উপরে ন্যস্ত।

যুবক যেন সৌন্দর্যের একখানি পূর্ণ প্রতীক। বাঙালীদের মধ্যে অমন উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ বড় একটা চোখে পড়ে না।

গায়ে একখানা সাদার উপরে সবুজ স্ট্রাইপ দেওয়া টেনিস কাপ্ শার্ট। পরিধানে ফ্ল্যানেলের সাদা ট্রাউজার।

পরিধেয় বস্ত্রের অন্তরাল হতে পেশল সুগঠিত দেহখানি যেন পাপড়িঢাকা ফুলের মতই একটা চাপা সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উন্নত দীঘল নাসা। টানা টানা স্বপ্নময় দুটি গভীর আঁখিপল্মে ঢাকা চক্ষু। একমাথা কোঁকড়ানো চুল সযত্নে পিছনদিকে উল্টিয়ে দেওয়া।

ধ্যানমগ্ন কিরীটীর গায়ে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললাম, দেখছিস কিরীটী, কি চমৎকার অ্যাপোলোর মত চেহারা! এইরকম সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না বাঙালীর মধ্যে, না রে!

কিরীটীর যে আমার পূর্বেই অদূরে রাস্তার গেটের ধারে দণ্ডায়মান যুবকটির প্রতি নজর পড়েছিল বুঝতে পারি নি।

আমার প্রশ্নোত্তরে পরক্ষণেই চাপা স্বরে বললে, হুঁ, চকিত-চঞ্চল চাউনি! Significant!

সত্যিই সুন্দর, না রে ?

হুঁ ! কিন্তু… । সুন্দর চোখ সব সময়ই সৌন্দর্যের পরিচয় নয়—অনেক সময় ঠিক বিপরীত কিছুরই ইঙ্গিত দেয় ।

চলমান গাড়ির দৃষ্টিপথ হতে যুবক ও বাগানবাড়ি ততক্ষণে অপসৃত হয়ে গেছে । এবং আরও কিছুটা পথ এগুবার পর গাড়িটা একটা হেঁচকা টান দিয়ে যেন থেমে গেল ।

ব্যাপারটা কী ! গাড়ীর জানালাপথে অনুসন্ধান করতে যাব বলে মুখ বের করতেই চোখে পড়ল আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয়, সবুজ বাংলো প্যাটার্নের দোতলা সাদা রংয়ের বাগানওয়ালা একখানা বাড়ি ।

লৌহ ফটকের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা—'মাধবী ভিলা' ।

গাড়োয়ান ততক্ষণে গাড়ির কোচবক্স থেকে নেমে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিয়েছে, বাবু এই কোঠি !

আমরা সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকে নামি । সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নেই বলতে গেলে । মাত্র দুজনার দুটো মাঝারি আকারের সুটকেস ।

যে যার সুটকেস হাতে নিয়ে গাড়োয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেটের দিকে এগুতে গিয়েই কিন্তু বাধা পেয়ে দাঁড়াতে হল আমাদের ।

এতক্ষণ নজরে পড়ে নি, কিন্তু এখন নজরে পড়ল । বাড়ির গেটের একেবারে বলতে গেলে সামনেই স-লাঠি দুজন লালপাগড়ি দণ্ডায়মান ।

আমাদের গেটের দিকে অগ্রসর হতে দেখে তাদেরই মধ্যে একজন বাধা দিল, কাঁহা যা-রাহে সাব ? জেরা ঠারিয়ে তো ।

আমি জবাব দিলাম, আমাদের বোলতা হায় ?

জী ।

এই মাধবী ভিলায় যাব ।

হুকুম নেহি হায় সাব ।

কিঁউ ? এবারে কিরীটীই প্রশ্ন করল ।

অন্দরমে এই কোঠিকো মালিক চৌধুরী সাব্ খুন হুয়া ।

চৌধুরী সাব্ খুন হুয়া ? কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ।

জী । লেকেন, আপ কিধারসে আরেহে হে ? কিস্‌কো সাথ মুলাকাত্ মাঙ্গতে হেঁ ?

কিরীটী পকেট হতে একটা স্বীয় নামাঙ্কিত কার্ড বের করে লালপাগড়ির হাতে দিয়ে বললে, এহি কার্ড অন্দরমে দারোগা সাব কো পাস্ লে যাও ।

লালপাগড়ি কার্ডখানা নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল ।

আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম ।

একটু পরেই লালপাগড়ির সঙ্গে সঙ্গে একজন নাদুসনুদুস চেহারার নাড়ু-গোপাল গোছের লোক এসে হাজির হলেন, নমস্কার, নমস্কার ! আপনি…, কণ্ঠে

বিগলিত সৌজন্য।

আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম কিরীটী রায়, আর ইনি আমার বন্ধু সুব্রত রায়।

আসুন, আসুন—ওর নাম কী, বহুবার আপনাদের, ওর নাম কী, কীর্তি-কাহিনী শুনেছি। আমার নাম শ্যামাচরণ লাহা। ওর নাম কী, এখানকার থানার ইনচার্জ।

বুঝলাম 'ওর নাম কী' ভদ্রলোকের একটি ব্যাধি।

ও, নমস্কার।

ওর নাম কী, কিন্তু হঠাৎ আপনারা? শ্যামাচরণ বলে কতকটা যেন বিগলিত বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই তাকাল।

কিরীটী তখন সংক্ষেপে তার আগমনের হেতুটা ব্যক্ত করলে, মানে সন্তোষ চৌধুরীর এই চিঠিটা পেয়েই এসেছি। তিনি পত্রে কোন কিছু খুলে লেখেন নি। অথচ পত্রখানি পড়ে সমস্তই বোঝা যায়। তিনি একটা অতি সম্ভাবিত বিপদে আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে উঠেই যেন আমাকে এখানে তাঁর সাহায্যের জন্য শীঘ্র আসতে লিখেছিলেন। কিন্তু একান্ত দুর্ভাগ্য আমার, আমি এসে পেঁছিবার আগেই আশঙ্কাটা সত্যে পরিণত হয়ে গেল। আমার সাহায্য যখন তিনি চেয়েছিলেনই, এবং আমি যখন তাঁকে সাহায্য করবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম, তখন তাঁকেই সাহায্য করা হবে, যদি তাঁর এই মৃত্যু-রহস্য ব্যাপারে, তাঁর ফ্যামিলিকে সাহায্য করতে পারি কোন উপায়ে এখনও। অবশ্যই আপনার ও মিসেস্ চৌধুরীর যদি মত থাকে।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। ওর নাম কী· মিসেস্ চৌধুরী আপনার সাহায্য সানন্দেই গ্রহণ করবেন বৈকি। আর তাছাড়া ওর নাম কী, মিসেস্ চৌধুরীর মত থাকলে আমার আপত্তি কি থাকতে পারে। আপনারা তা হলে বাইরে এসে বসুন, আমি মিসেস্ চৌধুরীকে একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

হ্যাঁ, চলুন।

লৌহ-গেট অতিক্রম করে আমরা দুজনে শ্যামাচরণের পশ্চাদনুসরণ করলাম।

বাড়ির সামনে প্রায় চার-পাঁচ কাঠা জমির উপরে সযত্নবর্ধিত পুষ্পোদ্যান। নানাজাতীয় দেশী বিলাতী ফুলের মন-ভোলানো সমারোহ। ফুলের মধ্যে বেশীর ভাগই নানা আকারের, নানা বর্ণের গোলাপই বেশী। বাতাসে তার মৃদু সুবাস।

মধ্যখানে প্রশস্ত লাল সুরকিঢালা পায়ে চলবার পথ। পথের দুপাশে মেহেদীর কেয়ারী এবং মেহেদীর কেয়ারীর গায়ে গায়ে মাধবীলতার অপূর্ব সমাবেশ। সবুজ চিকণ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘোর রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি যেন রক্তের বিন্দুর মতই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

বাড়িখানি বাংলো প্যাটার্নের দোতলা সাদা রঙের ইংরাজী অক্ষর 'E'র আকারে।

সামনেই প্রশস্ত পাঁচ ধাপ সিঁড়ির পরেই টানা খোলা সুপ্রশস্ত বারান্দা। রেলিংয়ের গায়ে পুরু আইভিলতার আচ্ছাদন। সবুজ মখমলের তৈরী যেন একটি

সতরঞ্জি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

রেলিংয়ের উপর হতে তারের তৈরী টবে অরকিড্ ও নানাজাতীয় দুষ্প্রাপ্য পাতাবাহারের ও ফুলের গাছ ঝুলছে।

সামনেই হলঘর। সুদৃশ্য পুরু পারস্য-গালিচায়-মোড়া মেঝে।

ঘরের ডিস্‌টেম্‌পারড্ নীলাভ দেয়ালে দেয়ালে দেশী ও বিদেশী খ্যাতনামা চিত্রতারকাদের সু-অঙ্কিত চিত্র টাঙানো।

দামী দামী গদী-মোড়া কুসন ও আরামকেদারা। ঘরের মধ্যখানে একটা গোলাকার সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত দারুনির্মিত টেবিলের উপর সুবৃহৎ একখানি জয়পুরী টবে একগোছা নানাজাতীয় নানা বর্ণের ফুল।

ঘরের এক কোণে প্রায় একমানুষ সমান সুদৃশ্য একটি বৃহৎ ঘড়ি, তার দোদুল্যমান সুবৃহৎ চক্‌চকে পিতলের পেণ্ডুলামটি দুলছে আপন মনে, সময়ের বুকে শব্দ তুলে নিজস্ব গতিবেগে।

আর এক কোণে কালো ব্রোঞ্জের একটি মাঝারি গোছের মার্কারীর প্রতিমূর্তি।

দিনশেষের ম্লান আলো পশ্চিমের খোলা জানালাপথে ঘরের মধ্যে এসে যেন শেষ নতি জানাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে একটি প্রাণী বসেছিলেন। আমাদের দুজনকে সহসা শ্যামাচরণবাবুর পিছু পিছু ঢুকতে দেখে তিনি গাত্রোত্থান করলেন।

ভদ্রলোকের বয়স ২৫-২৬-এর মধ্যে হবে। রোগা লিক্‌লিকে লম্বা শ্যামবর্ণ চেহারা। মুখখানি মেয়েলী লম্বাটে প্যাটার্নের। টিকোল বাঁশীর মত নাক। পাতলা ঠোঁট। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, রুক্ষ বিস্রস্ত। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মুখে একটা কালো রঙের পাইপ। পরিধানে দামী কালো সার্জের সুট্। বুক-পকেটের ফাঁক থেকে একখানা রক্তবর্ণের সিল্কের রুমাল উঁকি দিচ্ছে।

মুখের ভাবখানা যেন একটা বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের উদ্ধত অভিব্যক্তি। শ্যামাবাবু হাত তুলে কিরীটী ও আমাকে নির্দেশে দেখিয়ে বললেন, ইনি শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়, বিখ্যাত রহস্যভেদী—আর…

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা যেন সমাপ্ত করে দেবার জন্যই কিরীটী বললে, আর ইনি আমার বন্ধু শ্রীসুব্রত রায়।

ভদ্রলোক অযথা ভ্রূদুটো উঁচিয়ে ঠোঁটে একটা অবজ্ঞার ভাব টেনে এনে বললেন, I see ! আপনাদের দর্শন পেয়ে, I mean, ভারী glad. My name is Hansa Raj Chaklader. বেহার special Police Branch-এর অফিসার।

নমস্কার। নমস্কার। কিরীটী হাত তুলে বললে, সত্যি বড় আনন্দের বিষয় যে, আপনার মত একজন গুণীজনের দর্শন পেলাম এখানে এসে।

হংসরাজ বলে উঠলেন, আর বলেন কেন ? Extremely busy ! I mean, যত কিছু শক্ত কেস, কমিশনার সাহেব আমাকেই ডাকবেন ! তা আপনারা হঠাৎ এখানে ?

এবারে আমিই জবাব দিলাম, আর সহ্য হচ্ছিল না, বললাম, হাতে কোন কাজ-কর্ম নেই তাই আর কি, মিঃ রায় আসছিলেন, ওর সঙ্গে এলাম।

I mean, মানে, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না তো!

ওর নাম কী, মিঃ চাকলাদার, সন্তোষ চৌধুরীর চিঠি পেয়ে ওঁরা এখানে আসছেন।

শ্যামাবাবু ব্যাপারটা খুলে বললেন।

I see, কিন্তু·········never mind, এসে পড়েছেন যখন, তা যাঁর জন্য আপনার এখানে আসা মিঃ রায়, সেই client তো আপনার খুন হয়েছেন। শুনেছেন বোধ হয়?

হ্যাঁ। কথাটা বলে কিরীটী এবার শ্যামাচরণের দিকে তাকিয়ে তাঁকেই বললে, তা হলে মিঃ লাহা, ভিতরে একটা খবর দিন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—এখুনি দিচ্ছি।

শ্যামাচরণ খবর দেবার জন্যই বোধ হয় ভিতরে চলে গেলেন।

কিরীটী নিজে বসে আমাকেও ইঙ্গিতে বসতে বলল। কিরীটীর পাশে বসলাম।

হংসরাজ একবার কটমট করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে পায়চারি শুরু করে দিল ঘরের মধ্যে।

[এই পর্যন্ত সুব্রতর ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত]

॥ তিন ॥

একটু পরেই কিন্তু শ্যামাচরণ লাহা ফিরে এলেন।

কিরীটী বললে, খবর দিলেন?

হ্যাঁ, মানে—খবর আর দেব কি? তাছাড়া মিসেস্ চৌধুরী বোধ হয় এখন দেখাও করবেন না। এ বাড়ির পুরানো চাকরটাকে বললাম, সে বললে, বাবুরা এসেছেন যখন থাকুন, সময়মত খবর দেব।

তা হলে?

থাকুন না। তারপর মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলে যা করবার করবেন।

কিন্তু আর কাউকে দেখছি না বাড়িতে?

ওর নাম কী, বাড়ির লোক আর দেখতে পাবেন কি স্যার, সংসারে ওর নাম কী, সন্তোষবাবুর আপনার বলতে স্ত্রী, ওর নাম কী, মিসেস্ রমা চৌধুরী, আর একটি মাত্র ছেলে নির্মল চৌধুরী, তা সে তো এখানে নেই, দিন চারেক আগে বম্বে চলে গেছে। মিঃ চৌধুরীর সেক্রেটারী সুবিমলবাবু কলকাতায় আছেন, তাঁকে তার করা হয়েছে, হয়তো ওর নাম কী, কালকেই এসে পড়বেন।

হুঁ, ব্যাপারটা কী হয়েছিল শ্যামাবাবু, জানতে পারি কি?

ওর নাম কী······।

হংসরাজ বাধা দিলেন, I mean, মিঃ লাহা, আমি ততক্ষণ একবার বাড়িটা ও

অকুস্থান ঘুরে দেখে আসি…

হংসরাজ একটা ইংরাজী গানের শিস্ দিতে দিতে চঞ্চলপদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

তখন শ্যামাবাবুর নিকট হতে যা ব্যাপার শোনা গেল, মোটামুটি তার সারাংশ এই :—লোহালক্কড়ের ব্যবসা করে সন্তোষ চৌধুরী একজন কোটিপতি। কলকাতা ও বোম্বাই অঞ্চলে তাঁর কারবার। বিশ্রামের জন্য মধুপুরস্থিত 'মাধবী ভিলা'য় মাস কয়েক হল এসে সস্ত্রীক বসবাস শুরু করেছিলেন। বয়েস তাঁর প্রায় ষাটের কোঠা পেরিয়ে চলছিল। একমাত্র পুত্র নির্মল উচ্চশিক্ষিত, বিলাতফেরত, এখনও অবিবাহিত। কিছুদিন হল সে বিলাত হতে প্রত্যাবর্তন করে বাপের ব্যবসা দেখাশুনা করছে। এক কথায় চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। গত রাত্রে তিনি দশটার সময় শুতে যান। রাত্রি তখন প্রায় দুটো হবে, হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দে ও মুখের উপরে অস্বস্তিকর একটা চাপ অনুভব করে মিসেস্ চৌধুরীর ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন, তাঁর হাত-পা বাঁধা, কে একজন মুখে কালো রঙের মুখোশ আঁটা তাঁর মুখে কাপড় গুঁজে মুখ বেঁধে ফেলছে। ভাগ্যে চোখটা খোলাই ছিল, ঘরের মধ্যে আর একজন তখন তাঁর স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে, সে লোকটারও মুখে মুখোশ আঁটা। স্বামীর হাত দুটো পিছনদিকে ঘুরিয়ে শক্ত করে বাঁধা। লোকটার হাতে একটা তীক্ষ্ণ চকচকে ছুরি। ছুরিটা মিসেস্ চৌধুরীরই, তাঁর পুত্রই তাঁকে বছর দুই আগে উপহার দিয়েছিল। ছুরিটা শয়নঘরের সংলগ্ন ছোট্ট সাজঘরের টেবিলের উপরেই সর্বদা থাকত। স্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মান মুখোশধারী তাঁর স্বামীকে তখন বলছিল—এখনো বল সন্তোষবাবু, সেই চিঠিপত্রের ফাইলটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ?

সন্তোষবাবু জবাব দিলেন, আমি জানি না।

সাবধান! কার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি মিথ্যা কথা বলছ তা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি, চৌধুরী। এই ছুরির সবটা তোমার বুকে বসিয়ে দেবো। আমি জানি সেটা তোমার কাছেই আছে।

কিছুক্ষণ সন্তোষবাবু যেন গুম্ হয়ে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, বেশ চল নিচের ঘরে।

তখন তারা সে ঘর থেকে নাকি তাঁর স্বামীকে নিয়ে বের হয়ে যায়, মিসেস্ চৌধুরীও অজ্ঞান হয়ে যান।

ভৃত্য রাঘবের ডাকাডাকিতে আজ সকালে তাঁর জ্ঞান হয়। রাঘব সকালে চা দিতে গিয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ অবস্থায় জ্ঞানহীনা মিসেস্ চৌধুরীকে দেখতে পায় এবং পরে রাঘবের ডাকাডাকিতে বাড়ির আর সবাই এসে জড়ো হয় সেখানে। এদিকে সন্তোষ চৌধুরীকে বাড়ির মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পিছনদিকে প্রায় দুই শত গজ দূরে খেলার মাঠের ধারে দীর্ঘ গভীর এক সদ্য খনন করা গর্তের সামনে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়

ভদ্রলোককে। উবুড় হয়ে পড়ে আছেন। পরিধানে সাদা ফ্ল্যানেলের নাইট গাউন, পিঠের উপরে সমূলে বিঁধে আছে একখানা ছুরি। পৃষ্ঠদেশে সাদা নাইট গাউনটার উপরে একটা সুস্পষ্ট কালোহাতের ছাপ। এর পর পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিসের হেড্ অফিস থেকে ডিটেকটিভ হংসরাজকে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিস এসে সব কিছু দেখবার পর মৃতদেহ মাঠ থেকে তুলে এনে বাগানে গ্যারেজের পাশে একটা ছোট ঘরে (out-house) তালাবন্ধ করে রেখেছে। পুলিস-সার্জেন এখনও এসে পেঁছান নি। তিনি এলে মৃতদেহের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা হবে।

কিরীটী একটা বর্মা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে ধূমপান করছিল ও শ্যামাবাবুর কথা শুনছিল, হঠাৎ একসময় প্রশ্ন করলে, নির্মল চৌধুরীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে কি, শ্যামাবাবু ? মানে, সন্তোষবাবুর একমাত্র ছেলে নির্মল চৌধুরী ?

হ্যাঁ, আজ তাঁকেও তার করা হয়েছে, ওর নাম কী, হয়তো কালকের মধ্যেই এসে পড়বেন।

কিন্তু একটু আগে যেন শুনলাম তিনি বম্বে গেছেন ? কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শ্যামাবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

ওর নাম কী, কলকাতার অফিসেও তার করা হয়েছিল, সন্তোষবাবুর সেক্রেটারী সুবিমলবাবু জানিয়েছেন কলকাতায় কী একটা কাজে আটকে পড়েন নাকি নির্মল-বাবু, ওর নাম কী, বম্বেতে সময়মত যেয়ে উঠতে পারেন নি। তাই, ওর নাম কী, এখনও তিনি কলকাতাতেই আছেন।

তা হলে তিনি আসছেন ?

হ্যাঁ, এই আপনাদের আসবার কিছুক্ষণ আগে মাত্র তার পেলাম আমরা, তিনি আসছেন।

দেখতে পারি সে তারটা ?

শ্যামাবাবু পকেট হাতড়িয়ে বেলে রঙের একটা টেলিগ্রাফের খাম বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দেন।

এনভেলাপ থেকে তারটা খুলে পড়তে পড়তে কিরীটীর ভ্রূদুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, আপনারা কখন তার করেছিলেন কলকাতায় ?

বেলা সাড়ে নটায়, এইখানে পেঁছেই।

কিরীটী মৃদুস্বরে একটা হুঁ শব্দ করে তারটা পকেটে রাখতে রাখতে বলে, may I keep it ? এটা আমার কাছে রাখতে পারি কি ?

বিলক্ষণ ! ওর নাম কী, তা রাখুন না।

এর পর কিরীটী শ্যামাবাবুর দিকে তাকিয়ে অনুরোধ জানায়, চলুন না একবার আমরাও অকুস্থানটা দেখে আসি শ্যামাবাবু।

বেশ তো, ওর নাম কী, চলুন না। মিঃ চাকলাদারও তো ঐদিকেই গেলেন।

সকলে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

বাড়ির পশ্চাৎদিকেও ছোটখাটো একটি বাগান। তবে ফ্লগাছের নয়। অযত্নে বুনো গাছপালায় বাগানটি যেন সমাকীর্ণ হয়ে আছে।

দিনের আলো প্রায় নিভে এসেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না তখন। দিনশেষের ক্ষীয়মান আলোয় পৃথিবী যেন ছায়াচ্ছন্ন ম্লান।

বাগানের প্রান্তসীমানা নাতিউচ্চ ইঁটের প্রাচীরে ঘেরা। একটি ছোট কাঠের গেট। গেটের গায়ে অল্প কিছুদিন হবে বোধ হয় রঙ দেওয়া হয়েছে, গেটটা ঠেলে খুলতে গিয়েই কিরীটী সেটা বুঝতে পারে।

· গেট পার হলেই খোলা প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় অবারিত মুক্ত। ম্লান আলো ক্রমে আবছা হয়ে আসছে একটু একটু করে।

অল্প কিছুটা অগ্রসর হতেই সামনে শ্যামাবাবুর নির্দিষ্ট সেই সদ্য-খনন-করা গর্ত, যেখানে আজ সকালে সন্তোষ চৌধুরীর মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল।

গর্তটির গভীরতা প্রায় আধমানুষ সমান হবে। সামনেই চারপাশে স্তূপাকার করা কাঁচা মাটি।—গর্তটা শীঘ্র দু-এক দিনের মধ্যে খোঁড়া হয়েছিল বলেই মনে হয়, না সুব্রত? কিরীটী প্রশ্ন করে।

সেইরকমই তো দেখে মনে হচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ মাঠের মধ্যে একটা গর্ত খোঁড়বার কী এমন প্রয়োজন হয়েছিল, সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না। কিরীটী অতঃপর বলে।

সুব্রত মৃদু হেসে বলে, হয়তো কাউকে কবর দিতে।

কিরীটীও হেসে ফেলে, দেখে মনে হয় সেইরকমই যেন। তারপর একটু থেমে বলে, খুনের আগেই কবর তৈরী! খুনী দূরদর্শী বলতে হবে!

ইতিমধ্যে চারিদিক যেন অন্ধকার হয়ে উঠেছিল।

কিরীটী পকেট থেকে একটা শক্তিশালী টর্চবাতি বের করে তার বোতাম টিপল। টর্চের সুতীব্র আলোর রশ্মি সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারে।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের সেই আলোয় নজরে পড়ল কিরীটীর, শুকনো নরম মাটির ওপরে অনেকগুলো সুস্পষ্ট পায়ের দাগ। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে কষ্ট হয় না, পায়ের দাগগুলো দু জোড়া পায়ের বিভিন্ন দাগ। দাগগুলো সামনের দিকেই এগিয়ে গেছে।—ফিরতি পায়ের কোন ছাপ নেই, লক্ষ্য করেছিস সুব্রত? কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে।

হ্যাঁ।

শ্যামাবাবু বিশেষ কোন কথা না বলে চুপিচুপিই কতকটা যেন কিরীটী ও সুব্রতর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে থাকেন। কিরীটীই আবার কথা বলে।

কিন্তু যারাই এখানে আসুক না কেন, দুজনারই পায়ে জুতো পরা ছিল।

তারপর আলোর সাহায্যে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কিরীটী বলে, আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তো তাদের মধ্যে একজনের ডান পা-টা খোঁড়া ছিল, অর্থাৎ খুঁড়িয়ে চলে। শেষের কথাগুলো একমাত্র সুব্রতই শুনতে পায়,

শ্যামাবাবুর কানে যায় না।

যাহোক আরও কিছুক্ষণ আশপাশ পরীক্ষা করে কিরীটী ঘুরে দাঁড়ায়, চলুন, বাগানে যে ঘরে মৃতদেহ আছে, এবারে সেখানে গিয়ে একবার মৃতদেহটা দেখা যাক।

চলুন। শ্যামাবাবু বললেন।

অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এসেছে। প্রকৃতি যেন ঘন কালো এক যবনিকার আড়ালে ক্রমে আত্মগোপন করছে। চারিদিকে নেমে এসেছে একটা অতলান্ত নিস্তব্ধতা। কোথায় একটা ঝিঁঝিঁ শব্দ তুলেছে একটানা। সম্মুখে প্রসারিত অবারিত প্রান্তর যেন নিঃশব্দে রোদন করছে।

বাগানের পশ্চিম কোণে অনেকগুলো ঝাউ গাছ। সেই ঝাউ গাছের সারির মধ্যেই ছোট একখানি পাকা ভিতের টালির শেড্ তোলা ঘর টর্চের আলোয় দেখা গেল।

এককালে এটা হয়তো মালীরই আবাসস্থল ছিল, এখন সেটা অব্যবহারে অব্যবহার্য ও পরিত্যক্ত। পাশেই গ্যারেজ।

ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। শ্যামাবাবু পকেট হতে চাবি বের করে তালাটা খুলে ফেললেন।

কিরীটী শ্যামাবাবুর একেবারে পাশেই ছিল, বোতাম টিপে টর্চ জ্বালতেই ঘরের মধ্যে আলোর রশ্মি বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

একটা দড়ির খাটিয়ার উপরে মৃতদেহটা বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল।

বারেকমাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে ঘরের এদিক ওদিক আলো ফেলে দেখতে দেখতে ঘরের একটিমাত্র জানালার উপরে কিরীটীর দৃষ্টি যেন স্থিরনিবদ্ধ হল।

সেই জানালার কাচের শার্শি দুটো হা-হা করছে খোলা। প্রান্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জানালাপথে হু-হু করে ঘরে এসে প্রবেশ করছে। সে হাওয়ায় রীতিমত শীত জাগায়।

জানালার শার্শিটা কি খোলাই ছিল? কিরীটীই প্রশ্ন করে শ্যামাবাবুকে।

না তো! আমি তো নিজ হাতে দুপুরবেলা মৃতদেহ এ ঘরে রেখে যাবার সময় বন্ধ করে গেছি।

বন্ধ করে গিয়েছিলেন, ঠিক মনে আছে তো আপনার?

নিশ্চয়ই। ওর নাম কী, এ তো ভারি আশ্চর্য!

কিরীটী অতঃপর খোলা জানালাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জানালাপথে ঝুঁকে সামনের দিকে হস্তধৃত টর্চের আলো ফেলে বাইরেটা কিছুক্ষণ দেখে আবার ঘুরে জানালাটা যেমন বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ ঠিক জানালার নীচেই ঘরের মেঝেতে ওর চোখের দৃষ্টিটা আকৃষ্ট হল। কি একটা রঙ্গিন কাপড়ের মত জিনিস পড়ে আছে।

নীচু হয়ে কিরীটী জিনিসটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে হাতের টর্চের আলোয়

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, এক মিনিট, আমি আসছি।

কিরীটী সোজা বাইরে বের হয়ে ঘরের পিছনে চলে যায়।

সুব্রত আর শ্যামাবাবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। এবং একটু পরেই কিরীটী ফিরে এল।

সুব্রত তখন জিজ্ঞাসা করে, কী ওটা? জিনিসটা কিরীটী সুব্রতর হাতে দিল। একটা ছোট লেডিজ রুমাল, সবুজ রঙের সিল্কের।

হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রুমালটা থেকে একটা অতি মধুর স্নিগ্ধ অথচ পাতলা গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দেয়। কিরীটী পুনরায় রুমালটা সুব্রতর হাত থেকে নিয়ে নিজের পকেটস্থ করে।

অতঃপর সকলে আবার সেই ঘর থেকে বের হয়ে এল।

কিছুদূর এগিয়ে গেলেই বাগানের প্রাচীর-সীমানা।

বুনো আগাছায় এদিকটা একেবারে যেন ভরে আছে। কোথায় হয়তো কোন নাম-না-জানা বুনো ফুল ফুটেছে, তারই গন্ধ রাতের বাতাসে ভাসিয়ে আনে।

আচমকা একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দ ওদের কানে আসে। কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। কিসের শব্দ?

শব্দটা যেন মনে হচ্ছে সামনেরই বুনো ঝোপ থেকে ভেসে আসছে। শব্দটা কাছে, আরও কাছে মনে হয়।

কে কাঁদছে না? কিরীটী শ্যামাবাবুকে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ তাই তো, সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।

সত্যিই কে যেন চাপা-কান্না কাঁদছে। কে কাঁদে?

সুব্রত আর শ্যামাবাবুকে ফিরে যেতে বলে শব্দটা লক্ষ্য করে কিরীটী এগিয়ে যায় অন্ধকারেই কয়েক পা।

কিরীটী শব্দটা আরও ভাল করে শোনবার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই আশেপাশে কেউ কাঁদছে। কে কাঁদে?

কিরীটী আরও একটু এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই চমকে ওঠে, সামনেই বুনো ঘাসের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে কে যেন ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কে? কিরীটী এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে ভূপতিত ক্রন্দনকারীর পৃষ্ঠে হাতটা রাখে

কে? চমকে ওঠে সে।

চোখে কি এক ভয়ত্রস্ত দৃষ্টি। চোখের কোলে তখনও সুস্পষ্ট অশ্রুরেখা।

একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণী।

কে? কে আপনি? তরুণীর কণ্ঠ হতে প্রশ্ন নির্গত হয়।

সে প্রশ্ন আমিই করছি, আপনি কে? এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে কাঁদছেন কেন এমনি করে?

॥ চার ॥

কেন কাঁদছি ?

মুক্ত প্রান্তরের নিকষ অন্ধকার সাঁতরে শীতের হিমেল হাওয়া অকারণে একটা শিহরণ দিয়ে যায়। আসছে ঝরাপাতার উৎসব, এ তারই ইঙ্গিত যেন।

অশ্রু-আবিল চোখে তরুণী সম্মুখের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তরুণী গায়ের শালটা ভাল করে গায়ের ওপরে টেনে দেয়। মুক্ত প্রান্তরের খোলা হাওয়ায় শীতে গায়ের হাড় পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠে।

আপনি জানতে চান আমি কে ? কী আমার পরিচয় ? তরুণী কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলে।

হ্যাঁ।

তবে আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায় ?

এ বাগান পার হয়ে আরও দূরে খোলা মাঠের মধ্যে।

কিরীটী এক মুহূর্ত যেন কি ভাবে, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, বেশ চলুন।

তরুণী অগ্রসর হয়। কিরীটী নিঃশব্দে তরুণীকে অনুসরণ করে।

আকাশ পরিষ্কার, ঝকঝকে তারায় একেবারে ছেয়ে গেছে। স্তিমিত তারার আলোয় পৃথিবী কেমন যেন স্বপ্নময়। কোন শব্দ নেই, কোন সাড়া নেই। মাঝে মাঝে শুধু হিমেল বায়ুর ঠাণ্ডা পরশ।

তরুণীর চলার মধ্যে কোন সংকোচ নেই, স্বচ্ছন্দ সাবলীল। ঋজু দেহ, একটা কালো রঙের সিল্কের শাড়ী পরিধানে, মাথার ওপরে স্বল্প ঘোমটা টানা, গায়ে জড়ানো শাল, হাতে সোনার চুড়ি চলার তালে তালে ঝিন্ ঝিন্ করে বেজে উঠছে। অনেকটা পথ হেঁটে এসে সামনে একটা পত্রবহুল পলাশ গাছ, তারই নীচে তরুণী থেমে যায়, বসুন।

দুজনে পাশাপাশি মাটির ওপরেই উপবেশন করে।

আমার নাম না জানলেও আপনার কোন ক্ষতি নেই, মিঃ রায়।

কিরীটী চমকে ওঠে, আপনি আমাকে চেনেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু…

ভাবছেন কেমন করে আপনাকে চিনলাম, না ? আমার নামের মত সেটাও না হয় বর্তমানে আপনার কাছে অজ্ঞাতই থাক। যাক্‌গে সেকথা, যা বলবার জন্য আপনাকে এতটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে এলাম, এবারে সেই কথাতেই আসা যাক। মানিকতলার বোমার মামলারও বেশ কিছুদিন পরে। কানাই, সত্যেনের ফাঁসি হয়ে গেল, বারীন, উল্লাসকর, উপেন্দ্র প্রভৃতির হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। কিন্তু যে

বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ তারা জেবলে গেল, যে অগ্নিমন্ত্রে তারা দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে দীক্ষা দিয়ে গেল, ফাঁসির দড়িতে গলা দিয়ে তারই আত্মপ্রকাশ ঘটল একদল তরুণ যুবকের মধ্যে।

এবারে তারা ঢের বেশী সতর্ক, ঢের বেশী সাবধানী। তারা বুঝেছিল দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মধ্যে যে গৌরব আছে, যে ত্যাগ আছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার মত আজও জাতির মধ্যে চেতনার উদ্ভব হয় নি। সেই দলের মধ্যে যারা ছিল সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও অগ্রণী, তাদের নাম আজও অনেকেই জানেন না বা জানবার অবকাশও পান নি।

কিরীটী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল তরুণীর কথাগুলো।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় দূরে আকাশের এক প্রান্তে দেখা দিয়েছে শুক্লা সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ। চারিদিককার অবারিত মুক্ত প্রান্তর সেই চাঁদের আলোয় যেন সহসা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, রূপকথার রাজকন্যার মত, সোনার কাঠির ছোঁয়ায়। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। মনে যেন নেশা লাগে।

যতীন্দ্র, সন্তোষ, বারীন, কপিলপ্রসাদ, শঙ্করনারায়ণ, রাহুল, সত্যশিব, কৃপাল সিং—একবার ভেবে দেখুন, কপিলপ্রসাদ ও শঙ্করনারায়ণ বিহারের লোক, সত্যশিব মহারাষ্ট্রীয়, কৃপাল সিং পাঞ্জাবের লোক। ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঐ গুপ্ত সমিতির ছিল যোগাযোগ। অথচ মজা এই, একমাত্র দলপতি ভিন্ন এদের অন্য কেউই পরস্পর পরস্পরের আদৌ কোন পরিচয় জানত না। এমন কি মুখ-চেনাচিনি পর্যন্ত ছিল না।

এদের মধ্যে দলপতি কে ছিল?

সেও আর এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার বলতে পারেন। সেটা আজও অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এদের মধ্যে কে যে আসলে দলপতি, কী তার নাম আর কীই বা তার আসল ও সত্যিকারের পরিচয় কেউ জানে না। তবে প্রধান কর্ম-সচিবদের মধ্যে প্রত্যেকের একটা করে সাঙ্কেতিক নম্বর ছিল। 'এক', 'দুই', 'তিন', 'চার' করে 'দশ' নম্বর পর্যন্ত। দলপতির নম্বর ছিল 'এক'। ঐ গুপ্ত সমিতির একটা বিশেষ নিয়ম, সকলকে দলভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যেটা মেনে চলতে হত সেটা এই ঃ কেউ পরস্পর পরস্পরের পরিচয় জানবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। ভারতের সর্বত্র, বিভিন্ন স্থানে, এ দল ছড়িয়ে থাকত ও কর্মসচিবদের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করে যেতে হত। কর্মসচিবরাও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকত কার্যব্যাপদেশে। তবে মাঝে মাঝে সমিতির বিশেষ কোন অধিবেশন বা জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন হলে, কোন-না-কোন জায়গায় একত্রে মিলিত হত তারা।

আচ্ছা, তখনও কি ঐ দশজন কর্মসচিব পরস্পর পরস্পরকে জানার অবকাশ পেত না?

না। তার কারণ ঐ সব গুপ্ত সভার অধিবেশনে, প্রত্যেকেই মুখে মুখোশ এঁটে

আসতেন এবং প্রত্যেকের মুখোশের ওপরে নিজস্ব সাঙ্কেতিক ক্রমিক নম্বরটি বড় অক্ষরে লেখা থাকত, সেটাই হত তাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয়ের উপায়।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ, এ ধরনের সাবধানতা তারা নিয়েছিল এইজন্য যে, যাতে করে কখনও তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারে, কেউ কারও গতিবিধি বা আসল পরিচয়টুকু পর্যন্ত না জানতে পারে। অথচ প্রত্যেকেই নির্বিবাদে দেশের কাজ করে যেতে পারে গোপনে। চিঠি বা দূতের মারফৎ দলের লোকেরা যে যার কাজের নির্দেশ পেত। এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে বিপদ-আপদ আসত না তা নয়। কিন্তু দলের মধ্যে ভাঙন ধরে নি। বিদেশ হতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি হল প্রচুর, অস্ত্রচালনা শিক্ষা নিয়মিত চলতে লাগল, মহাবিপ্লবের প্রস্তুতি চলেছে গোপনে গোপনে, এমন সময়—

তরুণী কথা বলতে বলতে থামল।

গাছের ডালে কয়েকটা পাখী ডানা ঝট্‌পট্‌ করে। কয়েক ফোঁটা শিশির বৃক্ষপত্র হতে ওদের গায়ে ঝরে পড়ে।

কিরীটী একটা সিগার বের করে মৃদুকণ্ঠে বলে, আপত্তি নেই তো?

তরুণী জবাব দেয়, নিশ্চয়ই না।

কিরীটী সিগারে অগ্নিসংযোগ করলে।

এমন সময় তরুণী আবার মৃদুকণ্ঠে শুরু করে, কোথা থেকে ভেসে এল একটা বিশ্রী সন্দেহের কালো মেঘ। প্রথমে কানাকানি। শেষ পর্যন্ত দলের কর্মসচিবদের আর কারও সে কথা জানতে বাকি রইল না।

প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, ১৯১৯ সন। 'রাউলাট বিল' পাস হয়ে গেছে। দেশের সর্বত্র একটা থমথমে ভাব, বিশেষ পাঞ্জাবে যেন ঘনঘোর ঘটা। কর্মসচিবরা প্রত্যেকেই পরোয়ানা পেল: বিহারের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি গ্রামে এক কৃষকের কুটিরে সমিতির এক বিশেষ জরুরী গুপ্ত অধিবেশন বসবে।

ডিসেম্বর মাস। বিহারে সেবারে প্রচণ্ড শীত। রাত্রি দেড়টায় অধিবেশন বসবার কথা। কাঁচা মেঠো পথ ধরে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে যাবার পর ছোট একটি কৃষকপল্লী। সেই পল্লীর এক কৃষকের মাটির ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে।

ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ হলেও, দরজা-জানালার ফাঁকে ফাঁকে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে।

একটা ছিন্ন মাদুর বিছিয়ে সমিতির দশজন কর্মসচিব গোল হয়ে বসেছেন।

সহসা দলপতি 'এক' নম্বর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলা শুরু করলেন: বন্ধুগণ! এই অসময়ে এই নির্জন গ্রামে কেন আপনাদের মিলনের জন্য জরুরী আহ্বান জানিয়েছি, তা হয়তো না বললেও অনেকেই আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, আমাদের দশজনের মধ্যে একজন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গুপ্তচর। এবং আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন এ পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তারও আগে সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে আমরা বলছি, সত্যকারের পরিচয় দিয়ে নিজেকে আমাদের সকলের সম্মুখে এই মুহূর্তে surrender করতে।

ঘরের মধ্যে যেন সহসা বজ্রপাত হল।

কোথায় দূরে গ্রামপ্রান্তে একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল, নৈশরাতের অন্ধকারে যেন করুণ কান্নার মতই।

ঘরের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা থম্ থম্ করছে। মোমবাতির শিখাটা বারেকের জন্য কেঁপে উঠল।

আপনাদের মধ্যে যার যার কাছে রিভলবার আছে, দেশমাতৃকার নামে শপথ করে সকলে এইখানে রাখুন।

প্রথমেই দলপতি তাঁর রিভলবারখানি সামনে মাদুরের উপরে নামিয়ে রাখলেন, এই আমি রাখলাম।

দুই, তিন, পাঁচ, ছয় প্রত্যেকে একে একে যে যার রিভলবার বের করে দেন, কেবল চার নম্বর বাকি।

সহসা এমন সময় দড়াম করে ঘরের দরজাটা গেল খুলে ও সেই সঙ্গে দপ্ করে নিভে গেল ঘরের মধ্যে একটিমাত্র মোমবাতির ক্ষীণ শিখাটি। মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র আঁধারে ঘরখানি অবলুপ্ত হয়ে গেল।

বাইরে আঙ্গিনার ওপরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। কে ? কারা ? দলপতির বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল, Traitor ! বিশ্বাসঘাতক !

Hurry up ! Gentlemen ! পালান্—পুলিস !

কিন্তু ততক্ষণে পুলিসবাহিনী সমগ্র বাড়িখানা চারিপাশ থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে।

তারপর অন্ধকারে শুরু হল মরণ-বাঁচন সংগ্রাম। যায় প্রাণ যাক। কিন্তু জীবিত কেউ যেন না ধরা দেন। যে যেভাবে পারুন আত্মরক্ষা করুন।—চাপা কণ্ঠে দলপতির নির্দেশ শোনা গেল। নিস্তব্ধ গ্রামখানি গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে। নৈশরাত্রির অন্ধকার যেন ফালি ফালি হয়ে যায়।

তরুণী আবার চুপ করল।

তারপর ? চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কিরীটী প্রশ্ন করে, তারপর ?

তারপর ? হ্যাঁ, তারপর রাত্রি প্রভাত হল সারাটি রাত্রি ধরে সংগ্রামের পর। পুলিসবাহিনী যখন বাড়িটা নিজেদের আয়ত্তে আনলে, দেখা গেল দু নম্বর, তিন নম্বর ও পাঁচ নম্বর মৃত, বাকী আর কারও কোন পাত্তা নেই। এবং ঐ ব্যাপারের পরই দলের মধ্যে যেন ভাঙন ধরল।

একটা ঝোড়ো হাওয়া যেন সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল। চারিদিকে

ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। শুরু হল পুলিসের জঘন্য অত্যাচার। একটি বছর সমিতি যেন কোথায় তলিয়ে রইল। তাদের কোনও সাড়াশব্দ আর নেই। একটা গুপ্ত সমিতি যে এভাবে একদিন সকলের অজান্তে নিঃশব্দে গড়ে উঠেছিল তাও যেন সকলে ভুলে গেল।

তরুণীর কণ্ঠে কোথায় যেন একটা ব্যথার সুর ধ্বনিয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস।

তারপর ?

তারপর দীর্ঘ এক বছর পরে, এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে আচম্‌কা সহসা আবার দলপতির আহ্বান এল সমিতির যে সব কর্মীরা তখনও জীবিত ছিল তাদের কাছে। জরুরী আহ্বান।

আচ্ছা একটা কথা, চার নম্বরের সম্পর্কেও ঐ রাত্রির পর আর কোন উচ্চ বাচ্চই কি হয় নি ?

হয়েছিল। সে রাত্রে সেই গোলমালের মধ্যে চার নম্বরও অন্যান্যদের সঙ্গে আত্মগোপন করে। সকলে তাকে ভুলে গেলেও, দলপতি অর্থাৎ এক নম্বর তাকে কোনদিনই ভুলতে পারে নি। গোপনে গোপনে ঐ এক বছর ধরে চার নম্বরের সন্ধানে দলপতি ফিরতে থাকে। কিন্তু সবই বৃথা। চার নম্বর যে কোথায় কী বেশে আত্মগোপন করল, কোনমতেই সে কথা দলপতি জানতে পারল না। সে যেন হাওয়ায় উবে গেল। যাক্, যে কথা বলছিলাম, সেই বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীতে অবস্থাপন্ন ধনীর গৃহে মিলনের স্থান নির্দেশ করা হল। রাত্রি একটায় সকলে মিলিত হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল, দলপতির সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন মাত্র তিনজন।

মাত্র তিনজন ?

হ্যাঁ, মাত্র তিনজন। দলপতি ছাড়া ছয় আট ও দশ নম্বর।

তরুণী একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, দীর্ঘ এক বৎসর পরে দলপতি বোধ হয় ঐভাবে আবার আহ্বান না জানালেই পারতেন !

কেন ?

কেন ? তার কারণ ঐ এক বৎসরে কর্মীদের মনের ও চিন্তার অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। আট ও দশ নম্বর তো স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবেই সেই রাত্রে জানিয়ে দিল তারা এভাবে আর সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে রাজী নয়। তাদের মতের পরিবর্তন হয়েছে। এবং তাদের ধারণা এভাবে গুপ্ত সমিতি গড়ে, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এত বড় দুর্দান্ত পরাক্রমশালী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনদিনই সাফল্যলাভ করতে পারবে না। মাঝ থেকে কতকগুলো মূল্যবান প্রাণ অকালে নষ্ট হয়ে যাবে শুধু। হয়তো তাদের কথাই ঠিক। হয়তো নয়। কিন্তু দলপতি তাদের কথা শুনে যেন সহসা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর এতদিনকার স্বপ্ন যেন একদণ্ডে রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে দলপতি কথা বললেন, তা হলে কি সত্যিই আপনারা এই স্থির করেছেন ?

হ্যাঁ। আপনিও অনুগ্রহ করে ভেবে দেখবেন, আমাদের এ ধারণা সত্য কিনা ?

আমার কথা ছেড়ে দিন। যা আমি আমার জীবনে একবার সত্য বলে মেনে নিয়েছি, আজ এতদিন পরে তাকেই আবার মিথ্যা বলে বর্জন করবার দুর্বলতা আজও যেমন আমার নেই, ভবিষ্যতেও তেমনি কোন দিনই হয়তো হবে না। কিন্তু যাক্ সে কথা, আপনাদের কাছে আমার শেষ মিনতি, সমিতি থেকে আপনারা বিদায় নিতে চান নিতে পারেন, কিন্তু দেশদ্রোহীকে যেন কোনদিনই না ক্ষমা করেন। আচ্ছা আসি তা হলে, নমস্কার।

নিঃশব্দে দলপতি ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

তারপর ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তারপর ? অনেক—অনেকদিন পরে, একটু থেমে তরুণী শুরু করে আবার যেখানে কাহিনী শুরু হচ্ছে—সে কিছুদিন আগেকার, বাংলা দেশের পটভূমিকায়। দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হবে, তারই আয়োজন চলেছে দিকে দিকে। আসন্ন প্রলয়ের অগ্নি-ইশারা। আর সেই পটভূমিতে এসে দেখা দিল বর্তমান কাহিনীর 'কালো-পাঞ্জা'। 'কালোপাঞ্জা'র নাম শুনেছেন কি, মিঃ রায় ?

না।

শোনেন নি ?

না। কিরীটী জবাব দেয়।

তরুণী যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক। সুদূর প্রসারিত আবছা চাঁদের আলোয় ধ্যানগম্ভীর পৃথিবী। নিঃসঙ্গ একাকী।

তরুণী একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, কুৎসিত বিকৃত কল্পনার একটা বিকৃত রূপ যেন এই 'কালোপাঞ্জা'।

কিরীটী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে, কেন ?

কেন ? সেই তো আমার আসল বক্তব্য। আসলে সেইটুকু শোনাবার জন্যই আগের ঐ কাহিনী আপনাকে আমায় বলতে হল। আসলে অবিশ্যি সভ্য জগতে 'কালোপাঞ্জা'র আবির্ভাব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও প্রায় বছর তিন-চার আগে। একটা উন্মাদ প্রতিহিংসার তাড়নায় সুকল্পিত চিন্তা ও বুদ্ধির দীপ্তি যে কিভাবে বিকৃত হয়ে যেতে পারে, সে এই 'কালোপাঞ্জা'র পরিণতি না দেখলে চিন্তাও করা যায় না। যেমনি বেদনাক্লিষ্ট তেমনি মর্মন্তুদ। অথচ মজা এই···

তরুণীর শেষের কথাগুলো আর শেষ হতে পারল না, সহসা একটা দীর্ণ চিৎকার যেন নিশুতি রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতাকে ফালি ফালি করে দিয়ে গেল।

দুজনেই চমকে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

আবার সেই চিৎকার শোনা গেল।

চকিতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

।। পাঁচ ।।

কে অমন করে চিৎকার করে উঠল ?

তরুণীও ততক্ষণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, দু'চোখের দৃষ্টিতে তখন তার ভীতির সুস্পষ্ট ব্যাকুলতা। মৃদু জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির অতলান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা যেন শব্দের একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠে মুহূর্তে আবার যেন মিলিয়ে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে শব্দতরঙ্গ নিস্তব্ধতার মহাসমুদ্রে যেন।

অদ্ভুত স্তব্ধতা।

মনে হল যেন ডান দিক থেকেই শব্দটা ভেসে এল। কিরীটী আবার কথা বলে, চলুন একটু এগিয়ে দেখা যাক।

চলুন। তরুণী ক্ষীণ স্বরে জবাব দেয়, কণ্ঠে তার এতটুকু আগ্রহও নেই। একান্ত নিস্পৃহ। কিরীটী এগিয়ে চলে, তরুণী তাকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে।

হঠাৎ ঐ সময় যেন প্রকৃতির বুকে নেমে এসেছিল একটা পাতলা কুয়াশার পর্দা চাঁদের আলোকে আবরিত করে। ধূসর ধূলোট একটা যবনিকা।

কিরীটী চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। যে পথ ধরে এদিকে সে এসেছিল তরুণীর আহবানে, সেই পথ ধরেই ফিরে চলে টর্চের আলো ফেলে। গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে কিরীটী পথ চলছিল, সহসা কি একটা পায়ে ঠেকতেই হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে টর্চলাইটটা জেবলে ফেলে, যেটা ঐ সময় আপনা থেকেই তার অন্যমনস্কতায় নিভে গিয়েছিল। টর্চের আলোয় যে দৃশ্য সেই মুহূর্তে কিরীটীর চোখে পড়ে, সে যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বীভৎস।

একটা নিশ্চল দেহ মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ভূপতিত ব্যক্তির সমগ্র পৃষ্ঠদেশ রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে। সম্মুখের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রসারিত।

কিরীটী ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দু-পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে সামলে নেয়।

ভূপতিত নিশ্চল দেহটির পাশে কিরীটী বসে পড়ে। পরীক্ষা করে বুঝতে পারে, দেহে তখন তার প্রাণের কোন সাড়াই নেই, প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গিয়েছে।

কিরীটী মৃতদেহটি উল্টে দিল। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি প্রৌঢ়। মাথায় পাগড়ী, পরিধানে শালোয়ার, গরম ভায়লার পাঞ্জাবি ও গরম সার্জের দামী কোট। পায়ে পেশোয়ারী চপ্পল। লম্বাচওড়া বলিষ্ঠ গঠন। একজোড়া ভারী পাকানো গোঁফ। লোকটি যে বাঙালী নয়, তা প্রথম দৃষ্টিতেও বুঝতে কষ্ট হয় না। হয় বিহারী, না হয় পাঞ্জাবী। তবে শেষোক্তরই সম্ভাবনা বেশী।

চৌকো দৃঢ় চোয়াল। পুরু ওষ্ঠ। পিঠের উপরে গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখে মনে হয় কোন ধারালো তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে অতর্কিতে পশ্চাৎ দিক হতে আক্রমণ করে

লোকটিকে ক্ষণপূর্বে হত্যা করা হয়েছে। ক্ষতস্থানটি পরীক্ষা করতে গিয়ে কিরীটী চমকে ওঠে। ধূসর রঙের সার্জের কোটের উপরে অস্পষ্ট কিসের একটা চিহ্ন! আরো ভাল করে পরীক্ষা করতেই বোঝা যায়, সেটা আর কিছুই নয়, ছাপ পড়েছে একটি 'কালোপাঞ্জা'র।

কিরীটী এতক্ষণ মৃতদেহ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, সহচরী তরুণীটির কথা একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিল। সহসা এমন সময় তরুণীর কথা মনে পড়ায়, সম্মুখে পশ্চাতে আশেপাশে তাকিয়ে কোথায়ও তরুণীকে দেখতে পেলে না। আশ্চর্য! কোথায় গেল সেই তরুণী? ইতিমধ্যে কখন একসময় হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেছে। কোথাও তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কোথায় গেলেন? শুনছেন?

নামটাও জানে না কিরীটী। কি নামেই বা ডাকে? বিব্রত বিহ্বল কিরীটী চারিদিকে অনুসন্ধানী ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে, কুয়াশার ঘন যবনিকা দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। শিশির-ঝরা শীতের তামসী রাত্রি কুয়াশার ঘন অবগুণ্ঠনতলে যেন হারিয়ে গিয়েছে। সামনেই রক্তাক্ত প্রাণহীন নিশ্চল দেহ।

কিরীটী মৃতের জামা-কাপড় অনুসন্ধান করতে শুরু করে, যদি মৃতের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়—পাওয়া যায় কোন পরিচিতি এই অজ্ঞাতকুলশীলের।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মৃতের পকেট হতে একটি চামড়ার পার্স, একটি দোফলা বড় ছুরি, একটি কলিকাতা হতে মধুপুরের সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট—এ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। পার্সটা খুলতে তার মধ্যে পাওয়া গেল দশ টাকার চারখানা নোট, একটা ইংরাজী সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের কাটিং ও ভাঁজকরা আকাশ-নীল রঙয়ের পুরু লেটার-পেপারে একখানা ছোট সংক্ষিপ্ত টাইপ করা ইংরাজী চিঠি। চিঠির বাংলা তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়ঃ

আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি দশটায় মধুপুরে সন্তোষ চৌধুরীর 'মাধবী ভিলা'র পশ্চাতে ময়দানে শিমুল গাছের নীচে দেখা করো, অত্যন্ত জরুরী। কোনমতেই যেন ভুল না হয়। অন্যথায় অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা। আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি দশটায়। ইতিঃ

'কালোপাঞ্জা'

আবার 'কালোপাঞ্জা'! ভয়ংকর একটা নিষ্ঠুর কালোহাত যেন বাড়িয়ে রক্ত শোষণ করে বেড়াচ্ছে। নৃশংস! তরুণীটি একটু আগে বলছিল, এই 'কালো-পাঞ্জা'রই কথা। বলছিল, উন্মাদ প্রতিহিংসার তাড়নায় সংকল্পিত বুদ্ধির বিকৃত প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা আর লাভ কি? রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, কিরীটী ফিরে চলে কতকটা যেন হতাশ হয়েই।

আনমনে চিন্তা করতে করতে কিরীটী 'মাধবী ভিলা'য় ফিরে এল।

সুব্রত একা বাইরের ঘরে একটা সোফার উপরে বসে ঘরের আলোয় কি একখানা

ইংরাজী নভেল পড়ছিল। পদশব্দে চমকে মুখ তুলে সামনেই কিরীটীকে দেখে প্রশ্ন করে, তুই! কোথায় উধাও হয়েছিলি বল তো? এতক্ষণ ছিলিই বা কোথায়?

কিরীটী প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে, ক্লান্ত দেহভার সামনে একটি সোফার ওপরে এলিয়ে দিয়ে পকেট থেকে সিগার-কেস্‌টা বের করল।

পরম নিশ্চিন্তে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ ক'রে ধোঁয়া উদ্গিরণ করতে শুরু করে। সুব্রত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কিন্তু ও জানে, কিরীটী নিজে থেকে কথা না বললে কারও ক্ষমতা নেই তাকে কথা বলায়। হাতের অর্ধপঠিত বইখানা কোলের উপরে মুড়ে রেখে সুব্রত উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর ভাবলেশ-হীন মুখের দিকে অপলকে। ঘরের মধ্যস্থিত বড় ঘড়িটা টক্ টক্ করে সময়ের বুকে একটানা শব্দতরঙ্গ জাগিয়ে চলেছে। বাইরে নিঃসঙ্গ বোবা শীতের রাত্রি শিশিরসিক্ত কুয়াশা জড়িয়ে যেন শেষপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ কিরীটী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, কখন তোরা ফিরে এলি?

তুই আচমকা উধাও হবার ঘণ্টাখানেক পরেও যখন ফিরে আসিস্ না, তখন আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে কি করব, ফিরে এলাম।

সুব্রত, তোরা একটা চিৎকার শুনেছিলি?

চিৎকার? কই, না তো!

কোনরকম চিৎকার বা শব্দই শুনিস নি?

না। কিন্তু ওকথা জিজ্ঞাসা করছিস কেন?

না কিছু না, কিন্তু এরা সব কোথায়?

শ্যামাচরণবাবু থানায় চলে গেছেন, বলে গেছেন সকালেই আসবেন। মিঃ চাকলাদার আর ফেরেন নি।

ভাল কথা, মিসেস চৌধুরী আমাদের আগমন-সংবাদ পেয়েছেন? তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলাম। বললেন, আজ তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ, কাল সকালে দেখা করবেন। ভৃত্যকে দিয়ে আমাদের আহার ও থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আচ্ছা সুব্রত?

কি?

কালোপাঞ্জার নাম শুনেছিস কখনও?

কালোপাঞ্জা!

হ্যাঁ।

না। কই, মনে পড়ছে না তো? প্রথমে এখানে আসবার পর ঐ নামটা শোনা অবধি অনেক ভেবেছি, কিছুই মনে পড়ছে না।

এমন সময় ঘরের বাইরে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি ঢং ঢং করে রাত্রি তিনটে ঘোষণা করল। পদশব্দে সুব্রত ও কিরীটী দুজনে চমকে মুখ তুলে দরজার দিকে ততক্ষণে একই সঙ্গে তাকিয়েছে।

যেন অত্যন্ত ধীর ক্লান্ত পদে একটি ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। মাথায় স্বল্প ঘোমটা। গায়ে একখানা দামী কমলালেবু রঙের কাশ্মীরী শাল। পায়ে ঘাসের চপ্পল।

মহিলাটিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে কিরীটী ও সুব্রত দুজনেই একসঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মহিলা ধীর ক্লান্ত পদে এসে ওদের সামনের একটি সোফা অধিকার করে বসলেন।

বসুন। আপনারাই কলকাতা থেকে এসেছেন আমার স্বামীর চিঠি পেয়ে?

কণ্ঠস্বরের অভূতপূর্ব মিষ্টত্বে কিরীটী যেন মুগ্ধ, বিস্মিত। কোন মানুষের কণ্ঠস্বর যে এত স্নিগ্ধ হতে পারে, এ যেন তার চিন্তারও অতীত ছিল। কণ্ঠস্বর তো নয়, যেন সঙ্গীতের মূর্ছনা।

ভদ্রমহিলা নিশ্চল হয়ে সোফার উপরে বসেন। হাত দুটি আলতো ভাবে কোলের ওপরে ন্যস্ত।

কিরীটী ভদ্রমহিলার আনত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ভদ্রমহিলার বয়স যতই হোক না কেন, সুঠাম সযত্নলালিত দেহাবয়ব দেখে মনে হয় এখনও বুঝিবা তিনি তিরিশের কোঠা পার হন নি। স্বল্প ঘোমটার দুই পার্শ্বদেশে অপর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশদাম শুধু সুন্দর নয়, অপূর্ব। হাতের সোনার চুড়ির উপরে বাতির আলো প্রতিফলিত হয়ে চিক্‌চিক্ করছে।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই, বারান্দায় পায়চারি করছিলাম, এমন সময় নীচে এই ঘরে আলো দেখে ভাবলাম, হয়তো এখনও আপনারা জেগেই আছেন, তাই এলাম। আপনাদের বিশ্রামে বা আলাপে ব্যাঘাত করলাম না তো? মহিলা চোখ তুলে শেষের দিকে ওদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

না, না। বরং আপনি নিজে এসেছেন আমাদের কাছে, আমরা তাতে সুখীই হয়েছি। কিরীটী জবাব দেয়।

আপনাদের পরিচয় জানতে পারি কি?

আমার নাম কিরীটী রায়, এর নাম সুব্রত রায়।

একটা কথা মিঃ রায়, আমার স্বামীর সঙ্গে কি আপনাদের কোন পূর্বপরিচয় ছিল?

না। এবারেও কিরীটী জবাব দেয়।

আমার স্বামীর যে চিঠিখানা আপনারা পেয়েছিলেন, সে চিঠিখানা একটিবার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়। কিরীটী পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে মহিলার দিকে এগিয়ে দেয়, মিসেস্ চৌধুরী তার প্রসারিত হস্ত হতে চিঠিখানি নিয়ে চোখের সামনে বাতির আলোয় খুলে ফেললেন। চিঠিটার উপরে চোখ বুলিয়েই বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য!

আশ্চর্য ! কি ?

এ চিঠি তো আমার স্বামীর হাতের লেখা নয় ?

সে কি !

হ্যাঁ। সত্যি বলছি মিঃ রায়, এ চিঠির হস্তাক্ষর আদপেই আমার স্বামীর নয়।

কিরীটী মিসেস্ চৌধুরীর কথাটা শুনে শুধু বিস্মিতই নয়, বিমূঢ় হয়ে বলে, আপনি ঠিক জানেন মিসেস্ চৌধুরী, এ আপনার স্বামীর হাতের লেখা নয় ?

ক্ষীণ একটুকরো হাসি মিসেস্ চৌধুরীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। বলেন, না, এ আমার স্বামীর হস্তাক্ষর নয়।

চকিতে কিরীটী যেন কি ভাবে মনে মনে এবং পরক্ষণেই প্রশ্ন করে, আচ্ছা এ হস্তাক্ষরের সঙ্গে আপনার কোন পরিচয় আছে কি ?

মিসেস্ চৌধুরী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ। এ হাতের লেখা আমার পরিচিত বটে, তবে কিছুতেই যেন মনে করতে পারছি না—কার এ হস্তাক্ষর ! মিসেস্ চৌধুরীকে হঠাৎ যেন কেমন চিন্তিত মনে হয় কিরীটীর।

অতঃপর কিছুক্ষণ তিনজনই চুপচাপ বসে থাকে, কারও মুখে কোন কথা নেই।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বাইরে কুয়াশাক্লিষ্ট অন্ধকার হয়ে আসছে তরল। খোলা দরজা-পথে রাত্রিশেষের হিমেল বায়ু ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করছে। সেই সঙ্গে ভেসে আসে একটা মিশ্রিত ফুলের সৌরভ।

ঘড়িটার একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল সেই স্তব্ধতার মধ্যে।

মিসেস্ চৌধুরীর মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, অপূর্ব একটা শান্ত সমাহিত ভাব। কিছুক্ষণ পরে আবার মিসেস্-চৌধুরী বলেন, না মিঃ রায়, কিছুতেই মনে আসছে না। অথচ এ হস্তাক্ষর আমার পরিচিত। হয়তো আমার ছেলে নির্মল এলে বলতে পারবে। ইদানীং সব কথা আমার ভাল করে মনেও থাকে না।

মিসেস্ চৌধুরী ? কিরীটী আচমকা প্রশ্ন করে।

বলুন !

গতরাত্রের দুর্ঘটনাটি যদিও শ্যামাবাবুর মুখে আমরা সবই শুনেছি, তবু আপানার যদি কষ্ট না হয়, আপনার মুখে—আপনার জবানীতে আনুপূর্বিক সমগ্র ঘটনাটি আবার আমি শুনতে চাই। আশা করি এতে আপনার কোন আপত্তি হবে না।

না, আপত্তি কি ! বলে বলতে লাগলেন, আমার স্বামী চিরদিনই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রথম বয়সে বিবাহের পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ খুবই কম হত। নির্মল—আমার ছেলের বয়স যখন তিন কি চার বছর, সেই সময় হঠাৎ আমার স্বামী কলকাতায় ব্যবসা শুরু করেন সামান্য লোহালক্কড়ের এবং প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে সেই আমারও স্বামীর ঘর করা শুরু। অত্যন্ত হিসেবী ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তিনি—বলছি যখন কোন কথাই গোপন করব না, মিঃ রায়। মিসেস্ চৌধুরী বলতে লাগলেন, তবে একটা কথা আমার বরাবরই মনে হয়েছে—

স্বামীর জীবনে এমন একটা কিছু ঘটনা আছে যা তিনি আমার কাছেও যেন গোপন করবার চেষ্টা করতেন এবং আরও একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হত, তিনি সংসারের মধ্যে থেকেও যেন সংসারী নন। মাটির ঘরের স্নেহ, মমতা, বন্ধন যেন কোনদিনই তাঁকে বাঁধতে পারে নি। সব কিছুর সঙ্গে জড়িত থেকেও যেন তিনি সব কিছু হতেই ছিলেন দূরে—অনেক দূরে।

মিসেস্ চৌধুরী একটু থামলেন। তারপর আবার তিনি বলতে শুরু করলেন, অথচ কি স্নেহ ও মমতাই যে ছিল তাঁর অন্তরে, তা ভাবলেও বিস্ময় জাগে।

আপনার স্বামীর চরিত্রের এই অসঙ্গতির কারণটা কি কোনদিন আপনি জানবার চেষ্টা করেন নি ?

না। কারণ জানতাম তিনি সেটা পছন্দ করেন না।

কখনও আপনার কানেও কিছু আসে নি বা চোখেও কিছু পড়ে নি ?

না।

আচ্ছা মিসেস্ চৌধুরী, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা আপনাকে আমার বলা প্রয়োজন বোধ করছি।

বলুন।

আপনার কথায় বোঝা গেল, যে পত্রের উপরে নির্ভর করে আমরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি ও ঘটনাচক্রে এই বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, সেই পত্রটাই আপনার স্বামীর প্রেরিত নয় বলে আপনি বলছেন, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ।

সেক্ষেত্রে আপনার কি ইচ্ছা, এই ঘটনার তদন্তের ভার আমরা হাতে নিই, না......

কিরীটীর বাকী কথা শেষ হল না, মিসেস্ চৌধুরী মৃদু সংযত কণ্ঠে বললেন, মিঃ রায়, আপনি যে চিঠির উপরে নির্ভর করে এখানে এসেছেন। সে চিঠি সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, আমার তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। তাছাড়া চিঠিখানার গুরুত্ব যাই থাকুক না কেন, আমার স্বামী কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন, সেটাই বর্তমানে সবচাইতে বড় কথা। এবং ঠিক সেই কারণেই এত রাত্রে আপনাদের সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি, যদিও জানতাম না ঘুণাক্ষরেও এই চিঠির সত্যতা সম্পর্কে কোন কথা এখানে আসবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু সে যাই হোক, আপনাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আপনাদের যদি সত্যি কোন শক্তি থাকে তা হলে এই দুর্ঘটনার একটা কিনারা করে দিয়ে যান। আমার মৃত স্বামী আর বেঁচে উঠবেন না জানি, তবে তাঁর হত্যাকারীকে এবং এই নিষ্ঠুর হত্যার কারণটাও অন্তত যদি জানতে পারি, তা হলে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পাব মনে।

বেশ, তবে তাই হবে। কিন্তু আপনাকেও একটি প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে।

বলুন।

আমার সকল প্রশ্নের অকপট জবাব আপনার নিকট হতে যেন পাই।

পাবেন। আমি যতটুকু জানি, কিছুই গোপন করব না।

এমন সময় সহসা বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটি যুবক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

কিরীটী ও সুব্রত দুজনেই চমকে সামনের দরজার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

কে, নিমু? মিসেস্ চৌধুরী তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মা! যুবক এগিয়ে আসে।

কিরীটী দেখছিল, যুবক দ্রুতপদে এসে দণ্ডায়মানা জননীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

কয়েক মুহূর্ত এমনি ভাবেই কেটে যায়।

বোস নিমু। মা বলেন।

ছেলে ও মা পাশাপাশি সোফাটার উপরে উপবেশন বরে।

॥ ছয় ॥

কিরীটী আগন্তুক মৃত মিঃ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান নির্মল চৌধুরীকে তার স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। সাধারণতঃ বাঙালীর মধ্যে এমন চমৎকার দেহসৌষ্ঠব বড় একটা চোখে পড়ে না। প্রায় ছয় ফুট সমুন্নত পেশল উন্নত গঠন, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উন্নত নাসা, ভাসা-ভাসা দুটি চক্ষু, সমগ্র মুখাবয়বের মধ্যে যে সামান্য খুঁতটা একান্ত বিসদৃশভাবে চোখকে পীড়া দেয়, সেটা হচ্ছে নির্মল চৌধুরীর পুরু ও কালো দুটি ওষ্ঠ। চৌকো চোয়াল রূঢ়তার পরিচায়ক; মাথায় ঘনবিন্যস্ত কোঁকড়া চুল পরিপাটী করে ব্যাক্‌ব্রাশ করা।

পরিধানে দামী শৌখিন বিলাতী নেভি-ব্লু সার্জের গরম সুট। কোটের বোতাম খোলা।

চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ ও চিন্তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। দু হাতের মুঠোর মধ্যে মার বাঁ হাতখানি আলগাভাবে ধরে আছে। হাতের আঙুলগুলো লম্বা মোটা মোটা। কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর নখগুলো, গোড়ার দিক হতে মোটা হয়ে ক্রমে সরু হয়ে গেছে। ডান হাতের অনামিকায় একটি হীরার আংটি ঝিলমিল করে আলোয়। মার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্মল বলছিল, কলকাতার বাইরে রানাঘাটে একটা বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে অফিসে সুবিমলবাবুর 'তারটা' পেলাম।

আপনি তাহলে এখানকার টেলিগ্রাফ পেয়েই আসছেন মিঃ চৌধুরী? আচম্‌কা নির্মলের কথার মাঝখানে কিরীটী বলে ওঠে।

য়্যাঁ! নির্মল চৌধুরী কিরীটীর আচম্‌কা প্রশ্নে কতকটা যেন চমকে উঠে একটু থতমত খেয়েই প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই যেন আবার নিজেকে

সামলে নিয়ে শান্ত ও স্পষ্ট স্বরে বলে, হ্যাঁ, টেলিগ্রাফ পেয়েই আসছি। কিন্তু আপনার তো···

সংক্ষেপে দু-চার কথায় কিরীটী তার পরিচয় ও এখানে আসবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে বলে, আপনার গতকাল বম্বেতে যাওয়ার কথা ছিল না, মিঃ চৌধুরী ?

হ্যাঁ, কিন্তু কতকগুলো আর্জেন্ট ব্যাপারে কলকাতার অফিসে আটকা পড়ায় কয়েক দিনের জন্য বম্বে যাওয়া পোস্টপণ্ড করেছিলাম।

আপনি এখানকার থানা-ইন-চার্জ শ্যামাবাবুকে 'তার' করেছিলেন যে আপনি রওনা হচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

একটা কথা, গতকাল আপনি ঠিক কোন্ সময় শ্যামাবাবুর প্রেরিত 'তার'টা পান ? রানাঘাট হতে ফিরে এসে নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ,···মানে···কাল রানাঘাট হতে ফিরেই—বেলা প্রায় গোটাদশেক নাগাদ হবে।

ওঃ ! কি লিখেছিলেন তিনি তারে ?

লিখেছিলেন : **Father expired, come sharp** !

সেটা—মানে সেই তারটা কি আপনার সঙ্গেই আছে মিঃ চৌধুরী ?

হ্যাঁ, এই যে দেখুন না। বলতে বলতে নির্মল চৌধুরী পকেট হতে তারটা বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দেয়।

নির্মল চৌধুরীর হাত থেকে তারটা নিয়ে তারটার ওপরে চোখ বুলিয়ে কিরীটী বলে, বেলা সাড়ে নটায় কলকাতায় তার পেঁছেছে দেখছি। আপনি পেয়েছেন দশটা নাগাদ হবে। আর্জেন্ট তার। কথাগুলো কতকটা স্বগতোক্তির মতই শোনায়। তারপর একটু থেমে আবার বলে, আপনি wire করেছিলেন কখন ?

তখনই—তার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়।

মিঃ চৌধুরী ! কিরীটী আবার প্রশ্ন শুরু করে, কিন্তু তার এবারকার কণ্ঠস্বর যেন ঠিক আগেকার মত সহজ মনে হয় না সুব্রতর।—আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আপনি জানেন না বোধ হয়, আপনার পিতার মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক—মানে **natural** নয় !

চমকে নির্মল চৌধুরী কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, হ্যাঁ, কি বললেন ?

বলছিলাম আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে, আপনার পিতাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে ! মানে—**He has been brutally murdered** !

সে কি ?

মিসেস চৌধুরী পুত্রের দিকে তাকালেন। মুখে কোন কথা নেই, কেবল অবিরল ধারায় দু চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তখন তাঁর।

What do you mean by brutally murdered ! কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ? নির্মল বলে ওঠে।

তিনি সত্যি-সত্যিই নিহত হয়েছেন।

আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায় ! বাবা নিহত হয়েছেন—

কিরীটী এবার সংক্ষেপে যতটুকু জানত, সন্তোষ চৌধুরীর হত্যাকাহিনী বিবৃত করে গেল।

কিরীটীর কথাগুলো শুনে কিছুক্ষণ নির্মল যেন আচমকা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাত খাওয়া ব্যক্তির মতই স্তব্ধ অনড় হয়ে বসে রইল।

সমগ্র মুখখানা ফ্যাকাশে রক্তহীন হয়ে গিয়েছে, বেচারী যেন অতর্কিত আঘাতে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। কি বলবে সে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছে না। মিসেস্ চৌধুরী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একসময় ধীরপদে উঠে ছেলের পাশে এসে বসে তার গায়ে পরম স্নেহে ডান হাতখানা রেখে মৃদু কণ্ঠে ডাকেন, নিমু ?

মা !

ভেবে আর কি লাভ হবে বাবা ? এখন যাতে করে এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের একটা কিনারা করা যেতে পারে, ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তারই একটা উপায় দেখ।

নির্মল মার মুখের দিকে চেয়ে এতক্ষণে কথা বলে, কিন্তু মা, সেই লোকগুলো —তাদের কাউকেই তুমি চিনতে পারলে না ?

মিসেস্ চৌধুরী পুত্রের দিকে তাকিয়ে নীরবে শুধু মাথা হেলালেন, না।

এতক্ষণে কিরীটী আবার যেন কথা বলবার সুযোগ পায়। নির্মল চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা নির্মলবাবু, আপনার বাবার প্রতি কেউ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন বলে জানেন কিছু ? মানে তাঁর কোন শত্রু ছিল কি ?

শত্রু ! না, তেমন কিছু ছিল বলে তো আমি কখনও শুনি নি। বলে মার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মা, তুমি কিছু জানো ?

মিসেস্ চৌধুরী মৃদুকণ্ঠে বললেন, না।

আচ্ছা নির্মলবাবু, ইদানীং ব্যবসাসংক্রান্ত যা কিছু আপনিই দেখাশুনা করেন শুনছি, তাই না ?

হ্যাঁ। নির্মল জবাব দেয়।

আচ্ছা নির্মলবাবু, দেখুন তো এই চিঠির হাতের লেখাটা আপনি চেনেন কিনা ? বলতে বলতে কিরীটী সন্তোষ চৌধুরীর লেখা ও নাম-সই-করা চিঠিখানা নির্মলের দিকে প্রসারিত করে ধরে, দেখুন—এই চিঠিটা পেয়েই এখানে এসেছি আমরা !

এই চিঠি পেয়ে এসেছেন ?

হ্যাঁ, দেখুন না চিঠিটা ! পড়লেই সব জানতে পারবেন।

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নির্মল চৌধুরী মাথা নাড়ে, না, এ দেখছি বাবার

হাতের সই—কিন্তু এ তো বাবার হাতের লেখা নয়। না, এ বাবার হাতের লেখা নয়। না—অথচ আপনি বললেন এই চিঠি পেয়েই আপনি এখানে এসেছেন, এবং…

আপনি ঠিক বলছেন এটা আপনার বাবার হাতের লেখা নয়?

নিশ্চয়ই না। এ আমার বাবার হস্তাক্ষর নয়—I am sure।

হুঁ, আচ্ছা আপনি বলতে পারেন নির্মলবাবু এই হাতের লেখার সঙ্গে আপনার কোন জানিত লোকের লেখার মিল আছে কিনা?

মিল! না, এ ধরনের হস্তাক্ষর আমার কোন পরিচিতের বলেও কই মনে পড়ছে না তো!

ভাল করে আর একবার দেখুন।

না, I can distinctly remember! এ ধরনের কোন হস্তাক্ষরের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

রাত্রিশেষের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া মুক্ত দ্বারপথে ঘরে এসে প্রবেশ করছে। বেশ শীত-শীত করে।

নির্মলবাবু, এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আপনার মা অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন বলেই আমার মনে হচ্ছে, আপনি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন ভালই হল, এবারে আপনি মাকে নিয়ে উপরে যান, মার আপনার বিশ্রামের দরকার, আপনারও বিশ্রামের প্রয়োজন। সকালে আবার দেখা হবে, কথাবার্তা হবে।

নির্মল চৌধুরী মাকে ধরে সযতনে উঠে দাঁড়াল।

নিঃশব্দে দুজনে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই মস্ত বড় একটা প্রহেলিকা বলে মনে হচ্ছে কিরীটী! সুব্রত এতক্ষণে কথা বলে।

হুঁ, প্রহেলিকাই বটে। অনেকগুলো রহস্যময় ঘটনা একসঙ্গে যেন জট পাকিয়ে উঠেছে। সন্তোষ চৌধুরীর আজকার হত্যা-ব্যাপারের পশ্চাতে আছে অনেক পুরাতন রহস্যঘন একটা অধ্যায়, যা দীর্ঘকাল স্মৃতির অন্ধকারে চাপা পড়ে ছিল। বলতে বলতে কিরীটী যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। শেষের কথাগুলো তার কতকটা যেন স্বগতোক্তির মতই মনে হয়।

এই রহস্যের সঙ্গে অন্য কোন রহস্যের সন্ধান পেলে নাকি কিরীটী? সুব্রত প্রশ্ন করে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে।

সব ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। তবে এইটুকু বর্তমানে বলতে পারি, সন্তোষ চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারটা ঠিক কোন অর্থঘটিত কিছু নয়।

তবে?

এখনও অবিশ্যি তেমন বিশেষ কোন কিছু বুঝে উঠতে পারি নি, তবে জানতে পারব ঠিকই। বলেই হঠাৎ প্রশ্ন করে, হ্যাঁ রে, মানুষের চোখের দৃষ্টি কথা বলে জানিস?

মানে? সুব্রত বিস্মিত ভাবে বলে।

মানে বুঝতে পারছিস্ না? যাকে কবির কথায় বলে—আঁখির ভাষা!

আঁখির ভাষা?

হ্যাঁ। কিন্তু সে কথা থাক। নির্মল চৌধুরী লোকটাকে তোর কেমন মনে হল, তাই বল?

সুব্রত জবাবে কি যেন বলতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাকে থামিয়ে দেয় কিরীটী। বলে, **Hush**! চুপ! **Here he comes again**! নির্মলবাবু বোধহয় এইদিকেই আসছেন।

সুব্রত টের পায় নি, কারণ শব্দ পায় নি কিছুর। তাছাড়া কিরীটীর সঙ্গে কথায় সে ডুবেছিল। কিরীটীর ধারণাই ঠিক, সত্যই একপ্রকার নিঃশব্দে নির্মল চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

বেশ পরিবর্তন ইতিমধ্যেই হয়েছে, গায়ে রাত্রিবাস, পায়ে জাপানী ঘাসের চটি।

পায়ে ঘাসের চপ্পল থাকার দরুণই হয়তো সুব্রত নির্মল চৌধুরীর পদশব্দ শুনতে পায় নি। কিন্তু কিরীটীর প্রখর শ্রবণেন্দ্রিয়কে নির্মল চৌধুরীর চপ্পল পরা পদশব্দও এড়িয়ে যেতে পারে নি।

মিঃ রায়, আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম—যে কথাগুলি মার সামনে তখন বলতে পারি নি। নির্মলবাবু বললেন।

বসুন নির্মলবাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

হ্যাঁ, বসছি। নির্মল চৌধুরী একটা সোফার উপরে উপবেশন করে বলে, চা আনতে বলে এলাম—আপনারা নিশ্চয়ই চা পান করেন!

সুসংবাদ। কিরীটী স্মিতহাস্যে জবাব দেয়, কিন্তু কি যেন বলছিলেন?

কথাটা এমন বিশেষ কিছু নয়, তবে মনে হল—**you should know it**! আপনাকে জানানো উচিত, বাবার ইদানীংকার কিছুদিনের মতিগতির সম্পর্কে বলছিলাম, গত মাস চার-পাঁচ থেকে লক্ষ্য করছিলাম, বাবা যেন ইদানীং অত্যন্ত **restless** হয়ে পড়েছেন। বিশেষ যেন চিন্তিত মনে হত, সামান্য শব্দে চমকে উঠতেন, সামান্য গোলমালে বিরক্ত বোধ করতেন।

একজন ভৃত্য ট্রেতে করে ঐসময় তিন কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

একটা চুরুট ও দেশলাইটা দিয়ে যা গোবিন্দ!

যে ভৃত্য চায়ের কাপগুলো পরিবেশন করছিল, তার দিকে তাকিয়ে নির্মল চৌধুরী বললে।

গোবিন্দ চায়ের কাপগুলো নামিয়ে রেখে চলে গেল।

আপনার কথাটা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না মিঃ চৌধুরী! আপনি ঠিক কি বলতে চান? আপনি কি বলতে চান, আপনার পিতা মিঃ সন্তোষ চৌধুরী ইদানীং কিছুদিন ধরে **nervous strain**-এ ভুগছিলেন?

না তা ঠিক নয়, অত বড় ধীর স্থির ও শান্ত প্রকৃতির লোক আমার চোখে খুব

কমই পড়েছে। আর যাই হোক, বাবা nervous strain-এ ভুগবেন এটা আমার স্বপ্নেরও অতীত। আমি বলছিলাম, তিনি যেন ইদানীং কোন ব্যাপারে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির লোক বলেই সেই বিরক্তি-টাই প্রকাশ পেত না ঠিক তাঁর।

এ ব্যাপারে আপনি কোন কিছু অনুমান করেন ?

না।

আচ্ছা আপনি যে বললেন, ইদানীং মধ্যে মধ্যে তাঁর যে বিরক্ত ভাবটা প্রকাশ পেত—সেটা কি কোনরকম ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার বলে আপনার মনে হয় ?

না।

গোবিন্দ চুরুট ও দেশলাই দিয়ে গেল।

আরও এক কাপ চা দিয়ে যা গোবিন্দ। অপস্রিয়মান গোবিন্দর গমনপথের দিকে তাকিয়ে নির্মল চৌধুরী বললে, তবে আমার যতদূর মনে হয়, নিজস্ব কোন গোপনীয় ব্যাপার হয়তো বা হবে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণ।

এ কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ? কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নির্মল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

বললাম তো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার একটা অনুমান মাত্র।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আপনার পিতার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমন কোন কথা জানেন, যার আভাস মাত্রও হয়তো কাউকে তিনি কোনদিন কিছু দেন নি ?

না তো! কিন্তু হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

এমনি। আচ্ছা আর একটা কথা, আমি আপনার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে যে তদন্তভার হাতে নিয়েছি এতে আপনার সম্পূর্ণ মত আছে তো ?

Certainly! All co-operation পাবেন আপনি আমার কাছ থেকে। কারণ সত্যিই আমি এ ব্যাপারে একটা মীমাংসা চাই।

বাইরে জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল ঐ সময়।

কিরীটী উন্মুক্ত দ্বারপথে দৃষ্টিপাত না করেই বলে, মিঃ হংসরাজ আসছেন।

সত্যিই মিঃ হংসরাজ চাকলাদার জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ তুলে কক্ষে প্রবেশ করলেন, Good morning everybody!

হঠাৎ নির্মল চৌধুরীর দিকে নজর পড়তেই ভ্রূকুঞ্চিত করে হংসরাজ নির্মলের দিকে তাকান, I mean—who are you ?

॥ সাত ॥

আমিও আপনাকে সেই প্রশ্নই পাল্টা করছি, who are you please ?

I see, you don't know me! My name is Hansaraj Chakladar from Special Police Branch of Behar.

তা আপনি এখানে কেন ?

What? আমি এখানে কেন? Who are you to ask me that question?

কারণ আমিই এ বাড়ির বর্তমান মালিক।

মানে? মালিক তো already dead!

কিরীটী ও সুব্রত দুজনের কথোপকথন উপভোগ করছিল। একটা চাপা হাসির উচ্ছ্বাসে যেন সুব্রত ভেঙে পড়ে প্রায়।

কিরীটীই জবাব দিল, Mr. Chakladar, ওঁর নাম নির্মল চৌধুরী, উনি নিহত মিঃ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। গতরাত্রে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

I see! Very sorry Mr. Chowdhury! I mean—আমি বিশেষ দুঃখিত, বুঝতেই পাচ্ছেন—Special Branch-এর লোক আমরা, সেই জন্যই চট করে আমাদের মনে সন্দেহটাই আগে এসে দেখা দেয়। যাক্, আপনি এসে পড়েছেন ভালই হল। আপনার পিতার হত্যা-রহস্য প্রায় solve করে এনেছি, বারো আনাই বলতে গেলে, বাকী যা তাও আমি আশা করছি দু-চার দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলব।

বারো আনাই solve করে ফেলেছেন এর মধ্যে? ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ চাকালদার?

Not চাকালদার, but Chakladar please! সুব্রতর কথায় চাকলাদার প্রতিবাদ জানায়।

Sorry! কিন্তু বললেন না তো কি solve করেছেন বারো আনা?

বাইরে থেকে কেউ এসে মিঃ চৌধুরীকে gag করে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে।

তারপর?

তারপর একটা গর্ত খুঁড়ে একেবারে মৃতদেহটাই অন্যের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল হয়তো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কারণে সেটা নিশ্চয়ই হয়ে ওঠে নি।

তারপর?

এখন কথা হচ্ছে, খুনী কে হতে পারে! He must be someone, যার এ ব্যাপারে interest থাকা সম্ভব!

তারপর?

খুনীকে ধরতে পারলে তাকে ফাঁসিতে লটকাতে দেরি হবে না, কারণ মিসেস্ চৌধুরী নিশ্চয়ই তাকে সনাক্ত করতে পারবেন।

তারপর?

এতক্ষণে যেন চাকলাদারের হঠাৎ খেয়াল হয়, সুব্রতর এই পর পর তারপর শব্দগুলো তাঁর প্রতি একান্ত ইচ্ছা করেই প্রয়োগ করা হচ্ছে, কতকটা ঠাট্টার সুরেই। চাকলাদার ভীষণ খাপ্পা হয়ে ওঠেন, what do you mean! I say, আপনি ভেবেছেন কি সুব্রতবাবু, আমি কি আপনার ঠাট্টার পাত্র? ঠাট্টা করছেন নাকি

আমার সঙ্গে ?

Very sorry ! ঠাট্টা ? কে বললে আপনাকে সে কথা ?

কি মনে করেন আমাকে বলুন তো, আমি কি একটা idiot ?

সুব্রত মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বলে, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে মিস্টার !

ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ হয়ে যায় দেখে কিরীটী এখন কথা বলে, শুনুন মিঃ চাকলাদার। আপনার তদন্ত কতদূর এগুলো জানতে পারলে আমাদের উভয়েরই সুবিধা হয়। কেননা আমরা উভয়েই চাই খুনী ধরা পড়ুক।

Oh Yes ! নিশ্চয়ই।

আপনার মতামতটা জানা গেল। এবারে আমার যা মনে হয় বলছি। এ ব্যাপারে কতকগুলো স্থূল পয়েণ্ট আমাদের চোখে পড়েছে। এক নম্বর, মুখোশধারী একাধিক আততায়ীর মিস্টার ও মিসেস্ চৌধুরীর শয়নকক্ষে আবির্ভাব ও মিঃ চৌধুরী ও আততায়ীদের মধ্যে পরস্পরের কথোপকথন। দু নম্বর যে ছুরিটার সাহায্যে মিঃ চৌধুরীকে নিহত করা হয়েছে—that was a presentation of Mr. Nirmal Chowdhury to his mother। তিন নম্বর, মিঃ চৌধুরী ও আততায়ীর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল সেরাত্রে, তার মধ্যে আমরা কতকগুলো চিঠিপত্রের আভাস পাচ্ছি। চার নম্বর, মৃতদেহকে যেখানে পাওয়া যায় সে জায়গাটা সদ্য খনন করা। পাঁচ নম্বর, মিঃ চৌধুরীর লিখিত আমার কাছে পত্রখানা।

Yes, বলুন !

এই সব পয়েণ্টগুলো থেকে আমরা কি পাচ্ছি বা পেতে পারি ?

ঐগুলো তো minor points ! কোন গুরুত্বই ঐগুলোর মধ্যে নেই। আপনি যদি ভেবে থাকেন ওই সব আবোল-তাবোল সূত্র ধরে এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করবেন, তাহলে মস্ত বড় ভুল করেছেন। হংসরাজ একান্ত তাচ্ছিল্যভরে কিরীটীর দিকে চেয়ে কথাগুলো বললেন।

তা হবে। আচ্ছা ঐ মৃতদেহের উপরে যে কালোপাঞ্জার ছাপটা, ওটা—ওরও বোধ হয় কোন গুরুত্ব নেই ?

এবারে হংসরাজ হা-হা করে হেসে ওঠেন, আপনি দেখছি সত্যিই ছেলেমানুষ একেবারে। বুঝলেন মিঃ রায়, investigation ব্যাপারটা যদি এত সহজসাধ্য, I mean easy হত, তা হলে সরকার বাহাদুর এতগুলো টাকা খরচ করে প্রতি বৎসর এতগুলো লোককে ডাল-ভাত দিত না।

তা তো বটেই। সত্যিই বলেছেন, ডাল-ভাতের যোগাড় করাটাও একটা ভাগ্যের কথা বই কি মিঃ চাকলাদার। ও কি আর সকলের বরাতে জোটে ? কিরীটী হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

সুব্রত আগাগোড়া ওদের দুজনের কথাবার্তাগুলো মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। কিন্তু কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ করবারও সাহস

পায় না। সত্যিই মাঝে মাঝে কিরীটীর নির্বিকল্প ভাব দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এমন ভাবে ও নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, তখন বারংবার আঘাত করেও ওকে সচেতন করা যায় না।

একটু পরে শ্যামাচরণবাবুও এসে হাজির হলেন।

নির্মল চৌধুরীও অকস্মাৎ যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে, বিশেষ কোন কথাবার্তা বলতে চায় না। বহুক্ষণ ধরে এরপর শ্যামাচরণ, হংসরাজ ও সুব্রতর মধ্যে সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা সম্পর্কে আলোচনা চলল। কিরীটী প্রায় চুপচাপ বসে বসে চোখ বুজে সিগার টানছিল। মাঝে মাঝে শুধু আলোচনার মধ্যে দু'একবার হুঁ-হুঁ করছিল এই যা। এক সময় ওদের আলোচনার মধ্যেই সে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সামনের হলঘরটা অতিক্রম করলেই ছোট একটা পোর্টিকো এবং তার নীচেই সিঁড়ি। হলঘরের এক পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে।

সিঁড়ির ঠিক দক্ষিণ পাশে একটা কাঠের র‍্যাক। র‍্যাকে একটা দামী নেভি-ব্লু সার্জের লং-কোট ঝুলছে। হঠাৎ কিরীটীর নজরটা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, লং-কোটটায় খানিকটা কাদা শুকিয়ে আছে, দু হাতের কাছে। কিরীটী এগিয়ে এসে লং-কোটটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল, ঝুলে প্রায় সাড়ে চার ফুট তো হবেই। যে-ই এই লং-কোটটা ব্যবহার করে, লম্বায় তার ছয় ফুটের প্রায় কাছাকাছি হওয়াই স্বাভাবিক।

কিরীটী লং-কোটটা পরীক্ষা করছে এমন সময় নিঃশব্দ পায়ে কখন যে নির্মল চৌধুরী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে তা টেরই পায় নি।

আচমকা নির্মল চৌধুরীর প্রশ্নে ও ফিরে তাকায়, কি দেখছেন অমন করে, কোটটা নাকি ?

হ্যাঁ। এ লং-কোটটা কার বলতে পারেন ?

হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু এ কোটটা এখানে এল কি করে ? এটা তো আমার উপরের ঘরে ছিল ; কিছুদিন আগে এখানে একবার এসেছিলাম, হয়তো ভুলে ফেলে গিয়েছিলাম সেই সময়ে।

আপনার বাবা বেঁটেখাটো মানুষ ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্যবহার করেন নি ?

না, বাবা এ কোট পরলে তাঁর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছুবে।

এমন সময় স্থানীয় থানার হেড কনেস্টবল একপ্রকার হন্তদন্ত হয়েই পাশের কক্ষে যেখানে সুব্রত, শ্যামাচরণ ও হংসরাজ প্রভৃতি বসে আলাপ-আলোচনা করছিল সেখানে এসে প্রবেশ করে।

কিরীটী পুনরায় পাশের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল।

শ্যামাবাবু হেড কনেস্টবলকে দেখে বললেন, কি খবর দেওকীনন্দন ?

বাবু, মাঠের মধ্যে একটা লাশ পাওয়া গিয়েছে !

লাশ পাওয়া গেছে ? শ্যামাবাবু চমকে ওঠেন।

জি। একজন দেহাতী লাশটা পড়ে থাকতে দেখে মাঠের মধ্যে আমাকে এসে

সংবাদ দেয়। আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি, দুজন সেপাই লাশ পাহারা দিচ্ছে, আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে।

লোকটার কোন পরিচয় জানা গিয়েছে, কে বা কি নাম?

আজ্ঞে পরদেশী। সাজ-পোশাক দেখে মনে হয় কোন পাঞ্জাবীই।

চলুন মিঃ হংসরাজ, যাবেন নাকি লাশটা দেখতে?

চলুন।

শ্যামাবাবু, হংসরাজ ও দেওকীনন্দন ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সুব্রতও উঠছিল, চোখের ইশারায় কিরীটী তাকে নিষেধ করলে। সুব্রত আবার যথাস্থানে বসে পড়ে।

ওরা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি?

কাল রাত্রেই ও লাশ আমি দেখেছি।

কিন্তু কই, তুই তো আমাকে বলিস্ নি কিছু!

কাল রাত্রির কোন কথাই তো এখনও তোকে বলি নি। কেবল এসে তোকে জিজ্ঞাস্য করেছিলাম, একটা চিৎকার তুই শুনেছিস কিনা?

হ্যাঁ, তা—কোন চিৎকার তো শুনি নি। কিন্তু—

শোন, যে লাশটার কথা এইমাত্র ওরা বলে গেল—তার জামার উপরেও 'পাঞ্জার' ছাপ দেখেছি। আমার যতদূর মনে হয়, এও সেই 'কালোপাঞ্জা'রই কীর্তি।

কালোপাঞ্জা?

হ্যাঁ।

কিন্তু কে এই কালোপাঞ্জা?

তা তো জানি না ভাই। তবে এইটুকু আপাতত বুঝতে পারছি, ঐ অদৃশ্য কালোপাঞ্জার বিরুদ্ধেই আমাদের এবারকার অভিযান; এবং এও আমরা জানি যতদূর যে ঐ 'কালোপাঞ্জা'র হাতেই সন্তোষ চৌধুরী নিহত হয়েছেন।

কিন্তু কি তুই বলতে চাইছিস ঠিক?

আপাতত বিশেষ কিছু না, কেবল এইটুকু বলতে চাই যে—

কি?

সন্তোষ চৌধুরী এবং অন্য এক ব্যক্তি যে গতকাল নিহত হয়েছে, তাদের হত্যা করবার পরিকল্পনা অনেক দিন হতেই চলছিল। হঠাৎ তাদের খুন করা হয় নি। এই নৃশংস হত্যার পিছনে একটা গভীর রহস্য রয়েছে। এবং সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে আমাদের বহুদিন আগে পিছিয়ে যেতে হবে।

সুব্রত স্তব্ধবিস্ময়ে কিরীটীর কথা শোনে।

তোরা যা মনে করেছিলি, গতরাত্রে হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বুঝি পথ হারিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আসলে তা নয়—এক পরদেশী রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল কাল আকস্মিক ভাবেই।

রাজকন্যা !

তাই বলব তাকে। এবং যদিও এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারি নি কেন তিনি আমাকে সব বললেন, তবে অতীতের এক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ কাহিনী তিনি আমার কাছে গতরাত্রে বিবৃত করেছেন। এবং সে অতীত কাহিনীর সঙ্গে বর্তমানের এই কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। কিন্তু তারও আগে একটা লং-কোট আচমকা এসে ঘটনার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

কিরীটীর কথা যেন সুব্রত ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, বিস্মিতভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে কতকটা বোকার মতই যেন প্রশ্ন করে, লং-কোট ?

হ্যাঁ, লং-কোট। নীচের সিঁড়ির সামনে যে হলঘরটার মত জায়গা, সেখানে লক্ষ্য করেছিস কিনা জানি না, একটা টুপি, লাঠি ইত্যাদি রাখবার স্ট্যান্ড আছে। আজ সকালে সেখানে একটা গরম লং-কোট ঝুলে আছে দেখে, এবং লং-কোটটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে, কেন জানি না হঠাৎ আমার মনে হল, কোটের ঝুলটা একটু বেশী। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কোটটা কার ? মনে হয়েছিল একবার, হয়তো মিঃ সন্তোষ চৌধুরীরই হবে। কিন্তু কোটটার ঝুল দেখে মনে হল কোটটা সন্তোষ চৌধুরীর হতে পারে না, কারণ ভদ্রলোক বেশ একটু বেঁটেই ছিলেন। অবিশ্যি কারও কারও একটু বেশী ঝুলের লং-কোট পরা অভ্যাস আছে বটে, তাই বলে এত বেশী ঝুলের জামা ব্যবহার করতে পারে না, যেটা গায়ে দিলে ঝুল একেবারে গোড়ালি পর্যন্ত পেঁছাতে পারে ! তাছাড়া···

তাছাড়া কি ? সুব্রত আবার প্রশ্ন করে।

তাছাড়া কোটটার দুই হাতায় মনে হল যেন কাদা শুকিয়ে আছে। যাক, কোটটা দেখছি এমন সময় নির্মলবাবু সেখানে কখন একসময় এসে হাজির হয়েছেন টের পাই নি। তাঁর কাছেই শুনলাম কোটটা নাকি তাঁরই। গতবারে এখানে এসে ভুলে ফেলে গেছেন।

তারপর ?

তারপর আর বিশেষ কথা হবার সময় হল না, হঠাৎ সেই হেড কনেস্টবলটি এসে পড়ায় ; কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর আলাপ-আলোচনা নয়, চল্ আমাদের ঘরে গিয়ে বসা যাক।

দুজনে এসে তাদের নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। ঘরে প্রবেশ করে কিরীটী একটা আরাম-কেদারায় বেশ আরাম করে গা-টা এলিয়ে দিয়ে বললে, সন্তোষ চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারটি যতটা প্রাঞ্জল ভেবেছিলাম, বোঝা যাচ্ছে এখন ঠিক ততটা প্রাঞ্জল নয় সু। বেশ জটিল ও গোলমেলে। কারণ হত্যার পরে, এবং আমাদের এখানে এসে পেঁছবার পর থেকে কতকগুলো ঘটনা এমন দ্রুত ঘটে গেছে যে, সব কিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বেশ একটা ঘোরালো রূপ নিয়েছে। অবিশ্যি জটিল বা ঘোরালো হলেও খেই হারাবার মত এখনও এমন কিছু ঘটে নি।

তুই অতীতের ঘটনা সম্পর্কে একটু আগে আমাকে যা আভাস দিচ্ছিলি,

সেটা কি ?

বলছি শোন, কারণ আমার স্থির বিশ্বাস সেই অতীতের ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের এই হত্যা-ব্যাপারের নিশ্চয়ই কোন একটা যোগসূত্র আছে।

এরপর কিরীটী গতরাত্রে মাঠের মধ্যে সেই অচেনা মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়া ও তার সঙ্গে তার যে সব কথাবার্তা হয়েছিল সব কিছুই সংক্ষেপে সুব্রতকে বিবৃত করে বলে, আমার মনে হয় কালকের ঐ মহিলাটির সঙ্গে আমাদের মৃত সন্তোষ চৌধুরীর কোন যোগসূত্র নিশ্চয়ই ছিল।

ভদ্রমহিলাটিকে আর খুঁজেই পেলি না ?

না। যেন আচমকা রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অথচ সে বলেছিল যে, আমার পরিচয় বেশ ভাল ভাবেই জানে।

তোর মনে হয়, তুই কখনও ভদ্রমহিলাকে ইতিপূর্বে দেখেছিস ?

না। বিশেষ করে কাউকে জীবনে একবার দেখলে সহজে আমি ভুলি না, সে তো তুই জানিস।

তবে ?

সেই কথাই কাল রাত থেকে ভাবছি।

একটা কথা তোকে আমি বলব মনে করছি—

কি ?

মিসেস্ চৌধুরীকে যেন আমার কেমন-কেমন মনে হচ্ছে, তিনি যেন কোন একটা ব্যাপার আমাদের কাছে লুকোচেছন ইচ্ছা করে। কারণ তাঁকে এভাবে বেঁধে রেখে গেল, অথচ তিনি আততায়ীদের মধ্যে কাউকেই চিনতে পারলেন না, ব্যাপারটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

কিরীটী সুব্রতর কথায় মৃদু হাসে, হ্যাঁ, তোর অনুমান নেহাৎ একেবারে মিথ্যে নয়। যতদূর আমার মনে হচ্ছে ঐরকম একটা কিছু যে ঘটবে তিনি যেন পূর্ব হতেই অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, তাঁর স্বামীর মৃত্যুতেও তিনি যে খুব বেশী একটা কিছু আঘাত পেয়েছেন তাও যেন আমার মনে হচ্ছে না।

আমি এই কথাটাই তোকে বলব ভাবছিলাম।

তারপর মৃত সন্তোষ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে আমাদের নির্মলবাবু, সুব্রত বলতে থাকে, তিনিও যে তাঁর পিতার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে খুব বেশী আঘাত পেয়েছেন তাও আমার মনে হয় না।

না, এখানে আমি কিন্তু তোর সঙ্গে একমত হতে পারছি না সুব্রত।

কেন ?

বললাম যা আমার মনে হয়েছে। মৃদু হেসে কিরীটী বলে।

বেশ, আরও একটা কথা !

কি ?

আমার যেন মনে হচ্ছে, মা আর ছেলের মধ্যে কোথায় যেন কিসের একটা understanding—মানে বোঝাপড়া আছে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আমি কি বলতে চাইছি, সত্যিই কিরীটী রায় তা বুঝতে পারছে না ?

কিন্তু আমাদের বাঙালী ঘরের মধ্যে এ ধরনের ষড়যন্ত্র শুধু অসম্ভবই নয়, অস্বাভাবিক। মা ও ছেলে ষড়যন্ত্র করে বাপকে খুন করাবে.....উঁহু, এ হতেই পারে না সু। এ হতে পারে না। এ তোমার ইউরোপীয়ান সমাজ নয়। কিন্তু আপাতত আমাদের এসব আলোচনা মুলতুবী রেখে চল্ একবার নীচের বাগানটা ভাল করে দিনের আলোয় ঘুরে দেখে আসা যাক্।

বাগানটা !

হ্যাঁ।

বেশ, চলুন।

দুজনে নীচের বাগানে চলে আসে।

সত্যি মিঃ চৌধুরীর রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। দেশী-বিলাতী হরেক প্রকারের চমৎকার সব ফুলের মন-ভোলানো সমারোহে বাগানখানি যেন বিচিত্র রূপ ধরেছে। ওরা ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সন্তোষ চৌধুরীর শয়নকক্ষের নীচে এসে দাঁড়াল। মাটি কুপিয়ে সেখানে বাঁধাকপির গাছ লাগানো হয়েছিল। সমস্ত গাছগুলো বেশ ফলন্ত হয়ে উঠেছে। মাটি নরম।

হঠাৎ একটা কপির চারার নীচে একপাটি প্রায়-নতুন নিউকাট জুতো কিরীটীর নজরে পড়ে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে নীচু হয়ে জুতোর পাটিটা তুলে নিয়ে বলে, একপাটি জুতো দেখছি, কিন্তু অন্য পাটিটা কোথায় ?

কিরীটী চারিদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে অনুসন্ধান করে বাগানের আশেপাশে কোথাও দ্বিতীয় পাটি জুতোর সন্ধান মেলে না। কিছুদূরে বাগানের রক্ষকই হবে বোধ হয়, একজন বয়স্ক উড়িয়া মালী কতকগুলো ফুলের গাছের গোড়া নিড়েন দিচ্ছিল, ওরা এসে তার সামনে দাঁড়ায়, তুই মালী ?

হুঁ।

তোর নাম কি ?

মোর নাম গোবিন্দ অছি।

গোবিন্দ, এখানে কতদিন হলো কাজ করছিস্ ?

পাঁচ বছর।

পুরনো লোক তুই তা হলে ?

হুঁ।

দ্যাখ্ কাল রাত্রে আমার একজোড়া জুতো হারিয়ে গেছে, একটা পাটি এই বাগানের মধ্যে খুঁজে পেলাম, কিন্তু অন্যটা পেলাম না খুঁজে। দেখেছিস তুই

এমনি একপাটি জুতো এই বাগানের মধ্যে কোথাও ?

না বাবু, বাগানের মধ্যেই তো সব সময় আমি থাকি, কই অমন জুতোই দেখি নি !

একটু খোঁজ করে দেখিস্ তো পাস্ কিনা ?

আচ্ছা ।

উভয়ে বাগান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে ঐ একপাটি জুতো নিয়ে ।

॥ আট ॥

ঐদিন সন্ধ্যার দিকে কিরীটী একা একা মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে । ধূসর আবছা চারিদিক । এর মধ্যেই বেশ শীত-শীত বোধ হয় । গতরাত্রের সেই গাছতলাটাই কিরীটীর লক্ষ্য । চলতে চলতে কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে গতরাতের সেই মেয়েটির কথাই ভাবছিল ।

কিছুতেই যেন ও মেয়েটির কথা ভুলতে পারছে না । কেবলই ঘুরেফিরে গতরাত্রের সেই ক্ষণিকের দেখা স্বল্পপরিচিতা রহস্যময়ীর কথাই যেন মনের মধ্যে এসে উঁকি দেয় ।

নমস্কার !

আচম্‌কা কিরীটী মানুষের কণ্ঠস্বরে ফিরে দাঁড়ায় ।

তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি দীর্ঘাকৃতি যুবাপুরুষ । পরিধানে ফ্লানেলের ট্রাউজার ও হাফহাতা ফ্লানেলের কোট ।

অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিরীটী জবাব দেয়, নমস্কার ।

চেহারার দিকে চাইলে মনে হয় যেন অত্যন্ত পরিচিত । কবে যেন ইতিপূর্বে কোথায় দেখেছে ।

আপনি আমায় চেনেন না···আপনারই নাম বোধ হয় কিরীটীবাবু ?

হ্যাঁ । আপনাকে···

না, আমাদের পরস্পরের পরিচয় নেই, তাই চিনতে পারবেন না । আমার নাম অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় । কিছুদিন হল এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছি ।

ও !

মাধবী ভিলার মিঃ চৌধুরীর হত্যার তদন্তে আপনি ও সুব্রতবাবু এসেছেন শুনলাম । আমরা ঠিক পাশের বাড়িটাতে থাকি ।

এতক্ষণে কিরীটীর মনে সহসা যেন আলোকসম্পাত হয় । এখানে আসবার দিন বিকালের পড়ন্ত রোদে, বাগানবাড়ির গেটের সামনে অপূর্বদর্শন যে যুবকটিকে গাড়ি থেকে একবার মাত্র দেখেছিল, এ কি সেই যুবক !

কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, কিন্তু আমিই যে কিরীটী রায়, তা বুঝলেন কেমন করে ?

কতকটা আন্দাজে বলতে পারি অবিশ্যি, তাছাড়া আপনাদের মত স্বনামধন্য লোকদের চিনে নিতে কষ্ট হবে কেন! অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল, এত কাছে এসেছেন ভাবলাম এ সুযোগ নষ্ট করি কেন? তাই হঠাৎ দূর থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে চলে এলাম। বেড়াতে বের হয়েছিলাম, বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম।

আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম।

এবারে ভিলার দিকে ফিরবেন তো, চলুন না—গল্প করতে করতে ফেরা যাক। আর যদি আপত্তি না থাকে, আমাদের বাড়িতে এক কাপ চা—

চমৎকার প্রস্তাব। আপত্তি হবে কেন—চলুন।

যদিও তখন কিরীটীর ফিরবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সহজেই অনিলবাবুর কথায় রাজী হয়ে গেল।

নিঃশব্দে কিরীটী অনিলবাবুকে অনুসরণ করে চলে। চারিদিকে অন্ধকার ঘন-নিবিড় হয়ে আসছে। ফাল্গুনের প্রথম রাতের শিশির ঝরতে শুরু করেছে—বেশ শীত-শীত লাগে। দুপাশের রুক্ষ প্রান্তরের অন্ধকারে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা—কেবল দুজনের জুতোর শব্দ শোনা যায়।

কিরীটী উপরের দিকে তাকায়—আজ চাঁদ উঠতে দেরি হবে, তারার অজস্র বাতি জ্বলছে টিপ্ টিপ্ করে। মৃদু আলোয় অন্ধকার যেন কাঁপছে চারিপাশে থির থির করে।

অনিলবাবু? হঠাৎ পাশাপাশি চলতে চলতে কিরীটী ডাকে।

অ্যাঁ—কিছু বলছেন মিঃ রায়?

এখানে—মানে এই মধুপুরেই বুঝি আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ আছেন?

হ্যাঁ, দিদিমা। তাঁরই একটা চিঠি পেয়ে আমি আর আমার এই ছোটবোন মিনু, এখানে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি।

কি করেন?

বর্তমানে বেকার। মৃদু হেসে জবাব দেন অনিলবাবু।

এসেছেন যখন তখন কিছুদিন এখানে থাকবেন বোধ হয়?

হ্যাঁ, তাই তো মনে করছিলাম, কিন্তু মিনু আর একদিনও এখানে থাকতে রাজী নয়—জোর তাগাদা দিচ্ছে, কাল-পরশুই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কেন তাঁর বুঝি আর এখানে ভাল লাগছে না?

বলেন কেন? বোনটির আমার মাথায় একটু ছিট্ আছে, মামা-মামীর আদরে আদরে বিগড়েছে আর কি!

মামা-মামীর কাছেই বুঝি উনি মানুষ?

মিনু আমার মামাতো বোন। এবং মামা-মামীর ঐ একমাত্র সন্তান।

কথা বলতে বলতে দুজনে অনিলবাবুদের বাড়ির দরজার কাছে এসে হাজির হয় ইতিমধ্যে। দরজার ঠিক ওপরেই একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন—

ওদের দেখেই উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কে, অনু এলি ?

হ্যাঁ দিদিমা—দেখ, কাকে সঙ্গে এনেছি।

মিনু তোর সঙ্গে যায় নি ?

মিনু ? না তো !

তবে সে গেল কোথায় ?

কেন ? তাকে খুঁজে পাচ্ছ না নাকি ?

দুপুর থেকেই নাকি ঝি তাকে দেখে নি।

ব্যস্ত হবার কি আছে ? হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে, এখুনি আসবে'খন। আসুন মিঃ রায়।

কিরীটী অনিলবাবুর আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে।

ছোট ঘরখানি—চমৎকার সাজানো। সোফা কাউচ্‌—এক কোণে ব্যাটারী-সেট রেডিও। সুদৃশ্য বাতিদানে বাতি জ্বলছে। ঘরটি বাতির আলোয় স্বল্পালোকিত।

বাহাদুর গেল কোথায়—বাহাদুর ?

সে মিনুকে খুঁজতে বের হয়েছে।

আচ্ছা ব্যস্তবাগীশ তুমি দিদিমা !—বসুন মিঃ রায়।

কিরীটী একখানা সোফায় বসে।

ঠাকুরকে বল না দিদিমা—চা আনুক।

দিদিমা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বেশ আরাম করে একটা সোফায় বসতে বসতে অনিলবাবু বললেন, যেমন বিচ্ছু নাতনী তেমনি তার ঠাকুমারও হয়েছে পলকে প্রলয়—জ্ঞানহারা ! লেখাপড়া জানা বি. এ. পাস মেয়ে হেড মিসট্রেস—চালাক-চতুর, মুখে খৈ ফোটে—হারিয়ে গেলেই হল অমনি ! দেখুন না !

কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়, স্নেহ চিরদিনই অন্ধ, অনিলবাবু।

তা মানি কিরীটীবাবু, তবে দিদিমার চিরদিনই একটু বাড়াবাড়ি মিনু সম্পর্কে। একটিমাত্র নাতনী—তাই হয়তো স্নেহটা একটু বেশী। কিরীটী হাসতে থাকে।

ঠাকুর অল্পক্ষণ বাদেই ট্রেতে করে চা নিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে দিদিমাও এলেন। ট্রেতে শুধু চা-ই নয়—আনুষঙ্গিক বাড়িতে তৈরী কিছু মিষ্টি ও নোন্‌তাও আছে।

এসব কি অনিলবাবু ? বিকালে মিঃ চৌধুরীর ওখানে প্রচুর হয়েছে। কেবলমাত্র চায়ের কথাই ছিল।

জবাব দিলেন দিদিমা, ক্ষতি হবে না বাবা, দোকানের কিছুই নয়—সব আমার নিজের হাতে বাড়িতেই তৈরী।

অপূর্ব একটা স্নেহের সুর যেন দিদিমার কণ্ঠ হতে ঝরে পড়ল। কিরীটী মুগ্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে মায়ের জাতটা এমননিই, নিমেষে দূরের জনকে আপনার করে নিতে

পারেন। নিরন্তর বুকের মধ্যে তাঁদের বইছে স্নেহের ফল্গুধারা।

না দিদিমা—এখন কেবলমাত্র চা ছাড়া আর আমার পক্ষে কিছু খাওয়াই সম্ভবপর নয়।

অন্তত একটা মুখে দাও বাবা—প্রথম তুমি এ বাড়িতে এলে। মিষ্টিমুখ করতে হয়।

বেশ। আপনার কথা রাখছি—কিরীটী একটি মিষ্টি তুলে নেয়।

এ'র পরিচয়টাই এখনও পেলে না দিদিমা—অনিলবাবু বলেন, ইনি স্বনামধন্য রহস্যভেদী শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়, 'মাধবী ভিলা'র হত্যা-ব্যাপারের তদন্ত করতে এসেছেন বেসরকারী ভাবে।

তাই নাকি! ব্যাপারটা শুনে অবধি আমি যেন একেবারে থ হয়ে গিয়েছি। এই জায়গায় এমনি করে একটা জলজ্যান্ত লোককে খুন করে গেল! ব্যাপারটা সত্যিই যেন অবিশ্বাস্য।

খুন যখন হয়—এমনি করেই হয় দিদিমা, শহর গ্রাম বলে কোন কথা তো নেই। কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়।

কি জানি বাবা, বুঝি না। তা কিছু জানতে পারা গেল? কে খুন করলে?

না—এখনও জানতে পারা যায় নি। কিরীটী জবাব দেয়।

যে লোকটা খুন করেছে তাকে কি কেউ ধরতে পারবে না? দিদিমা প্রশ্ন করেন।

কেন পারবে না—ধরা তাকে দিতেই হবে। পালাবে কোথায়? স্থিরভাবে কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু শুধু ধরলেই তো হবে না, প্রমাণ করা তো চাই যে সেই লোকটাই মিঃ চৌধুরীকে খুন করেছে। কি বলেন, মিঃ রায়? কথাটা বলেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনিলবাবু।

তা বৈকি—প্রমাণ করতে হবে বৈকি।

মাঈজী! বাইরে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কে? বাহাদুর? দিদিমা জবাব দিলেন।

হ্যাঁ, মাঈজী।

দিদিমণিকে পেলি?

না, মাঈজী। কোথাও পেলাম না তাঁকে।

দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত্রি নয়টা ঘোষণা করলে। দিদিমার মুখে রীতিমত দুশ্চিন্তার ঘন কালো ছায়া।

পেলি না? তবে মেয়েটা কোথায় গেল?

রাত্রিও তো নয়টা বাজল—যথেষ্ট রাত্রি হয়েছে—এখানে তার কোন চেনাশোনা বন্ধু-বান্ধবের বাড়িটাড়ি নেই তো? কথাটা বললে কিরীটী।

কই না, এখানে তার কেউ পরিচিত আছে বলে তো জানি না, শুনিও নি। জবাব দিলেন দিদিমা।

তবে অনিলবাবু চলুন না হয়, একবার ভাল করে খুঁজে দেখা যাক।

নাঃ—মিনুটা জ্বালালে দেখছি। বিরক্ত চিত্তে অনিলবাবু উঠে দাঁড়ান, কণ্ঠস্বরেও যথেষ্ট বিরক্তির সুস্পষ্ট আভাস।

তারপরই কিরীটীর দিকে তাকিয়ে অনিলবাবু বলেন, বসুন মিঃ রায়, আমি বড় টর্চটা নিয়ে আসি—বাইরে বেশ অন্ধকার।

অনিলবাবু ভিতরে চলে গেলেন, বোধ হয় টর্চটা আনতেই।

তুমি আর কেন কষ্ট করে যাবে বাবা, অনিলই যাবে'খন। দিদিমা বলেন।

না না, কষ্ট আর কি। বলতে বলতে হঠাৎ অদূরে দেওয়ালে একটি তরুণীর এন্‌লার্জড ফটোর দিকে এতক্ষণে কিরীটীর নজর পড়তেই সে চমকে ওঠে যেন।

এতক্ষণ ফটোটার দিকে পিছন ফিরে সোফায় বসে থাকায় কিরীটীর নজরে পড়ে নি।

ও ফটোটা কার দিদিমা? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ওই তো মিনুর ছবি।

মিনুর—?

কিরীটীর সমস্ত স্মৃতিশক্তিকে যেন তখন একখানা চেনা মুখের আদল এবং ঐ ঘরের দেওয়ালে টাঙানো এন্‌লার্জড ফটোর মুখখানা তোলপাড় করে ফিরছে।

এমন সময় অনিলবাবু একটা পাঁচ-সেলের শক্তিশালী টর্চবাতি হাতে করে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বেশভূষারও কিছু অদল-বদল করে নিয়েছেন। অনিলবাবু কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলেন, চলুন মিঃ রায়—কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে এখন সারারাত সেই উড়নচড়ুই বোনটিরই সন্ধানে পথে মাঠে ঘাটে ঘুরে মরা যাক।

চলুন—আমিও সঙ্গে যাব।

না-না, তার কোন প্রয়োজন হবে না। অনিলবাবু প্রতিবাদ জানান।

চলুন আর তর্ক-বিতর্ক নয়—মিথ্যে দেরি করে লাভ নেই।

কিরীটী যেন একপ্রকার জোর করেই অনিলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পথে গিয়ে নামে।

॥ নয় ॥

অন্ধকার থম্ থম্ করছে বাইরে। ঠাণ্ডাটাও মন্দ নয়। রাতের শিশির ঝরছে নিঃশব্দে—দেখা যায় না বটে, তবে অনুভব করা যায়।

চলতে চলতে একসময় অনিলবাবুকে সম্বোধন করে কিরীটী বলে, দেখুন অনিলবাবু, এদিককার পথঘাটের সঙ্গে তো তেমন বিশেষ আমার পরিচয় হবার সুযোগ এখনও হয় নি—আপনি বরং এগিয়ে চলুন—আমি আপনাকে অনুসরণ করি।

বেশ—আসুন। কোন্ দিকে যে যাব তাও তো বুঝে উঠতে পারছি না।

সাধারণত বেড়াতে কোন্ দিকে তিনি যেতেন জানেন কিছু?

কে জানে! মাত্র দিনপাঁচেক তো এখানে এসেছে, কিন্তু আশ্চর্য, মিনুটা গেলই বা কোথায়?

কলকাতায় চলে যান নি তো?

আশ্চর্য নয়, কিন্তু না বলে-কয়ে চলে যাবে হঠাৎ কলকাতায়—তাই বা কি করে সম্ভব? আর যাবেই বা কেন?

বাড়িতে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয় নি তো?

না, কালও তো রাত্রে শোওয়ার আগে আমার সঙ্গে বসে বসে আলোচনা হচ্ছিল—যাওয়ার আগে একদিন 'পিকনিক্' করে যাবে। তা ছাড়া ঝগড়া করে রাগারাগি করে হঠাৎ চলে যাবার মত মেয়ে তো সে নয়—বিশেষ করে কাউকে কিছু না বলে-কয়ে। তবে খেয়ালী কবি ভাবুক প্রকৃতির একটু ছিল সে বরাবরই—হয়তো কোথাও মাঠের মধ্যে অন্ধকারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে কবিতার চরণ মেলাচ্ছে!

তিনি কবিতা লেখেন বুঝি?

কেন, আধুনিক মাসিকের পাতা ওল্টালেই তার অনেক কবিতা দেখতে পাবেন—অতি আধুনিকা কবিদের মধ্যেই আমাদের মৃণালিনী দেবীও যে একজন।

মৃণালিনী ব্যানার্জী?

হ্যাঁ হ্যাঁ—তিনিই।

কিরীটীর সহসা আবার মনে পড়ে যায়—একটু আগে অনিলবাবুদের বাইরের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো এন্‌লার্জড ফটোখানা দেখার কথা—না, তার ভুল হয় নি।

নিজের স্মৃতিশক্তিকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। সেরাত্রে মাঠের মধ্যে আচম্‌কা যার সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ তার হয়েছিল—এ সেই তরুণী—আলেয়ার মত যে হঠাৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ কিরীটী আবার পথ চলতে চলতে প্রশ্ন করে, আচ্ছা অনিলবাবু, আপনার মামা অর্থাৎ মৃণালিনী দেবীর বাবার নামটা জানতে পারি কি?

সত্যেন ব্যানার্জী—রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী। নাম শোনেন নি, প্রথম যৌবনে এককালে মস্তবড় বিপ্লবী ছিলেন নাকি শোনা যায়—এখন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার।

কাউন্সিলার সত্যেন ব্যানার্জী! হ্যাঁ—নাম শুনেছি বৈকি। তাঁরই মেয়ে মৃণালিনী দেবী?

হ্যাঁ।

কিরীটীর মনের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা যেন এলোমেলো ভাবে আসা-যাওয়া করতে থাকে।

কে—কে এই কাউন্সিলার রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী? কি তাঁর অতীত পরিচয়?

মৃণালিনী দেবীর মুখে শোনা সেই বিপ্লবযুগের অতীত কাহিনীর সঙ্গে কি এর কোন অদৃশ্য যোগসূত্র আছে? সেই বিপ্লবী সঙ্ঘের এক দুই প্রভৃতি ক্রমিক নম্বরের

কেউ একজন কি ?—নিশ্চয়ই তাই। আর তা যদি নাই হবে, কোথা হতে কেমন করে সে জানলে সেই অতীত কাহিনী ?

আচ্ছা অনিলবাবু ?

বলুন।

আপনার মামাতো বোন মৃণালিনী দেবীর বয়স কত হবে ?

বছর চব্বিশেক হবে, কেন বলুন তো ?

এমনি।

কিন্তু বৃথা প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত খুঁজে খুঁজেও মৃণালিনী দেবীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

আশ্চর্য ! মেয়েটা তাহলে গেল কোথায় ? কর্পূরের মত যে উবে গেল দেখছি জলজ্যান্ত মেয়েটা মিঃ রায় !

উবে যাবেন আর কোথায় ? নিশ্চয়ই কোথাও গিয়েছেন। যাক্, এবারে বাসায় ফিরে যাওয়া যাক্ চলুন—হয়তো এতক্ষণে বাসায়ও ফিরে গিয়ে থাকতে পারেন।

তা ছাড়া আর উপায়ও তো দেখছি না—চলুন এই মাঝরাত্রে আর কাঁহাতক পথে পথে ঘুরে বেড়ানো যায় পাগলের মত !

দুজনে তখন বাসার দিকে ফিরল। কিন্তু বাসায় এসে শোনা গেল, মৃণালিনী দেবী ফেরেন নি তখনও। উৎকণ্ঠিতা দিদিমা তখনও বাইরের ঘরে জেগে বসে আছেন তারই অপেক্ষায়।

ওদের ফিরতে দেখে উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে দিদিমা প্রশ্ন করলেন, কি হল—পেলি না ?

না, দিদিমা। আমার এখন মনে হচ্ছে সে নিশ্চয়ই বিকালের ট্রেনে না জানিয়ে কলকাতায় চলে গেছে।

কলকাতায় ?

তোমার নাতনীটির অসম্ভব বলে তো কোন কিছু নেই।

অনিলবাবু যা বলছেন হয়তো অসম্ভব নয়, হয়তো তাই। দেখুন না একবার তাঁর ঘরটা খুঁজে—কোন চিঠিপত্র যদি লিখে রেখে গিয়ে থাকেন। বললে কিরীটী এবং দিদিমাকেই লক্ষ্য করে যেন কথাগুলো বললে।

দেখি। দিদিমা ভিতরে চলে গেলেন ; এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একপ্রকার হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন, হাতে তাঁর একখানা চিঠি, সে কলকাতাতেই গেছে রে অনু—মিথ্যে আমরা এতক্ষণ ভেবে মরছি—কি দস্যি মেয়ে রে বাবা ! দেখ তো, বলা নেই কওয়া নেই—ধন্যি মেয়ে যা হোক্ !

বৃথা না হোক খানিকটা ঘুরিয়ে মারলে আমাদের ! তখনই বলেছিলাম—কী লিখে গেছেন শুনি ? কোন রাজ্যটা উদ্ধার করতে হঠাৎ তাঁর না বলে-কয়ে এমনি করে কলকাতা যাবার প্রয়োজন হল দেখি ?

অনিলবাবু দিদিমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লেন।

দিদিমা,

হঠাৎ ইচ্ছা হল তাই কলকাতায় চললাম—এখানে আর ভাল লাগছে না—তোমাকে আর অনুদাকে বললাম না—তা হলে তোমরা যেতে দিতে না। ভেবো না কিন্তু লক্ষ্মীটি—

তোমার মিনু।

যাক্, তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অনিলবাবু মৃদুস্বরে বললেন।

আচ্ছা এবারে তা হলে আমি আসি অনিলবাবু, আজ তো কথাবার্তা বলবার সুযোগই পেলাম না, কাল আবার দেখা হবে, কি বলেন?

না বাবা—তা হয় না, না খেয়ে তোমাকে আমি এত রাত্রে যেতে দিতে পারি না। এখানেই দুটো যাহোক মুখে দিয়ে যেতে হবে।

না দিদিমা—এতক্ষণ ফিরি নি, আমার বন্ধুটি হয়তো ভাবছে—কে জানে হয়তো খুঁজতেও বের হয়ে থাকতে পারে—আজ আমি যাই।

উঁহু। তা কি হয় মিঃ রায়—দিদিমা ঠিকই বলেছেন—এত রাত্রে আপনাকে না খাইয়ে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।

খুব বেশী কিছু একটা রাত এখনও হয়নি। অনিলবাবু ঘড়ি দেখুন, রাত এখন মাত্র সাড়ে এগারটা। আজ আমাকে ছেড়ে দিন—আজ আর ওসব হাঙ্গামা করবেন না। তাছাড়া এখন এখানে যখন কিছুদিন থাকতেই হবে, এর মধ্যে এসে একদিন না হয় বেশ জুত করে দিদিমার হাতের রান্না খেয়ে যাওয়া যাবে।

একদিন নয়—তা হলে কাল দুপুরে তুমি আর তোমার বন্ধুটি আমাদের এখানে খাবে বাবা। দিদিমা বললেন।

বেশ। তা বরং হতে পারে দিদিমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল, তাও তো হল না—কাল আলাপও করা যাবে আপনার সঙ্গে। আজকের মত তা হলে চলি দিদিমা।

এস ভাই।

কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একেবারে রাস্তায় নামল।

সত্যিই সুব্রত ও নির্মলবাবু দুজনেই কিরীটীর জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন। কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সুব্রত বলে ওঠে, আচ্ছা যা হোক তুই কিরীটী, কোথায় ছিলি বল্ তো এত রাত পর্যন্ত!

আমরা শ্যামাবাবুকে পর্যন্ত থানায় খবর পাঠিয়েছি। নির্মলবাবু বলেন।

কিরীটী একটা সোফায় গা ঢেলে দিয়ে আসতে হাসতে বলে, থানাতে পর্যন্ত ডাইরী করেছিস!

আপনি বলেন কি কিরীটীবাবু? সেই সন্ধ্যাবেলা একটা লোক বেড়াতে বের হয়েছে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত দেখা নেই—চিন্তা হয় না, আপনিই বলুন? নির্মলবাবু বলেন।

ছেলেমানুষ তো নই যে পথ ভুলে যাব! বা শহর কলকাতাও নয় যে গাড়িচাপা

পড়ে হাসপাতালে যাব।

যাক্ সে কথা—এত রাত হল কেন ? কোথায় গিয়েছিলেন ?

যাব আবার কোথায়—এখান থেকে দু-তিনখানা বাড়ির আগে যে বাগান-বাড়িটা আছে—অনিল চট্টোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক সেখানে থাকেন—বেড়াতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। তাঁদের ওখানেই এতক্ষণ ছিলাম।

কে অনিল ? 'Solitary Corner' বাড়িটা যাদের ?

বোধ হয় তাই। বাড়ির নামটা দেখি নি।

অনিল এখানে আছে নাকি ? নির্মলবাবু আবার প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো, চেনেন নাকি তাঁকে ?

হ্যাঁ—কিন্তু মনে পড়ে আমি যেন শুনেছিলাম, কিছুদিন আগে মীরাটে নাকি কী একটা চাকরি নিয়ে সে চলে গিয়েছিল ?

মীরাটে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ? কথাটা বলতে বলতেই কিরীটী যেন হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে যায়। তারপর হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে অনিলবাবুর পরিচয় আছে তা হলে মিঃ চৌধুরী—তা তো জানতাম না !

অনেকদিনকার পরিচয়। ওর বাবা পাটনার এডভোকেট ছিলেন। অনিলবাবু পাটনার একজন নামকরা খেলোয়াড়। বছর তিনেক পাটনায় আমাদের ব্যবসাসংক্রান্ত একটা ব্যাপারে তিন মাস আমাকে গিয়ে থাকতে হয়েছিল—সেই সময়েই আলাপ। ওদের বাসাতেই ছিলাম যে।

ওঁর বাবা এখনো জীবিত ?

হ্যাঁ। তবে এখন আর প্র্যাক্‌টিস করেন না—বছরখানেক হল পক্ষাঘাত রোগে ভুগছেন।

এখানে ওই বাড়িটা বোধ হয় অনিলবাবুর দিদিমার ?

হ্যাঁ। অনিলবাবুর দাদু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি করতেন, রিটায়ার করে এখানে থেকে গিয়েছিলেন। বছরখানেক হল সন্ন্যাস রোগে মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে—রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী, কাউন্সিলার কলকাতা কর্পোরেশনের।

হন্তদন্ত হয়ে শ্যামাবাবু এমন সময় হঠাৎ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, ওর নাম কী—মিরাকুলাস্ ব্যাপার—না, কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না !

কার সন্ধান পেলেন না শ্যামাবাবু ? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

ব্যস্ত শ্যামাবাবু ঘরে প্রবেশ করেও কিরীটীকে দেখতে পান নি, এখন কিরীটীর কণ্ঠস্বরে তার প্রতি নজর পড়ায় চমকে উঠলেন, ওর নাম কী, আরে আপনি তা হলে ফিরেছেন ? বলতে বলতে কতকটা যেন হতাশভাবেই সামনের সোফাটার উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। দেখুন তো—ওর নাম কী, মিথ্যে হয়রান ! আমিও তো তাই বলি—জোয়ান-মর্দ লোক—কোথায় যাবে ?

হ্যাঁ, মিথ্যে আপনি আমার জন্য কষ্ট পেলেন এই রাত্রে শ্যামাবাবু। সত্যি sorry।

ওর নাম কী, তাতে আর কী এমন হয়েছে—ও তো আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এত রাত পর্যন্ত ছিলেন কোথায়? ওর নাম কী, সেই সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বের হয়েছিলেন!

পাশেই একজনদের বাসায় বসে গল্প করছিলাম।

ওর নাম কী, ওদিকে আমরা কাকে কান নিয়েছে বলে কাকের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম এতক্ষণ! দেখুন তো—

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রাত্রি প্রায় বারোটার সময় শ্যামাবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ওরাও সকলে রাত্রের আহারের জন্য উঠল।

অধিক রাত্রি হওয়ায় আহারের তেমন আর রুচি ছিল না বলে কিরীটী নামমাত্র আহারে বসে উঠে চলে এল।

সুব্রত আহারপর্ব সেরে যখন শয়নকক্ষে এল—দেখলে কিরীটী তখনও শয্যায় যায় নি। গায়ে স্লিপিং-গাউনটা চাপিয়ে একটা আরামকেদারার উপরে শুয়ে চোখ বুজে একটা চুরুট টানছে নিঃশব্দে।

কিরীটীর চোখ বোজা শ্লথ ভঙ্গি দেখে সুব্রত স্পষ্টই বুঝতে পারে কোন একটা জটিল বিষয় নিয়ে কিরীটী আপাততঃ চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গেছে, ডাকলেও তার আর এখন সাড়া পাওয়া যাবে না।

এখনও কতক্ষণ যে অমনিভাবে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে চিন্তা করবে, তা কেউ বলতে পারে না।

সুব্রতর ঘুম পেয়েছিল—সে একবার আড়চোখে কিরীটীকে ধ্যানমগ্ন লক্ষ্য করে, বেশ-বদল করে সোজা শয্যার উপরে গিয়ে গা এলিয়ে দিল।

কখন একসময় সুব্রত ঘুমিয়ে পড়েছিল তা ওর নিজেরই মনে নেই—রাত্রি বোধ করি তখন সাড়ে তিনটে বাজে, হঠাৎ ওর ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুমভরা চোখে তাকিয়ে দেখল, নিঃশব্দে তখনও একই ভাবে কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

খোলা জানালাপথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে ও ওর শয্যায়।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। বাইরের অতলান্ত রাত্রির বুকে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার পরশটুকু যেন বড় করুণ মনে হয়।

হঠাৎ ওর কানে এল কিরীটী আত্মগতভাবে বলছে, না, এ হতেই পারে না—রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী—তার একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী দেবী—মিনু। মৃত সন্তোষ চৌধুরী পাটনার এড্‌ভোকেট্‌…

সুব্রত শয্যার উপরে উঠে বসল।

সুব্রতকে উঠে বসতে দেখে কিরীটী প্রশ্ন করে, কি রে? উঠে বসলি যে? ঘুম হল না?

একঘুম হয়ে গেল। কিন্তু তোর ব্যাপার কি বল্ তো? ঘুমোবি না, না? রাত তো বোধ হয় শেষ হয়ে এল।

সুব্রতর কথায় একবার কিরীটী রেডিয়াম ডায়েলের হাতঘড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, কোয়ার্টার টু ফোর! হ্যাঁ রে, মাঠের মধ্যে গতকাল সকালে যে মৃত দেহটা পাওয়া গিয়েছিল, তার কোন হদিস পাওয়া গেল—লোকটা কে?

না, লোকটার পকেটে একটা 'কালোপাঞ্জা'র নামাঙ্কিত চিঠি পাওয়া গেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কালোপাঞ্জার নির্দেশ ছিল সেই চিঠিতে—লোকটাকে মধুপুরে এসে মাধবী ভিলার কাছে দেখা করবার জন্য কালোপাঞ্জার সঙ্গে।

জানি।

জানিস! কি? সুব্রত বিস্মিতভাবে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ঐ চিঠির কথা। তাই তো ঐ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম লোকটা কে, কী তার পরিচয়? কিন্তু সে কথা যাক্—কাল সকালেই তোকে একটা কাজ করতে হবে।

কি?

কলকাতায় চলে যেতে হবে প্রথম ট্রেনেই।

কলকাতায় যেতে হবে? হঠাৎ?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

শোন, কলকাতায় গিয়ে কতকগুলি জরুরী সংবাদ তোকে সংগ্রহ করে আনতে হবে সর্বাগ্রে। বর্তমানে আমাদের এই হত্যা-ব্যাপারে সেই সংবাদগুলো বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কি সংবাদ?

কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী সম্পর্কে details খবর আনতে হবে, লোকটার গতজীবনের সমস্ত ঘটনা খুঁটিনাটি যতটা সম্ভব, আর—

আর?

আর মৃণালিনী দেবীকে spying করতে হবে।

গোয়েন্দাগিরি করতে হবে—মৃণালিনী দেবীর পিছনে? মানে ঐ রায়বাহাদুরের মেয়ে মৃণালিনী দেবী?

হ্যাঁ।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলবি? সব যে ধোঁয়াটে লাগছে এখন।

ধোঁয়াই বটে। মনে আছে, গতকাল এক আশ্চর্য তরুণীর কথা বলছিলাম—আচমকা আমার সঙ্গে মাঠের মধ্যে দেখা হয়ে গিয়েছিল—যার পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়েছিল আমাকে?

কী বলছিস তুই!

ঠিক তাই, তিনিই আমাদের রায়বাহাদুরের একমাত্র কন্যা তরুণী মিনু দেবী অর্থাৎ মৃণালিনী ব্যানার্জী। কাজটা নেহাৎ অপছন্দের হবে না আশা করি তোর পক্ষে, কি বলিস?

না, তবে মহিলাটি নেহাৎ আমার একেবারে অপরিচিতা নন!

তুই চিনিস তাঁকে?

হ্যাঁ, সবুজ সঙ্ঘের একজন কর্মী কবি মৃণালিনী ব্যানার্জী।

বাঃ, এ যে একেবারে দেখছি 'মহেন্দ্র যোগ'! ঠিক হ্যায়, তবে তো কথাই নেই আর। রায়বাহাদুর বাপের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরও বর্তমান ও অতীত জীবন সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে আসা চাই এবং যত শীঘ্র সেটা সম্ভব ততই ভাল।

রাত্রিশেষের আকাশে অন্ধকার তরল হয়ে আসছে—আবছা একটা পর্দার মত। শেষ অন্ধকারের আভাসটুকু যাই-যাই করছে আকাশের প্রান্তে—রাতের মত শিশির ঝরাও বোধ হয় শেষ হয়ে এল। চাঁদের আলো কখন মিলিয়ে গেছে, পৃথিবীতে সারারাত্রির নিদ্রার পর প্রথম জাগরণের কুণ্ঠাবনত আভাস।

সুব্রত শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লঃ তা হলে দেখা যাক—প্রথম ট্রেন কখন? কি বলিস?

কিরীটী জবাব দেয়, হ্যাঁ, আমার পকেটে দেখ্ একটা বোধ হয় টাইম-টেবিল আছে!

পায়চারি করতে করতেই মৃদুস্বরে কিরীটী বললে। সুব্রত আশ্চর্য হল, কিরীটী তখনও পায়চারি থামায় নি—ঘরের মধ্যে তেমনিই চলেছে পূর্বের মত পরিক্রমা। নির্দিষ্ট একটা পথের সন্ধানে সে অন্ধকারেই এখনও ঘুরে মরছে—বলাই বাহুল্য। এটা কিরীটীর চঞ্চলতা নয়—এটা তার মনোবিশ্লেষণ।

আর কোন বাক্যব্যয় না করে সুব্রত কিরীটীর নির্দেশমত কিরীটীর লং-কোটের পকেটটা হাতড়াতেই অভীষ্ট বস্তুটা পেয়ে গেল এবং পকেট থেকে টাইম-টেবিলটা বের করে আলোর সামনে এনে দেখতে বসল। ভোর সাতটার একটা ট্রেন আছে; কলকাতায় বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছায়।

কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে সুব্রত প্রশ্ন করলে, তা হলে এই সাতটার ট্রেনেই রওনা হয়ে পড়ি—কি বলিস্?

হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রম্।

সুব্রত চট্‌পট তৈরি হয়ে নিল—অশু যাত্রার জন্য। স্টেশনেই চা-পর্বটা শেষ করা যাবে ভেবে সুব্রত রওনা হয়ে গেল।

॥ দশ ॥

আর সেই রাত্রে মৃণালিনী দেবী—মিনু—রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জীর একমাত্র মেয়ে কলকাতা অভিমুখী ট্রেনের একটা লেডিজ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বসে

ভাবছিল। ট্রেনটা কলকাতায় গিয়ে পৌঁছবে ভোর চারটায়—দিদিমা হয়তো খুব ভাববেন—তা আর এমন কি! চিঠিটা না পাওয়া পর্যন্ত যা ভাবনা—চিঠিটা পেলেই সব ভাবনার শেষ। কিন্তু ওখানে আর এক রাত্রি থাকলে কিরীটীবাবুর শ্যেন-দৃষ্টিকে এড়ানো যেত না—যা সাংঘাতিক ভদ্রলোকটি। বাবা, চোখের কি চাউনি! মানুষের চোখ তো নয়—যেন এক জোড়া সাপের পলকহীন চোখ। বাবা অবিশ্যি ওকে এত তাড়াতাড়ি হঠাৎ ফিরতে দেখলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। দিন কুড়ি-পঁচিশ থাকবে বলে মধুপুরে ঠাকুমার ওখানে এসেছিল। জরুরী মিটিং-ফিটিং যা হোক একটা কিছু আছে, বানিয়ে বলা যাবে'খন।

কিন্তু যে কাজের জন্য মধুপুরে ছুটে যাওয়া তার কিছু তো হল না। ঘটনার চাকাটা এমনভাবে হঠাৎ ঘুরে গেল যে, সন্তোষ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগই হল না।

কিরীটীবাবুর নিশ্চয়ই একটা ধারণা হয়ে গেছে—সে কালোপাঞ্জা সম্পর্কে অনেক কিছুই সংবাদ জানে!

আপন মনেই মৃদু মৃদু হাসতে থাকে মিনু।

হু-হু করে রাত্রির অন্ধকারে মেল ট্রেনটা ছুটে চলেছে। অন্ধকার আকাশপথে ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ফানেল-মুখে নির্গত আগুনের ফুলকিগুলো যেন বিন্দু বিন্দু লাল রক্তবর্ণ ফুলের মত ফুটে উঠেই কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। কামরায় যাত্রী আর দুটি বৌ ও তাদের সঙ্গে একজনের একটি ও অন্য জনের দু'টি ছেলেমেয়ে—সকলেই নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু মিনুর চোখে ঘুম আসছে না। রাত্রে ট্রেনে ও কোনদিনই ঘুমোতে পারে না, কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

এ্যাটাচি কেসে একটা রহস্য উপন্যাস আছে। উঠে এ্যাটাচি কেস খুলে মিনু বইটা বের করে পড়তে শুরু করে আপন মনে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত চিন্তা কোথায় তলিয়ে যায়—বইয়ের ঘটনার মধ্যে ওর মন যায় তলিয়ে।

কলিকাতা।

নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পনেরো বাদে হাওড়ায় এসে গাড়ি 'ইন্' করল। গাড়ি থেকে নেমে সোজা স্টেশন থেকে বের হয়ে মিনু একটা ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভারকে বলল, বালীগঞ্জ প্লেস"।

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

সারারাত্রির জাগরণ-ক্লান্তি চোখেমুখে—দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সির খোলা জানালাপথে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ভারী ভাল লাগে মিনুর।

কলকাতা শহর ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে। চারিদিকে শুরু হয়ে গেছে জীবন-যাত্রার কর্মব্যস্ততা।

বাড়িতে পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উপরে উঠতেই ভৃত্য করালীচরণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

দিদিমণি ! এত সকালে ? করালী জিজ্ঞাসা করে ।

মধুপুরে ভাল লাগল না করালীদা—তাই চলে এলাম । হ্যাঁ রে, বাবা উঠেছেন ঘুম থেকে ?

বাবু তো কলকাতায় নেই । দিন চারেক হল লাহোর গেছেন কি একটা জরুরী কাজে—দিন সাতেক পরে ফিরবেন ।

হঠাৎ লাহোর গেলেন যে ? কেন গেলেন জানো কিছু ?

না তো । তোমার মধুপুর যাওয়ার পরদিনই তো সন্ধ্যার ট্রেনে হঠাৎ চলে গেলেন ।

ওঃ ! বিষ্ণুকে চা দিতে বল করালীদা ।

করালীচরণ চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেল ।

মিনু নিজের ঘরে এসে ঢুকল চিন্তিত মনে, বাবা হঠাৎ লাহোর গেলেন কেন ? হঠাৎ আবার তাঁর লাহোরে কী কাজ পড়ল ?

সারাটা রাত ট্রেনে জেগে কেটেছে । চোখ জ্বালা করছে । মিনু তাড়াতাড়ি স্নানের জন্য তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করে ।

কলকাতায় এখন শীত একপ্রকার নেই বললেও চলে ।

স্নান সম্পর্কে একটা বিলাস মিনুর চিরদিনই আছে—কি শীত, কি গ্রীষ্ম ! অনেকক্ষণ ধরে স্নান করবার পর শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হল ।

স্নানান্তে পৃষ্ঠব্যাপী অজস্র ভিজে চুলে ঘরে এসে দেখলে, ইতিমধ্যে ভৃত্য বিষ্ণু চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে গেছে ।

জামাকাপড় ছেড়ে, সামান্য প্রসাধন করে, সোফার উপরে বসে বসে বেশ আরাম করে মিনু দু কাপ চা পান করবার পর ঐদিনকার সংবাদপত্রটা খুলে বসল ।

মিঃ সন্তোষ চৌধুরীর হত্যাকাহিনী নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ! তার অনুমান মিথ্যা নয় সে দেখল ।

বেশী অনুসন্ধান করতে হল না—শেষ পৃষ্ঠায় বেশ বোল্ড্ টাইপে ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে—তবে তার মধ্যে 'কালোপাঞ্জা'র নাম-গন্ধও নেই ।

থাকবে যে না তা অবিশ্যি মিনু জানতই ।

এমনই হয় । অদৃশ্য একটি কালো হাত নিঃশব্দে এসে হত্যা করে গেল, ঘুণাক্ষরেও কেউ তা জানলে না, বুঝতে পারলে না বা জানতে পারলে না তার আসল সত্যিকারের পরিচয়টুকু পর্যন্ত ।

কোথা দিয়ে যে কী ঘটে গেল—সমস্ত রহস্যের মেঘনাদটি যে কে—কেউ হয়তো কোনদিন ভবিষ্যতে জানতে পারবে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে ? কিন্তু কিরীটীবাবু ! তিনিও কি বুঝতে পারবেন না, কে সেই 'কালোপাঞ্জা' ? কী তার সত্যিকারের পরিচয় ? ঘুমে যেন দু চোখের পাতা বুজে আসছে—

ঠাকুর ঘরে এসে প্রবেশ করল, দিদিমণি, কী রান্না হবে ?

যা খুশি তোমরা করগে, আমার এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে ঠাকুর, বিরক্ত করো না !

ঠাকুর চলে গেল। আর নয়, এবারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

টান টান হয়ে মিনু শয্যার উপরে শুয়ে পড়ল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মিনু সত্যিই পরিশ্রান্ত, ঘুমোক কিছুক্ষণ ও। ইতিমধ্যে—

মধুপুর।

মিসেস্ চৌধুরীর মনেও এতটুকু শান্তি ছিল না। অদৃশ্য কাঁটার মত কী একটা যেন তাঁর মনকে কেবলই পীড়ন করছিল। অদৃশ্য কোন চক্ষু হতে হচ্ছে অশ্রু-বরিষণ।

তবু জনান্তিকে প্রাণখুলে কিছুক্ষণ কাঁদবারও উপায় নেই, হায় রে দুর্ভাগ্য! স্মৃতির দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সমস্ত অন্তর। ক্ষীণ নয়, সবল প্রতিবাদ জানাচ্ছে সমস্ত অন্তর, তবু—তবু উপায় নেই বুঝি মুখ খুলবার। পাশের ঘরে ছেলে নির্মল ঘুমোচ্ছে—কিন্তু রাত্রি গভীর হল, মিসেস্ চৌধুরীর চোখে তবু ঘুম নেই। সমগ্র শরীর কেমন ক্লিষ্ট, অবসন্ন। মন যেন নেতিয়ে পড়েছে। শয্যা হতে উঠে মিসেস্ চৌধুরী জানালার সামনে এসে দাঁড়ান। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, তবু জানালার কবাট দুটো ঠেলে খুলে দেন।

বাইরে কি ঘন অতলান্ত অন্ধকার, নেই আলো—নেই কোথায়ও।

বন্ধ দরজায় হঠাৎ টুক্ টুক্ করে ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল।

মিসেস্ চৌধুরী চমকে ওঠেন, কে?

চারিদিকে একবার নিজের অজ্ঞাতেই যেন সভয়ে দৃষ্টিপাত করেন, না, ঘরে তো আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই, তিনি একা ঘরে। তবে?

তাঁর একমাত্র ছেলে নির্মল, সেও পাশের ঘরে এতক্ষণে হয়তো নিদ্রিত। তবু বুকের ভিতরটা যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করে ওঠে, একটা ভয়, একটা আশঙ্কা সর্বাঙ্গ দিয়ে শিরশির করে নেমে যায় যেন।

এমন শব্দের সঙ্গে উনি খুব ভালভাবেই পরিচিত।

আবার সেই শব্দ···টুক্···টুক্···টুক্!

বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে।

॥ এগারো ॥

কতকটা যেন নিজের অনিচ্ছাতেই, মন্ত্রমুগ্ধের মত। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মিসেস্ চৌধুরী দরজাটা হঠাৎ খুলে দেন। অনুমান ভুল হয় নি, সে-ই!

সুমিত্রা? আগন্তুক মৃদুকণ্ঠে ডাকে।

তুমি! আবার—আবার তুমি এসেছ? কিন্তু কেন—কেন? কেন এলে এখানে আবার? কী চাও তুমি? কী চাও আবার?

চল ঘরের মধ্যে, কথা আছে। মৃদু সংযত কণ্ঠে আগন্তুক জবাব দেয়।

না, তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই, কোন কথাই আর তোমার সঙ্গে আমার থাকতে পারে না। সব—সব কথার শেষ হয়েছে। তুমি যাও—তুমি যাও। অস্পষ্ট আর্তকণ্ঠে মিসেস্ চৌধুরী বলে ওঠেন।

খুব nervous হয়ে পড়েছ দেখছি! ছিঃ!

তোমার ঘরে যদি কখনও আগুন জ্বলত, তা হলে বুঝতে পারতে আমার আজকের ব্যথা।

ভুল, সুমিত্রা ভুল। ঘর তোমার অনেকদিন আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কেবল একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে সেই ছাইগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে মাত্র।

মানুষের দুর্ভাগ্যকে নিযে যারা পরিহাস করে, তারা পিশাচেরও অধম।

মৃদু হাসির শব্দ শোনা যায়—আগন্তুক হাসছে।

হাসছ?

না, কিন্তু তোমার আজকের এ দুর্ভাগ্যের জন্য আমাকে দায়ী করছ কেন সুমিত্রা?

তুমি—তোমাকে করব না তো কাকে করব?

আবার বলব, ভুল। এ ভুলের জন্য আর যাকেই হোক আমাকে তুমি বিন্দুমাত্রও দায়ী করতে পার না। কারণ তুমি ভাল করেই জান, তোমার আজকের এ দুর্ভাগ্যের সূচনা একদিন তোমার ঘরেই হয়েছিল। অতীতের দিকে ফিরে চাও একটিবার। ভুলো না তোমার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে। আজকের এ দুর্ভাগ্য তো তোমারই নিজ হাতে গড়া।

না, ভুলি নি আমি কিছুই—

তবে—তবে কেন তুমি কাঁদছ?

কাঁদছি যে কেন, তা তুমি বুঝবে না!

কেন?

কারণ তোমার সে অন্তর নেই—সমস্ত অন্তর তোমার আজ জমে পাষাণ হয়ে গেছে। পাথরে কোন স্পন্দন জাগে না।

হয়তো তাই, তবে পাষাণ আমিও একদিন ছিলাম না সুমিত্রা এবং সেকথা তুমি ও অনসূয়া সবার চাইতে বেশী করেই জানতে।

সে কথায় আজ আর আমার কাজ নেই। কেবল একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে—

বল?

তুমি আর আমার সামনে এস না—তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারি না। তোমাকে—তোমাকে···

বল, চুপ করে গেলে কেন? বল?

তোমাকে আমি ঘৃণা করি। পৃথিবীতে এতখানি ঘৃণা বোধ হয় কেউ কোনদিন

কাউকে করে নি।

ঘৃণা—অপমান—লজ্জা—অনুতাপ—সব কিছুর বাইরে আজ আমি। কিন্তু এও আমি বলে যাই সুমিত্রা—তোমার এ আজকের ভুল একদিন ভাঙবে। তখন—তখন বুঝবে, এ তোমার দুঃখ নয়—তোমার জীবনের সবচাইতে বড় আশীর্বাদ। ভগবান যদি তোমার জীবনকে কোনদিন পূর্ণ করে থাকেন—তবে ঐ একটিমাত্র আশীর্বাদই তোমার জীবনের একটি অধ্যায় অন্তত ধন্য ও পূর্ণ হয়ে রইল।

পূর্ণ—ধন্য! উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে মিসেস চৌধুরীর দু চক্ষু প্লাবিত হয়ে যায়, আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, এর চাইতে আমার মৃত্যুও ছিল ভাল, মৃত্যুও ছিল ভাল!

রাত্রি আরও গভীর হয়েছে। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ—ক্ষীণ আবছা আলো এসে পড়েছে টানা বারান্দায়। সমগ্র বিশ্বচরাচর যেন অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় নিঃশব্দতায় ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। সমস্ত বাড়িটা নিঃশব্দ একেবারে। ঘুমের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে তলিয়ে গেছে। কেউ কোথাও জেগে নেই।

হাতে একটি মোমবাতি, সর্বাঙ্গে একটা চাদর জড়ানো, খালি পা, মাথার ঘোমটা পড়েছে খসে, পা টিপে টিপে মিসেস্‌ চৌধুরী বারান্দা অতিক্রম করে চলেছেন।

বারান্দার শেষপ্রান্তে যে ঘরখানি মিঃ চৌধুরীর প্রাইভেট রুম ছিল, মিসেস্‌ চৌধুরী যন্ত্রচালিতের মত সেই ঘরের তালা খুলে ঘরেব মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেন।

মাঝারি গোছের ঘরখানা। মাঝখানে একটি ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি গদিআঁটা রিভলভিং চেয়ার। একধারে একটি সেল্‌ফ—ইংরেজী বাংলা বই। দেওয়ালের গায়ে প্রোথিত একটি লোহার সিন্দুক।

মিসেস্‌ চৌধুরী বাতিটা হাতে করে সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আঁচল থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে একটা চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলে ফেললেন।

সিন্দুকটা একেবারে খালি। একটি কাগজখণ্ডও সিন্দুকের মধ্যে নেই। আশ্চর্য! কী হল সব কাগজপত্র?

হঠাৎ পৃষ্ঠে অত্যন্ত মৃদু হালকা একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে মিসেস্‌ চৌধুরী ফিরে দাঁড়ালেন। অস্ফুট আর্ত চিৎকার শোনা গেল, কে?

মা!

নিমু?

হ্যাঁ মা, আমি—আমি জানি মিঃ রায় এখনও ঘুমোন নি।

কে বললে?

হ্যাঁ আমি জানি—চল এ ঘর থেকে। তোমার ঘরে চল।

কিন্তু—

আর এখন কোন কিন্তু নয় মা—চল লক্ষ্মীটি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত মিসেস্‌ চৌধুরী সিন্দুকটা খোলা রেখেই ছেলের পিছনে

পিছনে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

মিসেস্ চৌধুরীর সমস্ত চিন্তাশক্তিই নয়—সমস্ত অঙ্গও যেন একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে তখন। লোহার মত ভারী হয়ে গেছে দু'টি পা-ই—চলচ্ছক্তি আর বিন্দুমাত্রও নেই।

তুমি তোমার ঘরে যাও মা, আমি ও-ঘরটা বন্ধ করে আসি।

মিসেস্ চৌধুরী এগিয়ে গেলেন। নির্মল ফিরে গেল সেই ঘরটায়। মোমবাতিটা তখনও পিট পিট করে জ্বলছে পাশের সেল্ফটার ওপরে। দেওয়াল-সিন্দুকের দরজাটা তেমনি খোলা। চাবির গোছাটা তখনও ঝুলছে সিন্দুকের দরজার সঙ্গে লেগে। নির্মল সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নির্মল মোমবাতিটা সেল্ফের উপর তুলে থেকে নিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই নির্মল ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল···তারপর সোজা মার ঘরে এসে প্রবেশ করল। মিসেস্ চৌধুরী একটা সোফার উপরে দু হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, পূর্বের মতই মাথায় ঘোমটা নেই—অবেণী-সংবন্ধ কেশরাশি দু কাঁধের ওপর দিয়ে এসে লুটিয়ে পড়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায় অবরুদ্ধ কান্নার আবেগকে রোধ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং সেই জন্যেই হয়তো থেকে থেকে সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে মিসেস্ চৌধুরীর।

নির্মল নিঃশব্দে মার একেবারে পাশটিতে এসে দাঁড়াল। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে মার পাশে বসে গভীর স্নেহে মাকে জড়িয়ে ধরে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, মা, রাত্রি অনেক হয়েছে, এবার শুতে যাও।

এতক্ষণ অতিকষ্টে কান্নার যে দুঃসহ বেগটা মিসেস্ চৌধুরী রোধ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, সহসা সেটা যেন পুত্রের একটি 'মা' ডাকে বাঁধভাঙা বন্যার মতই তাঁকে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি সোফার উপর উবুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

কেঁদো না মা—কেঁদো না, চল, শোবে চল।

॥ বারো ॥

কলকাতা।

ভৃত্যের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে সামান্য কিছুমাত্র মুখে দিয়ে কোনমতে আহার-পর্বটা শেষ করেই মিনু আবার গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিল। ঘুমের নেশা তখনও তার যায় নি। শরীরের ক্লান্তি দূর হয় নি। এখনও ঘুমের প্রয়োজন।

সমস্ত দ্বিপ্রহরটাও ঘুমিয়ে কেটে গেল মিনুর। একখানা দীর্ঘ দিবানিদ্রা দিয়ে মিনু যখন শয্যার উপরে উঠে বসল—বেলা তখন প্রায় গড়িয়ে এসেছে। জানালার

রঙিন কাচের শার্শি'র গায়ে প্রতিফলিত হয়ে শেষ সূর্যরশ্মি রক্তিম পরশ জানাচ্ছে যেন।

ভৃত্য বিষ্ণু এসে জিজ্ঞাসা করলে, দিদিমণি, চা দেব?

চা! যা নিয়ে আয়।

এতক্ষণে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। ক্লান্তি আর অবশিষ্ট নেই। সন্ধ্যাটা এমনি ঘরে বসে কাটিয়ে লাভ কী? কোন সিনেমায় গেলে মন্দ হয় না। দেওয়ালের ক্লকটার দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে পাঁচটা হতে আর খুব বেশী দেরি নেই। ছটার শোতে এখনও চলতে পারে। টিকিট পাওয়া যাবে।

মিনু বেশ বদলের জন্য উঠে পড়ল। সাধারণভাবে কোনমতে বেশ বদলিয়ে নীচে এসে দাঁড়াতেই ভৃত্য করালীচরণ এসে বললে, দিদিমণি, কে একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—বিশেষ কি প্রয়োজন আছে বলছেন।

কে আবার বাবু এলেন দেখা করতে? আমি যে হঠাৎ ফিরে আসব, একথা তো কেউ জানত না!…বসতে দিয়েছিস?

হ্যাঁ, বাইরের ঘরে বসে আছেন।

চল্ দেখি।

ঘরে প্রবেশ করে মিনু আরও আশ্চর্য হয়ে যায়।

আগন্তুক আর কেউ নন—সুব্রত রায়।

সুব্রতবাবুর সঙ্গে 'সবুজ সঙ্ঘে' সামান্যই আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ তার ইতিপূর্বে মাত্র দু-একবার হয়েছিল।

তিনি ইতিপূর্বে কখনও ওদের বাড়িতে আসেন নি এবং ঘনিষ্ঠতাও তেমন বিশেষ কিছু হয় নি।

ব্যাপার কি? সুব্রতবাবু না?

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছেন তা হলে। আমি তো ভেবেছিলাম, বোধ হয় নতুন করে আবার আলাপটা ঝালিয়ে নিতে হবে।

কেন, আমার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আপনার এত poor opinion কেন—একবার কাউকে দেখলে সহজে আমি ভুলি না।

নিশ্চিন্ত হলাম আপনার কথা শুনে মৃণালিনী দেবী।

বসুন, উঠে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? মিনু মৃদু হেসে বললে।

মিনু ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রত উঠে দাঁড়িয়েছিল। আবার সোফার ওপরে বসে পড়ল।

কিন্তু আপনি তো মধুপুরে ছিলেন না? হঠাৎ চলে এলেন যে?

সে প্রশ্নটা আমিও কিন্তু আপনাকে করতে পারি মৃণালিনী দেবী।

সত্যি, ব্যাপার কী বলুন তো সুব্রতবাবু? বেশ চাঞ্চল্যকর বলেই তো মনে হচ্ছে যেন ব্যাপারটা। কিরীটীবাবু আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন নাকি?

সত্যিই তাই। কিন্তু কি করে অনুমান করলেন?

অবিশ্যি সত্যি কথা বলতে, এতটা ঠিক আশা করি নি একটু আগেও। তবে আশ্চর্যও অবিশ্যি তেমন কিছু লাগছে না। কিন্তু যাক সে কথা, আপনার বন্ধুটি নিশ্চয়ই আমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেন নি!

ধরে নিয়ে যেতে বলবে আপনাকে? কেন বলুন তো?

কী জানি, মনে হচ্ছে যেন অনেকটা তাই, নচেৎ আমার পিছনে-পিছনেই বা আপনি এসে হাজির হবেন কেন?

তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেরকমই যদি কিছু ভেবে থাকেন তো তার জন্য দায়ী কি আপনিই নন মিস্ ব্যানার্জী!

দায়ী আমি?

তা ছাড়া আর কে বলুন!

একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি সুব্রতবাবু?

কি এক আষাঢ়ে গল্প তার কাছে সেরাত্রে মাঠের মধ্যে বেচারীকে নির্জনে পেয়ে ফেঁদে এসেছেন, দেখুন না তার ঠেলা সামলাতে বেচারী সাতেও নেই পাঁচেও নেই, শেষ পর্যন্ত কিনা আমাকেই এতদূর ঘোড়দৌড় করতে করতে আসতে হল!

খিল্‌খিল্ করে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে ওঠে মিনু।

হাসছেন?

কি করি বলুন! যাক, চা আনতে বলি?

আপত্তি নেই।

তা হলে একটু বসুন, চায়ের কথা বলে আসি। মিনু ভিতরে যেতে উদ্যত হয়।

কোথাও বের হচ্ছিলেন বলে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ।

তবে তো এ সময় এসে অন্যায় করলাম।

এসে পড়েছেনই যখন তখন আর আফসোস করে কী হবে? নিশ্চিন্তে বসুন, আমি চায়ের কথাটা বলে আসি।

মিনু ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে মিনুর সঙ্গে সবুজ সঙ্ঘে দু-একবার দেখাসাক্ষাৎ ও সামান্য পরিচয় হয়েছে বটে, তবে মৃণালিনীর সঙ্গে এমনভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয় নি সুব্রতর। মেয়েটিকে কিন্তু সুব্রতর মন্দ লাগে না।

কিরীটী এখানে আসবার পূর্বে সুব্রতকে মৃণালিনী সম্পর্কে একটা কথা বলেছিল, ধারালো ক্ষুরের মত বুদ্ধিমতী মেয়েটি। খুব সাবধানে কাজ করবি।

এখন মনে হচ্ছে, কিরীটী নেহাৎ মিথ্যে বলে নি মৃণালিনী সম্পর্কে কথাটা।

একটু পরেই মিনু ভৃত্যের হাতে চায়ের ট্রেতে চা ও কিছু জলখাবার নিয়ে ঘরে এসে পুনরায় প্রবেশ করল।

সুব্রত কী যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মিনু মৃদু হেসে বাধা দিল, না, আগে এগুলো শেষ করে নিন, তারপর কথাবার্তা হবে। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি,

পালাব না।

সুব্রত প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে, কোন জবাব দেয় না।

মিনু খাবারের প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে, কই, শুরু করে দিন!

সুব্রত বিনা বাক্যব্যয়ে অতঃপর প্লেটটা তুলে দক্ষিণ হাতের কাজ শুরু করে দেয়। এবং একটা প্যাস্ট্রির একটু মুখে দিয়ে মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু হঠাৎ আচমকা বলা নেই কওয়া নেই মধুপুর থেকে পালিয়ে এলেন কেন বলুন তো?

পালিয়ে এলাম!

তাছাড়া আর কি? এদিকে বেচারী অনিলবাবু আর আপনার দিদিমা তো ভেবে অস্থির!

কিন্তু আমি তো ঘরে চিঠি লিখে রেখে এসেছিলাম!

সেটা আগে পেলে তো কথা ছিল না, পাওয়া গেল ঘুরে আসবার পর।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু যাক সেকথা, আপনার খোঁজে যেজন্যে এসেছি—

সে আমি বুঝতে পারছি বৈকি সুব্রতবাবু, কিন্তু আপনাকে সত্যিই বলছি—

কি?

যতটুকু আপনার বন্ধুকে সেরাত্রে বলেছি—তার বেশী এক বর্ণও জানি না আমি।

বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আপনার এ কথা আমার বন্ধুটি।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও কথাটার মধ্যে এতটুকুও মিথ্যে নেই জানবেন।

সত্যি বলছেন?

মিথ্যা কথা জীবনে আমি বলি নি সুব্রতবাবু।

কিন্তু তা হলে সেদিন মাঠের মধ্যে একা একা শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিলেন কেন অমন করে?

এবারে সহসা যেন মৃণালিনী স্তব্ধ হয়ে গেল। অলক্ষ্যে যেন নিক্ষিপ্ত হয়েছে সহসা নিদারুণ এক শব্দভেদী বান। অব্যর্থ সে বাণ, মিনুকে যেন মুহূর্তে স্তব্ধ অসাড় করে দেয়।

কয়েক সেকেন্ড সে আর একটি কথাও বলতে পারে না, কেবল বোবাদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সুব্রতর মুখের দিকে।

এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন মৃণালিনী দেবী, বন্ধুটি আমার নেহাৎ একেবারে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেন নি?

কাঁদছিলাম আমি কেন জানেন?

কেন?

জগতে যার চাইতে আপনজন আর মানুষের হতে পারে না—এমনি একজনের

অপমৃত্যুর সংবাদে।

কথাটা যদি আর একটু খুলে বলেন মিস্ ব্যানার্জী !

আমি দুঃখিত সুব্রতবাবু, আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে সত্যিই অক্ষম। তাছাড়া—

তাছাড়া ?

জেনেও আপনার কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। শুধু আপনার বন্ধুকে বলবেন, আমার কান্নার কারণ জানতে পারলেও তাঁর 'হত্যা-রহস্যের' কোন কিনারাই হবে না।

আর কি কিছুই এ সম্পর্কে আপনার বলবার নেই মৃণালিনী দেবী ?

না। সঙ্কোচহীন দৃঢ় উত্তর।

আচ্ছা আপনি হঠাৎ ওভাবে কেন মধুপুর থেকে পালিয়ে এলেন, তার জবাবটাও কি দেবেন না ?

না, কারণ সেটাও একান্ত আমার নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এরপর সুব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ একসময় আবার প্রশ্ন করে, আপনার বাবা রায়বাহাদুর ব্যানার্জী বাড়িতে আছেন ?

না, কয়েকদিন হল তিনি লাহোর গিয়েছেন।

লাহোরে গিয়েছেন ? কবে ?

দিন পাঁচ-ছয় হবে।

হঠাৎ লাহোরে গেলেন কেন জানেন কিছু ?

বলতে পারি না—আমি তখন এখানে ছিলাম না—বোধ হয় কোন জরুরী কাজেই গেছেন।

ও ! সুব্রত যেন কতকটা হতাশই হয়েছে।

অনেকখানি আশা নিয়েই সুব্রত কলকাতায় ছুটে এসেছিল। এখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে, একটা অলীক আলেয়ার আলো লক্ষ্য করে সে মধুপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ছুটে এসেছে। নিমেষে সে আলো ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।

আপনি আমার আসার আগে কোথায় যেন বের হচ্ছিলেন মৃণালিনী দেবী ! মিথ্যে আপনাকে এসে বিরক্ত করলাম। সত্যিই দুঃখিত।

না-না, বিশেষ কোথাও যাচ্ছিলাম না—সিনেমায় যাচ্ছিলাম। বসে বসে ভাল লাগছিল না,—তাছাড়া সারাটা দুপুর ঘুমিয়েছি, শরীরটাও বড় অবসন্ন লাগছিল।

আচ্ছা, আজ তা হলে আমি উঠি।

এর মধ্যেই উঠবেন ? বসুন না।

না, আমারও সারাটা দিন ট্রেনেই কেটেছে, এখন একটু স্নান করে বিশ্রামের প্রয়োজন। সুব্রত উঠে দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে মিনুও উঠে দাঁড়ায়, কিছু যদি মনে না করেন সুব্রতবাবু, একটা কথা

জিজ্ঞাসা করি।

বলুন।।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরীর হত্যা-ব্যাপারের কোন মীমাংসা—মানে আপনার বন্ধু কিছু বুঝতে পেরেছেন কি ?

ঠিক বলতে পারি না মৃণালিনী দেবী, তবে যতক্ষণ কিরীটী কোন ব্যাপারে স্থিরসিদ্ধান্তে একেবারে না পৌঁছায়—কোন কথাই সে বলে না, কোন মতামতও দেয় না, এটা ওর চিরকালের স্বভাব।

আর একটা কথা সুব্রতবাবু, হঠাৎ কি করে আপনার বন্ধু মধুপুরে মিঃ চৌধুরীর হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন জানতে পারি কি ? মানে কি করে একেবারে মৃত্যুর পরের দিনই গিয়ে সেখানে হাজির হলেন ?

সেও একটা রহস্য মৃণালিনী দেবী। মৃত মিঃ চৌধুরীই কিরীটীকে জরুরী তাগিদ দিয়ে সেখানে যাবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন একটা।

চিঠি! মিঃ চৌধুরী কিরীটীবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন ?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো ?

আশ্চর্য! আপনি ঠিক জানেন সুব্রতবাবু, মিঃ চৌধুরীই কিরীটীবাবুকে সে চিঠিখানা লিখেছিলেন ?

চিঠি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেটা চাপা রেখেই সুব্রত বলে, হ্যাঁ, সে চিঠি আমি দেখেছি। চিঠির নীচে সন্তোষ চৌধুরীরই নাম সই করা ছিল। কিন্তু কেন বলুন তো ?

গত মাস ছয়েক ধরে মিঃ চৌধুরী Hemiplegiaতে (অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতে) ভুগছিলেন—

হেমিপ্লিজিয়াতে ভুগছিলেন !

কেন, এ কথা শোনেন নি ?

না তো, এই তো প্রথম শুনছি।

তাঁর স্ত্রীও বলেন নি ?

না।

সংবাদটা সুব্রতকে শুধু স্তম্ভিতই নয়, বিমূঢ় করে দিয়েছিল।

॥ তেরো ॥

সেইদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে সুব্রত কিরীটীকে চিঠি লিখছিল :

কিরীটী,

তোর কথামত সাত-তাড়াতাড়ি মধুপুর থেকে কলকাতায় ছুটে এসে রায়-বাহাদুরের মেয়ের সঙ্গে দেখা করে চলে আসবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও তোর মুণ্ডুপাত করছিলাম। কিন্তু ঠিক সেখান থেকে চলে আসবার মুখে, এমন একটি সংবাদ পাওয়া গেল যা থেকে মনে হচ্ছে, শ্রমটা একেবারে বৃথাই হয়তো যায় নি।

কিছু লাভ হয়েছে। মিঃ চৌধুরীর যে চিঠিখানা পেয়ে তুই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে মধুপুরে গিয়ে হাজির হয়েছিস এবং যে চিঠিটার হস্তাক্ষর ইতিপূর্বেই আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে, এখন বুঝতে পারছি সেটা আদপেই মিঃ চৌধুরীর লেখা নয়, কারণ তিনি নাকি Hemiplegiaতে ভুগছিলেন গত মাসকয়েক থেকে। একটু আগে তোর বন্ধু ফ্যাটি গুপ্তকে * ফোন করেছিলাম, রোগটা সম্পর্কে ভাল করে জানবার জন্য। সে বললেঃ অর্ধাঙ্গে একেবারে পক্ষাঘাত হয়ে যায় ঐ রোগে এবং ঐ রোগের কারণগুলোও বেশ জটিল। সেদিক থেকেই মৃত মিঃ চৌধুরী সম্পর্কে অনেক তথ্যই হয়তো তুই এবারে পাবি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, একটা কথা আমি ঠিক এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, যে লোকটা Hemiplegia রোগে ভুগছিল, সে কেমন করে বাড়ি থেকে অত দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল ? আর তা যদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ যদি তাকে সেখান পর্যন্ত বহন করে বা অন্য কোন উপায়েই নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে তবে অবিশ্যি অন্য কথা—কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস, মিঃ চৌধুরীকে প্রথমে খুন করা হয়েছে, তারপর হয়তো তাঁর মৃতদেহ সেখানে অর্থাৎ মাঠের মধ্যে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে যাক, সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছেঃ রায়বাহাদুর ব্যানার্জী আপাততঃ কলকাতাতে নেই। তাঁর মেয়ের মুখে শুনলাম, তিনি নাকি হঠাৎ কি কাজে লাহোর গেছেন। তৃতীয় বক্তব্যঃ মৃণালিনী দেবী সেরাত্রে মাঠের মধ্যে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তার বেশী নাকি তিনি কিছুই জানেন না। চতুর্থ হচ্ছেঃ হঠাৎ তিনি একখানি পত্রাঘাত করে কেন যে মধুপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন, সে সম্পর্কেও কোন কথা বলতে তিনি নারাজ। বললেন, সেটা একান্ত নাকি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবারে পঞ্চম কথায় আসছিঃ সেরাত্রে তিনি একা একা মাঠের মধ্যে অন্ধকারে অমন করে ফুলে ফুলে কাঁদছিলেন কেন প্রশ্ন করায় বললেন, সেটা নাকি একান্ত তাঁর আপনার জন একজনের অপমৃত্যুর দুঃসংবাদে। এই হল মোটামুটি সব। এখন পত্রপাঠ আমাকে জানাবি কী আমাকে করতে হবে এর পর।

তোর সুব্রত।

পুঃ। হ্যাঁ, মৃত মিঃ চৌধুরীর Hemiplegiaর সংবাদটা মৃণালিনী দেবীর নিকটেই পাওয়া গেল বলা বাহুল্য। 'সু'

রাত্রি অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে। চিঠিটা লেখা শেষ করে খামে ভরে, খামের মুখটা আঠাতে আঁটতে আঁটতে সুব্রত টেবিলের উপর রক্ষিত হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল—রাত দুটো। চোখেমুখে জল দিয়ে আলোটা নিভিয়ে শয্যার ওপরে গা এলিয়ে দেয় সুব্রত।

সত্যিই আশ্চর্য মেয়ে ঐ মৃণালিনী দেবী! কী যেন একটা সযত্নে গোপন করতে চাইছিল প্রথম থেকেই। মধুপুর থেকে হঠাৎ এভাবে চলে আসবার কী এমন কারণ হল তার ? নিশ্চয়ই একটা না একটা কিছু কারণ ছিল। না হলে কেউ মিথ্যে

* ইসকাবনের সাহেব হরতনের বিবি : লেখক

মিথ্যে হঠাৎ চলেই বা আসবে কেন?

কথাবার্তায় যতদূর মনে হল, চলে আসবার কারণটা যেন ওর শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। একটু যেন হতাশই হয়েছে। কিন্তু কেন?

মাঠের মধ্যে সেই রাত্রে কেন কাঁদছিল, জিজ্ঞাসা করায় আচমকা তার মুখের যে পরিবর্তন হয়েছিল, সুব্রতর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা এড়ায় নি। অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমতী মেয়ে, মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল।

আচ্ছা—সুব্রত আবার ভাবে, হঠাৎ কেনই বা মৃণালিনী দেবী সেখানে গিয়েছিল? কী উদ্দেশ্য ছিল তার মধুপুর যাবার? সেটাও কি pre-arranged? এলোমেলো নানা প্রশ্ন একটার পর একটা মনের মধ্যে জাল বুনতে থাকে মাকড়সার মত। কিন্তু কোনটারই একটা ঠিকমত মীমাংসা ও খুঁজে পায় না। ভাবতে ভাবতে ক্রমে একসময় ক্লান্ত সুব্রত ঘুমিয়ে পড়ে।

মধুপুর।

পরের দিন চায়ের আসরে যখন একা কিরীটী এসে হাজির হল, নির্মল চুপচাপ একা একা বসে এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে চামচ দিয়ে চিনি মেশাচ্ছিল। চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, সমস্ত মুখটা শুষ্ক, বিষণ্ণ—সারারাত্রি জাগরণের সুস্পষ্ট আভাস।

কিরীটী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল, সুপ্রভাত, মিঃ চৌধুরী!

কে? চমকে ফিরে তাকায় নির্মল এবং বলে, মিঃ রায়! সুপ্রভাত। সুব্রতবাবু কই? তিনি এখনও ওঠেন নি বুঝি?

বিশেষ একটা কাজে হঠাৎ তাকে কিছুক্ষণ আগে কলকাতায় যেতে হয়েছে।

কলকাতায় গেছেন! বিস্মিত নির্মল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বুঝি?

অ্যাঁ! হ্যাঁ—

মিসেস্ চৌধুরী—আপনার মা উঠেছেন?

হ্যাঁ, এখুনি হয়তো আসবেন।

নির্মলের কথা শেষ হওয়ার আগেই মিসেস্ চৌধুরী এসে ঘরে ঢুকলেন। মাত্র এক রাত্রেই অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে যেন তাঁরও। একটা প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় যেন তাঁকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে। সমগ্র মুখে পড়েছে একটা গাঢ় বিষণ্ণ ছায়া…একটা ক্লান্ত অবসন্ন ভাব।

সুপ্রভাত, মিসেস্ চৌধুরী। কিরীটী বলে।

সুপ্রভাত।

আপনার শরীরটা কি ভাল নেই?

না। মৃদুকণ্ঠে মিসেস্ চৌধুরী জবাব দেন।

এর পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চা-পান চলে, কেউ কোন কথা বলে না। ভৃত্য এসে ঘরে প্রবেশ করল, ছোটবাবু, সেক্রেটারীবাবু এসেছেন।

কে, সুবিমলবাবু ?

হ্যাঁ।

তাঁকে এখানেই পাঠিয়ে দে।

একটু পরে ওঁদের সেক্রেটারী সুবিমলবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের নীচে তো নয়ই—কিছু বেশী হওয়াই বরং স্বাভাবিক। অদ্ভুত শরীরের গঠন ভদ্রলোকের। সচরাচর বাঙালীর মধ্যে এরকম দেহসৌষ্ঠব বড় একটা দেখা যায় না।

পাঁচ ফুটের বেশী দৈর্ঘ্য হবে না। মাজা-মাজা রং, অনেকটা তামাটে ধরনের—রৌদ্রদগ্ধ। মাথার চুল খুব ঘন, তেল তাতে কোনদিন পড়েছে বলে মনে হয় না।

দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। চোখ দুটি ছোট ছোট—কুতকুতে দৃষ্টি। রুক্ষ একটা কঠিন পুরুষ ভাব যেন সমগ্র মুখখানাকে ব্যেপে আছে।

অল্প দামী সার্জের কালো রংয়ের স্যুট পরিধানে, পায়ে মোটা ক্রেপ্-সোলের ব্রাউন রংয়ের সু।

সমস্ত বেশভূষায় ও চেহারায় অদ্ভুত একটা পারিপাট্য।

ছিম্‌ছাম্—সংযত, অথচ শৌখিন বলেও মনে হয় না ভদ্রলোককে।

বসুন সুবিমলবাবু।

নির্মলের আহ্বানে সুবিমলবাবু একখানা চেয়ার অধিকার করে বসলেন। প্রথমেই মিসেস্ চৌধুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, মিসেস্ চৌধুরী, আপনার চিঠি পেয়েই আমি রওনা হব ভেবেছিলাম—কিন্তু কয়েকটা জরুরী কাজ হাতে থাকায়, সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করে আসতে দেরি হয়ে গেল। আমি দুঃখিত।

॥ চৌদ্দ ॥

মিসেস্ চৌধুরী কোন কথা বলবার আগেই নির্মল প্রশ্ন করে, তুমি সুবিমলবাবুকে আসতে চিঠি লিখেছিলে, মা ?

হ্যাঁ, আমি জানতাম তুমি বম্বে চলে গেছ।

মিঃ রায়, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ নেই—ইনি আমাদের কোম্পানীর চীফ্ সেক্রেটারী—সুবিমল শীল।

নমস্কার। কিরীটী সুবিমলবাবুর দিকে চেয়ে হাত তুলে নমস্কার জানায়।

নমস্কার। প্রত্যুত্তরে বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করেন সুবিমলবাবু নির্মলের দিকে।

সুবিমলবাবু, ইনি মিঃ কিরীটী রায়—বাবার হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছেন বে-সরকারী ভাবে।

ওঃ! তারপর নির্মলের দিকে চেয়ে সুবিমলবাবু বললেন, বড়বাবুর হত্যার

ব্যাপারে কোন কিনারা হল নির্মলবাবু ?

সে কথার জবাব মিঃ রায়ই আমার চাইতে ভাল দিতে পারবেন সুবিমলবাবু। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যাপারটা এত unexpected যে ভাবতেও পারছি না আমি এখনো পর্যন্ত নির্মলবাবু! কিরীটীকে কোনও প্রশ্ন না করে, নির্মলের দিকে চেয়ে সুবিমলবাবু বললেন।

কিরীটীকে অগ্রাহ্য করলেও কথাটার জবাব কিন্তু কিরীটীই দিল, এ ধরনের ঘটনা চিরদিনই অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটে থাকে মিঃ শীল, তবে মিঃ চৌধুরীর হত্যা-ব্যাপারটা যতই unexpected হোক না কেন—it was definitely pre-arranged, অর্থাৎ আগে হতেই—

কী বলছেন আপনি, মিঃ রায় ? প্রশ্ন করলেন নির্মলবাবু।

হ্যাঁ, ও বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত। মিঃ চৌধুরীর হত্যা-ব্যাপারটা আগে থেকেই স্থির করে রাখা হয়েছিল। বলতে বলতে একবার আড়চোখে কিরীটী মিসেস্ চৌধুরীর দিকে আবার অলক্ষ্যে তাকায়। মিসেস্ চৌধুরীর মুখখানি যেন কিরীটীর কথার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে তখন।

মিঃ শীল! হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে কিরীটী সুবিমলবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বলুন! একান্ত নির্বিকার ও নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর।

আপনি ওঁদের কোম্পানীর চীফ্ সেক্রেটারী, confidential অর্থাৎ গোপনীয় অনেক সংবাদই হয়তো আপনি জানেন—আপনি বলতে পারেন, ইদানীং মিঃ চৌধুরীর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন কোন ব্যাপার ঘটেছিল কিনা, যাতে করে এ ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বা সম্ভব ছিল ?

আপনার কথা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না কিরীটীবাবু। সুবিমলবাবু জবাব দিলেন।

মানে, ব্যবসার ব্যাপার তো—অনেক সময় অনেক crisis-এর সম্মুখীন হতে হয় আপনাদের এবং যে কোন বড় ব্যবসাতেই বিপদ-আপদও আসে, তাই বলছিলাম আপনি এমন কিছুর সংবাদ রাখেন কি, যাতে করে হয়তো মিঃ চৌধুরীর এমন কোন শত্রুপক্ষ হয়েছিল, যারা হয়তো ঐভাবে মিঃ চৌধুরীকে—আশা করি আমার বক্তব্যটা আপনি বুঝতে পারছেন।

কিন্তু আমি যতদূর জানি সে রকম কোন কারণ ঘটে নি। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে, ইদানীং কয়েক বছর মিঃ চৌধুরী কোম্পানীর কোন কাজকর্মই তো দেখতেন না।

কেন দেখতেন না ?

তা বলতে পারি না, তবে নির্মলবাবু উনিই সব দেখাশোনা করছিলেন।

আপনি কি বলতে চান আপনার বাবা কিছুই দেখতেন না নির্মলবাবু ? এবার

কিরীটী নির্মলের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে।

না, আমি সব দেখাশোনা করছিলাম। নির্মলবাবু জবাব দিলেন।

ইতিমধ্যে একসময় মিসেস্ চৌধুরী চায়ের টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গিয়েছিলেন। কিরীটী হঠাৎ নির্মলবাবুর দিকে চেয়ে বললে, নির্মলবাবু, আপনার মার শরীরটা বোধ হয় অসুস্থ হয়েছে, আপনি সর্বদা মার কাছে কাছে থাকবেন। এ সময় আপনাকে কাছে পেলে, হয়তো কিছু সান্ত্বনা পাবেন উনি।—যান, মার কাছে যান।

নির্মল অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে চলে গেল।

কিরীটী পকেট থেকে অতঃপর সিগারকেসটা বের করে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করতে করতে সুবিমলবাবুর দিকে চেয়ে বললে, অভ্যাস আছে আপনার?

No, thanks! সুবিমলবাবু জবাব দেন।

কিরীটী একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে কয়েকটা মৃদু টান দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া উদ্গিরণ করলে।

সুবিমলবাবু, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা ছিল।

বেশ তো!

নির্মলবাবুর মুখেই শুনলেন, কেন আমি এখানে এসেছি। অবিশ্যি এ কথা খুবই সত্যি, মিঃ চৌধুরী কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন, এবং এখন সে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারলেও, মিঃ চৌধুরী আর দেহে প্রাণ ফিরে পাবেন না। তবু আইন ছাড়ে না, আততায়ীকে অনুসন্ধান করে বের করে। কারণ দুষ্টের দমনই সভ্য-জগতের রীতি। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও মৃতের প্রতি আপনাদের সকলেরই একটা দায়িত্বই বলুন বা কর্তব্যই বলুন আছে। এবং সেদিক দিয়েও, অর্থাৎ অন্য সব কিছু বাদ দিলেও, হত্যাকারীকে বের করে এর একটা মীমাংসা করা উচিত, কেমন কিনা?

নিশ্চয়ই। সর্বতোভাবে আপনাকে আমি সমর্থন করি মিঃ রায়।

দেখুন, আমি একজন সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি, কিরীটী বলতে থাকে, সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রেই এ ব্যাপারের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছি। অথচ এঁদের সংসারের কোন কিছুই আমি জানি না। তাই বলছিলাম—

আমি যতটুকু জানি এবং যতটা আমার পক্ষে সম্ভব, আমি জানবেন সর্বদাই আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

ধন্যবাদ সুবিমলবাবু। আচ্ছা, মিঃ চৌধুরীদের কোম্পানীতে আপনি কতদিন চাকরি করছেন?

তা বছর পাঁচেক হবে বৈকি!

আচ্ছা, নির্মলবাবু সম্পর্কে আপনার মত কি? মানে আমি জিজ্ঞাসা করছি

ঠিক কি ধরনের লোক উনি ?

মন্দ কি ! খুব সজ্জন বলেই তো জানি।

আচ্ছা ওঁর কোন বিশেষ হবি আছে বলে জানেন কিছু ?

হবি ?

হ্যাঁ—

শীল মহাশয় অত্যন্ত চালাক লোক, চট করে কিরীটীর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন, বলেন, বুঝেছি আপনি কি জানতে চান। দেখুন ধনী বাপের একমাত্র ছেলে নির্মলবাবু এবং ঠিক ধনী বললেই সবটা বোঝানো যাবে না। প্রচুর সম্পত্তির মালিক, লাখ দশ-বারো টাকার কারবার ওঁদের। ব্যাঙ্কেও মজুদ প্রচুর টাকা এবং সাধারণতঃ এ ধরনের ধনীদের একমাত্র বংশধরেরা যেমনটা হয়—বেহিসাবী, অগোছালো, উচ্ছৃংখল—নির্মলবাবু মোটেই তা নন। বরং উল্টোটাই—অত্যন্ত সংযতস্বভাব, ভদ্র, বিনয়ী ও মিতব্যয়ী। নিজস্ব একখানা প্রাইভেট্ 'কার' পর্যন্ত নেই, ট্রামে বাসে অথবা কোম্পানীর গাড়িতে অফিসে যাতায়াত করেন। একশত টাকার বেশী কখনও পকেট expenseপর্যন্ত নেন না।

আশ্চর্য !

সত্যিই তাই। তবে দোষ যে একেবারে নেই তা নয়—

কি রকম ?

একটু বেশীরকম একরোখা বা একগুঁয়ে বলতে পারেন ; নিজে যা ভাল বুঝবেন তা করবেনই—কারও নিষেধ বা উপদেশ নেবেন না। এবং বোধ হয় সেই জন্যই কিছুদিন ধরে কর্তার সঙ্গে তাঁর তেমন good terms ছিল না।

আর একটু খুলে বলুন সুবিমলবাবু ! কিরীটী মনোযোগী হয়ে ওঠে।

Good terms বলতে আমি বলতে চাই ইদানীং বাপে-ছেলেতে তেমন দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হত না, অথচ এই হত্যার কিছুদিন আগে হঠাৎ কেন জানি না, মিঃ চৌধুরী তাঁর পূর্বের উইল বদলে আবার নির্মলবাবুকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন।

আগেব উইলে বুঝি ছেলেকে কিছু দেন নি ?

সেই রকমই প্রায়। নগদ এক লাখ টাকা ও কলকাতার বাড়িটা ছাড়া তাঁর আর কিছুই প্রাপ্য ছিল না—তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিই তিনি দেশ-সেবার কাজে দিয়ে ছেলেকে কেবল অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছিলেন।

সে উইল হয়েছিল কতদিন আগে ?

বছর তিনেক আগে।

তা হঠাৎ সে উইল তিনি বদল করলেন কেন ? জানেন কিছু ?

না। এঁদের এটর্নী মিঃ সান্যাল হয়তো বলতে পারবেন। তাছাড়া মিঃ সান্যাল এঁদের ফ্যামিলির সঙ্গে বহুদিন পরিচিতও।

মিঃ সান্যাল মানে—এটর্নী সুধীন সান্যাল কি ?

হ্যাঁ—লেক রোডে থাকেন।

আচ্ছা, মিঃ সন্তোষ চৌধুরী কি ধরনের লোক ছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

একেবারে যাকে বলে সত্যিকারের ভদ্রলোক। অত্যন্ত নির্বিরোধী ও সদাশয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছেলের সঙ্গে মতের অমিল থাকলেও কখনও কোন ব্যাপারে interfere করতেন না পর্যন্ত!—তাই তো তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদে বেশ আশ্চর্য হয়েছি। তাঁর মত লোকের কেউ শত্রু থাকতে পারে—এমন নৃশংস ভাবে কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারে এ যেন ধারণারও অতীত। অবিশ্যি কর্তার আগেকার জীবন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁর কোম্পানীতে যোগ দেবার পর, বছর দুই যা তাঁর সঙ্গে পাশে পাশে থেকে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি—অমন ভদ্র ও চমৎকার নির্দোষ স্বভাবের মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি, মিঃ রায়। ধনী লোকদের কত খেয়ালই তো থাকে—কিন্তু মিঃ সন্তোষ চৌধুরীর কোন খেয়াল বা নেশা ছিল বলে আমি কখনও শুনিনি।

শীল মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা আর শুনছিল না শেষের দিকে কিরীটী। এই সামান্য কথাবার্তার মধ্যেই সে টের পেয়েছিল, শীল মহাশয় ব্যক্তিটি একেবারে পাকা রুই, এবং ওজনও কম নয়—একে অত সহজে টোপ গেলানো যাবে না।

শীল মহাশয়ের একপ্রকার অজ্ঞাতেই, কিরীটী মধ্যে মধ্যে তার আড়চোখে তীক্ষ্ণ অথচ সজাগ দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিল শীলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

একটা কথা মিঃ শীল, এখানে—মানে এদের কোম্পানীতে, আপনি কত করে মাহিনা পেয়ে থাকেন?

ছয়শত টাকা—

হুঁ। এতক্ষণে এটাই সে মনে মনে আশা করে আসছিল শীলের উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা শুনে।

আচ্ছা মিঃ শীল, এবারে আমি উঠি—আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই বড় প্রীত হলাম, আমার কয়েকটা জরুরী চিঠিপত্র লিখতে হবে।

কিরীটী চেয়ার হতে উঠে, ধীর শান্ত পায়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ফিরে সে তাকায় নি—তাকালে দেখতে পেত মিঃ শীলের দু চোখ বোজা এবং সেই বোজা চোখের কোণে অদ্ভুত একপ্রকার নিঃশব্দ চাপা হাসি—সে হাসি আগুনের ফুলকির মত ঝিলমিল করে জ্বলে উঠেই অকস্মাৎ আবার নিভে যায়।

॥ পনেরো ॥

কিরীটী তার কথা রেখেছিল। দ্বিপ্রহরে অনিলবাবুদের বাসায় মধ্যাহ্ন-আহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল দিদিমাকে, সেকথা সে ভোলে নি।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই সে অনিলবাবুদের 'সলিটারী কর্ণার'-এ গিয়ে হাজির হল।

অনিলবাবু স্নান সেরে বাইরের ঘরের সোফার উপরে বসে কি একখানা ইংরাজী

উপন্যাস নিয়ে নিবিষ্ট ছিলেন। কিরীটীর নিঃশব্দ আগমন তিনি টের পান নি।

অনিলবাবু!

কে? মিঃ রায় আসুন, আসুন! অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে অনিলবাবু উঠে দাঁড়ান।

অপূর্ব সুন্দর চেহারার অনিলবাবুকে আজ সত্যিই আশ্চর্যরকম সুন্দর দেখাচ্ছিল। মিহি শান্তিপুরী ধুতি পরিধানে, গায়ে গরদের চুড়িদার পাঞ্জাবি, পায়ে কাবুলী চপ্পল।

আজ যে বাঙ্গালীর বেশ? কিরীটী সোফার উপরে বসতে বসতে বলে।

এটাই তো আসল—অন্যটা তো নকল। মৃদু হেসে অনিলবাবু জবাব দেন।

দিদিমা কোথায়?

রান্না নিয়ে ব্যস্ত আছেন—বসুন দিদিমাকে সংবাদটা দিয়ে আসি। সকাল থেকে অন্ততঃ বার পাঁচ-সাত আমাকে বলেছেন—ছেলেটি না ভুলে যায়, অনু একবার মনে করিয়ে দিয়ে এলে পারতিস। আমি কি বলেছি জানেন?

কি?

আর তিনি যাই ভুলুন, এ বাড়ির নিমন্ত্রণের কথা তিনি নিশ্চয়ই ভুলবেন না।

ঠিকই তো—খাওয়ার কথা আমি বড় একটা ভুলি না কোনদিনই। কিন্তু আমার সে গোপন কথাটা আপনি জানলেন কি করে বলুন তো?

অনুমান।

কথাটা বলে হাসতে হাসতে অনিলবাবু খোলা দ্বারপথে অন্দরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অনিলবাবু! কিরীটী মনে মনে হয়তো আলোচনা করছিল, আশ্চর্য সুন্দর! দেহের কোথাও সামান্য খুঁত পর্যন্ত নেই। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত—অপূর্ব সুন্দর। বিশেষ করে তার চক্ষু দুটি—তার বুঝি তুলনা নেই। এত সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ সচরাচর বাঙ্গালীর ঘরে বড় একটা চোখে পড়ে না। মোমে গড়া একটি পুতুল যেন। ভদ্রলোকের হাসবার ভঙ্গীটিও আশ্চর্য সুন্দর।

একটু পরে দিদিমা এলেন। পরিধানে একটি গরদের সাদা থান। রান্নাঘর থেকেই আসছেন। কপালে পরিশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। আগুনের তাপে সুন্দর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে।

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে দিদিমা মিষ্টি অভ্যর্থনা জানালেন, সত্যি তুমি আসবে, আমি ভাবি নি ভাই—খুব খুশী হয়েছি, কাল অত রাত্রে না খেয়ে চলে গেলে—মনটা আমার খুঁতখুঁত করছিল। রাত্রে ওখানে ফিরে খেয়েছিলে তো?

হ্যাঁ দিদিমা, ওঁরা সকলেই আমার জন্যে জেগে বসেছিলেন।

বোস ভাই, অল্পক্ষণের মধ্যে আমার সব তৈরী হয়ে যাবে। এই যে অনু—

অনিলবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে লক্ষ্য করেই দিদিমা বললেন, ওর সঙ্গে বসে গল্প কর, আমি ওদিকটা গুছিয়ে নিই ততক্ষণ।

দিদিমা চলে গেলেন কক্ষান্তরে।

একটু পরেই আহারের ডাক পড়লো। একেবারে দেশী প্রথায় আসন পেতে থালায় অন্ন পরিবেশন করা হয়েছে।

আট-দশ রকমের তরকারি ইত্যাদি দিদিমা করেছেন। সব নিরামিষ। মাংস বা মাছের নাম-গন্ধও নেই।

সব কিন্তু নিরামিষ বাবা, কষ্ট হবে না তো ?

কিছু ভাববেন না আপনি দিদিমা। মাছ-মাংসের চাইতে এই আমার বেশী ভাল লাগে।

কাজ থেকে অবসর নিয়ে, শেষ কটা বছর এখানে এসে ছিলেন তো ! মাছ-মাংসের তেমন সুবিধা নেই, তাছাড়া মাছ-মাংস কোন দিনই তেমন পছন্দ করতেন না। কিন্তু ওদের জ্বালায় কি তার উপায় আছে ? যত সব অখাদ্যোই ওদের রুচি ! কথাটা শেষ করে দিদিমা অনিলবাবুর দিকে তাকালেন।

অনিলবাবু হেসে বললেন, অখাদ্যগুলো কি বুঝতে পেরেছেন তো মিঃ রায়, কংকর-কোঁ !···অর্থাৎ নিষিদ্ধ পক্ষী।

কিরীটী মৃদু হাসে মাত্র।

তুই থাম তো !—সেই থেকে নিরামিষ রান্নার দিকেই বেশী নজর দিতে হয়েছে আমাকে। দিদিমা কথাটা শেষ করলেন।

বাঃ—আজ বুঝি মুগের ডালের চপ করেছ, দিদিমা ?

থালা থেকে একটা চপ তুলে আরাম করে চিবুতে চিবুতে ঐসময় অনিলবাবু বললেন, আহা, কবি মৃণালিনী নেই, কে তোমাকে সোহাগ জানিয়ে বলবে, বল তো দিদিমা :

দিদিমা—রন্ধনে তুমি দ্রৌপদী সত্যি !
মুগের ডালের চপ—সৃষ্টি করেছ একি !···

বলতে বলতে অনিলবাবু হেসে ওঠেন।

কিরীটীও হাসিতে যোগ দেয়, বলে, মৃণালিনী দেবীর কবিতা বুঝি ?

হ্যাঁ, দিদিমার রান্না সম্পর্কে তার আরও অনেক কবিতা আছে। এতক্ষণ সে এই মধ্যাহ্ন-আহার-সভাতে থাকলে, কত কবিতা শুনতে পেতেন।

টোম্যাটোর চাট্‌নি, আহা কি বা মরি রে ;
মুগের ডালেতে বড়ি, তুলনা যে নাহি রে !

স্বভাব-কবি বলুন, আপনার মামাতো বোনটি ?

স্বভাব কি অভাব, তা জানি না মশাই, তবে তার কবিতার ঠেলায় আমাদের নিরীহজনের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

মেয়েটা যে কেন হঠাৎ চলে গেল !—দিদিমা এতক্ষণে সখেদে কথাটা বললেন।

মধ্যাহ্নে ভূরিভোজনের পর কিরীটী ও অনিলবাবু দুজনে আবার এসে বাইরের ঘরে বসে। উভয়ের মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। হঠাৎ একসময়

কথায় কথায় কিরীটী বললে, সন্তোষ চৌধুরীর ছেলে নির্মলবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে অনিলবাবু ?

হ্যাঁ, যথেষ্ট পরিচয় আছে। পাটনায় আমাদের বাড়িতে একবার উনি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মাস তিনেক ছিলেন। সেই সময়েই আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

উনিও আপনার কথা বলছিলেন।

বলছিলেন নাকি ? কি ?

হ্যাঁ, কাল রাত্রে এখান থেকে ফিরে গিয়ে যখন আপনাদের কথা বলছিলাম, উনি আপনাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে বলছিলেন।

উনি, মানে, নির্মলবাবু মধুপুরে এসেছেন নাকি ?

হ্যাঁ, পরশু রাত্রেই তো এসেছেন।

কই, আমি জানতাম না তো ? আজ সন্ধ্যাবেলাতেই দেখা করতে যাব, বাপের মৃত্যুতে নিশ্চয়ই অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন ভদ্রলোক।

ভাল কথা, আপনি কিছুদিন আগে মীরাটে চাকরি করতেন শুনছিলাম !

হ্যাঁ—কেন বলুন তো ?

না—এমনিই, নির্মলবাবুও বলছিলেন—তাঁর ধারণা এখনও আপনি মীরাটেই চাকরি করছেন।

পরের তাঁবেদারি করা খুব শক্ত নার্ভের দরকার কিরীটীবাবু।—বেটারা চাকরি দিয়ে মনে করে, আমাদের চোদ্দ-পুরুষের মাথা একেবারে কিনে নিয়েছে।

ওই রকমই হয়—তা হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন ?

হেড্ অফিসের বড়বাবুর হেড্ অফিসে একটা গোলমাল ছিল।

কিরীটী অনিলবাবুর কথার ধরনে হেসে ফেলে, তাই নাকি ? তারপর ?

আমি ডেস্প্যাচ ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ ছিলাম—হঠাৎ একটা ডেস্প্যাচের ব্যাপারে গোলমাল হয়—বড়বাবু আমাকে করলেন দায়ী, অথচ আসলে অর্ডারটা ভুল হয়ে ছেপে এসেছিল বড়বাবুর হাত থেকেই, সেইটা পয়েণ্টআউট করবার পর, আর চাকরি করা সেফ্ নয় জেনে ইস্তফা দিলাম।

অনিলবাবু হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, নির্মলবাবুর সুপারিশেই কিন্তু চাকরিটা পেয়েছিলাম। তবে চাকরি ছাড়বার পর আর নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি।

সন্ধ্যার দিকে কিরীটী মাধবী ভিলায় ফিরে এল। বাইরের ঘরে একা শ্যামাচরণবাবু ভূতের মত বসেছিলেন।

কিরীটী মৃদু হেসে প্রশ্ন করে, শ্যামাচরণবাবু যে, একা একা চুপটি করে এখানে বসে ? ব্যাপার কি ?

আপনার অপেক্ষাতেই। ওর নাম কী—একটা জরুরী পরামর্শ প্রয়োজন।

জরুরী পরামর্শ ! ব্যাপার কি ? হঠাৎ ?

বলছি বসুন !

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, কি, বলুন ?

ওর নাম কি—বেশ serious ব্যাপার !

হুঁ।

মিঃ চাকলাদার আজ সকালে আমাব ওখানে থানায় এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, ব্যাপারটা নাকি তিনি প্রায় যোল আনাই বলতে গেলে মীমাংসা করে ফেলেছেন।

তাই নাকি !

হ্যাঁ, শীঘ্রই ন্যাকি তিনি খুনীকে গ্রেপ্তারও করবেন বললেন।

বটে ! তা খুনী কে, কিছু আপনাকে বললেন ?

হ্যাঁ—তা বলেছেন বটে, তবে—

তবে ?

বুঝতেই তো পারছেন, পুলিস ডিপার্টমেণ্টের সিক্রেট ব্যাপার। ওর নাম কী, আপনি হলেন হাজার হলেও একজন তৃতীয় ব্যক্তি, এসব top secret তো—ওর নাম কী, আর যার তার কাছে ফস করে বলে ফেলা যায় না।

নিশ্চয়ই—তা আমার কাছে কি পরামর্শের জন্য এসেছেন, বলুন তো ?

সেরাত্রে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, মাঠের মধ্যে একজন খুন হয়েছিল, যার পিঠের উপরেও 'কালোপাঞ্জা'র ছাপ পাওয়া গেছে ?

হ্যাঁ—তাতে কি হয়েছে ?

মিঃ চাকলাদার বলছিলেন লোকটা কে তিনি নাকি জানতে পেরেছেন।

তাই নাকি ! তা হলে তাকে মিঃ চাকলাদার চিনতে পেরেছেন বললেন ?

হ্যাঁ।

কি করে চিনলেন বললেন কিছু ?

হ্যাঁ, বলছিলেন আজ সকালের ডাকে নাকি একটা উড়ো চিঠি পেয়েছেন।

উড়ো চিঠি !

হ্যাঁ।

তা সে চিঠিটা আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন তো ?

হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি !

কি লেখা ছিল চিঠিটায় ?

লোকটার নাম শঙ্করনারায়ণ। বিহারেরই লোক।

কি নাম বললেন ? কিরীটী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

শঙ্করনারায়ণ।

চকিতে কয়েকদিন আগেকার শোনা একটি কাহিনী স্মৃতির পাতায় যেন ঝাপটা দিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, যতীন্দ্র, সন্তোষ, বীরেন, কপিলপ্রসাদ, শঙ্করনারায়ণ, রাহুল, সত্যাশিব, কৃপাল সিং !—শঙ্করনারায়ণ !

চিঠিটার তলায় কারো নাম আছে, না বেনামীতে চিঠিটা দিয়েছে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

না, বেনামীতেই চিঠি এসেছে, নীচে কারো নাম নেই।

সে চিঠিটা এখন কোথায়?

আমার কাছেই আছে!

আপনার কাছে?

হ্যাঁ।

চিঠিটা একবার দেখতে পারি কি?

দেখবেন?

হ্যাঁ, যদি অবিশ্যি top secret বলে গোপন না করে দয়া করে দেখান!

বেশ দেখুন! কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন শ্যামাচরণবাবু বুকপকেট থেকে একটা খামসমেত চিঠি বের করে দেন, এই চিঠি!

কিরীটী হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে খামের ভিতর থেকে চিঠিটা টেনে বের করল।

ইতিমধ্যে কখন একসময় অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে, ওরা টের পায় নি।

অন্ধকার হয়ে গেছে দেখি! দাঁড়ান একটা আলোর ব্যবস্থা—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই ভৃত্য আলো হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল। তার ঠিক পশ্চাতে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন নির্মল। ভৃত্য ত্রিপয়ের উপরে আলোটা রেখে চলে যেতেই কিরীটী চিঠিটা আলোর সামনে মেলে ধরল।

পরিপূর্ণ আলোর সামনে চিঠিটার উপর প্রথম দৃষ্টিপাতেই কিরীটী যেন সহসা চমকে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটভাবে কণ্ঠ চিরে একটি শব্দ নির্গত হয়, আশ্চর্য!

অস্ফুট স্বরে কথাটা বললেও কথাটা শ্যামাচরণবাবুর কানে গিয়েছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, কি?

কিন্তু মুহূর্তে কিরীটী নিজেকে সামলে নিয়েছিল তৎক্ষণে এবং মৃদুকণ্ঠে চিঠিটার প্রতি নজর রেখেই বললে, না, কিছু না। তারপর চিঠিটায় মনোনিবেশ করল।

To Mr. H. Chakladar.

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে একটা সংবাদ জানানো প্রয়োজন বিধায় এই পত্র আপনাকে লিখছি। গতরাত্রে মাঠের মধ্যে যে মৃতদেহটি পেয়েছেন তাঁর আসল নাম শংকরনারায়ণ ঝা। ১৯০৭-৮ সনের কোন এক গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘের উনি অন্যতম কর্মী ছিলেন। পরে দেশদ্রোহিতা করায় এবং বৃটিশের তোষণ করায়—ওঁকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করে নিতে হল। ইতি— আপনাদের কশ্চিৎ বন্ধু—

চিঠিখানা বার দুই আগাগোড়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে কিরীটী শ্যামাচরণবাবুর হাতে আবার সেটা ফিরিয়ে দিল।

কার চিঠি মিঃ রায় ? প্রশ্ন করলেন নির্মলবাবু। নির্মল যে ঘরের মধ্যে এসেছে ইতিমধ্যে, কিরীটীর তা নজরে পড়ে নি। হঠাৎ নির্মলবাবুর কথা শুনে কিরীটী ফিরে তাকাল, নির্মলবাবু ! কখন এলেন ?

এই তো। দেখলাম আপনি চিঠি পড়ছেন। তা কার চিঠি ওটা ?

কিরীটী ব্যাপারটা চেপে গেল। বললে, ওটা শ্যামাবাবুদের একটা চিঠি।

ওঃ ! আপনাদের এখনও পর্যন্ত চা পান হয় নি বোধ হয় ?

না।

বসুন, আমি চায়ের কথা বলে আসি। নির্মলবাবু চা দেবার কথা বলতে ভিতরে চলে গেলেন।

কিন্তু শ্যামাবাবু—কি যেন পরামর্শের কথা আপনি বলছিলেন ?

মিসেস্ চৌধুরী আমাকে জানিয়েছেন—ওর নাম কী, তাঁর ছেলের জবানীতে—কাল দুপুরের গাড়িতেই তিনি ছেলেকে নিয়ে—ওর নাম কী—কলকাতায় চলে যেতে চান। এ বাড়ির সর্বত্র তাঁর স্বামীর স্মৃতি, তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না।

স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক।

ওর নাম কী—তা তো আমিও বুঝলাম। কিন্তু মিঃ চাকলাদার ভয়ঙ্কর ভাবে—ওর নাম কী—অমত করছেন। তিনি বলছেন, যতদিন না কেসের একটা কিছু মীমাংসা হয়—কাউকে তিনি যেতে দিতে পাবেন না এখান থেকে আপাততঃ।

হুঁ।—কিন্তু কেন ? মিঃ নির্মল চৌধুরীকে না-হয় তিনি সন্দেহ করছেন সন্তোষ চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে—কিন্তু তাঁর মা ?

Good Good ! ওর নাম কী—এ কথা আপনি—আপনি জানলেন কি করে ? আমি তো কিছু বলি নি—ওর নাম কী—উনি আমাকে বলতে বারণ করে—ওর নাম কী—নিজেই কি শেষ পর্যন্ত—

কিরীটী হেসে ফেলে, না—তিনি বলেন নি—ওটা আমার একটা অনুমান মাত্র।

ওর নাম কী—বড় সাংঘাতিক অনুমান তো আপনার !

কিন্তু আসল কথাটা কি বলুন তো ?

ওর নাম কী—সেইটেই তো আপনাকে জিজ্ঞাস্য মশাই—কি করি এখন বলুন তো ? উনি হলেন গে, ওর নাম কী, সরকার পক্ষের লোক। অথচ দেখুন তো কি বিশ্রী অবস্থা আমার ! নির্মলবাবুকে যে এখন কি বলে আটকাই…

কি আর বলবেন—বলুন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্মলবাবু বা তাঁর মা এখান থেকে যেতে পারবেন না।

কিন্তু—। শ্যামাবাবু ইতস্তত করতে থাকেন।

নির্মলবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, তারপর শ্যামাবাবু, এই সন্ধ্যাবেলায় কি সংবাদ ?

শ্যামাবাবু বিগলিত বিনয়ে হেসে ফেললেন, হেঁ হেঁ—ওর নাম কী, কিরীটী-বাবুর সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল। তাছাড়া আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম।

আপনার চিঠিটা আমরা পেয়েছি। কিন্তু—

কিন্তু?

দেখুন, হত্যাফত্যার ব্যাপার—তদন্ত চলেছে—এ সময় তো আপনাদের এখন মধুপুর থেকে যাওয়া চলতে পারে না!

কেন?

মানে বুঝতেই তো পারছেন—ওর নাম কী—পুলিসের আইন!

রেখে দিন মশাই আপনাদের—ওর নাম কী—পুলিসের আইন! এখানে আর এক রাত্রি বেশী থাকলেই মা আমার পাগল হয়ে যাবেন। বেশ বিরক্তি ও উত্তেজনা ঝরে পড়ে নির্মলবাবুর কণ্ঠস্বরে।

দেখুন নির্মলবাবু, ওর নাম কী, অত কথা বুঝি না—আমি আপনাদের যাওয়ার 'পারমিশান' দিতে পারব না।

I see! জোর করে আপনারা আমাদের আটকে রাখতে চান তা হলে?

॥ ষোলো ॥

ভৃত্য চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল এবং ট্রে-টা রেখেই ঘর হতে বের হয়ে গেল।

তা যা আপনি বলেন!

কিন্তু কেন শুনতে পাই কি?

ওর নাম কি—তা আমি বলতে বাধ্য নই, মিঃ চৌধুরী!

বেশ। আমি কালই আপনাদের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্টকে তার করব—দেখি আপনারা কি করে আমাদের যাওয়ায় বাধা দেন!

ওর নাম কি—করে দেখুন। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

শ্যামাচরণ লাহা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিরীটী এতক্ষণে কথা বললে, বসুন মিঃ চৌধুরী। আপনি বড্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। আসুন চায়ের সদ্ব্যবহার করা যাক।

কিন্তু কি ধৃষ্টতা দেখেছেন লোকটার?

এ সময় আপনার অধৈর্য হলে তো চলবে না, মিঃ চৌধুরী। জানেন তো, পুলিসের ব্যাপার—তিলকে তাল করে দেখাই ওদের স্বভাব। বলতে বলতে কিরীটী চা ঢালতে থাকে।

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে সেটা সামনে নামিয়ে রেখে নির্মলবাবু বললেন, মার দিকে চাওয়া যায় না, মিঃ রায়। আমিই মাকে বলে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় যেতে আজ সকালে রাজী করিয়েছি। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত 'শক্' পেয়েছেন উনি।

বুঝতে পারছি বৈকি সব, কিন্তু কি করবেন বলুন নির্মলবাবু! দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে আসেই।

এখন দেখছি বেটাদের জানানোই আমার উচিত হয় নি। মনে হল জানানো প্রয়োজন—তাই—

আমি কিন্তু বলব, একপক্ষে সেটা ভালই করেছেন নির্মলবাবু।

পরের দিন বেলা তখন বোধ করি ন'টা হবে। কিরীটী আব নির্মল চৌধুরী বাইরের ঘরে বসে গল্প করছিল, অনিলবাবু এসে ঘ' প্রবেশ করলেন।

এস অনিল। তুমি এখানে আছ, জানতাম না।—নির্মলবাবু আহ্বান জানালেন।

দিন কুড়ি হল এখানে এসেছি। কালই আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু—

অনিলবাবুব কথাটা শেষ হল না, মিঃ হংসরাজ চাকলাদার, শ্যামাচরণ লাহা ও দুজন বেহারী পুলিস এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কি ব্যাপার মিঃ চাকলাদার? সকালবেলাতেই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে একেবারে! কথাটা কিরীটী বললে।

কিরীটীর কথার কোন জবাব দেওয়া দূরে থাক—তার প্রতি দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে মচ্‌মচ্‌ শব্দে সোজা একেবারে নির্মল চৌধুরীর সামনে এগিয়ে এসে বললেন, মিঃ নির্মল চৌধুরী—আপনার নামে বডি ওয়ারেণ্ট্‌ আছে। আপনাকে এখুনি আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

বডি ওয়ারেণ্ট্‌! আমার নামে? বিস্মিত বিমূঢ় নির্মল চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

শ্যামাবাবু, do your duty! Make him understand!

এবারে শ্যামাবাবুর পালা। তিনি এগিয়ে এলেন, ওর নাম কী, থানায় গেলেই সব বুঝতে পারবেন।

কিন্তু যাবার আগে আমি জানতে চাই—কিসের জন্য ওয়ারেণ্ট?

আপনার পিতা মৃত মিঃ সন্তোষ চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে আপনাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। শ্যামাবাবু এবারে জবাব দিলেন।

আমার বাব্যর হত্যার ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করছেন! তার মানে বলতে চান, আমি আমার বাবাকে হত্যা করেছি? কি পাগলের মত প্রলাপ বকছেন শ্যামাবাবু?

প্রলাপ উনি বকছেন কি আপনি বকছেন, আদালতই সেটা স্থির করবে মিঃ চৌধুরী—জবাব দিলেন মিঃ চাকলাদার।

কিন্তু how it is possible, Mr. Chakladar? প্রশ্ন করলে এবার কিরীটী।

সে প্রশ্ন করবার আপনি কে মশাই? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেন চাকলাদার।

বিশেষ আর কে!—মিঃ চৌধুরীর বন্ধু ও শুভার্থী হিসাবে প্রশ্নটা করছি।

I see, বন্ধু! তার পরই যেন অবজ্ঞাভরে কিরীটীকে অস্বীকার করেই শ্যামাবাবুব দিকে তাকিয়ে চাকলাদাব বললেন, আপনার কাজ করুন, মিঃ লাহা। চলুন, মিথ্যে দেরি করছেন কেন?

সত্যিই তো, আপনাদের ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না ডিটেকটিভ মশাই—নির্মলবাবু তো হত্যার সময় এখানে উপস্থিতও ছিলেন না। হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে এসে হত্যা করে গেলেন নাকি? চমৎকার আপনাদের কল্পনা মশাই! —কথাটা বললেন এবার অনিলবাবু।

হুঁ, হু!···সে আপনি বুঝবেন না। সেটাই তো ওর Alibi।

বেশ, আমি প্রস্তুত। কিন্তু একবার মার সঙ্গে দেখা করে আসতে চাই।

না, প্রয়োজন হলে হাজতে গিয়েও মিসেস্ চৌধুরী আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। জবাব দিলেন মিঃ চাকলাদার।

ওঃ, বেশ। তবে চলুন।

নির্মল চৌধুরীকে নিয়ে শ্যামাচরণ ও চাকলাদার সম্প্রদায় চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে—অনিলবাবুও চলে গেছেন, একাকী কিরীটী ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে।

একটু আগে ভৃত্যকে দিয়ে মিসেস্ চৌধুরীকে নির্মলের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাঠানো হয়েছে।

হঠাৎ ঝড়ের মতই মিসেস্ চৌধুরী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন, কিরীটীবাবু?

কে? মিসেস্ চৌধুরী?

নিমু—এ কি শুনছি—আমার নিমুকে নাকি পুলিসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে, মিঃ রায়?

বসুন মিসেস্ চৌধুরী। অধীর হবেন না।

কিন্তু নিমু—নিমু তো দোষী নয়! এ আমার কি সর্বনাশ হল? মিসেস্ চৌধুরী কেঁদে ফেললেন।

বসুন মিসেস্ চৌধুরী।

বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, নিমু খুন করে নি। সে কিছু জানে না।

আমিও তা জানি মিসেস্ চৌধুরী। কিরীটী জবাব দেয়।

তবে—তবে কি হবে? আমার নিমু—

মিসেস্ চৌধুরী!—কিরীটী ডাকে।

মিসেস্ চৌধুরী কিরীটীর ডাকে মুখ তুলে তাকালেন, দু'চোখের কোণ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে।

মিসেস্ চৌধুরী, যদি আপনি আপনার ছেলেকে বাঁচাতে চান, আপনার মৃত স্বামীর সম্পর্কে আপনি যা জানেন সব এখনও আমাকে খুলে বলুন!

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস্ চৌধুরী। তারপর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, না না, আমি কিছু জানি না—কিছু জানি না! আমাকে ক্ষমা করুন—আমাকে ক্ষমা করুন!

কালোহাত

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

মিসেস্ চৌধুরী কাঁদছেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছেন মিসেস্ চৌধুরী। দশ আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরে পড়ে।

বিগলিত মমতায় কিরীটীর সমস্ত অন্তর যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কর্তব্য বড় কঠিন। রূঢ় কর্তব্যের খাতিরে আজ তাকে শক্ত হতেই হবে। যে অবশ্যম্ভাবী বিপদের কালো মেঘ আজ চৌধুরী পরিবারের মাথার উপরে ঘনিয়ে উঠেছে—রূঢ় কঠিন আঘাতেই যেন তাকে দূর করতে হবে। মমতায় বিচলিত হলে তো চলবে না।

মিসেস্ চৌধুরী ?

দু হাতে মুখ ঢেকেই মৃদু কান্নাঝরা সুরে মিসেস্ চৌধুরী জবাব দেন, বলুন।

এ তো আপনার কান্নার সময় নয়। বিপদে ধৈর্য হারালে চলবে কেন ?

কিন্তু আমার একমাত্র ছেলে নির্মল—নিমু…

শুনুন মিসেস্ চৌধুরী, আমি জানি আপনার ছেলে তাঁর পিতার হত্যাকারী নন। কিন্তু ঘটনা-বিপর্যয়ে আজ লোকের যে সন্দেহ তাঁর উপরে পড়েছে, সেও একেবারে তো ভিত্তিহীন বলে আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন না ?

হ্যাঁ ! বিস্মিতা মিসেস্ চৌধুরী অশ্রুসিক্ত চোখে কিরীটীর দিকে তাকালেন, কি বলছেন, আমার নিমু—

হ্যাঁ। পুলিসের নির্মলবাবুকে সন্দেহ করবার অনেক কারণই আছে।

অনেক কারণ আছে ? আপনার কথা আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, কিরীটীবাবু ?

হ্যাঁ। আপনি সুস্থির হয়ে বসুন—আপনাকে সব কথা আমি খুলে বলছি। কিন্তু তারও আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, আপনাকে যা যা আমি জিজ্ঞাসা করব, কোন কিছু গোপন না করে ঠিক ঠিক তার জবাব দেবেন, কেমন ? আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন ?

মিসেস্ চৌধুরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, তাই হবে।

বেশ। কিন্তু এখানে তো আমাদের কথা হতে পারে না। নিরিবিলি চাই, চলুন উপরের ঘরে যাওয়া যাক।

বেশ চলুন।

দুজনে উঠে দাঁড়ায়।

সিঁড়ির মুখে এসে কিরীটী বলে, বাথরুমে গিয়ে বেশ করে আগে চোখেমুখে জল দিয়ে সুস্থ হয়ে আসুন। আমি আমার ঘরে অপেক্ষা করছি আপনার জন্য।

মিসেস্ চৌধুরী ধীর শ্লথ পদে নিজ কক্ষের দিকে চলে গেলেন।

কিরীটী তার নিজেরই নির্দিষ্ট কক্ষে এসে সোফার উপরে বসল। নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

খোলা জানালাপথে শীত-শেষের নীল আকাশের খানিকটা চোখে পড়ে।

বাইরে কোথায় একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। বাতাসে ফুলের মিষ্টি সৌরভ।

এক পক্ষে এ সত্যি ভালই হল। হংসরাজ চাকলাদার নির্মলকে গ্রেপ্তার করে নিজের অজ্ঞাতেই যেন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটার গতি অন্য পথে চালিয়ে দিলে।

নির্মলের চারপাশে সন্দেহের জাল যেমন ভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল, এভাবে আচম্কা হংসরাজ তাকে গ্রেপ্তার না করলে আততায়ীর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা যে কোন্ পর্যন্ত বিস্তৃত হত কে জানে!

সেরাত্রে নির্জন মাঠের মধ্যে অন্ধকারে শিমুলতলায় বসে আকস্মিকভাবে মৃণালিনীর অতীত রহস্য উদ্ঘাটন, তার সেই কথা, একটা উন্মাদ প্রতিহিংসার তাড়নায় সুকল্পিত চিন্তা ও বুদ্ধির দীপ্তি যে কি ভাবে বিকৃত হয়ে যেতে পারে—তার চাইতে সহস্রগুণে এই ভাল হল।

সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত লৌহকারাগারে থাকুক ও এমনি করেই। কিছুদিন নির্ভয়ে নিঃসন্দেহে অবাধে বিচরণ করুক খুনী।

এদিকে কিরীটী তার প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো একত্র করে বন্ধন-রজ্জু আরও কঠিন করে তোলবার অবকাশ পাবে।

আরও একটা বিষয়ে কিরীটী নিশ্চিন্ত, নির্মল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে যদি হংসরাজের অকারণ কৌতূহল-বৃত্তি কিছুটা প্রশমিত হয়, অযথা ঘটনার ধারাটাকে যদি এলোমেলো না করে দেয়, কিরীটীর কাজ করাও সুবিধা হবে।

ঘরের বাইরে মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল।

কিরীটী সোজা হয়ে বসে। মিসেস্ চৌধুরী আসছেন।

খুব সন্তর্পণে সহানুভূতির সঙ্গে ওঁকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। সামান্যতম কারণেও যেন বিচলিত না হন।

মিসেস্ চৌধুরী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আসুন মিসেস্ চৌধুরী। বসুন ঐ সোফাটায়। কিরীটী কোমলভাবে বলে।

নিঃশব্দে এসে মিসেস্ চৌধুরী কিরীটীর নির্দিষ্ট সোফাটার উপরে কিরীটীর একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসলেন।

সমগ্র মুখখানির উপরে যেন একটা বেদনার বিষণ্ণ ছায়া নেমে এসেছে। উপর্যুপরি কয়েকটা আঘাতে সত্যিই যে ভদ্রমহিলা ভেঙে পড়েছেন, বুঝতে কষ্ট হয় না কিরীটীর।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়ে যায়। কিরীটীর ইচ্ছা, মিসেস্ চৌধুরীই নিজে থেকে কথা শুরু করেন। কারণ সে জানে, বিচলিত মাতৃহৃদয় একমাত্র পুত্রের আশু মঙ্গল-সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছে।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা হল না। কিছুক্ষণ পূর্বে নীচের কক্ষে বসে যে কথাটি ওঁর পুত্র সম্পর্কে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, মাত্র তারই জের টেনে মিসেস্ চৌধুরী মুখ খুললেন, মিঃ রায়!

বলুন?

আপনি যে একটু আগে—বলতে বলতে কথাটা যেন গলায় আটকে যায় মিসেস্ চৌধুরীর। সঙ্কোচ ও দ্বিধায় উনি থেমে যান, মুখের কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই।

থামলেন কেন? বলুন না কি বলতে চাইছিলেন? কিরীটী সস্নেহে আহ্বান জানায়।

না—বলছিলাম, একটু আগে নীচের ঘরে বসে আপনি যে বলছিলেন—ঘটনা-বিপর্যয় যে নিমুর উপরে যে সন্দেহ আজ লোকের হয়েছে, সে একেবারে ভিত্তিহীন নয়—

সত্যিই তাই মিসেস্ চৌধুরী। সব কথা বলব ও শুনব বলেই যখন আপনাকে আমি ডেকেছি—খোলাখুলি ভাবেই সব কথার আলোচনা করব। সত্যি কথা বলতে কি—আপনার ছেলে নির্মলবাবুর নির্বুদ্ধিতার জন্যই ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে। তিনি যদি বৃথা সব কথা গোপনের চেষ্টা না করে অকপটে সব কিছুই খুলে বলতেন, তবে সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো এমন বিশ্রী একটা মোড় নিত না।

আমি আপনার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, মিঃ রায়!

যে রাত্রে আপনার স্বামী নিহত হন, প্রকৃতপক্ষে সেই রাত্রে নির্মলবাবু মধুপুরেই ছিলেন—অথচ—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন মিসেস্ চৌধুরী, সে কি!

হ্যাঁ। সে কথা উনি গোপন করে রেখেছেন বলেই আপনারা কেউ জানেন না। কিন্তু আমার চোখে নির্মলবাবু ধুলো দিতে পারেন নি। সামান্য একটা ব্যাপারেই সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে।

বলেন কি? নিমু সেরাত্রে মধুপুরেই ছিল?

হ্যাঁ। তিনি মধুপুরে পৌঁছেছিলেন শেষরাত্রে—অর্থাৎ যে মেল ট্রেনটা পাস করে ভোররাত্রি প্রায় পাঁচটা নাগাদ, সেই ট্রেনেই মধুপুরে এসে পৌঁচেছেন। আমি শুধু ঐটুকুই জানি, কিন্তু জানি না পরের দিন সমস্ত সকাল দুপুর ও রাত্রি চারটা পর্যন্ত মোটামুটি ঐ চব্বিশ ঘণ্টা সময় তিনি কোথায় ছিলেন এবং কি করেছিলেন?

নিমু—নির্মল—

এবং এও নিশ্চিত জানবেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্মলবাবু ঐ চব্বিশ ঘণ্টার তাঁর সমস্ত গতিবিধির সংবাদ অকপটে স্বীকার করছেন আমাদের কাছে, তাঁকে বাঁচাবার আমাদের কোন উপায়ই নেই। আপনার স্বামী খুন হয়েছেন মধ্যরাত্রিতে, আর নির্মলবাবু মধুপুরে পৌঁছেছেন রাত্রি পাঁচটায়। অতএব তাঁর পক্ষে মিঃ চৌধুরীকে খুন করা অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। তবে অন্য সব সম্ভাবনা ও কারণগুলো ছেড়ে দিলেও ঐ একটিমাত্র কারণেই নির্মলবাবুর পক্ষে সন্তোষবাবুকে খুন করা অসম্ভব। কিন্তু তবু খুনীকে ধরতে হলে এবং যাবতীয় সব কিছু বুঝতে হলে নির্মলবাবুর ব্যাপারটা সর্বাগ্রে মীমাংসিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কারণ ?

কারণ সত্যিকারের খুনী তিনি এক্ষেত্রে না হলেও—যিনি খুন হয়েছেন তাঁর সঙ্গে তিনি নিকটতম সম্পর্কে সম্পর্কিত বটেই এবং তাঁর পক্ষে সন্তোষবাবুকে খুন করবার মত কারণও ছিল।

খুন করবার মত কারণ ছিল! কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ?

হ্যাঁ, প্রথমতঃ ধরুন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন পিতা ও পুত্রের মধ্যে ইদানীং কিছুকাল ধরে সহজ ও সৌহার্দ্যের সম্পর্কটা যেন ঠিক পূর্বের মত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সন্তোষবাবুর অতীত জীবনের কয়েকটি পৃষ্ঠা—যার গুরুত্ব তাঁর এই অতর্কিতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী আমি মনে করি।

বাপ-ছেলের মধ্যে ইদানীং একটু মন-কষাকষি চলছিল সত্যি, কিন্তু আপনি যা বললেন এইমাত্র, আমার স্বামীর অতীত জীবনের কয়েকটি পৃষ্ঠা—ব্যাপারটা আমি যেন ঠিক বুঝলাম না!

বুঝেছেন ঠিকই। কিন্তু আবার আমি বলছি, আমার কাছে এসময় কোন কথা গোপন করবার চেষ্টা করবেন না।

মিঃ রায়!

হ্যাঁ, আপনার স্বামীর এইভাবে নিহত হওয়ার ব্যাপারটা ঠিক অতর্কিত নয় মিসেস্ চৌধুরী। হত্যাকারীর এটা একটা দীর্ঘদিনের সুপরিকল্পিত প্ল্যান এবং ঐ প্ল্যানের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর অর্থাৎ আপনার স্বামী মিঃ চৌধুরীর অতীত জীবনের অন্ধকারাবৃত রহস্যময় কয়েকটি পৃষ্ঠা, যেটা হয়তো আপনার ছেলে আভাসে বা ইঙ্গিতে বা অন্য কোনভাবে জানতে পেরেছিলেন। আমার যতদূর মনে হয়, সেই কারণেই হয়তো কিছুকাল ধরে পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটা মন-কষাকষি চলছিল। তারপর আরও একটা কথা আপনি জানেন কিনা জানি না, শুধু বাপে-ছেলেতে মন-কষাকষিই নয়, ইদানীং নির্মলবাবু তাঁর পিতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

ঘৃণার চক্ষে দেখতো নির্মল আমার স্বামীকে! কি বলছেন আপনি কিরীটীবাবু ?

আমার অনুমান এতটুকুও মিথ্যা নয় মিসেস্ চৌধুরী এবং সেই জন্যই বোধ

হয় আপনার ছেলে আপনার স্বামীর মৃত্যুতে এতটুকুও আঘাত পান নি, বরং অনেকটা নিশ্চিন্তই বোধ করেছেন।

কিরীটীবাবু! আর্ত অস্ফুট কণ্ঠে মিসেস্ চৌধুরী চিৎকার করে ওঠেন।

অনিবার্য সত্যকে এড়াতে চাইলেই কিছু এড়ানো যায় না মিসেস্ চৌধুরী। সত্য চিরদিনই রূঢ় ও কঠিন। মানুষের জীবনে যখন কোন সত্য অতর্কিতে এমনি করে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, বিশেষ করে যে সত্যকে আমরা চাই না, সে এমনই মর্মান্তিক ও বেদনাক্লিষ্ট হয়। অভিনয়! অভিনয়! যত বড় অভিনয়ই নির্মলবাবু করুন না কেন, আমার চোখকে তিনি ফাঁকি দিতে পারবেন না। শুনুন মিসেস্ চৌধুরী, আপনাকে আমি স্পষ্টাস্পষ্টিই বলছি, যে তিনটি কথা তিনি আমার কাছে মিথ্যে বলেছেন—তার সবটুকু সত্য যতক্ষণ না তিনি আমায় খুলে বলছেন তাঁকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো একেবারেই অসম্ভব।

তিনটি মিথ্যা কথা সে বলেছে!

হ্যাঁ। এক নম্বর, কোন টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আসেন নি এখানে, আসা তাঁর ঐ দিনই রাত্রে আগে থাকতেই বোধ হয় ঠিক ছিল। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে টেলিগ্রামগুলো তিনি কোথা হতে পেলেন? দু নম্বর, এখানে এসেও কেন তিনি মিথ্যা কথা বললেন, কি কারণে তিনি এসেছিলেন? 'ওভারকোট'টা সম্পর্কেই বা মিথ্যা কথা বললেন কেন? তিন নম্বর, আমি যে চিঠি পেয়ে এখানে এসেছি সে চিঠির হস্তাক্ষর কার তা তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, তবু তিনি সেকথা স্বীকার করলেন না কেন? শুধু নির্মলবাবুই নন, আপনি—হ্যাঁ, আপনিও আপনার ছেলের মত তিনটি মিথ্যা কথা বলেছেন। বজ্রের মতই কঠোর কিরীটীর কণ্ঠস্বর।

আমিও মিথ্যা কথা বলেছি?

হ্যাঁ, বলেছেন। মিসেস্ চৌধুরী, আমি কিরীটী—এ কথার ঠিক তাৎপর্য আপনি হয়তো জানেন না, তাই সত্য গোপন করতে আপনি আমার কাছেও দ্বিধাবোধ করেন নি।

কিন্তু—

আপনি কি কি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছেন শুনবেন? এক নম্বর, সেরাত্রে আপনার স্বামীর হত্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন আমি তা বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করেন না!

না।

কেন?

কেন? সেকথা এখনও আমার বলবার সময় আসে নি। তবে এটা জেনে রাখুন, আমি সমস্তটুকু তার বিশ্বাস করি নি এবং না করবার মত আমার যথেষ্টই কারণ আছে। দু নম্বর, আপনি—হ্যাঁ আপনিও ঐ চিঠির হস্তাক্ষর চেনেন। কেমন, বলুন—জানেন না কি কে ঐ চিঠি আমাকে লিখেছে?

আমি—আমি সত্যি বলছি মিঃ রায়—

থাক। গোপন রাখতে চান রাখুন, পীড়াপীড়ি করব না। তিন নম্বর, আপনি আপনার স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে আমার কাছে যে অজ্ঞতার কথা বলেছেন, তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মিথ্যা ?

হ্যাঁ, মিথ্যা। অত বড় মিথ্যা ও অসত্য ইতিপূর্বে জীবনে আপনি কখনও উচ্চারণ করেন নি!

কিরীটীর কথায় মিসেস্ চৌধুরী যেন হতবাক্, বিমূঢ়।

ফ্যালফ্যাল করে বোবা আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মিসেস্ চৌধুরী।

কিরীটী আবার বলে, মিথ্যা সঙ্কোচেব কোন প্রয়োজন নেই মিসেস্ চৌধুরী। যা আপনি স্বেচ্ছায় গোপন করেছেন তা আপাততঃ আমার কাছে না হয় গোপনই থাক। সময় হলে আপনিই তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার ছেলেটি, তাকে এক নম্বর ও দু নম্বর মিথ্যা কথাগুলো তো পরিষ্কার করে বলতেই হবে, নচেৎ তাকে বাঁচানো কারও সাধ্য নেই জানবেন।

কিরীটীবাবু!

বৃথা অনুনয়ে কোন ফল নেই মিসেস্ চৌধুরী। অন্যায় ও অসত্যকে আমি প্রশ্রয় দিই না। একটা কথা মনে রাখবেন, অসত্য ও অন্যায়ের উপরে কোন কিছুই দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মিসেস্ চৌধুরী।

॥ দুই ॥

মিসেস্ চৌধুরী কাঁদছেন আবার। এ কি মহাসঙ্কট আজ তাঁর জীবনের পথে এসে দেখা দিল? একদিকে তাঁর নারীত্বের মর্যাদা—অন্যদিকে তাঁর মাতৃত্ব। একমাত্র পুত্র—এ জগতে তাঁর শেষ ও একমাত্র স্নেহের বন্ধন নির্মল। দুইয়ের মধ্যে একটিকে আজ বর্জন করতেই হবে, কিন্তু কাকে করবেন বর্জন?

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আজ যখন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করছেন—ব্যর্থতা অপমান ও দুঃসহ লজ্জা সেখানে কেবল জমা হয়ে উঠেছে। অরিন্দম—নিষ্ঠুর অরিন্দম শেষে তাঁর জীবনটাকে এমনি করে ব্যর্থ করে দিল!

ক্ষমা করবেন না তিনি অরিন্দমকে। না, কিছুতেই তিনি ক্ষমা করবেন না। নির্মম আঘাত হানবেন তিনি—তার মুখোশটা টেনে খুলে ফেলে তার সত্যিকারের রূপটা জগতের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করে দেবেন।

একটা উন্মাদ প্রতিহিংসার আগুন যেন মিসেস্ চৌধুরীর সমস্ত অন্তর জুড়ে জ্বলতে থাকে, দুঃসহ জ্বালায় অন্তর ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। কিন্তু—কিন্তু কোথায় অরিন্দম? দুঃস্বপ্নের মতই অরিন্দম আজ তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাঁর এত কল্পনার সাজানো সংসার···আচম্কা ধূমকেতুর মতই যেন ও এসে সব তছনছ করে দিয়ে গেল। বিষাক্ত নিশ্বাসে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা কত কল্পনা! কোথায় কোন্ মহাশূন্যে আজ সব মিলিয়ে গিয়েছে! ব্যর্থতা!

একটা বিরাট শূন্য রিক্ততা ! একটা মর্মন্তুদ হাহাকার !

কিন্তু না—না। এ তিনি হতে দেবেন না।

ধীরে ধীরে কখন একসময় চোখের অবিরল অশ্রুধারা শুকিয়ে গিয়েছে, দুটি চক্ষুপ্রান্ত শুষ্ক-অগ্নিগোলকের মতই যেন জ্বলছে। মমতাময়ীর করুণানির্ঝর শুকিয়ে গিয়েছে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে বুকে। সমস্ত অবসাদ—সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের জীর্ণ স্মৃতি সহসা যেন চৈত্রশেষের ঝরাপাতার মত কোথায় উড়ে গেল।

ধূসর অতীত। সুমিত্রা চৌধুরী নয়। সুমিত্রা সান্যাল।

একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছেন—অতীতের কত স্মৃতি-বিজড়িত কত হাসি, কত কান্না, ভালবাসা, মান-অভিমানে ভরা পৃষ্ঠাগুলো। তা কি ভোলা যায়, না সত্যিই কেউ ভুলতে পারে? না কেউ কোনদিন পেরেছে?

সুমিত্রা আর সুচিত্রা দূর-সম্পর্কীয় মামাতো ও পিসতুতো বোন।

প্রায় দুজনেই সমবয়সী এবং সুচিত্রার মা অল্পবয়সে মারা যাওয়ায় সুচিত্রা তার মামা-মামী, সুমিত্রার মা-বাপের কাছেই মানুষ। চার বছর বয়স থেকে তাঁরা পাশা-পাশি মানুষ হয়েছেন। কখনও তাঁরা পরস্পর জানতে পারেন নি যে তাঁরা এক মার পেটের সন্তান না। অচ্ছেদ্য ভালবাসা দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। একের অন্য অন্ত প্রাণ। সব কথাই জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন সুমিত্রা কিরীটীকে। জীবনের প্রতিটি কথা যা তিনি দিনের পর দিন গোপনে ডাইরীর পৃষ্ঠায় লিখে রেখেছিলেন, সেই ডাইরীটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সুমিত্রা ঐদিনই কিরীটীকে।

ঐদিন রাত্রে। কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় চেয়ারের উপরে বসে মিসেস্ চৌধুরীর দেওয়া ডাইরীখানা পড়ছিল।

মুখোমুখি বসে তিনি তাঁর বক্তব্য বলতে পারবেন না বলে বলেছিলেন, মিঃ রায়, এই ডাইরীটা পড়লেই আপনি আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী জানতে পারবেন। আমার জীবনের কথা জেনে আপনার কোন উপকার হবে কিনা জানি না, তবে যদি আমার ছেলেকে উদ্ধার করতে পারেন এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

কিরীটী পড়ছিল।

সুমিত্রা আর সুচিত্রা। আমরা ছিলাম যেন পরস্পর কায়া আর ছায়া। মাঝে মাঝে মনে হত যেন একই রক্তপ্রবাহ দুজনের শরীরে বইছে। আশ্চর্য ! দুজনে দেখতে অনেকটা ছিলাম যেন একই রকমের। আশ্চর্য মিল ছিল আমাদের চেহারায়। ক্রমে ম্যাট্রিক, আই-এ পাস করবার পর দুজনে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হলাম। নিরবিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার পথে আমার হঠাৎ যেন একটা ছায়া পড়ল।

ঘটনাটা ছিল এই :

অবাধ স্বাধীনতা ছিল আমাদের গতিবিধির। যত্রতত্র যেখানে খুশী আমরা যখন তখন যাওয়া-আসা করতাম। একদিন রাত্রে বাড়িতে এসে বই খুলে পড়তে

বসতে গিয়ে বইয়ের মধ্যে একটা খামের চিঠি পেলাম। খামটার উপরে স্পষ্টাক্ষরে বাংলায় লেখা ঃ সুমিত্রা দেবী।

কৌতূহল ও উত্তেজনাভরে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। অপরিচিত হস্তাক্ষর। কিন্তু জীবনে এমন অপূর্ব সুন্দর মুক্তার মত হস্তাক্ষর ইতিপূর্বে আর দেখি নি। গোটা গোটা অক্ষরগুলোর যেন একটা সম্মোহন শক্তি আছে। দুর্দমনীয় আকর্ষণে যেন টেনে নেয় সামনের দিকে।

সুমিত্রা দেবী,

দেশকে আপনি ভালবাসেন নিশ্চয়ই। কিন্তু জানেন দেশ বলতে কি বুঝায়? কতটুকু বুঝায়? সত্যিকারের এর অর্থ কি? দেশ বা দেশের মাটি বলতে আর আমাদের কিছুই নেই, নিজভূমে পরবাসী আমরা। কিন্তু কেন? কেন হব আমরা পরবাসী? মীমাংসার দিন এসেছে আজ—শিকল ভাঙার দিন। আসুন আমরা দেশের ছেলেমেয়েরা মুক্তিপণে দাঁড়াই। সত্ত্বাধিকারের দাবিতে প্রতিষ্ঠা করি আমাদের দেশকে ও সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদের। আশা করি দেশের এই আহ্বানে আপনার সাড়া পাব। যদি রাজী থাকেন কলেজের কমনরুমে লেটার বক্সে একটা খামের মধ্যে কেবল একখানা সাদা কাগজ ভরে শ্রীঅরিন্দম নামটা লিখে ফেলে দেবেন। সাত দিনের মধ্যে কোন চিঠি না পেলে জানব আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী নন। অবিশ্যি এও জানবেন, আপনি আমাদের ডাকে সাড়া দিন বা না দিন তার জন্য কোন বিপদ বা ভয়ের আপনার কারণ নেই। শেষ কথা, ব্যাপারটা আপনি গোপন রাখবেন ও চিঠিটা পড়া হলেই পুড়িয়ে ফেলবেন।

ইতি—১নং

সমগ্র চিঠিটা একবার দুবার করে যে কতবার পড়লাম!

ইতিপূর্বে আমার মনকে এমনভাবে কোন কিছুই নাড়া দিতে পারে নি। আমার সমস্ত সত্তাকে যেন একটা প্রচণ্ড দোলা দিয়েছে।

আমার কাজকর্ম সব গেল। পড়াশুনা আমোদ-আহ্লাদ সব—সব গেল। কেবল দিবারাত্র শয়নে স্বপনে জাগরণে এক চিন্তা, দেশের দাবি দেশের ডাক! আমি কি সাড়া দেব না সে ডাকে?

একটা কথা বুঝতে পেরেছিলাম—এ কোন গুপ্ত বিপ্লবী দলের গোপন আহ্বান।

ইতিপূর্বে গুপ্ত বিপ্লবী দলের অনেক রহস্যময় কথাই আমাদের কানে এসেছে। তাদের কর্মপ্রেরণা, তাদের ত্যাগ, তাদের বিস্ময়কর অত্যাচারে সহ্যশক্তি। জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ-ভালবাসাকে তুচ্ছ অবহেলা করে একমাত্র দেশের জন্য নিজের সবকিছুকে সম্পূর্ণ করে উৎসর্গ করছে যারা—চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করে সেই মানুষগুলোকে প্রণাম জানিয়েছি।

প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে একদল বেপরোয়া তরুণ মৃত্যুসংগ্রামে বদ্ধপরিকর হয়েছে। মধ্যে মধ্যে তাদের অদ্ভুত সব কার্যকলাপের টুকরো টুকরো

রহস্যময় কাহিনী আমাদের শান্ত নিরুপদ্রব জীবনে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে যেত। শিউরে উঠতাম। রোমাঞ্চিত হতাম। প্রণাম জানাতাম। ভয় ও কৌতূহলে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা শিহরণ জাগত।

কত ভাবলাম, চিঠির জবাব দেব—না দেব না ? দেশের কাজ তো অন্যায় নয়। দেশের দাবি—সে তো তুচ্ছ করবার নয়। দেশকে ভালবাসার অধিকার তো সকলেরই আছে।

অস্থির আবেগ-চঞ্চল সে দিন ও রাত্রিগুলো কি ভাবে যে আমার কেটেছে ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারি না। কাউকে বলবারও উপায় নেই।

সামান্য পরামর্শ বা আলোচনা—তারও উপায় নেই। চিরদিনের সাথী সুচিত্রা, তাকেও একটি কথা বলি নি, বলতে পারি নি।

বুকের মধ্যে এমনি করে সঙ্গোপনে কথা চেপে রাখার যে কি দুঃসহ যাতনা—বিশেষ করে মেয়েমানুষের পক্ষে, একমাত্র জানি আমি, আর হয়তো বুঝবে আমারই মত মেয়েমানুষ যারা। কতবার ভেবেছি সুচিত্রাকে সব খুলে বলব।

সুচিত্রা আমাকে সন্দেহ করছিল কিনা তখন তাও জানি না। আরও আশ্চর্য লাগত, ওর মুখের দিকে চাইলে। মনে হত সুচিত্রাও যেন দিবারাত্র কি ভাবছে। তখনও জানি না—ঠিক এমনি একখানি চিঠি সুচিত্রারও হাতে এসে পেঁছেছে এবং সেও আমারই মত অন্তর্দ্বন্দ্বে দিন ও রাত্রি কাটাচ্ছে। পাশাপাশি একই শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে বিনিদ্র রজনী দুজনেই কাটিয়েছি—অথচ কেউ কাউকে সামান্য প্রশ্নটুকু পর্যন্ত করবার সাহস পাই নি।

মরাব মত দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। দুজনেই জেগে—দুজনেই দুজনের কাছ থেকে নিজেকে লুকোবার সে কি দুঃসহ প্রচেষ্টা !

শেষ পর্যন্ত চিঠির জবাব না দিয়ে আর থাকতে পারলাম না।

নির্দেশমত একখানা খাম কলেজ কমনরুমের লেটার-বক্সে রেখে এলাম নির্দিষ্ট দিনে।

এবপর এক দিন দু দিন করে পনেরটা দিন কেটে গেল। অন্য পক্ষ হতে আর কোন সাড়া-শব্দ পর্যন্ত নেই।

রোজ বাড়িতে ফিরে এসে বইগুলোর পাতাগুলো একটার পর একটা উল্টে যাই। না, কোন চিঠিপত্র কিছুই নেই।

তবে কি আমার চিঠি তারা পেল না ? কেমন একটা হতাশায় যেন মনটা ভারী হয়ে উঠল। ক্রমে যেন উত্তেজনাটাও থিতিয়ে গেল একটু একটু করে।

এমনি করে আরও পনেরটা দিন চলে গেল দেখতে দেখতে। মনে আছে আজও—সেটা বৃহস্পতিবার। জীবনের আমার লাল তারিখ। আমাদের এক বান্ধবীর বিবাহের নিমন্ত্রণে তার ওখান থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল।

বাড়ির গাড়িতে ফিরে এলাম। গাড়ি থেকে নেমে ভিতরের দিকে যাচ্ছি, একটা লম্বা বারান্দা—সাগেকার আমলের বাড়ি আমাদের, বারান্দায় মোটা মোটা থাম ও

সুউচ্চ খিলান। বারান্দার সিলিং থেকে গ্যাসের ঝোলানো বাতি জ্বলছে। সমস্ত বারান্দাটা অদ্ভুত একটা আলোছায়ায় কেমন যেন অস্পষ্ট ঘোর-ঘোর।

আপন মনে সিঁড়ির দিকে চলেছি। ঘুমও পেয়েছে, শরীরও ক্লান্ত। হঠাৎ চাপা অথচ সুস্পষ্ট গলায় কে যেন পাশের একটা থামের আড়াল থেকে ডাকল, সুমিত্রা দেবী!

থমকে দাঁড়ালাম। স্পষ্ট শুনেছি ডাক। কিন্তু—

সুমিত্রা দেবী? আবার ডাক শোনা গেল।

আশপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না।

রাত্রি তখন প্রায় একটা।

অত বড় বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এতটুকু সাড়াশব্দ পর্যন্ত কোথাও নেই। হঠাৎ গা-টার মধ্যে কেমন যেন ছম্-ছম্ করে উঠল।

মৃদু ভীতকণ্ঠে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, কে? সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট আলোছায়ায় আমার ঠিক দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল এক দীর্ঘ মূর্তি। পরিধানে ধুতি-পাঞ্জাবি, মুখে একটা কালো মুখোশ। কপালের ঠিক মধ্যস্থলে ১নং সাঙ্কেতিক ক্রমিক নম্বরটি কালো মুখোশের উপর সাদা অক্ষরে লেখা। স্তম্ভিত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না। গলাটা যেন কেমন শুকিয়ে উঠেছে।

ভয় পেয়েছেন সুমিত্রা দেবী?

প্রশ্ন শুনে সামনের দিকে তাকালাম আবার। নিজের অজ্ঞাতেই কণ্ঠ হতে উত্তর বের হয়ে এল, কে আপনি?

আপনার চিঠি আমরা পেয়েছি। সর্বাগ্রে তাই আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারপর একটু থেমে আবার বললে, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। কোথায় আমাদের কথাবার্তা হতে পারে বলুন তো? আপনাদের বাগানে সম্ভব হবে কি?

হতে পারে।

বেশ, তবে তাই চলুন।

একটা কামিনী গাছের পাশে গিয়ে দুজনে দাঁড়ালাম।

কালো অন্ধকার রাত্রি যেন বিশ্বচরাচরকে গ্রাস করে ফেলেছে। কামিনী গাছটায় অজস্র সাদা ফুল ধরেছে, অন্ধকারে সেগুলো যেন স্বপ্নের চুমকির মত মনে হয়, বাতাস গন্ধে মন্থর। মাঝে মাঝে দু-চারটা জোনাকি পোকা আলোর বাতি জ্বালাচ্ছে আর নিভোচ্ছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আগন্তুকই কথা বললে, দেশের ডাকে আপনি সাড়া দিয়েছেন এ যে কত বড় আনন্দের কথা তা কেমন করে আপনাকে বলব! কিন্তু কাজে নামবার আগে আমাদের সকল কথাই আপনাকে খুলে বলব। কারণ কাজ না জেনে কাজে নামা উচিত নয়। এ পথ কিন্তু বড় বিপদসংকুল।

জীবন ও মৃত্যু নিয়ে এ পথের প্রতিটি মুহূর্ত ঘেরা। তাই প্রথম প্রশ্ন আমার, যদি বলি এই মুহূর্তে দেশের জন্য আপনাকে প্রাণ দিতে হবে!

কেমন যেন একটা নেশা ধরে গিয়েছিল সে-সময়। স্থির অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলাম, দেব!

চক্ষের পলকে আগন্তুক তার পকেট হতে একটা ধারালো ছুরির ফলা বের করে আমার সম্মুখে এগিয়ে ধরে বললে, পারবেন? বেশ আসুন, তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক। এই ছুরিটা দিয়ে আপনার একটা আঙ্গুল কাটুন তো?

মনের মধ্যে যেন আগুনের ঝড় বইছিল। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে ছুরিটা হাতে নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে বসিয়ে দিতেই আগন্তুক ক্ষিপ্রহস্তে আমার হাতটা চেপে ধরল।

কি ছিল সে স্পর্শে জানি না, একটা তীব্র আগুনের স্রোত যেন আমার দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে বয়ে গেল মুহূর্তে উগ্র কামনার মত।

থাক্। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছেন সুমিত্রা দেবী।

ঝর ঝর করে তাজা লাল রক্ত ক্ষতস্থান থেকে তখনো ঝরে পড়ছে, এতটুকু যন্ত্রণা-বোধও নেই। সমস্ত দেহ ও সেই সঙ্গে মন যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

আগন্তুক নিজের ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সেই রক্ত নিয়ে আমার কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, সুমিত্রা দেবী, আজ হতে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের রক্ততিলক আপনার কপালে পড়ল। দেশের সেবায় আপনি উৎসর্গিতা হলেন। আজ হতে আপনি দেশের। দেশ আপনার।

তারপর একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, আজকের মত আমি চললাম। প্রয়োজন হলে ডাক আসবে, প্রস্তুত থাকবেন।

চকিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

কিরীটী আবার ডাইরীটা পড়তে লাগল।

সেরাত্রে শয়নকক্ষে যে কি করে ফিরে এলাম জানি না। ইতিমধ্যে নিজের দামী শাড়ীটার একাংশ ছিঁড়ে কাটা আঙুলটায় একটা পট্টি বেঁধে নিয়েছিলাম।

সুচিত্রার শরীর খারাপ বলে সে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যায় নি জানতাম। এসে দেখি ঘরের আলো নিভোনো, ঘর অন্ধকার।

শিয়রের কাছে একটা মোমবাতি-দান থাকত, প্রয়োজন হলে রাত্রে সেটা জ্বালানো হত। আলো জ্বালাতে আর ইচ্ছা করছিল না।

সমস্ত শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। কিছু যেন ভাবতে বা চিন্তা করতেও তখন পারছি না। গভীর উত্তেজনার পর একটা অবসন্ন ক্লান্তি। অসহ্য ঘুমে দু চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। কোনমতে বেশভূষা বদলিয়ে শয্যার উপরে

এসে এলিয়ে দিলাম শরীরটাকে। উঃ, কি ঘুম! অনেকদিন অমন আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমোই নি।

ভাল করে রাতের অন্ধকার তখনও কাটে নি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি পাশে সুচিত্রা স্থির নির্বাক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

সুমি!

ধড়ফড় করে শয্যার উপরে উঠে বসলাম।

তোর কপালে ওটা কি?

আশ্চর্য হয়ে সুচিত্রার দিকে আমিও তখন তাকিয়ে। তারও কপালে যেন কিসের ফোঁটা।

রক্ত শুকিয়ে গেলে যেমন হয়—অনেকটা তেমনি ধরনের।

তোর—তোর কপালে ওটা কি সুচি? আমিও প্রশ্ন করলাম।

মুহূর্তে ও দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজল, বাঁধ-ভাঙা অশ্রুর বন্যা নেমেছে তখন ওর দুই চক্ষু বেয়ে। বক্ষ আমার অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে সুচি আমার বক্ষলগ্ন হয়ে কাঁদছে।

আমারও দুটি চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে এল।—আমাকে ক্ষমা কর সুমি—আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে কোন কথা আজ পর্যন্ত তোর কাছে লুকোই নি। এই একটা মাস ধরে কি যন্ত্রণা যে সহ্য করেছি!

তুইও আমাকে ক্ষমা কর সুচি। আমিও তোর কাছ থেকে সব গোপন করে এ কদিন কম যন্ত্রণা সহ্য করি নি!

দুজনে দুজনার কাছে অকপটে সব স্বীকার করলাম।

সুচিত্রার মুখেই শুনলাম, ঐদিনই সন্ধ্যার সময় তারও রক্ততিলকে দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

দুজনেই আমরা যখন একই দলের, আর গোপনেরই বা প্রয়োজন কি? বরং একদিক দিয়ে এ ভালই হল। এক বাড়িতে এক ঘরে দিবারাত্র পাশাপাশি থেকে এ চেষ্টাকৃত গোপনতার সব কিছু আড়াল একদিন ভেঙে যেতই।

তার চাইতে এই ভাল হল। দুজনেই আমরা একই পথের পথিক। সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে যেন নিজের দিক দিয়ে একটা সান্ত্বনাও পেলাম। শুধু সান্ত্বনা নয়, মনের শক্তিও। গুপ্ত বিপ্লবী জীবনের দুঃসহ গোপনতার মধ্যে এর মূল্যও তো কম নয়।

ভাবতে পারে কেউ আমাদের অবস্থাটা? ধনীর দুলালী, জীবনের সহজ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে অনিশ্চিত বিপদসঙ্কুল পথে অনির্দিষ্ট যাত্রা শুরু হল এবারে আমাদের।

বাবা সরকারের পুলিস বিভাগে ডেপুটি কমিশনার, রায় বাহাদুর। সরকারী

মহলে অখণ্ড প্রতিপত্তি। দোর্দণ্ড প্রতাপ। রায় বাহাদুর বাবার নামে সকলে তখন সশঙ্কিত।

দেশের সর্বত্র তখন শুরু হয়েছে—গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য জীবন-পণ সংগ্রাম। মানিকতলার বোমার কেস দেশের হাওয়া গরম। ঘুমন্ত জাতির বুকে জেগেছে এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডব সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর সমস্ত কর্মতৎপরতাকে অবহেলায় উপেক্ষা করে গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘ চারিদিকে ছড়িয়ে ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে মহা সংগ্রামের জন্য।

সরকারী যথেচ্ছ দমননীতির রথচক্র নিষ্পেষ্ট করে চলেছে নির্বিবাদে কত তরুণের জীবন-স্বপ্ন! লৌহকারাবেষ্টনীতে ফাঁসির দড়িতে কত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে!

এমন সময় পুলিস কমিশনার পিতার অন্দরে আমরা দুটি বিপ্লবী নারী দীক্ষা নিলাম মুক্তিযজ্ঞে।

স্বয়ং রায় বাহাদুর পুলিস কমিশনারকে কে সন্দেহ করবে? তারই বাড়িতে গোপনে দুটি তরুণী বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছে কেই বা ভাববে? এর চাইতে আর বড় নিরাপদ আশ্রয় কী হতে পারে?

যথাসময়ে আমরা দুই বোন ক্রমিক নম্বর দেওয়া দলের মুখোশ পেলাম। আমার নম্বর হল আট আর সুচিত্রার নম্বর হল সাত। জানি না কেন, দলপতি অর্থাৎ যার ক্রমিক নম্বর ছিল এক, প্রথম হতেই আমাদেরও দলের প্রধান দশজনের মধ্যে স্থান দিয়েছিল।

দু-এক মাসের মধ্যেই জানতে পারলাম দশজনের মধ্যে আমরা দুজন অর্থাৎ আমি ও সুচিত্রাই ছিলাম নারী। অন্য সকলে পুরুষ। এবং আমি ও সুচিত্রা যে পরস্পর পরস্পরকে চিনি সেকথা হয়তো একমাত্র দলপতি এক নম্বর ছাড়া দলের আর কেউই জানত না।

দলের কোন মিটিং হলে কেউই আমরা স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতাম না। তাছাড়া সর্বদাই আমাদের যে মিটিং হত, তাতে পুরুষের বেশে যেতে হত বলে, কেউই হয়তো চট করে সন্দেহ করতে পারত না যে আমরা দুজন আট ও সাত পুরুষ নয় নারী। প্রথম প্রথম যে সঙ্কোচ অনুভব করতাম ক্রমে ক্রমে সেটাও কেমন ধাতস্থ হয়ে গেল। কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধার বালাই আর অনুভব করতাম না।

হঠাৎ একদিন গুলি ছোঁড়ার ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদের দুজনারই ডাক পড়ল।

প্রথম যেদিন আগ্নেয়াস্ত্রটি হাতে পেলাম—সে কি একটা অপূর্ব উন্মাদনা! কি পুলকশিহরণ! তারপর হঠাৎ কোন কারণে প্রয়োজন হলে যাতে পিস্তল ব্যবহার করতে পারি সেজন্য আমরা দুজনেই একটি করে পিস্তল ও পঁচিশটি করে রাউণ্ড অর্থাৎ গুলি পেলাম।

তবে আমাদের যে বিশেষ কোন actionয়ে ডাক পড়ত তা নয়। সংবাদের

আদানপ্রদান, গুপ্ত সমিতির চিঠিপত্র লেখা, প্রচারকার্য চালানো ও গোলাগুলি এক স্থান হতে অন্য স্থানে চালান দেবার ছোটখাটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতেই আমার ও সুচিত্রার ডাক পড়ত।

পড়াশোনা গোল্লায় গেল। গুপ্ত সমিতির ব্যাপারেই সর্বদা ব্যস্ত আছি। উগ্র নেশার মত যেন ঐ এক চিন্তাই সর্বদা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আমি যে নারী, বিশেষরূপে যে আমার দেহ ও মন গঠিত, আমার দেহের আদিমতম সার্থকথা প্রেম ও মাতৃত্বে, পুরুষের সৃষ্টিকে ধারণ করে তাকে প্রাণ-প্রাচুর্যে বিকশিত করে তোলাই যে আমার দেহের প্রতিটি কোষের সত্যিকারের পরিচয়, এ কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম! এই দেহের উপর দিয়ে যে কুড়িটি বসন্ত ছাপ রেখে গিয়েছে তাও যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

খোলা বাতায়ন-পথে প্রকৃতি কখন কি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে তাও যেন দেখবার ফুরসৎ ছিল না।

আচমকা বুঝি তাই একদিন পঞ্চশরের ভস্মরাশি খোলা বাতায়ন-পথে এসে আমার ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

সুচিত্রার চোখের চাউনি চঞ্চল। আনমনা ভাব।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল সুচি তোর?

সুচিত্রা কোন জবাব দিতে পারে না। মুখখানা সহসা রাঙা হয়ে ওঠে, চোখের পাতা কেমন বুজে আসে।

সত্যেন ব্যানার্জী আমাদের এক ক্লাস উপরে পড়ত। প্রায়ই সত্যেন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করত।

সুচিত্রা আমার কানে কানে একদিন রাত্রে বললে, সত্যেন ব্যানার্জীকে তোর কেমন লাগে সুমি?

হেসে ফেললাম, কেন, ভালই তো! বুঝতে আর কিছুই বাকী রইল না।

আর একদিন রাত্রে।

হঠাৎ সুচিত্রা আমাকে বললে, জানিস সুমি, সত্যেনও আমাদেরই দলের একজন?

সে কি! চমকে উঠলাম।

হ্যাঁ, তার নম্বর নয়।

তা হলে?

ও বলেছে দল ছেড়ে দেবে।

কিন্তু এ যে বিশ্বাসঘাতকতা সুচি!

কেন? বিশ্বাসঘাতকতা কেন? আমার মনোধর্ম কোন একটা বিশেষ পন্থাকে গ্রহণ করতে পারছে না। তাই সেই বিশেষ কর্মক্ষেত্র থেকে সরে যাব, এতে বিশ্বাস-ঘাতকতার কি আছে? তাছাড়া সংসার করে কি দেশের সেবা করা যায় না? আমরা তো সন্ন্যাসী নই?

মানি। কিন্তু বিপ্লবের পথ সংসারীর জন্য নয়। বিপ্লবীর দেশ-সেবা আর

সাধারণের দেশ-সেবার মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য। প্রতি মুহূর্তে যার প্রাণ বিপন্ন তার জন্য তো সংসারের বন্ধন নয়। সংসারের মায়াডোরে কেন সে আবদ্ধ হবে?

সুচিত্রা তবু নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে।

কেমন যেন একটা বিরক্তি আসে সুচিত্রার প্রতি।

এ কি দুর্বলতা সুচিত্রার! সামান্য প্রেমকে সে জয় করতে পারবে না? হায় রে! তখন তো জানি না, ও সোমরস যে একবার পান করেছে সমস্ত জগৎ তার কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে!

আমাকে গোপন করেই সুচিত্রা ও সত্যেন তখন প্রায় ঠিক করে ফেলেছে, গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সংস্রব তারা ত্যাগ করবে।

আমাদের বাড়িতে বাবার এক বহু দূরসম্পর্কীয় পিসির ছেলে সুধাকান্ত থাকত। আমাদের বাড়িতে থেকেই সে বি-এ পাস করে এম-এ পড়ছিল। একমাত্র আমি ছাড়া বাবার অন্য কোন সন্তানাদি না থাকায় বাবা সুধাকান্তকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন।

ধীর, লাজুক ও নম্র ছেলেটি। লেখাপড়ায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। বাইরের বাড়িতেই একটা ঘরে সে থাকত। মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎও হত। সব চাইতে আশ্চর্য ছিল সুধাকান্তর দুটি চক্ষুর দৃষ্টি। অমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি জীবনে আর আমি দেখি নি। কি একটা সম্মোহন শক্তি ছিল সেই দৃষ্টিতে!

মাঝারি গোছের দীর্ঘ লম্বা দোহারা চেহারা, শ্যামবর্ণ গায়ের রং। মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের, তীক্ষ্ণ উদ্ধত খড়্গের মত নাসা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথার চুলগুলো তৈলহীন রুক্ষ। পরিধানে সর্বদা থাকত একটি মিলের ধুতি ও হাফশার্ট।

বেশী কথাবার্তা বলত না। বাড়িতে বড় একটা থাকত না—বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে বাইরে কাটাত।

সুধাকান্তর পরম বন্ধু ছিল দুজন, সত্যেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ চৌধুরী। প্রায়ই তারা সুধাকান্তর কাছে যাওয়া-আসা করত।

তিনজনের মধ্যে সন্তোষের রূপের যেন অবধি ছিল না। কিন্তু সে রূপ সহসা চট্ করে সকলের চোখে পড়ে না। কিন্তু একবার যখন পড়ে তখন যেন আর চোখ ফেরানো যায় না।

গায়ের রঙ সন্তোষের ঈষৎ তামাটে বর্ণের। এককালে হয়তো খুব ফরসা রঙই ছিল—দীর্ঘদিন ধরে রৌদ্রে দগ্ধ হলে যেমন একটা পিঙ্গল রুক্ষ আভা ফুটে বের হয় তেমনি তার রঙের মধ্যে একটা দগ্ধ ভাব ছিল। বেঁটেও নয়, লম্বাও নয়—মাঝামাঝি। পেশল বলিষ্ঠ গঠন। মাথায় ছোট ছোট ঘন কুঞ্চিত নিগ্রোদের মত পিঙ্গল চুল।

পাঞ্জাবেই ওর জন্ম এবং জীবনের আঠারটা বছরও পাঞ্জাবে মামার কাছেই মানুষ। ছোটবেলায় সন্তোষের মা মারা গিয়েছিল।

অদ্ভুত বাঁশী বাজাত সন্তোষ। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে সুধাকান্তর ঘরে বসে ও বাঁশী বাজাত আপন খেয়ালে। প্রায়ই শোনা যেত। শেষ পর্যন্ত তার ঐ বাঁশীই আমাদের পরস্পরকে পরিচিত করাল। আলাপ করে মুগ্ধ হলাম।

সন্তোষ সুধাকান্তরই সহপাঠী এবং মিষ্টভাষী।

অবশেষে আমারও ঘরের খোলা দ্বারপথে একদিন ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।

॥ চার ॥

চমকে উঠলাম সেই ভ্রমরের কম্পমান পাখার গুঞ্জনে। সাত রঙের রামধনু কখন মনের আকাশের একপ্রান্তে রঙিন হয়ে উঠেছে তা তো কই জানতেও পারি নি! আকাশে বাতাসে এ কি হিল্লোল! কার গুনগুনানি গানের সুর এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যায়! হঠাৎ চমকে উঠি। হঠাৎ লজ্জায় চোখের পাতা আসে বুজে।

সুচিত্রা একদিন বললে, আমাদের সুমির কি হল গো!

চকিত নয়ন, লাজ আভরণ
আহা কে অঙ্গে দিল গো?

ছুটে পালিয়ে গেলাম। ছিঃ, সুচিটা যেন কি!

সত্যি কি আমি পাগল হয়ে গেলাম নাকি? মনের মধ্যে এ কি শিহরণ, এ কি পুলকোচ্ছ্বাস! এ কি দোলা ক্ষণে ক্ষণে! কি হল আমার—কি হল?

ইতিমধ্যে দলে ঘুণ ধরেছিল। আমি টের পাই নি তা।

রাউলাট বিল পাস হয়েছে। পাঞ্জাবের মাটির বুক থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্ত তখনও শুকোয় নি।

ডিসেম্বর মাস। হঠাৎ এমন সময় বিহারের এক প্রান্তে আমাদের সমিতি এক বিশেষ জরুরী অধিবেশনের গুপ্ত পরোয়ানা পাঠাল। দলপতি এক নম্বরের কাছ থেকে এল পরোয়ানা। পরোয়ানা দুজনের নামেই এসেছে—সুচিত্রা ও আমার।

কিন্তু কেমন করে যাব সেই বিহারে? বাবাকে কি বলব?

দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম বান্ধবীর ওখানে বেড়াতে যাচ্ছি বলে আমরা যাব।

পরিকল্পনামত বাবাকে বললাম। বাবা তখন কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। বললেন, যাবে যাও কিন্তু সাবধানে থেকো—আর বেশী দেরি করো না যেন।

জানতাম বাবা আমাদের কোন দিন কোন কাজে বাধা দেন নি, আজও দেবেন না। শেষ পর্যন্ত হলও তাই।

অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে বিহারে পৌঁছুলাম।

বিহারের ছোট একটা গ্রামে, রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে এক

কৃষকের ছোট্ট কুটীরে নিভৃতে আমাদের দলের সঙ্গোপন গুপ্ত অধিবেশন বসল।

কোথা হতে কি হয়ে গেল! আচমকা যেন একটা ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য বয়ে গেল। গুলিবারুদে ধোঁয়ায় মুহূর্তে সব হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড।

তারপর একদিন—তখন সমিতি ভেঙে গিয়েছে

মনটা কেমন বিষণ্ণ। সুধাকান্ত হঠাৎ যেন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

মাস দুই পরে হঠাৎ সন্তোষ এল একদিন এবং খোলাখুলি ভাবেই আমার কাছে করল বিবাহের প্রস্তাব।

বললাম, বাবাকে বল।

এতটুকু দ্বিধা না করে চলে গেল সে বাবার বসবার ঘরে বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাবার সঙ্গে সন্তোষের কি কথা হয়েছিল জানি না।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন ও ফিরে এলো আমার ঘরে—মুখে তার হাসি।

এদিকে সুচিত্রার সঙ্গে সত্যেনের বিবাহও ঠিক হয়ে গেল।

একই রাত্রে একই লগ্নে আমার সন্তোষের সঙ্গে, আর সুচিত্রার সত্যেনের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল।

দেড়টা বছর কেমন করে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, টেরও পেলাম না আমাদের বিবাহিত জীবনে। সে কি আনন্দ! সে কি সুখানুভূতি!

তারপর একদিন কোল জুড়ে এল নির্মল। আমার কামনার ফুল—আমার সন্তান।

আমার স্বামী কিছুদিন আগে থেকেই লোহার ব্যবসা শুরু করেছেন। দিন দিন তাঁর ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে। চারিদিকে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়ছে।

গৃহ যেন আনন্দে ও লক্ষ্মীশ্রীতে ভরে উঠছে দিনের পর দিন। জীবন-দেবতার আশীর্বাদ যেন শতধারে উপচে পড়ছে।

হায়, তখন তো জানি না নদীর এক পাড় যখন গড়ে ওঠে, অন্য পাড় ভেঙে চলে সেই সঙ্গে সঙ্গে—অভিশাপ আসে আশীর্বাদের পাশে পাশে অনেক সময়।

অকস্মাৎ শান্তির নীড়ে এল অশান্তির কালো হাওয়া।

অনেকদির পরের ডাইরী, অনেক বছর পরের।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি সন্তোষের পরিবর্তন। সর্বদা সে যেন আপন মনে কি ভাবে। চোখেমুখে চিন্তার একটা বিষণ্ণ ছায়া। কেমন সদা অন্যমনস্ক ভাব। ভাল করে কথা বলে না, আগের মত কারণে-অকারণে হেসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। অবশেষে আর না থাকতে পেরে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোমার সন্তোষ?

কই, কিছু তো হয় নি!

বুঝলাম সে আমাকে গোপন করছে। আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়। কেমন অভিমান হল। থাক, ও যখন বলতে চায় না, আমারই বা কি এমন মাথাব্যথা।

হঠাৎ এমন সময় অতর্কিতে এল বজ্রাঘাত। সন্তোষ কি একটা কাজে দিল্লী গিয়েছে। সন্তোষের লাইব্রেরী ঘরে বই খুঁজতে খুঁজতে একটা সাংকেতিক চিঠি আমার হাতে পড়ল।

চিঠিখানা দেখেই যেন ভূত দেখবার মত চমকে উঠলাম। এ সংকেত যে আমার চেনা—এর সঙ্গে যে আমি বিশেষ করে পরিচিত।

সংকেত থেকে চিঠির ভাষা উদ্ধার করতে গিয়ে চমকে উঠলাম।

বুঝলাম সন্তোষও ছিল আমাদেরই গুপ্ত সমিতির একজন। শুধু তাই নয়, সে ছিল প্রধান দশজনের মধ্যেই একজন। তার সাংকেতিক ক্রমিক-নম্বর ছিল চার।

চার—চার সাংকেতিক নম্বর! আমার স্বামীর সাংকেতিক নম্বর চার! সমস্ত দেহটা আমার কেঁপে উঠল। একটা প্রচণ্ড অগ্নিগোলকের মত যেন ঐ চার ক্রমিক নম্বরটি আমার দৃষ্টি জুড়ে বিভীষিকার মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

মনে পড়ে গেল, দুই বছর আগে বেহারের প্রান্তে এক নির্জন শীতের রাত্রে আমাদের গুপ্ত সমিতির জরুরী অধিবেশনের কথাটা।

চার নম্বর সম্পর্কে দলপতির সেই বজ্রনির্ঘোষ: বিশ্বাসঘাতক!

ক্রমিক নম্বর চার। অর্থাৎ আমার স্বামী সন্তোষ। আমার এতদিনকার এত যত্নের স্বপ্নসৌধ যেন প্রচণ্ড একটা আঘাতে মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। পুষ্প-স্তবকের মধ্য হতে সহসা যেন কালসাপ ফণা বিস্তার করে গর্জে উঠল। ঘৃণায় লজ্জায় বার বার সমস্ত দেহ যেন আমার কুণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগল।

কাকে আমি ভালবেসেছি? কাকে নিয়ে আমার সুখের গৌরবের সংসার গড়ে তুলেছি? দুঃসহ অপমানে যেন আমার সমস্ত নারীত্ব কালো হয়ে গিয়েছে।

সন্তোষ—সন্তোষের আসল রূপ এই! যাকে আমি দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেছি, অন্তরের সমস্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা অকাতরে ঢেলে দিয়েছি যার পায়ের তলায়—সে এত নীচ, এত ঘৃণ্য সে! সে বিশ্বাসঘাতক—দেশদ্রোহী!

সন্তোষের বাড়ি, ঘর, দুয়ার, আসবাবপত্র, সকল ঐশ্বর্য যেন আজ আমাকে ব্যঙ্গ করছে। প্রাসাদের আনন্দ, সুখ ও ঐশ্বর্য হতে মুহূর্তে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা আমাকে একেবারে পথের ধূলায় এনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সর্বাঙ্গে অনুভব করছি সহস্র বৃশ্চিক-দংশন।

দিনসাতেক বাদে দিল্লী থেকে সন্তোষ ফিরে এল।

আমার সঙ্গে দেখা হতেই ও প্রশ্ন করল, কি হয়েছে তোমার সুমি? কোন অসুখ করে নি তো?

মৃদু হেসে জবাব দিই, না তো।

কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? তোমাকে যে চেনাই যায় না?

ইচ্ছা হল চিৎকার করে বলি, ভণ্ড! কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক! দেশদ্রোহী! কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না।

সন্তোষ আমার কাছে আরও এগিয়ে এল, বল! নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে সুমি—লুকিও না লক্ষ্মীটি, আমার কাছে বল!

সন্তোষ আমার হাত স্পর্শ করতেই বিদ্যুদ্বেগে সরে এলাম। ও চমকে আমার মুখের দিকে তাকাল। ছুটে পালিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

তারপর?

দিনের পর দিন—রাতের পর রাত সে কি দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব! কি মর্মান্তিক ক্লেশ! আমি কি পাগল হয়ে যাব!

তারপরই একটু একটু করে স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার ছিন্ন করে দিয়েছি। যেখানে ভালবাসা নেই, নেই বিশ্বাস ও প্রীতির সম্পর্ক, সেখানে একত্রে পাশাপাশি ঘর করা যে কি দুঃসহ ক্লেশ। হায় ভগবান, এ তুমি কি করলে?

রাত্রে চোখে ঘুম নেই। বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদি। চোখের জলে আমার নিশি হয় অবসান।

মাঝে মাঝে সুচিত্রার সঙ্গে দেখা হত। সুচিত্রা সত্যিই সুখী। বড় আনন্দ লাগত সুচিত্রার কথা ভেবে। অন্তত সুচিত্রা সুখী হয়েছে। তার সংসার সত্যিই সুখের সংসার।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—দীর্ঘ দুটো বছর যে কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করেছি! কোন বন্ধন নেই—কোন শাসন বা বাধ্যবাধকতা নেই, তবু—তবু মনে হয়েছে কঠিন এক লৌহপ্রাচীরের আবেষ্টনী যেন আমার চতুষ্পার্শ্বে কালসাপের মত বেষ্টন করে আছে।

আমি বন্দিনী।

কিন্তু এমনি করেই কি আমার জীবনের বাকী দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে?

এখনও যে যৌবন তার প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছায় নি।

না, না—সত্যিই এর একটা বোঝাপড়া করা প্রয়োজন।

তখন স্বামীর সঙ্গে খুব কমই সম্পর্ক। দিনান্তে একবারও দেখা হয় কিনা সন্দেহ। অন্দরে আমার মহলের দিকে তিনি কচিৎ কখনও আসেন। নিজের ব্যবসা ও কাজকর্ম নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

আমার সংসার—আমার একমাত্র ছেলে নির্মলকে নিয়ে। মাতা-পুত্রে মিলে আমাদের ছোট্ট নীড়। সেই নীড়ে প্রবেশাধিকার কারও নেই। এমনি করে দীর্ঘ আঠারোটা বছর কেটে গেল।

দ্বিতীয় মহাসমর আসছে। তারই অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত পৃথিবীর সর্বত্র।

সন্তোষ তার ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে এলাহাবাদ গিয়েছে। সময়টা শীতের শেষে। নির্মলও আজকাল সন্তোষের ব্যবসার মধ্যে ঢুকেছে। কলকাতার অফিসের

একপ্রকার সে-ই ইনচার্জ। ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে আজকাল বেশীর ভাগ সময়ই নির্মলকে বাইরে বাইরে থাকতে হয়, আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় খুবই কম।

তারপর আমার জীবনের সেই মহারাত্রি। রাত্রি বোধ করি বারোটা বেজে গেছে। ঘুম আসছে না। অন্ধকারে শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে পড়ে আছি।

রাত্রি। কালো রাত্রির অন্ধকার। আকাশে মেঘ করেছে। চারিদিকে কেমন একটা বিষণ্ণ থমথমে ভাব। অন্ধকার ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই, শুধু খোলা জানালাপথে বাগানের ভিতর হতে থেকে থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা মৃদু ঝিঁঝিঁ শব্দ।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে যেন অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট শব্দ মর্মরিত হয়ে উঠল। অন্ধকারে চোখ মেলে তাকালাম। কিসের শব্দ!

অতি সন্তর্পণে যেন কে এসে ঘরে প্রবেশ করল। কে? শয্যার উপরে উঠে বসতে যাব, হঠাৎ মৃদু চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বর কানে এল, সুমিত্রা!

কে?

ভয় পেয়ো না সুমিত্রা। আমি অরিন্দম।

অরিন্দম!

দীর্ঘ কুড়ি বছরের ঘুমন্ত অতীত স্বপ্নের মধ্যে শরীরী হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। এও কি সম্ভব! না এ স্বপ্ন! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি! অরিন্দম! অরিন্দম!

সুমিত্রা, আর অরিন্দম!

অরিন্দম?

হ্যাঁ, অরিন্দম।

আপনি—আপনি বেঁচে আছেন?

দুর্ভাগ্য! সত্যিই বেঁচে আছি আমি। অধিবেশনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলাম, গেলে না যে অধিবেশনে?

অধিবেশনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন! কই, আমি তো কোন চিঠি পাই নি?

চিঠি পাও নি?

ন!

আশ্চর্য! কিন্তু—। সহসা অরিন্দম থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, আমাকে হঠাৎ এতকাল পরে আসতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছ, না?

আমি ভেবেছিলাম—

ভেবেছিলে মরে গিয়েছি, না? সত্যি এর চাইতে বোধ হয় মৃত্যুও ভাল ছিল। এ তোমাদের কি অধঃপতন সুমিত্রা? একদিন যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলে, কেমন করে তা ভুললে সুমিত্রা?

এ কার—কার কণ্ঠস্বর ? বহুকালের বিস্মৃতির যবনিকা পার হয়ে এ কণ্ঠস্বরে যেন চেনা ও জানা একটা সুরের আভাস পাচ্ছি। না, না—তা কি সম্ভব ! তবু বললাম, প্রতিজ্ঞা ?

হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাতেও ক্ষতি ছিল না সুমিত্রা, শেষ পর্যন্ত এ তুমি কি করলে ? একজন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী হীনচরিত্রের লোকের গলায় মালা দিলে ? শুধু মালা দেওয়াই নয়—ঘর করছ আজও ?

সহসা কেন জানি না, অরিন্দমের কথায় সর্বাঙ্গ আমার জ্বলে উঠল। যে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় এই দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্তে পলে পলে নিজে জ্বলে-পুড়ে মরছি, সেই যন্ত্রণার উপরে অরিন্দমের কথাগুলো যেন বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিল। নিজের দৈন্য—সে আমারই একান্ত ও নিজস্ব লজ্জা। থাক্ সে আমাবই বুকেব মধ্যে।

তীক্ষ্ণ স্বরে বললাম, তারই জবাবদিহি নিতে কি এতকাল পরে আপনি একজন ভদ্রলোক হয়ে গভীর রাত্রে এক ভদ্রনারীর নিভৃত শয়নকক্ষে এসে চোরের গত প্রবেশ করেছেন ?

সুমিত্রা !

আজ আমি আর বিপ্লবী সমিতিব কেউ নই। চব্বিশ বছর আগেকার সুমিত্রা আজ আর বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই—না ?

না।

বেশ, তবে আমিও চললাম। অবিন্দম চলে গেল।

আবার সাতদিন পবে এক বাত্রে অরিন্দমের আবির্ভাব হল আমার শয়নকক্ষে।

আবার আপনি কেন এসেছেন ? সেদিনই তো আপনাকে আমি শেষ কথা বলে দিয়েছি ?

কিন্তু তোমার এ সুখের ঘরে যদি আজ আমি আগুন ধরিয়ে দিই সুমিত্রা দেবী ! ফুলে-ফলে সাজানো বাগানে—হ্যাঁ, যদি আজ আগুন জেবলে ভস্ম করে দিই !

যান—আপনি এই মুহূর্তে এখান হতে চলে যান। নইলে আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

তাতে কেলেঙ্কারিটা আমার চাইতে তোমারই বেশী হবে। যে ঘরের বড়াই করছ, সে ঘরের দরজা চিবদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে।

নীচ ! শয়তান ! আপনাব ছায়া দেখলেও পাপ হয়।

নীচ ! শয়তান ! কিন্তু নীচ শযতান করেছে আমাকে কে ? কে করেছে পূজার নৈবেদ্যকে কলুষিত ? লজ্জা করে না তোমার ? একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের গলায় মালা দিয়ে পতিব্রতার অভিনয় করে চলেছ !

অভিনয় ?

অভিনয় নয়? চিরাচরিত প্রেমের অভিনয়ই যদি করবে মনে ছিল, তবে কেন—কেন এসেছিলে দেশসেবার ছল করে গুপ্ত সমিতিতে নাম লেখাতে?

ছল করে নাম লিখিয়েছিলাম!

ছল নয়? ছলনাময়ী নারী!

বেরিয়ে যাও—এখুনি বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে, নইলে তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারব।

অরিন্দম চলে গেল।

দীর্ঘ আঠারো বছর যে স্মৃতিকে সযতনে বুকের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, হঠাৎ যেন আগুনের স্পর্শে সহসা সহস্র শিখায় তা লেলিহান হয়ে উঠল। গভীর রাত্রে পা টিপে টিপে ওর লাইব্রেরী ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সমস্ত বাড়িটা ঘুমের ঘোরে নিস্তব্ধ।

লাইব্রেরী। আমার স্বামীর লাইব্রেরী ঘর। থরে থরে সব বই সাজানো।

নির্দিষ্ট আলমারিটা খুলে তাঁর মধ্যস্থিত বইয়ের থাকের পিছনে হাত চালিয়ে অল্প খুঁজতেই বের হয়ে এল কালো কাপড়ে মোড়া, বহুকাল আগে সঙ্গোপনে, রাখা একটা বস্তু। খুলে ফেললাম। একটি ছোট অটোমেটিক পিস্তল, একটি সাংকেতিক নম্বর লেখা মুখোশ। মুখোশটি দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল, ঠিক অমনি একটি মুখোশের কথা—তার নম্বর 'চার'।

এর পর হতে আমার প্রতি রাত্রের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে এইগুলো দেখা। প্রতি রাত্রেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, চোরের মত পা টিপে টিপে একা একা লাইব্রেরী ঘরে আসি, তারপর আলমারি থেকে মুখোশ ও পিস্তল বের করে নির্নিমেষে চেয়ে থাকি ঐ দুটো বস্তুর প্রতি। এ আমার কি হল?

হঠাৎ আবার একদিন অরিন্দমের একখানা চিঠি পেলাম।

সুমিত্রা,

আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই—তোমাকে আমি প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিলাম এবং সে ভালবাসা আজও আমার—

ছিঃ ছিঃ!

শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পড়ি নি। তীক্ষ্ণ ঘৃণায় চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি।

অরিন্দম এত নীচ! এত কাপুরুষ! কোন মানুষ এতখানি নিচে নামতে পারে, এ যেন আমার ধারণারও অতীত ছিল। এরই নাম দেশপ্রেম! সম্বংশজাত ভদ্রসন্তান শিক্ষিত—তার এতদূরে অধোগতি হতে পারে! এরই নাম কি দেশপ্রীতি? একজন নারীকে দেশপ্রেমের মঙ্গল মন্ত্রে আহ্বান করে, গোপন প্রেমের হীন লালসাকে পরিপোষণ করা?

এই কারণেই তাহলে তাকে দলে টেনে নেওয়া হয়েছিল!

এতদূরে সে আজ নেমে গেছে যে, কোন একজন নারীকে, পরের স্ত্রী ও

সন্তানের মা জেনেও তাকে প্রেম নিবেদন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করলে না !

সমস্ত পুরুষজাতির মুখে লেপে দিল দুরপনেয় লজ্জার কলঙ্ক-কালিমা !

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! তাড়াতাড়ি উঠে চিঠির দুমড়ানো টুকরোগুলো তুলে দেশলাই জেলে পুড়িয়ে ফেললাম।

শুধু চিঠিই নয়, ঐ ভস্মস্তূপের সঙ্গে অরিন্দমের স্মৃতিও ভস্মে পরিণত হোক। বিপ্লবী জীবনের সমস্ত স্মৃতির অবসান হোক।

ছিঃ ছিঃ, এ কি লজ্জা—কি ঘৃণা !

আবার অরিন্দম আমার সামনে এল।

ঘুমিয়েছিলাম নিজের শয়নকক্ষে, চোরের মত চুপি চুপি এসে আমার নাম ধরে ডাকতেই ধড়ফড় করে উঠে বসলাম শয্যায়।

আলো নিবানো, ঘর অন্ধকার। বর্ষাকাল—বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘে মেঘে আকাশ একেবারে কালো অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক চকমকিয়ে ওঠে।

কে ?

আমি অরিন্দম।

সহসা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে যেন সর্বশরীর আমার কেঁপে উঠল। সমস্ত বোধ-শক্তি আমার অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেল। রাগে সর্বশরীরে আমার যেন আগুন জ্বলে উঠল।

প্রথমটায় কোন কথাই আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হল না। উত্তেজনা, লজ্জা, ভয়, অপমান ও ক্রোধ সব কিছু মিলে বুকের মধ্যে যেন আমার ঝড় বইছে তখন।

কোন্ সাহসে তুমি আবার আমার সামনে এসেছ ? তুমি ভদ্রসন্তান না অন্য কিছু ? ঘুমন্ত একজন পরস্ত্রীর কক্ষে এই নিভৃত রাতে তোমার পা দিতে লজ্জা বোধ হল না এতটুকু ? ভদ্রতা বা শিক্ষায় বাধল না ?

সুমিত্রা !

Shut up you mean scoundrel ! আমার হাতের কাছে চাবুক থাকলে—

আমাকে চাবুকপেটা করতে ! শোন সুমিত্রা, অত আস্ফালন ভাল নয়। ভুলে যেও না আমিও অরিন্দম। আমি লম্পট, হীনচরিত্র সব কিছু হতে পারি, কিন্তু তবু—তবু আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

বিশ্বাসঘাতক ! পথের কুকুরও তোমার চাইতে ভাল।

তাই বটে। পথের কুকুরের চাইতেও হীন। কিন্তু আজ—আজ আমার এ অধঃপতনের জন্য দায়ী কে ? কারা ? ভাবতে পার স্বামী-সোহাগিনী লক্ষপতি সন্তোষ চৌধুরীর স্ত্রী, সমস্ত জীবনের তিল তিল করে সঞ্চিত বুকের সমস্তটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা কারও যখন আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন তার মনের

অবস্থা কি হয় ? ভাবতে পার জীবনের প্রচুর সম্ভাবনা গৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিষ্ঠা সব কিছু অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে যে তারই মত কয়েকজনকে বিশ্বাস করে জীবন-মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছিল অথচ চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাকে একদিন সর্বস্ব হারাতে হল, তার মনের অবস্থা কি হতে পারে ? ভাবতে পার যাকে সে একদিন নিজের সর্বস্ব দিয়ে অন্তরের সমস্তটুকু প্রেম নিঙড়ে হৃদয়ে গোপনে মানসীর আসনে বসিয়েছিল—চোখের উপর দিয়ে সেই মানস-প্রতিমা যখন আর একজনের, বিশেষ করে যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে—তার অঙ্কশায়িনী হয়, বলতে পার তখন সে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ? কি তার মনের অবস্থা হয় ?

সব—সব তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। তোমার সংকীর্ণ মন ও রুচির বিকৃতি। যা নয়, সেই মরীচিকার পশ্চাতেই ছুটে বেড়িয়েছ তুমি। আর তার জন্য দায়ী তুমিই।

আমি !

হ্যাঁ। আক্রোশে তুমি আজ অন্ধ, তাই তোমার হিতাহিতজ্ঞান, সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যতাটুকু পর্যন্ত হারিয়েছ।

শোন সুমিত্রা, মন আমার যতই সংকীর্ণ হোক না কেন—তবু ভুলো না রক্তেমাংসে আমিও একজন মানুষ। তোমাকে একদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম।

ছিঃ ছিঃ, থাম, থাম ! লজ্জায় আমার সর্বশরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে।

শোন—শোন, হ্যাঁ, ভাল আজও বাসি এবং আমার সে ভালবাসার মধ্যে কোন পাপ নেই জেনো। সে ভালবাসার ধারণা মাত্রও তুমি করতে পারবে না। তা যদি তুমি পারতে, তাহলে আজ এভাবে বিষোদ্গার করতে অন্তত এতটুকু কুণ্ঠাও তোমার হত। তোমার সে ভালবাসার কথা শুনতে ঘৃণা-লজ্জা হতে পারে, কিন্তু আমার—

তোমার লজ্জা হচ্ছে না, কারণ সত্যিই তুমি লজ্জাহীন !

হয়তো তোমার কথাই ঠিক সুমিত্রা, নইলে যে কথা ভেবেছিলাম কোনদিন কেউ জানবে না, সে কথা কেমন করে উচ্চারণ করলাম ! কিন্তু এও জেনে রাখ সুমিত্রা, মানুষের দেহে যে ভগবান বাস করেন—অরিন্দমের অন্তর থেকে আজ সে নির্বাসিত। ক্ষমা করব না—আমি কাউকেই ক্ষমা করব না। আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তোমরা সুখের নীড় রচনা করে জীবনকে সার্থক করবে, এ আমি হতে দেব না। আজ আমি চললাম, শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

অকস্মাৎ যেমন সে এসেছিল অন্ধকারে, তেমন অকস্মাৎ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। আকাশে বজ্রহুঙ্কার শোনা গেল—বিদ্যুতের অগ্নিইশারা।

॥ পাঁচ ॥

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত।

মিনু সত্যিই যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।

সংবাদটা অবিশ্যি এনেছে সুব্রত। কিরীটী সুব্রতকে তার করে জানিয়েছে এবং সেই তারের মধ্যেই কিরীটীর নির্দেশ ছিল, জরুরী সংবাদটা যেন কবি মৃণালিনীকে অতি অবিশ্যি এবং যত শীঘ্র সম্ভব জানানো হয়। তারের আসল উদ্দেশ্যটা উহ্য থাকলেও, কিরীটীর অলিখিত সংকেতটির মর্মার্থ গ্রহণ করতে সুব্রতর কষ্ট হয় নি।

তার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাই সুব্রত এতটুকু দেরি না করে সোজা মৃণালিনীর বাড়িতে এসে সংবাদটা যথাস্থানে পেশ করেছে।

সন্তোষ চৌধুরীর হত্যাপরাধে তাঁর একমাত্র পুত্র নির্মল চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছেন।

মিনু বৈকালিক চা-পানান্তে নিজের ঘরে সোফার উপরে গা এলিয়ে একখানা মাসিকের পাতা উল্টোচ্ছিল। ভৃত্য এসে সংবাদ দিল সুব্রতবাবু এসেছেন।

কি ভেবে মিনু ভৃত্যকে বললে, যা তাঁকে এই ঘরে নিয়ে আয়।

একটু পরেই সুব্রত ভৃত্যের পিছনে পিছনে ঐ ঘরে এসে প্রবেশ করল।

আসুন সুব্রতবাবু। বসুন। চা আনতে বলি?

চা? তা মন্দ কি, আনুক।

যা, চা নিয়ে আয়। ভৃত্যকে আদেশ দিতেই সে চলে গেল।

রহস্যভেদীর কাছ থেকে বোধ হয় কোন সংবাদ এসেছে মনে হচ্ছে! মিনু প্রশ্ন করে সহাস্যে।

সত্যিই তাই। কিন্তু আঁচ করলেন কি করে?

আপনারা কি ভাবেন সুব্রতবাবু, মস্তিষ্ক পদার্থ একমাত্র আপনার ও আপনার বন্ধুরই একচেটিয়া সম্পত্তি!

সুব্রত হেসে ফেলে, না, তা হবে কেন? কিন্তু সে কথা থাক। এখন বলুন আমার বক্তব্যটুকু সভয়ে না নির্ভয়ে পেশ করব?

সত্যি খুব বিশেষ বক্তব্য নাকি? কৌতুকভরা দৃষ্টিতে মিনু সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।

বিচারসাপেক্ষ। স্মিতভাবে জবাব দেয় সুব্রত।

তাহলে নির্ভয়েই বলুন। হাসতে হাসতে মিনু বলে।

কিরীটী আপনাকে জানাতে তার করেছে, নির্মলবাবু তাঁর পিতার হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

মুখে কিছু প্রকাশ না পেলেও, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তে যে মিনুর মুখের সমস্ত হাসিটুকু দপ্ করে নির্বাপিত হয়ে গেল।

কি হল? একটু যেন শক্ড্ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে! সুব্রতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যাপারটা এড়ায় না। সে বলে, মৃণালিনী দেবী!

কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থেকে সহসা মিনু প্রশ্ন করে, তা এ সংবাদটা হঠাৎ আপনার বন্ধু আমাকে দেবার জন্য আপনাকে তার করলেন কেন ?

কেন তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন !

মোটেই নয়। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

তা হলে এবারে কিন্তু আপনারই প্রশ্নটিকে পাল্টা পেশ করছি আপনাকেই। মস্তিষ্ক পদার্থটি নিশ্চয়ই আপনারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। শুনুন মৃণালিনী দেবী, বড় সাংঘাতিক লোককে নিয়ে আপনি লুকোচুরি খেলছেন। দীর্ঘকাল পাশাপাশি থেকে এবং একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েও জোর গলায় বলতে পারি না, কিরীটীর চিন্তাশক্তির হদিস সব সময় যথার্থভাবে পাই। তার ব্যবহারে কখনও মনে হয়েছে অত বড় নিরেট ও হাবাগোবা মানুষ বুঝি দ্বিতীয়টি নেই, কখনও আবার মনে হয়েছে ওরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও আত্মসচেতন মানুষ বুঝি এ দুনিয়ায় সত্যিই বিরল। কোনটি যে ওর সত্যিকারের রূপ, আজও সত্যি কথা বলতে কি—তেমন করে বুঝে উঠতে পারি নি বা পারি না।

বন্ধুর সম্পর্কে ধারণাটা আপনার সত্যিকারের যাই হোক না কেন, শ্রদ্ধাটা যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না সুব্রতবাবু ?

না। বরং ঠিক তার যতটুকু প্রাপ্য তার চাইতে একতিলও বেশী বলছি না।

তারপর একটু থেমে হঠাৎ আবার সুব্রত বলে, একটা কথা বলব মৃণালিনী দেবী, কিছু যদি মনে না করেন !

নিশ্চয়ই বলবেন। শাস্ত্রে আছে—দশ পা একত্রে গেলেই নাকি বন্ধুত্ব হয়, তা আপনার সঙ্গে যা পরিচয় তাতে দশ পা ছেড়ে দশ যোজনও বলতে পারেন। কাজেই আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে বন্ধুত্বের দাবি করতে পারি বৈকি ! এবং সেক্ষেত্রে—

দেখুন, কথাটা তা হলে খুলেই বলি। সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা-ব্যাপারে আপনি কতটুকু মুখ্যভাবে অনুসন্ধিৎসু জানি না এবং জানবার ইচ্ছাও নেই, তবে একটা কথা বুঝতে পারছি, আমাদের নির্মলবাবুর ব্যাপারে আপনি সত্যিই কিছুটা আগ্রহশীল এবং আশা করি সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে আপনার দ্বিধা নেই !

আছে। আপনার বন্ধু বা আপনার নিজের অনুমান সম্পূর্ণ ভুল।

ভুল ?

হ্যাঁ, ভুল।

বেশ, আপনার কথাই আপাততঃ মেনে নিয়েও যদি বলি, নির্মলবাবুর গ্রেপ্তারের ব্যাপারটায় আপনি ইচ্ছা করলে, অর্থাৎ যে অজ্ঞাত পরিস্থিতিতে জড়িত হয়ে নির্মলবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি আমাদের আলো দিতে পারেন, সেটাও কি খুব ভুল বলা হবে ?

হাসতে হাসতে মৃণালিনী বলে, সুব্রতবাবু, সত্যিই আপনার উকিল হওয়া উচিত ছিল !

কেন বলুন তো ?

এমন চমৎকার জেরা করতে পারেন এবং লোককে কোণঠাসা করতে পারেন !

সুব্রত হেসে ফেলে, তারপর বলে, মিস্ ব্যানার্জী, সত্যিই কি আপনি মুখ খুলবেন না বলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বসে আছেন ?

সুব্রতর কথায় এবার মৃণালিনী যেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি ভাবল, তারপর অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, মুখ খুললেও আপনাদের এক্ষেত্রে কোন লাভ হবে না, সুব্রতবাবু !

কত সামান্য ব্যাপার থেকেও যে আমরা কত সময় প্রচুর লাভবান হই, তা তো আপনি জানেন না ! জানলে এ কথা কিন্তু বলতেন না ।

বেশ, তবে একটি শর্তে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের আমি খোলাখুলি জবাব দিতে প্রস্তুত আছি ।

শর্ত ?

হ্যাঁ ।

বলুন কি শর্ত ?

যা আমার কাছ থেকে জানবেন, তার সত্যতা নিরূপণের ব্যাপারে আপনি বা আপনার বন্ধু কখনও আমাকে সামনাসামনি কারও সামনে জেরা করতে পারবেন না ।

অর্থাৎ সোজা কথা বলুন—আপনার বক্তব্য একেবারে পুরোপুরি সত্য মেনে নিয়ে, আমাদের সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ বুজে থাকতে হবে, কেমন তাই নয় কি ?

বলতে পারেন, তাই ।

সুব্রত চুপ করে থাকে ।

কি, রাজী আছেন ?

দেখুন আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই । কিন্তু—

আপনার বন্ধু হয়তো রাজী নাও হতে পারেন, কেমন এই তো ?

হ্যাঁ ।

কিন্তু আপনার বন্ধু যদি কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা আজও না বুঝতে পারেন, তা হলে তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা আর যেই করুক, আমি করতে পারছি না কিন্তু ।

এই কথাই তা হলে জানাব কিরীটীকে ।

হ্যাঁ ।

সেরাত্রে সুব্রত কিরীটীকে তার তারের জবাবে ও মৃণালিনীর সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল তার আলোচনা করে একখানা চিঠি লিখতে বসল ।

কিরীটী,

তোর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে জানবি । দীর্ঘ সময় ধরে মিনুকে নানাভাবে জেরা করে এবং কথাবার্তা বলে এইটুকু বুঝেছি, কবি মৃণালিনী

দেবী সন্তোষ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র নির্মল চৌধুরীকে সত্যিই ভালবাসে। তবে চালাক মেয়ে মৃণালিনী, নিজের গোপন দুর্বলতাকে ধরা-ছোঁওয়া দিতে চায় না। এখনও বুঝে উঠতে পারি নি, কেন সে হঠাৎ মধুপুরে গিয়েছিল! তবে সন্তোষ চৌধুরীর মৃত্যু-ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে সে জড়িত না থাকলেও, ঘটনাচক্রে যে কিছুটা ছিল সে ধারণা আমার নিশ্চিত। জাঁহাবাজ মেয়ে—বোমা মারলেও পেট থেকে কথা বেরুবে না সহজ ভাবে। কাজেই কথার মারপ্যাঁচে তাকে কাবু করা যাবে বলে অন্তত আমার বোধ হয় না। আশার কথা, সে বলেছে যদি তার স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আমরা নিরাপত্তা দিতে পারি, সে মুখ খুলবে এবং এটাই শেষ কথা তার। ইতি—

তোর সুব্রত।

দিন দুই পরে কিরীটীর জবাব এল।

সু,

তোর আগের ও পরের দুখানা চিঠিই পেয়েছি। এদিকে কতকগুলো সূত্র জট পাকিয়ে গিয়েছিল, তার দু-একটা খুলেছে। মিসেস্ চৌধুরী সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা মুখ খুলেছেন অর্থাৎ তাঁর একটা নিজ লিখিত ডাইরী পড়ে অনেক কথা জানতে পারা গিয়েছে, যদিও এখনও তার মধ্যে অনেক কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকছে। অতীতের যোগসূত্র ধরে অগ্রসর হতে গেলেও বাধা আছে। কারণ চারজনের মধ্যে দুজন অর্থাৎ সন্তোষ চৌধুরী, সুমিত্রার স্বামী ও সুচিত্রা, এ্যাডভোকেট সত্যেন ব্যানার্জী'র স্ত্রী আজ দুজনেই মৃত।

অতীতের সাক্ষী দেবে আজ কেবল সুমিত্রা ও সত্যেন ব্যানার্জী। ওরা চারজনেই একসূত্রে বাঁধা ছিল। আর একজন পঞ্চম ব্যক্তি যে ওদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল এবং অতীতে ওদের বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাতের মূলে যে ছিল, সেই এক নম্বর বা অরিন্দম—বর্তমান হত্যা-রহস্যের ব্যাপারে তারও যোগাযোগ অনেকখানি আছে।

অরিন্দমকে আমরা দেখতে পেয়েছি, ওদের বিপ্লবী জীবনের প্রারম্ভে একটি মুখোশের অন্তরালে। তারপর কিছুদিন ধরে ওদের বিপ্লবী জীবনের কার্যকলাপ চলেছে এবং সেই সময় অলক্ষ্যে চলেছিল এক প্রেমের নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্রে ছিল আমাদের অরিন্দম।

যেটুকু অরিন্দম সম্পর্কে জানতে পেরেছি তাতে মনে হচ্ছে, এমন খাঁটি একনিষ্ঠ চরিত্রের লোক বড় একটা দেখা যায় না। অসাধারণ চরিত্রবলের জন্যই একই সময় দুধারার দুটি প্রবল প্রেমকে সে হৃদয়ের মধ্যে জিইয়ে রাখতে পেরেছিল অনেকদিন ধরে।

কিন্তু সে-ও মানুষ। যেদিন আকস্মিক প্লাবনে তার কর্মধারাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল, সে একেবারে ডুব দিল দীর্ঘদিনের জন্য এবং সেই অজ্ঞাতবাসের সময় তার

যে প্রধান কর্মপ্রচেষ্টা তার ব্যর্থতার পীড়নে তা পর্যুদস্ত হতে থাকে। আবার একদিন যখন সে সকলের মধ্যে ফিরে এল, সে দেখল সে ব্যর্থ। একদিন যারা তাকে ঘিরে সৌধ রচনা করতে অগ্রসর হয়েছিল, তারাই আজ যেমন করেই হোক জীবনে কতকটা সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এ আঘাত অরিন্দম সহ্য করতে পারলে না এবং ইতিমধ্যে প্রেমের যুদ্ধেও সে যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে সেটাও সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে।

এইখানেই শুরু হল বর্তমান নাটক।

মৃণালিনী এই নাটকের একটি অপ্রধান চরিত্র। এবারে বোধ হয় মৃণালিনীর গুরুত্ব তুই বুঝতে পারবি। অতএব সাবধানে তাকে যাচাই করে আমাকে জানাবি। প্রয়োজন হলে আমাকে জানাস। যদিও শীঘ্রই হয়তো আমি এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় আসছি। ইতি—

তোর কিরীটী।

॥ ছয় ॥

চিঠিখানা আগাগোড়া বার দুই পড়ে সুব্রত তার বর্তমান কর্মপন্থা সম্পর্কে আরও ভাল করে চিন্তা শুরু করে।

আজ সাত-আট দিন ধরে প্রায়ই মৃণালিনীর সঙ্গে আলাপ করে, নানা কথাবার্তা বলে, বলতে গেলে ও কিছুই অগ্রসর হতে পারে নি।

মৃণালিনীর কঠিন চারিত্রিক লৌহবর্মে ঠেকে ওর সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে আজ পর্যন্ত। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মৃণালিনীর কাছে ও আজ সত্যিই পরাজিত।

আজই একবার সন্ধ্যাবেলা আবার ও মৃণালিনীর সঙ্গে দেখা করবে। এদিকে মৃণালিনীর পিতা রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী এখনও কলকাতায় ফিরে আসেন নি।

লোকটা হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই দুম করে লাহোরে প্রস্থান করল মেয়ের অনুপস্থিতিতে, এই বা কি রকম? মৃণালিনীও যে তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে বিশেষ চিন্তিত তাও তো মনে হয় না।

মনে মনে মৃণালিনীর ওখানে যাবার কথা ভাবলেও, শেষ পর্যন্ত সুব্রত সে সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে উঠতে পারল না এবং পরদিন সকালে সমস্ত কাজ ফেলে প্রথমেই সোজা মৃণালিনীদের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আশেপাশে কয়েকজন লাল-পাগড়ী ঘোরাফেরা করছে এবং গেটে তিনজন লালপাগড়ী মোতায়েন। কি করবে ভাবছে এমন সময় একটা পুলিস ভ্যান এসে গেটের সামনে দাঁড়াল এবং ভ্যান থেকে

প্রথমেই যে নামল তাকে দেখে সুব্রতর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকটি আর কেউ নয়—স্পেশাল ইন্‌ভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চের বহু পরিচিত স্বনামধন্য মফিজুদ্দীন তালুকদার সাহেব।

সুব্রত এগিয়ে এসে ডাকল, তালুকদার!

তালুকদার গেট দিয়ে প্রবেশ করছিল। সুব্রতকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, আরে সুব্রত যে! হঠাৎ এদিকে কোথায়?

মানে এই রায়বাহাদুর ব্যানার্জীর বাড়িতেই আসছিলাম।

রায়বাহাদুর ব্যানার্জী মানে, এই বাড়িতে?

হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো? এখানে এ বাড়ির সামনে এত লালপাগড়ীর আবির্ভাব হঠাৎ কেন?

তুমি কি এদের পরিচিত?

তেমন বিশেষ কিছু নয়, ওঁর মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ও জানাশোনা আছে।

ব্যাপার কি? রায়বাহাদুর ব্যানার্জীর মেয়ের সঙ্গে পরিচয়, জানাশোনা!

ভয় নেই, বয়েস অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

রায়বাহাদুর ব্যানার্জীকে হঠাৎ আজ ভোরবেলা তাঁর ঘরে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

চমকে ওঠে সুব্রত। বলে, রায়বাহাদুর ব্যানার্জী? তিনি তো কলকাতায় ছিলেন না!

না, কালই সকালে এসেছেন এবং রাত্রে এই দুর্ঘটনা।

দুজনে কথা বলতে বলতে এসে প্রবেশ করে।

সুব্রত সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। মৃণালিনীর পিতা সত্যেন ব্যানার্জী অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত!

সিঁড়ি বেয়ে দুজনে প্রথমেই দ্বিতলে রায়বাহাদুরের শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে। খোলা জানালার ঠিক সামনেই রায়বাহাদুরের নিস্পন্দ অসাড় মৃতদেহটা লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। তাঁর পৃষ্ঠে সাদা সিল্কের ড্রেসিং গাউনের উপরে একটি 'কালোপাঞ্জা'র ছাপ ও পৃষ্ঠদেশের ঠিক মাঝামাঝি সুদৃশ্য হাতির দাঁতের তৈরী বাঁটের একখানা ছোরার প্রায় সবটাই বিঁধে আছে। আশেপাশে অনেক রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

কালোপাঞ্জা! আবার সেই কালোপাঞ্জা!

দু-চার মিনিট সুব্রত সেই মৃতদেহটার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পায়ে বোধ হয় জাপানী ঘাসের চটি ছিল, অদূরে তার এক পাটি ছিটকে পড়ে আছে। ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলোয়। কোন কিছু অস্বাভাবিকই নজরে পড়ে না।

অদূরে পালঙ্কের উপরে শয্যাটি দেখে মনে হয়, শয্যাটি গতরাত্রে ব্যবহৃত হয় নি।

মৃত্যুর উলঙ্গ বীভৎস প্রকাশ।

সুব্রত জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গরাদহীন বেশ প্রশস্ত জানলা। জানলাপথে তাকালে নিচে দেখা যায় একটা পার্ক। পার্ক ও এ বাড়ির মধ্যে ব্যবধান ছোট্ট একটি সরু গলিপথ। পার্কের চতুঃসীমানার যে প্রাচীর তার উচ্চতা নেহাৎ কম হবে না।

পার্কের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে এ বাড়ির জানলার নাগাল পাওয়া যায় না। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় সুব্রত জানলাটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করতে থাকে। বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না।

জানলার গায়ে রং অনেক দিন আগে দেওয়া হয়েছে। এ বাড়ির ঝাড়াপোঁছাটা যে বেশ নিয়মিত ভাবেই হয় তা চারিদিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হয় না। কতকগুলো আঁচড়ের দাগের মত জানলার গায়ে দেখতে পাওয়া ছাড়া বিশেষ আর কিছুই সুব্রতর নজরে পড়ে না।

তালুকদার তখন স্থানীয় থানা ইনচার্জ রমেশবাবুকে প্রশ্ন করছিল।—

ভিতর থেকে দরজা তা হলে বন্ধই ছিল রমেশবাবু?

হ্যাঁ স্যার, আমরা আসবার পর দরজা ভাঙা হয়েছে।

থানায় খবর দিয়েছিল কে?

এ বাড়ির দারোয়ান।

এবারে সুব্রত প্রশ্ন করে, আচ্ছা রমেশবাবু, মৃতদেহের position এখন যা দেখছি, দরজা ভেঙে আপনারা যখন ঘরে প্রবেশ করেন তখনও ঠিক এমনি ছিল তো?

হ্যাঁ, ঠিক ঐ positionয়েই বরাবর আছে।

আচ্ছা সামনের ঐ জানলাটা যে খোলা দেখা যাচ্ছে, ওটা কি অমনি খোলাই ছিল?

হ্যাঁ।

বাড়ির লোকদের জবানবন্দী নিয়েছেন? প্রশ্ন করে তালুকদার।

আজ্ঞে বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। মৃত রায়বাহাদুরের একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী দেবী, একজন দাসী, জনচারেক ভৃত্য, বামুন, সোফার, মালি, দারোয়ান আর একজন সরকার আছেন সুখেন্দু রানা।

চাকরবাকরদের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে, না বাকী আছে?

বাকী আছে।

মৃণালিনী দেবীর জবানবন্দী?

হ্যাঁ।

তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হয়েছে।

তিনি কোথায়?

তিনি তাঁর নিজের ঘরে আছেন। বলেছেন, প্রয়োজন হলে যেন সেখানে যাই।

বেশ। তা জবানবন্দীতে কতদূর কি জানতে পেরেছেন?

অতঃপর তালকদারের প্রশ্নে রমেশবাবু যা বললেন তা হচ্ছে ঃ

গতকাল দুপুরে রায়বাহাদুর পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে লাহোর থেকে ফিরেছেন। সমস্ত দিন বাড়ি থেকে কোথাও বের হন নি। সন্ধ্যার দিকে তাঁর নিজের ঘরে বসে বাপ ও মেয়েতে অনেকক্ষণ ধরে কি সব নাকি কথাবার্তা হয়। রাত্রি গোটা দশেকের সময় রায়বাহাদুর আহারাদি করে এই ঘরে শুতে আসেন। রাত্রে কোন রকম চিৎকার বা অস্বাভাবিক শব্দ কেউ কিছু শোনে নি বা এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যাতে করে কারও সন্দেহ হতে পারে। খুব ভোরে রায়বাহাদুরের কি শীত কি গ্রীষ্মে স্নান করার অভ্যাস নিয়মিত। ভৃত্য সেই জন্য প্রত্যহ ভোরে এসে রায়বাহাদুরের স্নানের যাবতীয় সরঞ্জাম ঠিক করে রেখে যেত। আজও ঠিক করতে এসে দেখে ঘরের দরজা তখনও ভিতর হতে বন্ধ। অথচ ও সময়ের আগেই চিরদিন রায়বাহাদুর ঘরের দরজা খুলে রাখেন। ভৃত্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ক্রমে যখন ছয়টা বেজে যায় তখন সে দরজায় ধাক্কা দেয়। কিন্তু কোন সাড়াশব্দই না পেয়ে ও আরও দু'চারবার বেশ জোরের সঙ্গেই দরজায় ধাক্কা দেয়। তবু কোন সাড়াশব্দ মেলে না। ক্রমে ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে ডাকাডাকি শুরু করে। ডাকাডাকি করেও যখন কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তখন ও ভয় পেয়ে রায়বাহাদুরের মেয়েকে গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। মৃণালিনী দেবী এসে অনেক ডাকাডাকি ও দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেও কোন সাড়াশব্দ পান না। অতঃপর নিচে থেকে সুখেন্দুবাবুকে সংবাদ দিয়ে উপরে ডেকে আনা হয়। তিনিই কোন কিছু অঘটন ঘটেছে সন্দেহ করে তখুনি দারোয়ান পাঠিয়ে থানায় সংবাদ পাঠান। সংবাদ পেয়েই আমি এখানে এসে দরজা ভেঙে ঐ দৃশ্য দেখতে পাই এবং মৃতদেহের ঠিক মধ্যখানে ছোরাটা প্রায় সমূলে বিঁধে আছে দেখে বুঝতে আমার কোন কষ্টই হয় না যে ব্যাপারটা হত্যা।

কোন নৃশংস আততায়ীর নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতেই রায়বাহাদুরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঘরে প্রবেশ ও নির্গমের জন্য একটিমাত্র দরজা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথই নেই। কক্ষ-সংলগ্ন স্নানঘরে ঢুকবার জন্য কক্ষমধ্যস্থিত দরজাটি ছাড়াও অবিশ্যি বাইরের দিকে একটা ছোট দরজা আছে মেথরদের যাতায়াতের জন্য। কিন্তু সে দরজাটাও ভিতর থেকে খিল-তোলা ছিল।

তালুকদার প্রশ্ন করে, আপনার কি মনে হয়, রমেশবাবু? তবে কোন্ পথে আততায়ী এল এবং কোন্ পথেই বা অদৃশ্য হল?

সমগ্র রহস্যের একটি মাত্র মীমাংসার সূত্র হতে পারে ঐ খোলা জানালাটি। কিন্তু ঐ জানালাপথে কোনক্রমে নির্গম সম্ভবপর হলেও প্রবেশের সুবিধা তো নেই স্যার! রমেশবাবু বললেন।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, তবে এক যদি হয় আততায়ী আগে হতেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে নিজেকে আত্মগোপন করে রেখেছিল এবং পরে সময় বুঝে কার্য হাসিল করে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়েছে! তাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, খুনী সহজভাবে দরজাপথে না গিয়ে অন্য কষ্টসাধ্য পথে যাবে কেন? এতে করেই অনুমান

করা যায়, নিশ্চয়ই আগে থাকতে আততায়ী এ কক্ষের মধ্যে এসে আত্মগোপন করে ছিল না। অন্তত আমার তাই ধারণা স্যার।

তাই যদি না থাকবে তা হলে কি ভাবে, কোন্ পথে সে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার। তাছাড়া আরও একটা কথা, মৃতদেহ ওভাবে জানালার ঠিক নিচেই বা পড়ে আছে কেন? তা হলে কি ঐ খোলা জানালার সঙ্গেই হত্যার কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে? ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার!

তালুকদার অতঃপর রায়বাহাদুরের ঘরের শয্যাটা পরীক্ষা করে বলেন, শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেও বোঝা যায় রাত্রে শয্যা কেউ ব্যবহার করে নি। এতে স্পষ্টই মনে হয় হত্যা-ব্যাপারটা শয়নের পূর্বেই ঘটেছে। রাত্রি দশটার পর আহারাদি শেষ করে রায়বাহাদুর যখন শয়নকক্ষে এসেছেন, তখন রাত এগারোটা কি সাড়ে এগারটার মধ্যেই খুব সম্ভবত হত্যা-ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছে।

সুব্রত ভাবছিল কিন্তু তখন সম্পূর্ণ অন্য কথা। কেমন করে হত্যা করেছে তা নয়, কে হত্যা করেছে তারই কথা! কালোপাঞ্জার ছাপ থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে, হত্যাকারী কালোপাঞ্জা ছাড়া আর কেউ নয় এবং বোধ হয় হয়তো একই কারণে এ হত্যাটি হয়েছে!

সহসা সুব্রতর মনে পড়ে ঐ সময় কিরীটীর শেষ চিঠির কথাগুলো। সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা ও রায়বাহাদুর ব্যানার্জীর হত্যা একই সূত্রে গাঁথা!

একটার পর একটা চিন্তাগুলো সুব্রতর মাথার মধ্যে ভেসে যায়।

কিন্তু এবারে মৃণালিনীর সঙ্গে দেখা করা বিশেষ প্রয়োজন।

॥ সাত ॥

হঠাৎ তালুকদারের প্রশ্নে সুব্রত ফিরে তাকায়।

মৃতের নাইটগাউনের উপরে একটা কিসের ছাপ, দেখছ সুব্রত?

হ্যাঁ দেখেছি। কালোপাঞ্জার নিদর্শন।

কালোপাঞ্জার নিদর্শন?

ঝুঁকে পড়ে আর একবার ভাল করে দেখে তালুকদার বলে, সত্যিই তো, একটা পাঞ্জার ছাপই বটে! আশ্চর্য! তবে কি—

হ্যাঁ। নিঃসন্দেহে। এও কালোপাঞ্জারই কীর্তি!

তবে কি—

বুঝতেই পারছ মধুপুরে মাধবী ভিলায় সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা, মধুপুর ময়দানে শংকরনারায়ণের হত্যা ও কলকাতায় এই রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জীর হত্যা সব একই সূত্রে গাঁথা। সবগুলোই শ্রীযুক্ত কালোপাঞ্জা নামধারী কোন কীর্তিমানের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বল কি! হেড্ কোয়ার্টারে শুনছিলাম বটে, কিরীটী মধুপুরে গিয়েছে সন্তোষ

চৌধুরীরই হত্যার ব্যাপারে। তা হলে ব্যাপারটা বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে!

তাতে আর সন্দেহ কি! আচ্ছা তুমি ততক্ষণ এদিককার ব্যাপারগুলো সেরে ফেল, আমি একবার মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

বেশ যাও। তোমার সঙ্গে কিন্তু কথা আছে সুব্রত, আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যেও না।

বেশ। সুব্রত কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

মৃণালিনীর কক্ষ।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে সুব্রত কক্ষে প্রবেশ করল।

খোলা জানালাপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মৃণালিনী একখানা চেয়ারের উপরে কোলের উপর দুটি হাত ন্যস্ত করে বসে আছে নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার মত।

একটু আগেও হয়তো কাঁদছিল! দু চোখের কোলে তার সুস্পষ্ট অশ্রুচিহ্ন।

মাথার অজস্র চুল দু কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপরে এসে পড়েছে। গায়ের কাপড় অসংলগ্ন।

মৃণালিনী দেবী?

চমকে সুব্রতর ডাকে মৃণালিনী ফিরে তাকাল।

সুব্রত আরও কাছে এগিয়ে এল।

সহসা মৃণালিনীর দুই চক্ষুর কোল ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে এল। দু হাতে মৃণালিনী মুখ ঢাকল। দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

কিছুক্ষণ কাঁদবার পর মৃণালিনী যেন অনেকটা শান্ত হল।

এই দুঃখের সময় আপনাকে ভেঙে পড়লে তো চলবে না মৃণালিনী দেবী। শক্ত হতে হবে।

বাবা! এ জগতে যে আর আমার কেউ নেই সুব্রতবাবু!

কি করবেন বলুন? নিয়তিকে তো রোধ করতে কেউ পারে না মৃণালিনী দেবী।

আমি—আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না সুব্রতবাবু, বাবা, আমার বাবা আর নেই। এ সংসারে আমি আজ একলা। একেবারে একা। কাল রাত্রে বাবা যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যান, তখনও যে ঘুণাক্ষরেও ভাবি নি এত বড় সর্বনাশ এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটবে!

আহা বেচারী সত্যিই বড় আঘাত পেয়েছে। আঘাত পাবারই তো কথা। সুব্রতর মনটাও যেন ব্যথায় বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে।

সামান্য একটা দিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় সত্যিই ওর বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে। একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সহজ কৌতুক আনন্দপ্রিয় হাসি-খুশি স্বভাবটিও ওর প্রতি সুব্রতকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল।

আচ্ছা কোন রকম শব্দ বা অস্বাভাবিক কিছুই আপনি শুনতে পান নি কাল রাত্রে মিস্ ব্যানার্জী ?

না। বিকালের দিকে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাত্রি প্রায় সাতটায় ফিরি। ফিরতেই বাবা তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। অনেকক্ষণ ধরে বাবার সঙ্গে গল্প করে দুজনে খেতে গেলাম—

মৃণালিনীর কথাটা শেষ হল না।

বাইরে কার দ্রুত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই দ্রুতপদে যে এসে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে সুব্রত সত্যিই আশ্চর্য হয়ে ওঠে, এ কি, অনিলবাবু ?

মৃণালিনী দেবীও কম আশ্চর্য হন নি। তিনিও বলেন, এ কি অনিলদা, তুমি !

হ্যাঁ। সকালের ট্রেনেই কলকাতায় নেমে সোজা এখানে আসছি। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই—

আবার মৃণালিনীর দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নামে।

অনিলবাবুর চোখও জলে ভরে ওঠে। অনিলবাবু বলেন, দিদিমা এ সংবাদ শুনলে তাঁকে আব বাঁচানো যাবে না সুব্রতবাবু। আঘাত খেয়ে খেয়ে গত কয়েক বছব ধবে তাঁর যে অবস্থা হয়েছে ! মামাবাবু দিদিমার ঐ একমাত্র সন্তান। পাঁচ-পাঁচটি ছেলে অল্পবয়সে মরে যাওয়ার পর ঐ একটিই বেঁচে ছিল। উপর্যুপরি এতগুলো শোকতাপে জর্জরিত, তাব উপরে এই চরম আঘাত এ বয়সে যে দিদিমা কি করে সহ্য করবেন আমি তাই ভাবছি।

ওসব কথা এখন থাক অনিলবাবু। একে উনি অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন—সুব্রত অনিলবাবুকে বাধা দেয়।

তা তো নিশ্চয়ই। তা তো নিশ্চয়ই। অনিলবাবু বলে ওঠেন।

আমি সন্ধ্যার দিকে আবাব আসব মিস্ ব্যানার্জী—এখন উঠলাম। বলে অনিলবাবুর দিকে ফিবে তাকিয়ে সুব্রত বললে, ওঁকে দেখবেন অনিলবাবু।

সুব্রত কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

তালুকদার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করতে বলে, আপাততঃ সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

কথায় কথায় সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, কালোপাঞ্জার নাম তা হলে তুমি প্রথম কখন শোন তালুকদার ?

দিন কয়েক পূর্বে সেদিন বিহার স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস-রিপোর্ট পড়ে প্রথম জানতে পারি। সেদিনই জানতে পারি মধুপুরের 'মাধবী ভিলায়' সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা-ব্যাপারে তাঁর জামার উপরে পৃষ্ঠদেশে নাকি একটি কালোপাঞ্জার ছাপ দেখা যায় এবং পরের দিন তাঁর বাড়ির সন্নিকটবর্তী মাঠের মধ্যে যে অজ্ঞাত মৃতদেহটি পাওয়া গেছে তারও পৃষ্ঠদেশে অনুরূপই কালোপাঞ্জার ছাপ ছিল।

হ্যাঁ, কিরীটীর ধারণা মধুপুরের দুটি হত্যাব্যাপার একই সূত্রে গাঁথা।

কিন্তু এই কালোপাঞ্জাটি কে ? কি বলছে কিরীটী ? মানে কিরীটী সে সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছে নাকি ?

কিরীটীর কথা যদি জিজ্ঞাসা করো—সে তো তুমি জানই, কোন একটা রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারকে হাতে নেওয়ার পর যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা মীমাংসায় এসে সে পৌঁছচ্ছে—কখনও কোন মতামত প্রকাশ তো দূরে থাক, মুখই খোলে না। আর আমার কথা হচ্ছে, পর পর তিনটি নৃশংস হত্যার মূল সূত্র যেখানেই থাকুক না কেন, এইটুকু আমি বুঝতে পারছি আপাততঃ যে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডগুলোর পিছনেই আছে কোন একটি ব্যক্তিবিশেষের উন্মাদ প্রতিহিংসা চরিতার্থতার নৃশংস প্রচেষ্টা।

তা হলে এই কালোপাঞ্জা—

বললাম তো, ব্যক্তিবিশেষের একটা কমপ্লেকস্ মাত্রও বলতে পার !

বুঝলাম। কিন্তু, বর্তমানে তুমি এ বাড়িতে যাতায়াত করছ কেন ? যারা তোমাকে ভাল করে জানে না, তারা হয়তো বলবে রায়বাহাদুরের সুন্দরী তন্বী কন্যাটির আকর্ষণে তুমি ঘোরাফেরা করছ, কিন্তু আমি তো জানি—

তালুকদারের কথা শেষ হয় না, সুব্রত হো হো করে হেসে উঠে বলে, তা যে নয়, সেটাই বা কে বললে ? আমিও তো মানুষ !

থাক্ ভাই। ওইটিই আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না, সত্যিই তুমি মানুষ—মানে পুরুষমানুষ কিনা ?

কিন্তু যাক্‌গে ওসব কথা, তোমার কথারই জবাব দিই। মধুপুরের হত্যা-রহস্যের ব্যাপারেই আমি এ বাড়িতে কয়েকদিন যাবৎ যাতায়াত করছিলাম।

কেন ? এঁদের সঙ্গে সে হত্যার কি সম্পর্ক আছে ?

সম্পর্ক যে একটা কিছু ছিল তার প্রমাণ তো তুমি একটু আগে নিজ চোখেই দেখে এলে। আরও বিশদভাবে যদি জানতে চাও তার জবাব হচ্ছে, নিহত সন্তোষ চৌধুরীর স্ত্রীর সঙ্গে এ বাড়ির একটা কিছু যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে বলে আমার মনে হয়, যদিও তার সঠিক প্রমাণ আমি এখনও পাই নি। সন্তোষ চৌধুরী যে রাত্রে নিহত হন, আমার ধারণা মৃণালিনী দেবী সে রাত্রে মাধবী ভিলার আশেপাশে কোথাও ছিলেন। আর তার একদিন পরেই হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় পালিয়ে এসেছেন। সে কারণে কিরীটী মৃণালিনী দেবীর উপরে বেশ একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

হুঁ, এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম।

এখানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দেখলাম, রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী, আমি এখানে এসে পৌঁছবার পূর্বেই, অকস্মাৎ লাহোরে অন্তর্ধান করেছেন এবং তাঁর মেয়েটি কৌতুকরহস্যে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠেছে।

তারপর ?

তার পর আজ সকালে এই রূঢ় আঘাত। অকস্মাৎ লাহোর থেকে অন্তর্ধান

করে কলকাতায় ফিরে পা দিতে-না-দিতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে নিহত। এখন ভেবে মর কেনই বা হঠাৎ লাহোরে গেলেন এবং তার পর একটু থেমে আবার বলে, ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বা কেন নিহত হলেন ?

মেয়েও তাঁর জানে না কেন হঠাৎ রায়বাহাদুর লাহোরে গিয়েছিলেন ?

জানে না বলেই এখনও আমার বিশ্বাস, তবে জানলেও যে সহজে এখন আর সেকথা তার কাছ থেকে জানা যাবে তাও মনে হয় না।

ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে তা হলে বল ?

গোলমেলে নিশ্চয়ই।

গাড়ি ইতিমধ্যে লালবাজারের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

সুব্রত ট্রামে করেই রায়বাহাদুরের ওখানে গিয়েছিল। তালুকদার বললে, আমাব গাড়িই তোমাকে পেঁছে দেবে যখন এস না একবার অফিসে !

রক্ষে কর—এখন আর নয়। গেলেই সব ছেঁকে ধরবে।

তালুকদার হাসে, কিরীটীকে চিঠি লিখছ তো ?

চিঠি মানে ? তার—তার করতে হবে এখুনি গিয়ে !

বেশ। আমাব কথাটাও লিখে দিও।

দেবো।

তালুকদার তার ড্রাইভারকে সুব্রতকে তাঁর বাসায় পেঁছে দেবার নির্দেশ দিয়ে নেমে গেল। চলমান গাড়ির গদিতে হেলান দিয়ে সুব্রত চোখ বুজল। বোজা চোখের পাতায় ছায়াছবির মত আজকের সমস্ত দৃশ্যগুলো আবার একটাব পর একটা ভেসে উঠতে থাকে।

মৃত্যু নৃশংস তাণ্ডবলীলা শুরু করেছে !

কালোপাঞ্জার অমোঘ অদৃশ্য হাত একে একে তিনটি প্রাণীকে হত্যা করল।

কবে কোন্ সুদূর অতীতে কি ঘটেছিল, তাঁর সূত্র টেনে চলেছে এ কি বীভৎস মৃত্যুলীলা !

এ কি পাগলামি !

গাড়ি চলেছে।

ওদিকে মৃণালিনী তখনও স্থির পাষাণের মত সোফার উপরে বসে।

অনিলবাবু মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন।

মৃণালিনীর চোখের সমস্ত জল শুকিয়ে গিয়েছে। এত বড় আঘাতের জন্য সত্যিই সে প্রস্তুত ছিল না এতটুকুও। নিমেষে তাকে যেন প্রবল একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে একেবারে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

অন্ধকার—আশপাশে কেবল নিকষ কালো অন্ধকার ! শান্ত নিরুপদ্রব জীবন-যাত্রার মাঝখানে যেন দুঃস্বপ্নের কালো ঝঞ্ঝা নেমে এসেছে অতর্কিতে চারিদিক আঁধার করে।

নির্মল—নির্মল হয়েছে গ্রেপ্তার! কারাগৃহের লৌহ-আবেষ্টনীর মধ্যে পিতৃহত্যার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে নিদারুণ মর্মপীড়ায় হয়তো প্রতিটি প্রহর গুনছে। সংসারের একমাত্র আশ্রয়—স্নেহের উৎসটিও আজ তার জীবন থেকে অবলুপ্ত। এ কি হল তার! এ কি হল!

॥ আট ॥

এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে কিরীটী সুব্রতর দীর্ঘ 'তারবার্তা' পেয়েছে।

রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী বিখ্যাত অ্যাড্‌ভোকেট ও কাউন্সিলার নিহত এবং তাঁরও পৃষ্ঠদেশে ছিল কালোপাঞ্জার সুস্পষ্ট ছাপ।

আততায়ী অমানুষিক ঔদ্ধত্য জানিয়েছে আবার, দেখ আমার মৃত্যু-পরশ কত অমোঘ!

মৃণালিনী সম্পর্কে যা সুব্রত জানিয়েছে, তাও মোটেই আশাপ্রদ নয় এবং এ ব্যাপারের পর সহজে যে সে মুখ খুলবে তাও আদপেই মনে হচ্ছে না। ঘটনাচক্র সহসা যেন কুটিল আবর্ত রচনা করলে।

আরও একটা বিশেষ সংবাদ যা ঐ তারবার্তা থেকে ও জেনেছে, একদিক থেকে সেটা যেমন হত্যাকারীর হত্যার ব্যাপারে অনুকূল, তেমনি আগের মতই এখনও সেটা হয়ে আছে ধোঁয়াটে অস্পষ্ট। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

একটি—মাত্র একটি সূত্রের মীমাংসা!

সমগ্র ব্যাপারটা একেবারে ছক্ কেটে এগিয়ে এসে এখানেই যেন বাধা পাচ্ছে বার বার! ঐ একটি! ঐ একটি জায়গাতেই খরস্রোতা নদী আগাগোড়া দীর্ঘ পথ একটানা বয়ে এসে হঠাৎ রচনা করছে যেন একটা ঘূর্ণাবর্ত। সমস্ত বিশ্লেষণ সমস্ত যুক্তিকে যেন ঘূর্ণাবর্ত আপন বিবরে টেনে নিয়ে চলেছে।

মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে এখন কোন আলোচনা করেও ফল নেই। একমাত্র পুত্রের আকস্মিক গ্রেপ্তারের ব্যাপারে যেন তিনি বিশেষরকম মুষড়ে পড়েছেন।

যে শক্তির জোরে তিনি একটানা দীর্ঘকাল ধরে একান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও সংগ্রাম করে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আজ যেন হঠাৎ সেই শক্তির মূলেই চরম আঘাত লেগেছে। নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েও তিনি কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুত্রকে নিয়ে জড়িত দুর্ঘটনার আঘাতটা আর তিনি সামলাতে পারলেন না।

অন্তরের যে তীব্র স্নেহ ও প্রেম একদিন তাঁর স্বামীকে নিয়ে চিরসুখের নীড় রচনা করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিল, যে স্বামীর আদর্শের স্বপ্নকে ঘিরে তাঁর নারীত্ব একদিন বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল, সেই স্বপ্ন যেদিন চুরমার হয়ে গেল, সুখের নীড় বালুর প্রাসাদের মত ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও প্রেম ভিন্ন ধারা নিল। একমাত্র পুত্রকে তিনি তখন চারদিক থেকে আঁকড়ে ধরলেন। এবং আজ যখন সেই একমাত্র স্নেহের আধার পুত্র নির্মল হীন খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল, সুমিত্রার সমস্ত মানসিক শক্তির হল অবসান।

সুমিত্রা আজ মৃতা। তার অস্তিত্বই মাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু প্রাণ নেই।

অথচ এখন একমাত্র সে-ই কিরীটীকে সাহায্য করতে পারে।

এদিকে কিরীটী কারাগারে নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু হংসরাজ বাধা দিয়েছে। আত্মীয় ও পুলিসের কর্মচারী ছাড়া আর কাউকেই সে কারাগারে নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। বিশেষ করে প্রথম হতেই কিরীটীর উপরে সে যখন প্রসন্ন নয়। কিরীটী মুখে কোন প্রতিবাদ না করে গোপনে কলকাতার পুলিস বিভাগে একটা জরুরী চিঠি লিখেছে যাতে সেখান থেকে বিহার সরকারের কাছে একটা সাক্ষাতের অনুমতি পত্রেরজন্য সুপারিশ করা হয়।

আপাততঃ এখন কারাগারে নির্মলের সঙ্গে দেখা করে কয়েকটা কথা তাকে জানতেই হবে। মধুপুর ত্যাগের পূর্বে তাকে যেমন করেই হোক একটিবার নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে।

ইতিমধ্যে একদিন মিসেস্ চৌধুরী কারাগারে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানা গেছে, মা ও ছেলের সঙ্গে বিশেষ নাকি তেমন কোন কথাবার্তা হয় নি।

মৃত সন্তোষ চৌধুরীর পার্সোন্যাল সেক্রেটারী সুবিমল শীলের সাহায্যে কিরীটী একবার চেষ্টা করেছিল নির্মল চৌধুরীকে যাতে জামিনে খালাস করিয়ে আনা যায়, কিন্তু সরকারী মহলে হংসরাজের প্রতিপত্তি একটু বিশেষরকম থাকায় তাতেও সে সফলকাম হতে পারে নি। কলকাতার কাজকারবার দেখাশোনা করা প্রয়োজনে সুবিমল কলকাতায় চলে গিয়েছে।

আরও দিন চারেক পরের কথা।

কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরটিতে বসে একটা ইংরাজী ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ছিল। বাইরে পরিচিত জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল। কিরীটীর চোখেমুখে চাপা হাসির বিদ্যুৎ যেন খেলে যায়। একবার কোন বিশেষ একটি জুতোর শব্দ শুনলে এবং তার মধ্যে যদি কোন বিশেষ বৈচিত্র্য থাকে, কিরীটীর কোন দিনই আর সে শব্দ চিনতে ভুল হয় না।

স্থানীয় থানার দারোগা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণবাবু আসছেন এবং কেন যে এ সময় আসছেন অনুমান করতে কিরীটীর কষ্ট হয় না।

সত্যিই শ্যামাচরণবাবু সেঘরে প্রবেশ করলেন: নমস্কার। ওর নাম কি, কিরীটীবাবু শুনছেন!

কিরীটী ইচ্ছা করেই প্রথমটায় শ্যামাচরণবাবুর দিকে বই থেকে চোখ তুলে তাকায় নি, যদিও মনটা তার ওদিকেই ছিল। এবারে শ্যামাবাবুর সুস্পষ্ট আহ্বানে মুখ তুলে তাকাল এবং বলল, নমস্কার।

ওর নাম কি, আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই!

কেন বলুন তো? কিরীটী সহাস্য প্রশ্ন করে।

ওর নাম কি, সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত 'পারমিশন' এনে তবে ছাড়লেন জানবেন!

পারমিশন! কিসের? ব্যাপারটা যেন ঘুণাক্ষরেও কিরীটী জানে না এইভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শ্যামাবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

জানেন না বুঝি? ওর নাম কি, তা হলে আপনি এখনও সে অর্ডারের কপি পান নি?

অর্ডার! কিসের অর্ডারের কপি বলুন তো?

আপনি যে কোন দিন গিয়ে হাজতে—

হাজতে! কেন?

মানে ওই যে আপনি নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চান না!

ওঃ, তাই বলুন।

কবে যাবেন বলুন? ওর নাম কি, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব আপনাকে, আমার উপরে সেই আদেশই আছে পুলিস কমিশনারের।

শুনে খুশী হলাম। তবে আজ বিকালের দিকেই যাব। সেইভাবেই ব্যবস্থা করবেন। আর একটা কথা, এই দেখাশোনার ব্যাপারটা মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে একান্ত গোপনীয় তাঁর এবং আমার মধ্যে। কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে মানে আশেপাশেও কেউ থাকতে পারবে না কিন্তু।

মিঃ চাকলাদার কি তাতে রাজী হবেন?

মুহূর্তে যেন কিরীটী দপ করে জবলে ওঠে, কিন্তু অন্তরের উষ্মা চেপে রেখে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, শুনুন শ্যামাবাবু, আপনাদের মিঃ চাকলাদারকে জানিয়ে দেবেন, ঠিক আমি যেভাবে বললাম সেই ভাবে, যদি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হয় তো দেখা করব, নচেৎ তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করব না।

লোকটা বড় সাংঘাতিক। আপনার ভালর জন্যই বলছিলাম। নাহলে কি নিজের বাপকে খুন করতে পারে?

প্রথমতঃ তিনি তার বাপকে যে খুন করেন নি, আপনাদের মগজে এতটুকু পদার্থ থাকলেও সেটা বুঝতে পারতেন। দ্বিতীয়তঃ যত বড় সাংঘাতিক চরিত্রেরই মানুষ হোক না কেন, সাক্ষাৎ করতে আমি কারও সঙ্গেই ডরাই না।

মানে, ওর নাম কি, আপনার এখনও ধারণা নাকি নির্মল চৌধুরী তাঁর পিতাকে খুন করেন নি?

নিশ্চয়ই। তাছাড়া সে ধারণা বদলাবার মতও এখনো পর্যন্ত কোন কারণই তো ঘটে নি। আপনারা মিথ্যে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে অযথা পীড়ন করছেন। এটা বোঝেন না কেন, বাপের সঙ্গে পুত্রের যদি মতেরই অমিল থাকে, আমাদের বাংলা দেশের কোন ছেলে তার বুড়ো বাপকে সেই তুচ্ছ কারণে খুন করতে পারে না। আপনারা তাকে খুনী বলে দাঁড় করিয়েছেন—খুনের কোন

উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন কি? কতকগুলো circumstantial evidence—তার ওপরে মাত্র নির্ভর করে খুনী বলে কাউকে অপরাধী প্রমাণ করানো এত সহজ নয় শ্যামাবাবু। আপনাদের হাতে আইন আছে ও আইনের শক্তি আছে, যার অযৌক্তিক জোরে অনায়াসেই মিঃ নির্মল চৌধুরীকে আপনারা হুট করে পরোয়ানা জারী করে হাজতে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছেন, কিন্তু আইন শুধু একতরফাই নয়। তা ছাড়া মিঃ নির্মল চৌধুরী প্রচুর অর্থসম্পন্ন লোক—মামলার এদিকগুলো একবারও ভেবে দেখলেন না, এটাই আশ্চর্য লেগেছে আমার কাছে!

আপনার মতে তাহলে অন্যায়ভাবে নির্মলবাবুকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছে?

গ্রেপ্তার সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে চার্জে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আপনারা এনেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কিন্তু এসব কথা সেদিন আপনি মিঃ চাকলাদার সাহেবকে বলেন নি কেন?

না মশাই, পরের ব্যাপারে মাথা গলানো আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তা ছাড়া আপনাদের চাকলাদার সাহেবও হয়তো সেটা পছন্দ করতেন না।

তবে নির্মলবাবুই যদি সন্তোষ চৌধুরীকে না খুন করে থাকেন, তা হলে খুনী কে?

খুন যখন হয়েছে তখন খুনীও আছে বৈকি একজন। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

না মশাই, ওর নাম কি, এ যে কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

তা একটু তো গুলিয়ে যাবেই। আসল ব্যাপারটাই যে বিশেষ গোলমেলে।

শেষ পর্যন্ত কিরীটীকে একাকী নির্জনে নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হল।

শ্যামাবাবু সেলের দরজা পর্যন্ত কিরীটীকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন।

একটি মাঝারি আকারের স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে নির্মল চৌধুরী পায়চারি করছিলেন। কিরীটীকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন, কে?

নমস্কার নির্মলবাবু। আমি কিরীটী।

সত্যি এই আট-দশ দিনেই নির্মল চৌধুরীর যেন অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। মুখভর্তি দাড়ি, রুক্ষ চুল বিস্রস্ত। চোখের দৃষ্টিতে একটা অসহায় ক্লান্তির বেদনা।

ঘরের মধ্যে একটি কাঠের তক্তাপোশের উপরে সাধারণ শয্যা বিছানো ও বসবার জন্য একটি সাধারণ চেয়ার।

নিজে খাটের উপরে বসে নির্মল চৌধুরীকে মৃদু সম্বোধন করে কিরীটী, বসুন মিঃ চৌধুরী। আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

চেয়ারটার উপরে বসতে বসতে নির্মল চৌধুরী বললেন, আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি আমার বাবাকে খুন করি নি! আমি—

বাধা দিল কিরীটী, আমি জানি আপনি খুন করেন নি।

আপনি—আপনি তা হলে বিশ্বাস করেন ?

করি।

তবে এই কলঙ্ক থেকে আমাকে মুক্তি দিন !

মুক্তি দেওয়ার আমি কেউ নই মিঃ চৌধুরী।

তবে—তবে আপনি এখানে এসেছেন কেন ? মজা দেখতে ? যান যান, এখুনি এ ঘর থেকে চলে যান !

শুনুন মিঃ চৌধুরী, ছেলেমানুষি করবেন না। আপাততঃ মুক্তি আপনাকে আমি এখান থেকে না দিতে পারলেও খুব শীঘ্র যাতে মুক্তি পান সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি, যদি—

যদি—যদি কি বলুন ?

যদি আপনি আমার সব কথার সত্য জবাব দেন, কিছু গোপন না করে সব খুলে বলেন। কেমন, রাজী আছেন তো ?

এবারে নির্মল চৌধুরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকেন, কোন জবাব দেন না।

নির্মলবাবু, অবুঝ হবেন না। যে অভিযোগে আপনি গ্রেপ্তার হয়েছেন সে সাংঘাতিক। সহজে এ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না—যদি না এখনও সব কথা খুলে বলেন !

সহসা যেন নির্মল ভেঙে পড়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেন, না, না—আমি কিছু জানি না ! আমি কিছু জানি না !

মিছে কথা। আপনি জানেন অনেক কিছুই। দৃঢ়স্বরে কিরীটী বলে ওঠে।

না ! না ! না ! আর্তস্বরে নির্মল বলে ওঠেন।

কিরীটী মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে, তার পর বলে, বেশ, তবে আপনি আমার তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন—পূর্বে যে তিনটি মিথ্যা কথা আমার কাছে বলেছেন !

মিথ্যা কথা বলেছি ? সবিস্ময়ে তাকান কিরীটীর মুখের দিকে নির্মল চৌধুরী।

হ্যাঁ, মিথ্যা কথা।

কি—কি মিথ্যা কথা বলেছি ?

এক নম্বর, যে রাত্রে আপনার বাবা সন্তোষ চৌধুরী মশাই নিহত হন সে রাত্রে আপনি মধুপুরেই ছিলেন, খুনের পরের দিন আপনি আসেন নি !

হ্যাঁ !

হ্যাঁ। বলুন আমার কথা সত্য কিনা ? 'তার' ইত্যাদি পাওয়ার কথা, রাণাঘাটে যাওয়া সব আপনার বানানো। আপনি কাউকে shield করবার চেষ্টা করেছেন—বলুন সে কে ?

পারব না—পারব না আমি সেকথা বলতে। তবে হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক সেরাত্রে আমি মধুপুরেই ছিলাম। শেষ কথাটা বলে নির্মলবাবু হাঁপাতে থাকেন।

বেশ, তাঁর কথা না বলেন—বলুন মধুপুরে পৌঁছবার পর ও পরের দিন শেষ রাত্রে নাটকীয়ভাবে আপনার গৃহ প্রবেশের মধ্যে যে দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা সময়—ঐ সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি করেছিলেন ?

আমি স্টেশনে ছিলাম।

বিশ্বাস করতে পারলাম না।

বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ছিলাম।

বেশ, না হয় আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম—কিন্তু বাড়িতে না গিয়ে ওয়েটিংরুমে চব্বিশ ঘণ্টা ছিলেন কেন ? তবে কি আপনি জানতেন ঐ রাত্রেই আপনার বাবা নিহত হবেন এবং হত্যাকারীকে সেই সুযোগটাই দিয়েছেন ?

আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠেন নির্মল চৌধুরী, না না, হত্যার ব্যাপারের কথা আমি পরদিন সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত কিছুই জানতাম না—কিছুই জানতাম না।

জানতেন না ?

না। আপনি বিশ্বাস করুন, বিন্দুবিসর্গও আমি জানতাম না।

যদি জানতেনই না তবে ওয়েটিংরুমে ওভাবে আপনার চব্বিশ ঘণ্টা আত্মগোপন করে থাকবার কারণ কি ?

এবারে নির্মল চৌধুরী চুপ করে থাকেন।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, বলুন, চুপ করে থাকবেন না। আপনি কি বুঝতে পারছেন না কত বড় বিপদের খাঁড়া আপনার মাথার উপরে ঝুলছে।

আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে সে আমাকে ঐখানে দেখা করতে বলেছিল।

চিঠি লিখে সে নিশ্চয়ই দেখা করতে বলেছিল ?

হ্যাঁ।

কোথায় সে চিঠিটা ?

আমি পুড়িয়ে ফেলেছি !

পুড়িয়ে ফেলেছেন !

হ্যাঁ।

চিঠির মধ্যে ঠিক কি লেখা ছিল সে কথাগুলো অন্তত বলুন ?

তাও আপনাকে আমি বলতে পারব না, সে আমার একান্ত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বেশ। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন জানলেন আপনার বাবা নিহত হয়েছেন, তখনই বাড়িতে গেলেন না কেন ? অত রাত করে গেলেন কেন ?

ভয়ে সব কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, তাই যাই নি।

ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন, মিঃ চৌধুরী। সোজা কথা—আপনি তাও বলবেন না ! আচ্ছা আর একটা কথা, সে রাত্রে যে আমার কাছে আপনার বাবার স্বাক্ষরিত লেখা চিঠিখানা আপনাকে দেখিয়েছিলাম, সেই চিঠির সে হাতের লেখাটা

আপনি চেনেন না বলেছিলেন, মনে পড়ে ?

পড়ে।

আপনি তাহলে সেদিন আমার কাছে সত্য গোপন করেছিলেন, বলুন ?

না করি নি, কেবলমাত্র মনে মনে একটা অনুমান করেছিলাম। কিন্তু কেবল সামান্য একটা অনুমানের উপরে নির্ভর করে একটা স্বীকারোক্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বলেই সেকথা আপনাকে আমি সেদিন বলি নি।

আজও কি আপনি সেই যুক্তিতেই চুপ করে থাকতে চান ?

না। আজ বলতে বাধা নেই, সে চিঠির হাতের লেখাটা—। নির্মল চৌধুরী ইতস্ততঃ করতে থাকেন।

বলুন ! চুপ করে রইলেন কেন ?

সে—সে লেখাটা আমার মার হাতের লেখা বলে মনে হয়েছিল।

কিরীটী যেন ভীষণভাবে চমকে ওঠে, সে কি ! তবে—। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সে সামলে নেয়। তার পর অল্পক্ষণ চুপ করে সে কি যেন ভাবে মনে মনে —ভাবে এবং বলে, শুনুন মিঃ চৌধুরী, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে আপনি কাউকে কিছু স্বীকারোক্তি দেবেন না, এই কথা আপনার আমাকে দিতে হবে। কেমন, রাজী আছেন আমার প্রস্তাবে ?

বেশ, তাই হবে। কিন্তু—

আপনার জামিনের চেষ্টা আমি করছি। আশা করি শীঘ্রই আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারব। আজকের মত তা হলে উঠি। নমস্কার।

কিরীটী বিদায় নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

এরপর নির্মল চৌধুরী একাকী অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। এলোমেলো কত যে চিন্তা পরস্পরবিরোধী একটার পর একটা মনের মধ্যে এসে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে তার অন্ত নেই।

॥ নয় ॥

পরের দিন বেলা দশটা হবে।

কিরীটী আবার নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এল।

মিঃ রায় ! সবিস্ময়ে নির্মল চৌধুরী কিরীটীর মুখের দিকে তাকান।

বিশেষ একটা ব্যাপারে আপনার কাছে আজ আবার আসতে হল নির্মলবাবু। তবে এবারে আমি বার্তাবহ মাত্র। মৃদু হেসে কিরীটী বলে।

বার্তাবহ ! নির্মল চৌধুরী যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি, এমনি ভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ। কবি মৃণালিনী—। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে।

মিনু ! কোথায় ? কোথায় সে ?

আজই ভোররাত্রের ট্রেনে তিনি মধুপুরে এসেছেন। স্টেশনেই তাঁর সঙ্গে আমার

দেখা হয় এবং অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

কথা হয়েছে? কি কথা হল? একান্ত উদ্‌গ্রীব ভাবে নির্মল চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার কাছে বলতে আমার ইচ্ছা নেই তবে মৃণালিনী দেবী আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন. বিশেষ করে সেই চিঠিটাই আপনার হাতে নিরাপদে পেঁছে দিতেই আমার এ সময়ে এখানে আসা। কিরীটী কোনমতে বক্তব্যটা যেন শেষ করে।

চিঠি! মিনু চিঠি দিয়েছে? কই—কই সে চিঠি?

এই নিন। কিরীটী জামার ভিতরের পকেট থেকে একখানা সবুজ রঙের খামে আঁটা চিঠি বের করে নির্মলবাবুর হাতে দিল. কতকটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই।

বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে নির্মলবাবু খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা খুলে ফেলেন, উত্তেজনায় হাত দুটি যেন তাঁর কাঁপছে। অধীর আগ্রহে তখনই সে চিঠিটায় মনঃসংযোগ করেন।

চিঠিটা খুব ছোটও নয় এবং দীর্ঘও নয়।

কিরীটী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নির্মলের মুখের দিকে।

চোখে-মুখে তার তীব্র ব্যাকুলতা। সহসা নির্মলবাবু চিঠি পড়েই একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে ওঠেন, মীনুর বাবা খুন হয়েছেন! সঙ্গে সঙ্গে আরও আগ্রহ নিয়ে সে চিঠিখানা পড়ায় মন দেয়।

উত্তেজনা ও আগ্রহের মধ্যে কেন কিছু ভাল করে চিন্তা করে বা বুঝে দেখবার শক্তিও যেন তাঁর নেই। নচেৎ একটু স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখলেই তিনি বুঝতে পারতেন, হাতের লেখাটা ঠিক মৃণালিনী দেবীর হস্তাক্ষরের মত হলেও, সত্যি করে মোটেই তাঁর হস্তাক্ষর নয়।

চিঠিটা সম্পূর্ণ বানানো ও তৈরি করা। একেবারে অন্য হাতের লেখা। কিন্তু কিরীটীর কাজ হয়ে গেছে। যে ব্যাপারটা সে জানতে চাইছিল নির্মলের কাছ থেকে, তাঁকে এই চিঠির প্যাঁচে ফেলে সবটাই তার প্রায় জানা হয়ে গিয়েছে। এখন বাকিটা —ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নির্মলের মুখের দিকে।

নির্মল চিঠিটা পড়ছিল তখনও।

নির্মল,

স্বেচ্ছায় তোমাকে আমি এই চিঠি লিখছি। কারণ অকস্মাৎ যে ঝড়ের ঝাপটা আমার মাথার উপর এসে পড়েছে, তাতে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। গত সোমবার আমার বাবা কালোপাঞ্জার হাতে নিহত হয়েছেন। আমার আশঙ্কা যে দ্রুত কঠিন সত্যে পরিণত হবে, বাবার মৃতদেহ দেখবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত স্বপ্নেও তা ভাবি নি। বাবাকেও তোমার বাবার মত অনুরূপ হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা একটি ছোরা দিয়ে খুন করা হয়েছে। তার পর—তার পর শুনলাম তুমিও

হাজতে এবং পিতৃহত্যার অভিযোগ তোমার মাথার উপরে। আমি হঠাৎ কেন মধুপুর ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছিলাম তুমি তো জান। শঙ্করনারায়ণের হত্যা এবং মাঠের মধ্যে তোমার ও আমার শেষ সাক্ষাৎ—তারপর হতেই ঘটনার গতি এত এগিয়ে চলেছে যে সেরাত্রে তোমার সঙ্গে আমার স্টেশনের বাইরে সাক্ষাৎ—

চিঠিখানা অত্যন্ত দ্রুত ও আগ্রহ সহকারে এই পর্যন্ত পড়েই নির্মল চিঠি থেকে মুখ তুলে প্রথমে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন এবং পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানা পরীক্ষা করতে করতে বললেন, এ কি!

কি হল? কিরীটী যেন কিছুই জানে না এইভাবে প্রশ্ন করে, অনেকটা বোকা-বোকা ভাব করে।

এ তো মিনুর চিঠি নয়! সন্দিগ্ধ ভাবে নির্মল চৌধুরী বলেন।

মিনুর চিঠি নয়? কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি মিঃ রায়, এটা আদপেই মিনুর লেখা চিঠি নয়। প্রথম দিকটায় উত্তেজনার মধ্যে আমি অতটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, না—এ মিনুর হাতের লেখা নয়! বলুন—এর মানে কি!

কিরীটীই এবারে হেসে ফেলে বলে, আমাব এ চালাকিটুকু মাপ করবেন নির্মলবাবু, একান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে এ পন্থা নিতে হয়েছে। এছাড়া আর আমার সহজ কোন দ্বিতীয় পথই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম চিঠির গোড়াতেই আপনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারবেন।

কিন্তু এ কথা কি সত্যি, মীনুর বাবাও কালোপাঞ্জাব হাতে নিহত হয়েছেন?

হ্যাঁ। এবং চিঠিতে ঐ সত্যটুকু ছিল বলেই আপনাকে এত সহজে আমি ধোঁকা দিতে পেরেছি।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, তাছাড়া আরও দুটো কথা আপনার কাছ হতে জানবার ছিল। এক নম্বর, সেরাত্রে সন্ধ্যার পর বা রাত্রে আপনার মাধবী ভিলায় উপস্থিত হবার পূর্বে কোথায়ও আপনার মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে মাঠের মধ্যে দেখা হয়েছিল কিনা? এখন বুঝতে পারছি হয়েছিল।

কিন্তু তা জেনে আপনার কি লাভ? প্রশ্ন করেন নির্মল চৌধুরী।

এই লাভ যে আমার জানা দরকার মৃণালিনী দেবীর মুখেই আপনি আপনার পিতার হত্যার সংবাদ পেয়েছিলেন, না অন্য কারও কাছে পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, মিনুর কাছেই সংবাদটা আমি প্রথমে পেয়েছিলাম। সে-ই আমাকে মাঠের মধ্যে বলে। আপনার সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় মীনু কথাবার্তা বলবার পর হঠাৎ শঙ্করনারায়ণের মৃতদেহ দেখে, যখন আপনি মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত সেই ফাঁকে সে সরে পড়ে এবং পালাবার সময় মাঠের মধ্যে আমার সঙ্গে তার অতর্কিতে দেখা হয়। তার মুখেই আমি আমার পিতার হত্যাসংবাদ ও আপনার এখানে আসবার কথা জানতে পারি।

যাক্, অনুমানের উপর নির্ভর করে অন্ধকারে যে তীরটা ছুঁড়েছিলাম এখন দেখছি অন্ধকারেও সেটা লক্ষ্যভেদ ঠিক করেছে। কিন্তু এও বুঝতে পারছি, দ্বিতীয়

অনুমানটি আমার ভুল হয়েছে। স্টেশনে আপনি অপেক্ষা করেছিলেন মৃণালিনী দেবীর জন্য নয়!

না।

এখনও আপনার সেই কথা বলতে আপত্তি নির্মলবাবু?

হ্যাঁ।

যাক্ গে, আপনি বলবেনই না যখন, বৃথা পীড়াপীড়ি করে আর লাভ নেই। জানতে আমি একদিন পারবই আপনি না বললেও, তবে সময় নেবে হয়তো। আপনি বলে দিলে সহজে ব্যাপারটা মিটে যেত, এই আর কি! কিরীটী দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে কথাগুলো বলে।

নির্মল চৌধুরী তবু চুপ করেই থাকেন।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কিরীটী সুব্রতকে একটা জরুরী চিঠি লিখছিল।

সুব্রত,

এখানকার কাজ আমার প্রায় শেষ হয়ে এল। তিন-চার দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরছি। কালোপাঞ্জার কালো রহস্য একপ্রকার মীমাংসা করে এনেছি। সূত্রগুলো এত বিশ্রীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল একটা থেকে আর একটা যে প্রথমটায় সত্যিই আমাকে বিশেষ গোলমালে ফেলেছিল। একটা ধরতে গিয়ে আর একটার যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। সেরাত্রে নির্জন মাঠের মধ্যে মৃণালিনী দেবীর মুখ হতে যে কথাটা শুনেছিলাম, আসলে কথাটা সত্যিই তাই। একটা উন্মাদ প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই পর পর এই তিনটি নৃশংস হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের শুভবুদ্ধি যখন নিঃশেষে তার অন্তর থেকে নির্বাসিত হয়, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ এমনি ভাবেই বোধ হয় রুদ্ধ হয়ে যায়। তার সহজ ও সরল দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

মদ খেয়ে মানুষ নেশা করে এবং মদের নেশার এমনি একটা মজা যে উত্তরোত্তর মদের পরিমাণটাকে না বাড়ালে নেশার পরিমাণও যায় কমে। তাই হয়তো পরবর্তী-কালে মদই নেশাকে অতিক্রম করে গিয়ে গোটা মানুষটাকেই গিলে ফেলে। Crime বা অপরাধ-বৃত্তিটাও মানুষের অনেক সময় দু-একবারের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মদের নেশার মতই একটা নেশায় পরিণত হয় শেষটায় এবং তার অন্তরের সমস্ত শুভ ও কল্যাণ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অনিবার্য ধ্বংসের পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় কতকটা তার অজ্ঞাতেই। পরে সে জালকে অতিক্রম করবারও তার ক্ষমতা থাকে না। কালোপাঞ্জার জীবনীকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলেও ঠিক তাই দেখা যায়। অবিশ্যি যতটুকু তার সম্পর্কে আমরা জানবার অবকাশ পেয়েছি তা থেকে।

তবু একটা কথা স্বীকার না করে আমি এখানে পারছি না, অন্তরের ভয়ংকর প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করবার জন্য যে নির্মম আত্মঘাতী রাস্তা সে বেছে নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত সে যতই চাতুরী খেলুক না কেন, নিজেকে সে অনিবার্য ধ্বংসের গ্রাস

থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তার পরিকল্পনা বা কর্মের পরাজয় সেইখানেই, যা আজ পর্যন্ত সে কল্পনাও করতে পারে না। তাকে আমি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই উদ্ঘাটন করেছি, কেবলমাত্র একটি সামান্য মীমাংসা ছাড়া। বলতে পারি না, হয়তো এমনও হতে পারে, ঐ সামান্য মীমাংসার সূত্রকে কেন্দ্র করে আমার সমস্ত পরিশ্রম বা মীমাংসা একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত পথেও বইতে পারে। এত বড় মারাত্মক ভুলও যদি করে থাকি, তবু আমার দুঃখ থাকবে না তখন, যখন সমগ্র রহস্যটির উপর হতে অন্ধকারের যবনিকা উঠে যাবে এবং আসল ও সত্যিকারের রূপটি প্রকাশিত হবে।

নির্মল চৌধুরী মৃণালিনীকে ভালবাসেন।

সামান্য অনুমানের উপরে নির্ভর করে যে বস্তুটা বিচার করতে গিয়েছিলাম, আজ দেখছি সেটা শুধুমাত্র অনুমানই নয়, অত্যন্ত কঠোর সত্য। সামাজিক দিক দিয়ে সুমিত্রার ছেলের সঙ্গে সুচিত্রার মেয়ের এ ধরনের ভালবাসাটা স্বীকৃত হবে কিনা সে প্রশ্ন সমাজকারীদের, সত্যান্বেষী আমার নয়। আমি বুঝেছি তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে এবং সমাজের ভয়েই হয়তো তারা আজও চুপ করেই আছে। কিন্তু সমাজের দাবি দিয়ে অন্তরের দাবিকে কতদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে সেইটাই এক্ষেত্রে বিচার্য!

আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা যখনই ভাবি তখনই মনে মনে হাসি পায়। বিধাতার খেলবার ধারাটাও কি নির্মম! দুটি ভিন্নমুখী রক্তপ্রবাহ কেমন করে আবার পাশাপাশি এসে পড়েছে অবশ্যম্ভাবী মিলনের অচ্ছেদ্য এবং অনিবার্য আকর্ষণে! এবং এই মিলন যদি সম্ভব হয় কোনদিন, জানবি দুস্তর এক দুঃখ-সমুদ্র পার হয়ে শান্তির দ্বীপে তরী ভিড়ল। মৃণালিনী দেবীর উপরে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবি। কারণ তাঁর এই চরম সংকটে আশেপাশে সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই। যারা হয়তো আছে তারাও মুখোশধারী মাত্র। বেচারী জানেন না এখনও, যে জাল থেকে তিনি একজনকে ছাড়াতে এতদূর ছুটে এসেছিলেন, আজ নিজেই সেই জালে আটকা পড়েছেন। নিয়তির কি নিষ্ঠুর খেলা!

মৃণালিনীর সঙ্গে এবারে যা কথা বলবার তা আমিই বলব প্রয়োজন হলে। তুই আর তাঁকে এ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিস না। অনিলবাবু ওখানে গিয়েছেন, সেও একদিক থেকে আশার কথা।

নাটকের পরিসমাপ্তিতে একে একে সকলকেই এক জায়গায় এসে মিলতে হত—এই ছিল আগেকার কালের নাটকের ধারা। এখন অবিশ্যি যুগ বদলেছে, বদলেছে ধারাও। তবে এ নাটকের শেষ দৃশ্যে কারা থাকবেন, সেই হচ্ছে বিচার্য।

আজকের মত ইতি করছি। ভালবাসা রইল।

তোর কিরীটী

পরের দিন প্রত্যুষে ঘুম হতে উঠেই নিচে সুবিমল শীলের গলা শুনে কিরীটী

বুঝতে পারলে, শীল মশায়ই আবার ফিরে এসেছেন।

তবে হঠাৎ আবার ফিরে আসবার ঠিক যে কি হেতু তা চট করে বুঝে উঠতে পারে না।

হাতমুখ ধুয়ে নিচে আসতেই বসবার ঘরে সুবিমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

শীল মহাশয়ই প্রথমে সুপ্রভাত ও সম্ভাষণ জানালেন, এই যে মিঃ রায়, জানতে এলাম কতদূর কি করলেন?

কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়, বিশেষ কিছুই এখনও অগ্রসর হতে পারি নি, তবে নির্মলবাবুকে বোধ হয় দু-এক দিনের মধ্যেই জামিনে খালাস করে আনতে পারব বলে মনে হয়।

সত্যি! তা হলেই তো ষোল আনার মধ্যে বারো আনা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যা হবার তা তো হয়েছেই, এখন যাতে সকল দিক বজায় রেখে একটা মাঝামাঝি পথ বের করা যায় বিশেষ করে সেটাই হয়েছে বর্তমানের প্রয়োজন। কোথা হতে যে কি হয়ে গেল! আমার তো মশাই এঁদের এ কারবারেই আর মন বসছে না। হাঙ্গামাটা মিটে গেলে এবং নির্মলবাবু একটু সুস্থ হলেই এ কাজ ছেড়ে দেব। ভাল কথা, চাকর-বাকরেরা তো বিশেষ কিছু বলতে পারলে না, মিসেস্ চৌধুরী কেমন আছেন জানেন কিছু?

এ কদিন তাঁর সঙ্গে তো বিশেষ তেমন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, তবে, অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন।

আহা, তা পড়বেনই তো। এই বয়সে স্বামীর মৃত্যু, তাছাড়া এমন অপঘাতে মৃত্যু। তা উনি এখানে পড়ে আছেন কেন? আমার তো মনে হয়, এ বাড়ি থেকে কিছুদিন এখন তাঁর দূরে থাকলেই সব দিক দিয়ে ভাল হত। এখানকার চারিদিক-কার সব স্মৃতি মনের উপরে—এও তো কম ক্ষতি করে না।

আপনি ভাল কথাই বলেছেন, একবার বলে দেখুন না।

আমি? মৃদু হাসেন সুবিমল শীল, তাঁদের একজন সামান্য বেতনভুক ভৃত্য বৈ তো নয়! আমার সঙ্গে যে সামান্য কথাবার্তা বলেন সেটাই একটা অনুগ্রহ। না, না—আমার পক্ষে ওটা অনধিকার চর্চাই হবে, মিঃ রায়। বরং আপনিই বলুন একবার।

বলতে পারতাম, তবে নির্মলবাবুর একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যে উনি এখান থেকে নড়বেন তা আমার মনে হয় না মিঃ শীল!

তাও বটে। ওই তো একটিমাত্র ছেলে। তার পর হঠাৎ একসময় শীল প্রশ্ন করেন, আচ্ছা মিঃ রায়, আপনার কি মনে হয়? সত্যিই কি নির্মলবাবু এ ব্যাপারে দোষী?

দেখুন, দোষী ঠিক যে নন সেও যেমন সত্যি, একেবারে নির্দোষী নন এও সত্যি।

মানে, কি আপনি বলতে চান মিঃ রায়?

হংসরাজ যে ঠিক কি প্রমাণের উপরে নির্ভর করে নির্মলবাবুকে গ্রেপ্তার করেছেন তা জানি না, তবে গ্রেপ্তার যখন করেছেন এবং এত বড় একটা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে খাড়াও করেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর প্রমাণ তাঁর হাতে আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু কি করেই বা এ সম্ভব? হত্যার সময় আগে বা পরে তিনি তো মধুপুরেই ছিলেন না?

হত্যার সময়টিতে ঠিক না থাকলেও, আগে বা পরে যে তিনি মধুপুরে ছিলেন না, তা আপনি কি করে জানলেন?

য়্যাঁ! এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়? তিনি তো 'তার' পেয়ে কলকাতা থেকে আসেন!

লোকে তা জানলেও আসল ব্যাপারটা হয়তো তা নাও হতে পারে।

এ কি রকম কথা বলছেন আপনি মিঃ রায়?

ঠিকই বলছি এবং আপনি—হ্যাঁ আপনিও সেটা বেশ ভাল ভাবেই জানেন না কি মিঃ শীল?

আমি!

হ্যাঁ, আপনি শ্রীযুক্ত সুবিমল শীল! বলতে বলতে হঠাৎ জামার বুক-পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে সুবিমল শীলের চোখের সামনে মেলে তীক্ষ্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, দেখুন তো, এই তারটা genuine কিনা?

কিরীটীর অতর্কিত প্রশ্নে মুহূর্তের জন্য যেন সুবিমল শীল কিরকম হতভম্ব হয়ে যান। একটি শব্দও তাঁর মুখ ফুটে বের হয় না।

এই তার পেয়েই নাকি নির্মলবাবু এখানে আসেন! অথচ দেখুন ভাল করে তারটা পরীক্ষা করে, এ তার যেদিন এখান থেকে করা হয়েছে বলে নির্মলবাবু বলেছেন, ডাকঘরের স্ট্যাম্পটা ভাল করে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না এটা যেদিন সন্তোষ চৌধুরী মারা যান রাত্রে, সেদিনকার সকালের তারিখ এতে আছে। তার মানে হত্যার পূর্বেই নির্মলবাবুকে তার করা হয়েছিল যে—Father expired, come sharp! তবেই বুঝতে পারছেন, এ থেকে দুটি কথা ভাবতে পারি আমরা। প্রথমত everything pre-arranged—অর্থাৎ সব কিছুই আগে থাকতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তা যদি না হয়ে থাকে, শ্যামাবাবু নির্মলবাবুকে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে যে তার করেছিলেন, এটা মোটেই সেই আসল তার নয়, এটা একটা নকল তার মাত্র। তাছাড়া আপনি জানতেন যে নির্মলবাবু দিন দুই আগেই কলকাতা ছেড়ে চলে যান এবং তারটা যখন অফিসে পৌঁছায় তখন তিনি অফিসে অনুপস্থিত অর্থাৎ তার পান নি, পেতে পারেন না। শুনুন, হত্যার দিন সকাল থেকেই নির্মলবাবু মধুপুরে ছিলেন। আপনি এখানে এসে যখন সব কথা জানতে পারলেন তখন কেন আমাদের বলেন নি আসল ও সত্য কথাটি?

আমি—আমি—

বলবেন আপনি এর কিছু জানেন না! কিন্তু পুলিসের লোক সে কথা তো বিশ্বাস করতে চাইবে না মিঃ শীল। তারা বলতে বাধ্য হবে যে, কোনও কারণবশতঃ নিশ্চয়ই আপনি আসল কথা গোপন করেছেন!

সুবিমলবাবু কিরীটীর স্পষ্ট কথায় অতঃপর কি যেন মনে মনে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তার পর মৃদু কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ করেছিলাম, সেও নির্মলবাবুকে বাঁচাতেই। যখন এসে সব শুনলাম, তখনই বুঝেছিলাম আসল কথাটা বললে তাঁর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

শুধু কি একমাত্র সেই কারণেই আপনি আসল কথাটা গোপন করেছিলেন মিঃ শীল?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবিমল শীল কিরীটীর মুখের দিকে তাকান।

কিরীটীর চোখের তারায়ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

চার জোড়া ছুরির ফলা যেন ঝিঁকিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে একটা ভয়ানক স্তব্ধতা নেমে এসেছে। দেওয়ালে ঝুলন্ত ঘড়ির দোদুল্যমান পেণ্ডুলামটা একটানা শব্দ করে যাচ্ছে টক্ টক্ করে।

বাইরে কোথায় একটা পাখী ডেকে ওঠে।

যদি বলি মিঃ রায়, কেবলমাত্র সেই জন্যই আমি সেদিন সত্য গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করবেন না, না?

আপনার এ কথার জবাব আর একদিন খুব শীঘ্রই দেব মিঃ শীল, আজ নয়।

বেশ।

কিরীটী ধীর শান্ত পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

।। দশ ।।

আরও দিন দুই বাদে কিরীটী দশ হাজার টাকার জামিনে নির্মল চৌধুরীকে খালাস করে নিয়ে এল। এ কদিনের হাজতবাসেই নির্মল চৌধুরীর চোখে-মুখে যেন একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট কালো ছাপ এঁকে দিয়ে গিয়েছিল।

নির্মল বাড়িতে এসে প্রথমেই সোজা তার মার শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হল।

খোলা জানলার ধারে একটা আরাম-কেদারার উপরে মিসেস্ চৌধুরী অর্ধশয়নাবস্থায় ছিলেন। চোখের দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। নির্মল এসে ঘরে প্রবেশ করে মা বলে ডাকতেই মিসেস্ চৌধুরী চম্‌কে উঠে বসেন, কে?

মা, আমি নিমু!

নিমু! এলি বাবা?

মিসেস্ চৌধুরী ব্যগ্র দুটি বাহুর আলিঙ্গনে পুত্রকে বক্ষের মধ্যে চেপে ধরেন। দু চোখের কোণ বেয়ে অবাধ্য অশ্রু অবিরল ধারায় নেমে আসে।

কিরীটীবাবু না থাকলে জামিনেও খালাস পেতাম না মা। সত্যিই তিনি আমাদের হিতৈষী।

মিসেস্ চৌধুরী পুত্রের কথায় কোন জবাবই দেন না।

কিরীটীবাবু আজই সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা চলে যাচ্ছেন মা।

সে কি! কে বললে?

হ্যাঁ, থানা থেকে আসতে আসতে আমাকে বলছিলেন তিনি।

আমি যাই।

কোথায়?

যাই একবার কিরীটীবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

আমরাও আজই কলকাতায় যাব মা।

কলকাতায় যাব! আজই?

হ্যাঁ। এখানে আর থাকতে পারছি না।

আচ্ছা সে হবে'খন।

মিসেস্ চৌধুরী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিরীটী সুটকেসটার মধ্যে জামাকাপড়গুলো ভরছিল।

মিসেস্ চৌধুরী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন, কিরীটীবাবু?

কে? ও মিসেস্ চৌধুরী! বসুন।

ও নামে আর আমাকে ডাকবেন না কিরীটীবাবু। আপনি তো আমার নাম জানেন, সুমিত্রা!

বেশ।

নিমুর মুখে শুনলাম, আপনি নাকি আজই সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, এখানকার কাজ তো আমার শেষ হয়েছে সুমিত্রা দেবী।

কিন্তু আপনি যেজন্য এখানে এসেছিলেন সে কাজ তো এখনও আপনার শেষ হয় নি কিরীটীবাবু?

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন সুমিত্রা দেবী. বসুন!

খালি চেয়ারটা অধিকার করে সুমিত্রা উপবেশন করলেন।

না, সে কাজ অবিশ্যি এখনও আমার সম্পূর্ণ হয় নি এবং আমি যখন স্বেচ্ছায় সে কর্তব্য মাথায় তুলে নিয়েছি, সব কিছুর একটা শেষ মীমাংসা করবই।

তবে—তবে আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? আমাদের দিক থেকে কি কোন ত্রুটি হয়েছে কিরীটীবাবু? আপনি তো জানেন, কি রকম মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমার দিন যাচ্ছে?

না, না—সে রকম কোন কিছুই নয়। শুনুন সুমিত্রা দেবী, আপনি যখন নিজে থেকেই বিষয়টা উত্থাপন করেছেন, খোলাখুলিই সব আপনাকে বলব। আপনার স্বামীর হত্যা-রহস্যের সঙ্গে আপনার অতীত জীবনের এমন অনেক কিছু জড়িয়ে আছে, যার জট না খুললে বর্তমানে কোন সত্যিকারের মীমাংসাতেই পৌঁছানো

অসম্ভব। অথচ তাতে হয়তো আপনার লাভের চাইতে ক্ষতির পরিমাণটাই হবে বেশী। তার চাইতে আমি ভেবেছিলাম আপনাকে অনুরোধ জানাব, এ ব্যাপার থেকে আমাকে এখন থেকেই ছুটি দিতে। পুলিসের লোকেরা যতদূর পারে করুক। আর আপনার ছেলের কথা—তার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণই পুলিসের জানা নেই, যাতে করে তাকে এ হত্যা-ব্যাপারে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

না—

সহসা সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে যেন কিরীটী চমকে ওঠে।

মিসেস্ চৌধুরীর ঠিক এই ধরনের কণ্ঠস্বর কিরীটী এখানে আসা অবধি শোনে নি।

কণ্ঠস্বরে একটা অবিসংবাদী দৃঢ়তা ও অনন্যতা যেন ফুটে উঠেছে।

সুমিত্রা বললেন, না—তা হবে না কিরীটীবাবু। এ কদিন অর্থাৎ আপনাকে আমার ডাইরীটা পড়তে দেবার পর থেকেই, কেবল ঐ কথাটাই অহোরাত্র চিন্তা করেছি এবং স্থির করেছি, এর একটা সত্যিকারের মীমাংসায় আমাকে পেঁছিতেই হবে। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর সঙ্গে আমি যে ব্যবহারই করে থাকি না কেন, আজ তাঁর নৃশংস হত্যার পরও যদি আমি চুপ করেই থাকি, তা হলে আমার মধ্যে যে নারী আছে তাকেই করা হবে অপমানিত লাঞ্ছিত। আমার কৃত-কর্মের ফল আমাকেই বহন করতে দিন। যদি কোন পাপ করে থাকি, প্রায়শ্চিত্তও তার করতে দিন। এমন কি তার জন্য আজ যদি আমার শেষ ও জীবনের একমাত্র বন্ধন নিমুকেও হারাতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত জানবেন।

সুমিত্রা দেবী!

হ্যাঁ কিরীটীবাবু, এই আমার শেষ কথা। আজ দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যে লাঞ্ছনা আব অপমান সহ্য করেছি তার পরও কি আপনি মনে করেন বাইশ বছর আগেকার সে সুমিত্রা আজও বেঁচে আছে? না, সে মরে পাথর হয়ে গেছে। আমি পারব—সব সহ্য করতে পারব। বলতে বলতে সুমিত্রা দু হাতে মুখ ঢাকলেন।

বংশ-পত্রের মত সমস্ত শরীর তার কাঁপছে।

কিরীটীর মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা ঝড়ের আঘাতে সতেজ একটি গাছ যেন ভেঙে দুমড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে একেবারে।

করুণায় কিরীটীর সমস্ত মন যেন সহসা কেমন দ্রব হয়ে আসে।

সামান্য এক নারী হয়ে সুমিত্রা যা সহ্য করেছে, অন্যের পক্ষে হয়তো তা সহ্য করা ধারণার অতীত ছিল।

সুমিত্রা দেবী! সস্নেহে কিরীটী ডাকে।

সুমিত্রা মাথা তুললেন। দুটি চক্ষের কোলে তখনও অশ্রুর সুস্পষ্ট রেখা। অশ্রুসিক্ত অক্ষিপল্লব থরথর করে কাঁপছে।

কেবলমত্র. আপনার কথা ভেবেই আমি শেষ পর্যন্ত ভেবেছিলাম, এ ব্যাপার

থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেব। কারণ আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হলে আপনাকেই হয়তো সবার চাইতে বেশী আঘাত সহ্য করতে হবে। তা ছাড়া যা অতীত, গত হয়েছে, মিথ্যে আজ আবার তাকে বর্তমানের আলোয় টেনে এনে অকারণ দুঃখ ও লজ্জা ডেকে আনবেন কেন? থাক না কেন অতীত অতীতের অন্ধকারেই ভুলের মাঝখানে।

না, কিরীটীবাবু, না! সে লজ্জা ও দুঃখের, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, আমিও যখন কতকটা কারণ, তা যতই রূঢ় ও কঠিন হোক না কেন, মাথা পেতে আজ তার ফলাফল বা শুভাশুভকে আমায় মেনে নিতেই হবে। তা ছাড়া আমার জীবনে শেষ ও একমাত্র বন্ধন আমার পুত্র—

হ্যাঁ, সেটাও নিশ্চয়ই আপনি ভেবেছেন?

ভেবেছি বৈকি। সে মুখ ফুটে না বললেও, আমি কি বুঝতে পারি নি, ইদানীং কয়েক বছর ধরে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে তারও মনের মধ্যে একটা রীতিমত দ্বন্দ্ব বেধেছিল! এতে করে হয়তো সে দ্বন্দ্বেরও একটা মীমাংসা হয়ে যাবে।

বেশ, তবে তাই হবে সুমিত্রা দেবী। সমস্ত রহস্যেরই আমি মীমাংসা করে দেবো।

আরও একটা কথা আছে মিঃ রায়!

বলুন?

জীবিতকালে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও আদানপ্রদান যাই থাকুক না কেন, আজ তাঁর মৃত্যুর পরে এটুকুও যদি না করি তা হলে আমাকে ধর্মে পতিত হতে হবে। মানুষটাকে তাঁর জীবিতকালে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না দিতে পারলেও, আজ তাঁর মৃত্যুর পর কোন বিদ্বেষই আর নেই। সেই কারণেও স্বামীর হত্যাকারীকে আমায় ধরতেই হবে জানবেন।

আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে ধরতে কোনই বেগ পেতে হবে না যদি আপনি আমার সহায় হন, অকপটে এখনও সব কথা স্বীকার করেন।

আমার কোন কথাই তো আর আপনার কাছে গোপন নেই, মিঃ রায়?

আছে বৈকি। এখনও অনেক কিছুই বলতে বাকি।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?

যে রাত্রে আপনার স্বামী নিহত হন সে রাত্রের সমস্ত সত্য ঘটনা কি আজও আপনি আমার কাছে বলেছেন?

মুহূর্তে যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে সুমিত্রার সমস্ত শরীর স্তব্ধ অসাড় হয়ে গেল।

কিন্তু খুব শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিত্রা বললেন, বলুন কি আপনি জানতে চান?

নিজে থেকে প্রশ্ন করে একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি কিছুই জানতে চাই না সুমিত্রা দেবী, আপনার কাছ থেকে আমি চাই—সেরাত্রের সমস্ত ব্যাপার

আনুপূর্বিক আপনি অকপটে আমাকে খুলে বলুন।

কিরীটীর বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না, কি নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব সেই মুহূর্তে চলেছে সুমিত্রার সমগ্র মন জুড়ে।

বর্তমান মুহূর্তটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত ও দৃঢ় করে নিতে সুমিত্রার কয়েক মুহূর্ত গেল।

আজ তিনি সত্যিই দৃঢ়সংকল্প। অহর্নিশি নিরন্তর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, আজ তাঁকে সত্যিই সহ্যের শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল। আজ অকপটে নিজেকে সকল প্রশ্নের সামনেই উদ্ঘাটিত করে দাঁড় করানো ছাড়া অন্য দ্বিতীয় পন্থাই নেই।

সত্যি কিরীটীবাবু, সেদিন আমার স্বামীর হত্যার ব্যাপারে পুলিসের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছিলাম তা সম্পূর্ণ সত্যি নয়।

আমি তা জানি সুমিত্রা দেবী।

আপনি জানেন?

হ্যাঁ, মানে প্রথম হতেই আপনার জবানবন্দী শুনে ধারণা হয়েছিল, সে রাত্রের আসল ও সত্য কথা অর্থাৎ যা ঘটেছিল আপনি আমাদের কাছ থেকে গোপন করেছেন।

গোপন করেছি বুঝেছিলেন?

বুঝেছিলাম বৈকি। যার মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক বলে সামান্য পদার্থটুকুও আছে সে-ই বুঝতে পারত আপনি যা বলেছেন তা সত্য ও সম্ভব হতে পারে না। আপনাকে তাহলে খুলেই বলি মিসেস্ চৌধুরী। আপনি বলেছিলেন, রাত প্রায় দুটোর সময় একটা গোলমালের শব্দে ও মুখের উপর একটা অস্বোয়াস্তিকর চাপে আপনার ঘুম ভেঙে যায়। তখন দেখতে পেলেন আপনার হাত-পা বাঁধা এবং একজন মুখোশধারী আপনার মুখে কাপড় গুঁজে মুখটা বাঁধছে। অথচ আপনি বলেছেন আপনার চোখ দুটো নাকি খোলাই ছিল। এখানেই আমি প্রশ্ন করব, যারা নিজেদের মুখে মুখোশ এঁটে ঘুমের মধ্যে আপনার হাত-পা-মুখ বেঁধে এতখানি সাবধানতা নিল, তারা আপনার চোখ খোলা রাখলে কেন? দ্বিতীয়তঃ আপনার স্বামীকে নিয়ে আততায়ীরা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার পর আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যতক্ষণ তারা ঘরের মধ্যে ছিল আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হল, ততক্ষণ আপনি বেশ রইলেন, যেই তারা ঘর হতে বের হয়ে গেল, আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আপনি বলুন, ব্যাপারটা একেবারে ছেলে-ভুলোনো চেষ্টা নয় কি? তার পর দেখুন, আপনি বলেছেন আপনার জবানবন্দীতে, পরদিন সকালবেলা ভৃত্য রাঘবের ডাকাডাকিতে আবিষ্কৃত হল আপনার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ির মধ্যে কোথায়ও এবং সে কথা আপনি জানতে পারলেন পরের দিন আপনার জ্ঞান ফিরে আসার পর। অর্থাৎ আপনি তখনও জ্ঞান ফিরে পান নি। কিন্তু ভয় পেয়েই সত্যি যদি আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকতেন—তবু বলব, এতক্ষণ ধরে কেউ কি অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে? যদি বলি ঘুমিয়েছিলেন—

তাও সত্য নয়, বাঁধা অবস্থায় কেউ কি ঘুমাতে পারে? আমি বলব আপনি আগাগোড়াই সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা আপনি দেখেছেন এবং সকালেও সম্পূর্ণ জ্ঞানেই ছিলেন, অজ্ঞানের সেটা ভান মাত্র।

মিসেস্ চৌধুরী যেন একেবারে নির্বাক। একটি শব্দও তাঁর মুখ দিয়ে বের হয় না। কিছুক্ষণ একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন।

তারপর এক সময় ধীরে ধীরে মুখ তুললেন—না, সত্যিই আমি জ্ঞান হারাই নি কিরীটীবাবু। আর সকালবেলাতেও ইচ্ছা করেই অজ্ঞানের ভান করেছিলাম। চোখ আমার বাঁধে নি এবং পরে মনে হয়েছে বোধ হয় ইচ্ছা করেই তারা চোখ আমার বাঁধে নি। হ্যাঁ, তাদের হয়তো ইচ্ছা ছিল আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সামনেই ঘটুক। কেবল আমি যাতে বাধা দিতে না পারি ও চিৎকার করে লোকজন না ডাকতে পারি সেইজন্য হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে বেঁধে দিয়েছিল।

এবার তাহলে বলুন, সত্যিই আপনি তাদের কাউকেই কি চিনতে পারেন নি? এমন কি গলার স্বরেও না?

না—তাদের মধ্যে যে অরিন্দম ছিল না, সে আপনাকে আমি হলফ করে বলতে পারি, তবে এও আমার স্থির বিশ্বাস, অরিন্দম সেখানে না থাকলেও তারই ইঙ্গিতে সব কিছু ঘটেছে।

কেন—একথা আপনার মনে হল কেন?

আমার ডাইরী পড়েও কি আপনি সে কথা বুঝতে পারেন নি?

একটা কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন সুমিত্রা দেবী, অরিন্দমকে আপনি যতই নীচ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাবুন না কেন, এত বড় দুর্বলতা সে প্রকাশ করবে না। সে সম্পূর্ণ অন্য ধাতে তৈরী মানুষ।

আপনি—

হ্যাঁ, আমি অরিন্দমকে চিনি।

চেনেন!

হ্যাঁ, চিনি।

তা হলে আমিও বলব, বর্তমানে সে কোথায় এবং কোন্ বেশে আছে তা জেনেও আপনি অরিন্দমকে এখনও ধরিয়ে দিচ্ছেন না!

ব্যাপারটা আপনি যতখানি সহজ মনে করেছেন, ঠিক ততটা সহজ নয়। আইন বড় বিচিত্র। সামান্য সন্দেহ, রাগ বা বিদ্বেষের বশে হুট্ করে কাউকেই কি গ্রেপ্তার করা যায়? বিশেষ করে খুনের অভিযোগে? না, তা যায় না। তাছাড়া অরিন্দমকে আপনি যে চোখে দেখেছেন, আমি যে সে চোখে এখনও তাকে দেখতে পারছি না!

আপনার কথা আমি যে কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, মিঃ রায়?

ক্ষমা করবেন, আপনার ডাইরীর সমস্ত কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হব, অরিন্দম আজও আপনাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সত্যিকারের ভালবাসে।

ছিঃ ছিঃ! ও কথা আজ আমার শুনতেও ঘৃণা হয়।

ঘৃণা হওয়াই উচিত। তবে আমার বক্তব্য ঠিক তা নয়। আমার এক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে, সত্যিকারের ভালবাসা কখনও অতখানি নীচে নামতে পারে না। কিন্তু যাক গে সে কথা। আমি যখন আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, আপনার স্বামীর হত্যা-রহস্যের যেমন করে হোক একটা মীমাংসা করবই, তখন শীঘ্রই সেটা করব। আমি আজ কলকাতায় যাচ্ছি—

আর ফিরে আসবেন না?

তেমন আর প্রয়োজন কি বলুন? নির্মলবাবুও তো বলেছিলেন আপনাকে নিয়ে শীঘ্রই তিনি কলকাতাতেই যাচ্ছেন!

হ্যাঁ, সে বলছিল আজই সন্ধ্যার গাড়িতে যেতে।

বেশ তো। সে তো খুবই ভাল কথা। চলুন না একই ট্রেনে যাওয়া যাবে'খন।

তা হলে নিমুকে বলে আসি গে?

যান।

সুমিত্রা দেবী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

॥ এগারো ॥

গড়িয়াহাটায় সন্তোষ চৌধুরীর সুবৃহৎ আধুনিক আমেরিকান কংক্রিটে তৈরী আবাস—'চৌধুরী লজ'। বাড়িখানা প্রায় নয় কাঠা জমির উপর। বাড়ির সম্মুখ-ভাগে লোহার গেট পার হলেই প্রকাণ্ড টেনিস লন, একপাশে ফুলের বাগান—দেশী-বিদেশী ফুলের ও পাতাবাহারের গাছ, রঙিনের বিচিত্র সমারোহ। বাড়ির পশ্চাৎ দিকেও একটা ছোটখাটো বাগানের মত আছে। করিডর ও পোর্টিকো, তারও চতুর্দিকে পিতলের টবে পামট্রি ও অর্কিড। নীচের তলায় চৌধুরীর অফিস। উপরের তলায় ওঁরা থাকেন।

কিরীটীর কাছ থেকে হাওড়া স্টেশনেই বিদায় নিয়ে মা ও ছেলে ট্যাক্সিতে করে বাড়িতে সোজা চলে এলেন। বাড়িতে তাঁরা জানাননিও যে তাঁরা ফিরে আসছেন সবাই। পোর্টিকোতে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই সাড়া পেয়ে ভৃত্যের দল চারপাশ থেকে এসে হাজির হল।

বৃদ্ধ সরকার প্রফুল্লবাবু এ গৃহের বহুদিনকার পুরাতন লোক।

প্রফুল্লবাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধের দুই চক্ষু অশ্রুসজল, মা—

আর যে কি বলবেন তিনি মনিব-পত্নীকে বুঝতে পারলেন না। তাই 'মা' বলেই চুপ করে গেলেন। সুমিত্রা একবার প্রফুল্লবাবুর দিকে চোখ তুলে তাকালেন, কোন জবাব তাঁরও কণ্ঠে নেই। মাত্র মাস দেড়েক আগে সুমিত্রা এই বাড়ি থেকে স্বামীর সঙ্গে কয়েক মাস মধুপুরের বাড়িতে থাকবেন বলে গিয়েছিলেন।

অসাধারণ বুদ্ধিমতী সুমিত্রাকে বাইরে থেকে দেখে কারও বুঝবারও উপায়

ছিল না, এ সংসারে সর্বময়ী গৃহকর্ত্রীর আসনটিতে উপবেশন করেও মনের মধ্যে তাঁর আসলে এ সংসারের যাবতীয় সব কিছু হতে শুরু করে, মায় মালিকটির প্রতি পর্যন্ত এতটুকু বন্ধন ছিল না। এ গৃহের সর্বময়ী হলেও তিনি আসলে এ গৃহের কেউ ছিলেন না। সংসাবের হালটি তাঁর হাতে থাকলেও, এ সংসারের কেউ তিনি ছিলেন না।

এ সংসারের কোন কিছুর প্রতিই তার সামান্যতম স্পৃহাও ছিল না। কিন্তু তবু—তবু আজকের প্রভাতে এ বাড়ির দরজায় পা দিতেই সহসা কেন না-জানি মনের মধ্যে একটা অদৃশ্য হাহাকার জেগে ওঠে।

একটা মর্মান্তিক বেদনার তীব্র দাহে কেন জানি না সমস্ত অন্তরটা তাঁর হাহাকার করে ওঠে। আজ প্রায় দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে যাঁর সহধর্মিণীর পদমর্যাদাকে স্বীকার করে নিয়েও অন্তরে কোন স্বীকৃতিই দেন নি, যাঁর অপরিমেয় শুভেচ্ছা ও ভালবাসাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় অস্বীকার করে এসেছেন, আজ তাঁরই অবর্তমানে তাঁরই গৃহে পা দিয়ে অকারণ মূক বেদনায় যেন তাঁর সমস্ত অন্তর কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, দোষ কি কেবল একা তাঁরই ছিল?

কর্তব্যের দিক দিয়ে মনের কাছে তিনিও কি দোষী নন? কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতেই সুমিত্রা পায়ে পায়ে এসে স্বামীর নিত্যকার ব্যবহারে বন্ধ ঘরটির দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

সামনেই স্বামীর এনলার্জড ছবিখানা। যেন তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে ঠিক ছবির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

নির্বাক প্রাণহীন ছবির চোখেও কি ভাষা ফোটে! একদিন সমস্ত অন্তর দিয়েই তো ওই মানুষটিকে সুমিত্রা ভালবেসেছিলেন। চিরসুখের নীড় বাঁধবার জন্য ঐ মানুষটির হাতে হাত মিলিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। অথচ সেদিন কি তিনি ঘৃণাক্ষরেও জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর সেই ভালবাসার অম্লান গন্ধপুষ্পের মধ্যে অভিশপ্ত কালো কীট আত্মগোপন করে আছে!

আবার মনে হয়, সত্যিই কি তিনি বিশ্বাসঘাতক? সত্যিই কি তিনি দেশদ্রোহী?

নির্মল ভাবছিলেন তাঁর নিজের ঘরে বাগানের দিককার খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে। সামান্য কটা দিনের মধ্যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! একটা প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল।

ভাল করে জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পিতার প্রতি তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছিল। অথচ পিতা তাঁকে কি স্নেহই না করতেন!

তাঁর অবজ্ঞা অবহেলা—কোনদিন তার জন্য পিতা এতটুকু অভিযোগও করেন নি। নিঃশব্দে আজ তিনি সমস্ত অবজ্ঞা সমস্ত অবহেলা চিরতরে মাথায় তুলে নিয়ে

নৃশংস ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়ে গেলেন।

তাঁকেই আজ তাঁর পিতার হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সত্যিই তো তিনি নির্দোষ নন! অন্তরে কি তাঁর পাপ ছিল না? মনে মনে তিনিও কি পিতার মৃত্যুকামনা করেন নি? মার ব্যথাকরুণ মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে কত সময় কি তাঁর মনে হয় নি, কর্তব্যের এই মর্মান্তিক দুঃখ সয়ে থাকার চাইতে নিজ হাতে তিনি সব মীমাংসা করে দেবেন?

হ্যাঁ, আজ অস্বীকার করতে পারবেন না—তাঁরও মনের ঘুমন্ত পশু নর্খবিস্তার করেছে থেকে থেকে। দোষী? হ্যাঁ, তিনিও দোষী বৈকি। হত্যা করা ও কাউকে হত্যা করবার পরিকল্পনা মনে মনে পোষণ করা—একই অপরাধ নয় কি?

দু হাতের মধ্যে মুখ ঢাকেন নির্মল।

রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জীর মেয়ে মৃণালিনী।

সেও তার নিজ শয়নকক্ষে একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল। এই কদিনেই তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। মুখের সে সুষমা নেই। নেই দেহের সেই ঢলঢল কমনীয় লাবণ্য। দুঃখের দারুণ তাপে যেন সব শুকিয়ে ঝলসে গেছে। মাথার পর্যাপ্ত কেশ আলুথালু বিস্রস্ত। চোখের কোলে সুস্পষ্ট কালো রেখা। তপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যতাপে ঝলসানো রজনীগন্ধার ফুলটি যেন।

সদা ক্রীড়া ও হাস্যময়ী মৃণালিনী—ঝর্ণার স্বচ্ছন্দ ধারার মত যার হাসির তরঙ্গ দিবারাত্র সমস্ত বাড়িটাকে আনন্দমুখর করে রাখত, সে হাসির উৎসমুখে যেন পাথর চাপা পড়েছে আজ।

একটা দিন মৃণালিনী বাড়ি থেকে একটিবারের জন্য কোথাও বের হয় নি পর্যন্ত।

অনিলবাবু অবিশ্যি এ বাড়িতেই আছেন, তবে মৃণালিনী তার সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলে না। বরং এড়িয়েই থাকতে চায়। একা একা চুপটি করে ঘরের মধ্যে থাকতেই ভাল লাগে।

পিতা শুধু মৃণালিনীর পিতাই ছিলেন তা নয়, সখা সচিব। মেয়েকে রায় বাহাদুর অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে অন্তরের সমস্তটুকু স্নেহ নিংড়ে গড়ে তুলেছিলেন।

পিতার কাছে মৃণালিনী কোন দিন এতটুকুও সংকোচ বোধ করে নি। যে কথা সমবয়সীদের কাছে এবং একান্ত অন্তরঙ্গদের কাছেও বলতে বেধেছে, পিতার কাছে অসংকোচে সে কথা সে বলতে দ্বিধাবোধ করে নি কখনও। সেই পিতার মৃত্যুর আঘাত কি এত সহজে ভোলা যায়? সমস্ত সংসারই যেন আজ মৃণালিনীর কাছে শূন্য হয়ে গিয়েছে। একটিমাত্র লোকের অভাবে তার জীবন যেন শূন্য হয়ে গেছে একেবারে।

ঠাকুমাকে মধুপুরে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনিও নাকি শয্যা নিয়েছেন।

কিরীটী তার শয়নকক্ষে শয্যার উপরে শুয়ে ভাবছিল ঘটনার আকস্মিক দ্রুত গতিবেগের কথাই। বহু জটিল সূত্র একসঙ্গে জট খুলে তাকে কেমন বিহ্বল করে ফেলেছে।

সুমিত্রার নিসঃঙ্গ একাকীত্ব তাকে আজ সত্যিই কেন যেন ভীত করে তুলেছে। সুমিত্রার মত মেয়ে, এই চরম আত্মস্খলনের পর যে বিপর্যয়ের সম্মুখে এসে তাকে বাধ্য হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে, আজ সে বিপর্যয়ের বেগকে দেহ ও মন সহ্য করতে পারবে কিনা সেটাই কিরীটীর সব চাইতে বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে যে সংগ্রামকে সত্য বলে সে দেহ ও মনে যুদ্ধ করে এসেছে, আজ তার সত্যতার সংশয়ে যে অন্তর্বিপ্লব তার মনে জেগেছে তাকে সহ্য করবার মত মত শক্তি কি তার আছে ?

অথচ আজকের এই হত্যারহস্যের মীমাংসার পর চারিদিক বজায় রাখতে হলে, বিশেষ করে আগামী দিনের দুঃখ হতে সকলকে বাঁচাতে হলে সুমিত্রাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে তাকে।

প্রফুল্লবাবু এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন। মৃদু সংযত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আমাকে ডেকেছিলেন মা ?

দরজার বাইরে প্রফুল্লবাবুর গলা শুনে ঘরের ভিতর থেকে সুমিত্রা মৃদু আহ্বান জানালেন, আসুন—ঘরের ভিতরে আসুন সরকার মশাই।

প্রফুল্লবাবু ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। সুমিত্রার দিকে চেয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বিগতযৌবনা সুমিত্রাকে দেখলে এখনও বোঝা যায় একদা যৌবনে তিনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন।

ইতিমধ্যে কখন স্নানান্তে একখানা সাদা পাড়হীন সিল্কের শাড়ি পরিধান করেছেন। রুক্ষ সিক্ত চুলের রাশি পৃষ্ঠদেশে ছড়িয়ে আছে, মাথায় অল্প ঘোমটা। হাত দুটি এখন সম্পূর্ণ নিরাভরণা। সমস্ত গহনা ইতিমধ্যেই খুলে ফেলেছেন তিনি। অপূর্ব যোগিনীবেশ !

প্রফুল্লবাবুর চোখের পাতা জলে ভরে আসে। মাথা নীচু করলেন প্রফুল্লবাবু, বোধ হয় উদ্যত অশ্রুধারাকেই নিরোধ করতে।

এ বাড়ির প্রতিটি লোক সুমিত্রাকে সত্যিই ভালবাসত। সুমিত্রার মিষ্ট-মধুর ব্যবহার, সংযত স্নেহশীল আচরণ সকলকেই আকৃষ্ট করত।

সরকার মশাই, আপনি বোধ হয় শুনেছেন আমার স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর আত্মার সদ্গতির জন্য যা করা প্রয়োজন সব কিছু ব্যবস্থা করুন। নির্মল তো ওসব ব্যাপারের কিছুই জানে না। যদি কোন পণ্ডিতের কাছে পরামর্শ নিতে হয়—

সব ব্যবস্থাই হবে মা। ছোটবাবুকে ভাবতে হবে না, আপনিও নিশ্চিন্ত

থাকুন।

এইজন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম—হ্যাঁ, আর একটা কথা, সেক্রেটারী-বাবুকে অফিসে একটা সংবাদ দেবেন, আমরা কলকাতায় হঠাৎ চলে এসেছি। তিনি যেন আজ সন্ধ্যার পর এখানে একবার এসে দেখা করেন আমার সঙ্গে, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আচ্ছা মা!

এরপর প্রফুল্লবাবু ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নির্মল কিছুতেই নিজের ঘরে চুপ করে থাকতে পারলেন না। বিকালের রোদটা একটু পড়ে আসতেই তিনি বের হয়ে পড়লেন গাড়ি নিয়ে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, কোন্ দিকে যাব বাবু?

রায়বাহাদুরের বাড়িতে চল।

গাড়ি রায়বাহাদুরের বাড়ির দিকেই চলল।

॥ বারো ॥

সন্ধ্যার আবছা আলোয় চারিদিক তখন ম্লান হয়ে আসছে। রাস্তার ইলেকট্রিক বাতিগুলো জ্বলতে শুরু হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে নির্মল সোজা উপরে মৃণালিনীর ঘরের দিকে চললেন।

সন্ধ্যার ম্লান ও স্বল্প আলোয় ঘরটা প্রায়ান্ধকার বললেও অত্যুক্তি হয় না। খোলা জানলাপথে শেষ আলোর যে সামান্য একটুখানি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে, তাতে ঘরের ভিতরের কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

নির্মল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটু ইতস্তত করে ফিরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ অন্ধকারে মৃণালিনীর গলার স্বর শোনা গেল, কে?

মিনু, আমি নির্মল!

নির্মল! চমকে মৃণালিনী উঠে দাঁড়ায়।

এগিয়ে এসে সুইচ টিপে আলোটা জেলে দিতেই মুহূর্তে উজ্জ্বল আলোয় ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হল। মৃণালিনী সামনে নির্মলকে দেখে কম বিস্মিত হয় নি। নির্মল পিতৃহত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তারই হয়েছিল জানত, কিন্তু জামিনে যে সে এর মধ্যে খালাস পেয়েছে তা সে জানত না।

অবাক হয়ে গেছ, না? হ্যাঁ, কিরীটীবাবুর চেষ্টায়ই শেষ পর্যন্ত জামিনে খালাস পেয়ে মাকে নিয়ে এসেছি।

মাসীমা কলকাতায় এসেছেন?

হ্যাঁ। তাঁকে আর মধুপুরে রাখতে সাহস হল না।

আমাদের কথা তিনি শুনেছেন?

না। এখনও তাঁকে কিছু বলি নি। আমি তো কিছু জানতাম না, কিরীটী-

বাবুর মুখেই সব শুনলাম।

বসো নির্মল। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নির্মল একটা সোফার উপরে উপবেশন করেন।

নির্মল সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন মৃণালিনীর অসাধারণ মনের শক্তি দেখে। তিনি ভেবেছিলেন প্রথম দর্শনেই হয় মৃণালিনী দুঃখে ও শোকে ভেঙে পড়বে, না হয় কোন কথাই বলবে না। এবং সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছেন কি ভাবে সে কথা শুরু করবেন?

মিনুর পিতার নিহত হবার সংবাদ শুনবার পর হতেই এই কথাটাই তিনি বার বার ভেবেছেন, এই দুর্ঘটনার পর মিনুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার সম্মুখীন তিনি হবেন কি করে? কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখে যেন একটু বিস্মিতই হয়ে যান।

কি ভাবে ঠিক কোথা হতে কথা শুরু করবেন নির্মল ভাবছিলেন। কিন্তু তাঁকে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি হতে মুক্তি দিয়ে মিনুই নিজ হতে প্রথমে কথা শুরু করলে, আমার বাবার অতীত জীবনের কথা তুমি সঠিক জান কিনা আমি জানি না নির্মল—

কিছু কিছু জানি, তোমার বাবা ও আমার বাবা প্রথম যৌবনে এক গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘে বিশেষভাবে যে জড়িত ছিলেন তা আমি জানি।

সেইটুকুই কিন্তু সব না। তুমি হয়তো জান না, ঐ সম্পর্কে একটা খোলাখুলি আলোচনা করবার জন্যই এবারে তোমাকে আমি মধুপুরে যেতে বলেছিলাম, কারণ সেই আলোচনার উপরেই নির্ভর করছিল একান্তভাবে আমাদের দুজনের ভবিষ্যৎ। তুমি বলেছিলে, তোমার কয়েকটা জরুরী কাজ আছে এবং সেগুলো সেরেই তুমি আসবে, কিন্তু আচমকা কোথা হতে ঝড় এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল। এখানে ফিরে এসে দ্বিতীয়বার ঝড় উঠল—যার ফলে সমস্ত আশা-ভরসা আমার শেষ হয়ে গেছে।

শেষ হয়ে গেছে কেন বলছ মিনু?

বলছি তার কারণ সত্যিই শেষ হয়ে গেছে! আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে কেন্দ্র করে যে পরিকল্পনা আমি গড়ে তুলেছিলাম আজ আর তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। সব—সব শেষ হয়ে গেছে।

কিছু শেষ হয় নি মিনু। তাছাড়া নিয়তির গতি রোধ করতে পারে মানুষের সাধ্য কি?

নিয়তি! নিয়তিই বটে নির্মল! যাক তুমি নিজে থেকে এসেছ ভালই হয়েছে, নাহলে আমাকেই হয়তো শীঘ্র একদিন তোমার কাছে যেতে হত। তারপর একটু চুপ করে কি যেন ভাবে মৃণালিনী। তার সুসংযত চিন্তান্বিত মুখের রেখায় একটা অনিবার্য দৃঢ়তা যেন ফুটে ওঠে। হঠাৎ কণ্ঠস্বরকে অত্যন্ত নীচু ও সুস্পষ্ট করে মৃণালিনী ডাকে, নির্মল!

বল ?

তোমার সঙ্গে সেদিন আমি কি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম জান ?

কি ?

আলোচনা করতে চেয়েছিলাম যে, কথাটা আমাদের দুজনের পক্ষেই লজ্জার, কারণ এমন চারজন এদের মধ্যে জড়িয়ে আছেন যাঁদের কাছে আমরা সর্বতোভাবে তো ঋণীই এবং যাঁদের চাইতে ভালবাসার ও শ্রদ্ধার বাক্তি আমাদের উভয়েরই আর কেউ হতে পারে না—বুঝতে পেরেছ বোধ হয় আমি কি এবং কাদের কথা বলতে চাই ? তোমার ও আমার মা ও বাবা। আজ অবিশ্যি চারজনের মধ্যে মাত্র একজনই বর্তমান—তোমার মা। তাঁরা অন্যায় করেছিলেন কি ভুল করেছিলেন সে তর্ক বা বিচার আমাদেব নয়—

ওসব কথা এখন থাক মিনু।

না নির্মল, আমাকে বলতে দাও এবং শেষ কবতে দাও। বাবাকে আজও আমি শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি এবং যতদিন বেঁচে থাকব মানুষ হিসাবে তাঁর স্মৃতিকে চিরদিন অকুণ্ঠিত প্রণাম জানাব। কাবণ সত্যিকারেব মানুষেব কর্ম বহু ব্যাপৃত, বহু বিস্তৃত। সেই বিস্তৃত কর্ম থেকে বাদ দিয়ে একটি ভগ্নাংশকে নিয়ে কোন একজন মানুষকে বিচাব করতে গেলে বস্তুত তাঁর প্রতি অন্যায়ই করা হবে। তাছাড়া তুমি জান, বাবা আমার কাছে কতখানি ছিলেন। জীবনে তিনি আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন। নিঃসঙ্কোচে চিরদিন তাঁব সঙ্গে আমাব সকল প্রকার আলোচনাই চলত।

আমি জানি।

না, সবটুকু তুমি জান না নির্মল। বছরখানেকও হবে না, মাস আষ্টেক বোধ হয় হবে, একদিন বাবা একখানা চিঠি পান। চিঠিটা পাবার দিন দুই বাদে একদিন রাত্রে আহারাদির পর শুতে যাব, বাবা আমাকে তাঁর শয়নকক্ষে ডেকে পাঠালেন। আমি ঘবে যেতেই বললেন, বসো মিনু, আজ তোমাকে কতকগুলো বিশেষ কথা বলবার জন্যই এ সময়ে ডেকে পাঠিয়েছি।

মিনু বলতে লাগল আবার : চিঠিটা পড়ার পর থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম বাবা যেন কেমন বিষণ্ণ ও সর্বদা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে আছেন। মনের মধ্যে যেন তাঁর প্রচণ্ড একটা অন্তর্বিপ্লব চলেছে। বললাম, কি এমন কথা বাবা ?

বাবা বললেন, বসো মা। আজ রাত্রে তোমাকে সব খুলে বলব বলেই ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি আমার কন্যার চাইতেও অধিক। অনেকদিন ভেবেছি সব কথা তোমাকে খুলে বলব, কিন্তু কেন জানি না একটা সংশয় একটা কুণ্ঠা আমারও কণ্ঠকে রোধ করছে। সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছে, এ কথাটা তোমার কাছে এখনও গোপন রাখা আমার পক্ষে শুধু অন্যায় নয়—পাপ, তোমার প্রতি আমার কর্তব্যের একটা গুরুতর ঘাটতি। কারণ আমার মতে প্রত্যেক সন্তানের যেমন তাদের মা-বাপের প্রতি একটা কর্তব্য আছে, আছে একটা দায়িত্ব, তেমনি প্রত্যেক মা-বাপেরও

তাদের সন্তানের প্রতি আছে একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য। বলতে বলতে বাবা কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়ে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

মিনু বলতে লাগল, বাইরে অন্ধকার রাত্রি। রাতও অনেক হয়েছে, ঘরের মধ্যে সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা টেবিল ল্যাম্পটার ম্রিয়মাণ আলো সমস্ত ঘরটার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। ঘরের মধ্যে চেয়ারের উপরে বসে আমি। বাবা পায়চারি করছেন নিঃশব্দে। আজও স্পষ্ট মনে আছে, বাবার দীর্ঘ মূর্তিটা সেই স্তব্ধ আলোছায়ায় যেন কেমন করুণ ও নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। হঠাৎ বাবা পায়চারি থামিয়ে বলতে শুরু করলেন, আমি জানি মা, তুমি আমাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা কর, ভালবাস। আর এও জানি, সেই অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রের হঠাৎ যখন কোন ঘটনা-বিপর্যয়ে তাঁর ভালর মুখোশটা খুলে যায়, যে তাঁকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে, তখন তার চোখে কি মর্মান্তিক বেদনা ও গ্লানি নিয়েই না দাঁড়াতে হয়! তবু—তবু আজ তোমাকে আমায় সব কথা খুলে বলতেই হবে। সব কিছু শুনবার পর আমার সম্পর্কে যে ধারণাই তোমার হোক না কেন, জানবে সেটা আমি সন্তুষ্ট মনেই গ্রহণ করব।

আমি বললাম, বাবা, আপনি কি মনে করেন আপনার মেয়ে এতই অপদার্থ!

না মা, তা ভাবি না। আর ভাবি না বলেই আজ অকপটে সব কথা তোমার কাছে স্বীকার করব বলে স্থির করেছি। শোন, প্রথম জীবনে ঘটনাচক্রে আমার মনকে বিপ্লবের মত ও পথ তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। অন্তরের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, একাগ্রতা ও পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়েই বিপ্লবীর দলে আমি নাম লিখিয়েছিলাম। বিপ্লবীর আদর্শই ছিল আমার আদর্শ। কিন্তু হঠাৎ সেই আদর্শের মূলে লাগত আঘাত। তোমার মা এসে আমার জীবনপথে দাঁড়ালেন। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে, তোমার মাও সেই বিপ্লবী দলেরই ছিলেন একজন সভ্যা। যদিও আমাদের উভয়ের আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে দিয়েই এবং তিনি যদিও জানতেন না যে একই বিপ্লবী দলে তিনি ও আমি আছি, অবিশ্যি আমি কিন্তু আমাদের বিবাহের কিছুদিন আগে জানতে পারি যে তিনি সেই বিপ্লবী দলে আছেন, তবু বলব আজ তোমার মার বাহ্যিক রূপের চাইতে তাঁর স্বভাবের সহজ ও সরল প্রীতিই একান্তভাবে তাঁর প্রতি আমাকে আকর্ষণ করেছিল। বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, এবারে যে কথাটা বলব আমাদের উভয়ের অর্থাৎ তোমার মা ও আমার জীবনে সেটাই সব চাইতে বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার, যে তথ্যটা আমি আমাদের বিবাহের এবং তোমার জন্মের পরে অকস্মাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম। এই পর্যন্ত বলে বাবা কিছুক্ষণ আবার যেন কি ভাবলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, প্রথমটা না জানলেও শেষের দিকে তোমার মা কিন্তু জানতে পেরেছিলেন যে আমিও তাঁদের দলের একজন, তবে একটা ভুল করেছিলেন—আমাদের বিপ্লবী দলের সর্বাধ্যক্ষ এক নম্বরের সম্পর্কে আমাকে ভুল করেছিলেন এবং সেই

ভুলের বশবর্তী হয়েই পরে আমি জানতে পারি আমার প্রতি তাঁর প্রীতি ও ভালবাসা জন্মায়। বাইরের জগতে আমি সত্যেন নামে পরিচিত থাকলেও, দলের মধ্যে এক নম্বরের মুখোশের অন্তরালে যে আমিই সেই ব্যক্তি এ তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল। আরও একটু খুলে বলি, বস্তুত তিনি এক নম্বর মুখোশধারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যবহারিক জীবনে আমাকে সেই এক নম্বর ভুল করে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অবিশ্যি সত্যি কথাই বলব, এ ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও আমি জানতে পারি নি বহুদিন পর্যন্ত। তুমি জান তোমার মা সুচিত্রা ও নির্মলের মা সুমিত্রা দূর-সম্পর্কীয়া মামাতো পিসতুতো বোন এবং তোমার মা সুমিত্রার বাবার কাছেই ছোটবেলা থেকে মানুষ। সুচিত্রা ও সুমিত্রার পরস্পরের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন ছিল। একে অন্যের ছায়া বললেও অত্যুক্তি হবে না। ওদের বাড়িতে আমি আমি যাতায়াত করতাম। তার কারণ ওদের বাড়িতে আমারই প্রায় সমবয়সী একটি ছেলে থাকত, সে ছিল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং সহপাঠী। জীবনে আর তার দেখা পাব না। তার মত অত বড় প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মননশক্তির কর্মী সত্যিই খুব বিরল। তাকে কেবল যে আমি প্রাণের সঙ্গে ভালই বাসতাম তা নয়, তাকে শ্রদ্ধাও করতাম। তাকে পূজা করতাম। এক কথায় সেই ছিল আমার তখনকার আদর্শ। আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রধান এক নম্বর—পরে যার নাম জেনেছিলাম অরিন্দম, সে ছিল আমার ঐ বন্ধুটির পরম বন্ধু। আমার ঐ বন্ধুটির কথাতেই আমি বিপ্লবী দলের প্রতি আকৃষ্ট হই এবং তারই সুপারিশে ও উদ্যোগে একদিন অরিন্দমের সঙ্গে দেখা করে কপালে রক্ততিলক ধারণ করে দলভুক্ত হই। যাই হোক জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। সে যে কি একটা উন্মাদনা, কি অভূতপূর্ব একটা প্রেরণা—যা আমার সমস্ত কল্পনা ও চিন্তাধারাকে তখন এক প্রবল ঝড়ের দোলায় যেন দুলিয়ে গিয়েছিল। প্রথমটায় সত্যিই আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, সমস্ত দিন-রাত্রি যেন একটা উন্মাদ নেশার মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকতাম।

আমি শুনতে লাগলাম।

বাবা একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, ঠিক এরই কিছুকাল পরে হঠাৎ আমার বিপ্লবী জীবনের মধ্যে এসে ধাক্কা দিল আর একটি ঝড়ের দোলা। তোমার মার সঙ্গে আমার পরিচয় হল সেকথা আগেই বলেছি। বলতে গেলে তোমার মা আমার চাইতে খুব বেশী ছোট নন বয়সে, এবং আমাদেরই এক শ্রেণী নীচে পড়তেন। ক্রমে তোমার মার সঙ্গে আলাপটা ও পরিচয়ের সূত্রটা দৃঢ়বদ্ধ হতে লাগল দিনের পর দিন। ফলে জীবনের একটা দিক যেমন তোমার মার মধুর সাহচর্যে, প্রেমে, ভালবাসায় ও আশায় ভরে উঠতে লাগল, অন্য দিকটায় অর্থাৎ আমার বিপ্লবী জীবনটা তেমনি যেন আমার কাছে ক্রমে ফাঁকা ও নিরস হয়ে আসতে লাগল। একদিকে বিপ্লবী জীবনের চরমতর সঙ্কট, দুর্দশা ও অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে জীবনের সাফল্য-প্রেম-ভালবাসা-সুখ নিশ্চিন্তের নীড়। নিরন্তর এই দুইয়ের টানাপোড়েনে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, হঠাৎ এমন সময় জানতে পারলাম তোমার মাও

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত। নিজের দিক দিয়ে যে লজ্জা ছিল আজ তার সমস্ত ব্যবধানটা যেন মুহূর্তে ভেঙে সমতল হয়ে গেল। অসঙ্কোচে তোমার মার কাছে এগিয়ে গেলাম।

জানালাম আমার দাবি। তোমার মাও আমাকে সানন্দে গ্রহণ করলেন। ঠিক করলাম, অতঃপর আমরা গুপ্ত বিপ্লবী দল ছেড়ে দিয়ে সংসারী হব।

দলপতি অরিন্দমকে সব কথা খুলে বলে আলাদা আলাদা করে আমরা সঙ্ঘ হতে বিদায় চেয়ে নেব স্থির করলাম।

একদিন অরিন্দমকে মিটিংয়ের পর গোপনে আড়ালে ডেকে সব কথা খুলে বললামও। আমার কথা শুনে অরিন্দম কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, একটি কথাও বললে না। শেষে বললে, আজ নয়, দিন পনেরো বাদে তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেব। সমিতির একটা বিশেষ ব্যাপারে আমি এখন ব্যস্ত আছি, তার একটা সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তোমার এ সব কথা ভেবে দেখবার আমার সময় হবে না ভাই।

হায় রে! তখন কি জানি অরিন্দমই আমার জীবনের সব চাইতে বড় শত্রু? আমার জীবনের পথে ধূমকেতু হয়ে সে আত্মপ্রকাশ করবে? আমার সুখের ঘরে সে আগুন জ্বালিয়ে দেবে? সে নিজেই সুচিত্রাকে ভালবাসে?

বাবা আবার কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে নিঃশব্দে পায়চারি করলেন। কত বড় মর্মপীড়ার ঝড় যে তখন তাঁর মনের মধ্যে বইছিল, তাঁর মুখের রেখায় সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দুঃসহ একটা যাতনায় তিনি তখন সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন যেন মনে হচ্ছিল।

বাবা আবার বলতে লাগলেন, এদিকে আমাদের উভয়ের পরামর্শমত সুচিত্রাও অরিন্দমকে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন। তাঁকেও অরিন্দম ঐ একই জবাব দিয়েছিল। কিন্তু পনের দিনও কাটল না, অকস্মাৎ শান্ত নীল আকাশে ঝড়ের মেঘ দেখা দিল চারিদিক কালো করে।

বিহারের এক ছোট পল্লীতে এক জরুরী গুপ্ত অধিবেশনের পরোয়ানা এল দলপতির কাছ থেকে আমাদের সকলের।

সকলে মিলিত হলাম নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে। সে অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল. দলপতির সন্দেহ হয় সমিতির কতকগুলো দলিল সংক্রান্ত ব্যাপারে দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারই বিষয় আলোচিত হচ্ছে, এমন সময় পুলিস এসে বাড়ি ঘেরাও করে। খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় দুই পক্ষে। দলের কয়েকজন মারা পড়ে, বাকী সব গা-ঢাকা দেয়।

নির্মল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মৃণালিনীর কথা শুনছিলেন।

তিনি প্রশ্ন করেন, তারপর?

মৃণালিনী আবার শুরু করে, বাবা বলতে লাগলেন, এবারে তোমাকে মা সেই কথাই বলব যেজন্য আজকের রাত্রে তোমাকে ডেকে এনেছি। দলপতি অরিন্দমের বিশ্বাস ছিল জরুরী গোপনীয় দলিলপত্রগুলো সুমিত্রার স্বামী

সন্তোষই কোথায় সরিয়ে রেখেছিল এবং দলের মধ্যে সে-ই প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও পরে আমি তার সঙ্গে হাত মেলাই। পরে তোমার মা যখন আমার সত্য পরিচয়টা পেলেন অর্থাৎ জানতে পারলেন আমি সত্যেন, এক নম্বর নয়, এক নম্বর অরিন্দম সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, তিনি একদিন সহসা আত্মহত্যা করলেন। তোমার বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। আগে দুখানা চিঠি তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন, একখানা পুলিসকে, যে তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, দ্বিতীয়খানা আমাকে লিখেছিলেন, তুমি আমার কল্পনার স্বামী নও, তাই দ্বিচারিণী হতে পারলাম না। ক্ষমা করো। যাকে ভেবে তোমার গলায় মালা দিয়েছিলাম সে তুমি নও।

মৃণালিনী এই পর্যন্ত বলেছে, বাইরে মৃদু গলাখাঁকারির শব্দ শুনে ওরা দুজনেই, নির্মলা ও মিনু একসঙ্গে চমকে সামনের অন্ধকারে খোলা দরজাটার দিকে তাকাল।

খুট করে একটা মৃদু শব্দ, সেই সঙ্গে ঘরের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করে দপ করে ঘরের বিজলী বাতি জ্বলে উঠল।

॥ তেরো ॥

অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে আচমকা আলোর রশ্মি চোখে লাগায় ওরা প্রথমটায় কিছুই যেন দেখতে পায় না।

নমস্কার মৃণালিনী দেবী! নমস্কার নির্মলবাবু!

ওরা দুজনেই দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে কিরীটী রায়।

কিরীটীবাবু! কথাটা বলেন নির্মলবাবুই।

হ্যাঁ, আমিই। অনেকক্ষণ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে গোপনে মৃণালিনী দেবীর কথা শুনছিলাম। প্রথমেই তাই অসংযত ব্যবহারের জন্য বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি ক্ষমা পাব।

এতক্ষণে মৃণালিনী কথা বললে, বসুন মিঃ রায়।

কিরীটী সামনের সোফাটার ওপরে বসতে বসতে আবার বলে, লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার কথাগুলো না শুনলে, হয়তো ঠিক অমনি করে অত সহজভাবে আপনার মুখে সব কিছু আমার শোনা সম্ভবপর হত না মিস্ ব্যানার্জী। তবু ত্রুটিই হয়েছে আমার দিক থেকে, তাই আবার ক্ষমা চাইছি।

নির্মল এবারে বলেন, একদিক থেকে বোধ হয় ভালই হল মিঃ রায়। আপনি মিনুর সব কথা শুনেছেন, না হলে আমিই হয়তো আজ বা কাল আপনার ওখানে গিয়ে সব বলতাম। অবশ্য জানি না কতটুকু শুনেছেন আপনি, তবে—

প্রায় সবটাই শুনেছি, যতটুকু আমার শুনবার প্রয়োজন ছিল এবং আশা করছি বাকীটাও মৃণালিনী দেবী বলতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না।

না, আর সঙ্কোচ নেই। সবই বলব আপনাকে মিঃ রায়। ততক্ষণে মৃণালিনী

কথা বলে।

মৃণালিনী আবার তার অর্ধসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বলতে শুরু করে, বাবার জবানীতেই বলছি। আসল কাগজপত্র, যেগুলো নিয়ে অরিন্দম আমাকে ও সন্তোষকে সন্দেহ করে প্রথমে, সেগুলো সরিয়েছিল দলের একজন —শঙ্করনারায়ণ ঝাঁ। সে-ই পরে সেগুলো সন্তোষের কাছে রাখতে দেয়।

কিরীটী মৃদুস্বরে বলে, এতক্ষণে শঙ্করনারায়ণের হত্যার ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হল। পাটনা থেকে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম তার মধ্যেও এতদিন কিছুটা অমীমাংসিত ছিল। বলুন, তারপর?

বাবা বলতে লাগলেন, দুর্ভাগ্য, সন্তোষও প্রথমে কাগজগুলোর ব্যাপার কিছুই জানতে পারে নি বা সন্দেহ করে নি। আসল কথাটা অবিশ্যি, কথাটা আমার পরে সন্তোষের কাছেই শোনা, কাগজের বাণ্ডিলটা সন্তোষের কাছে রাখতে দিয়ে নাকি শঙ্করনারায়ণ তাকে বলেছিল, অত্যন্ত জরুরী ডকুমেণ্টস্, সেগুলো যেন ও খুব সাবধানে গোপন কোন জায়গায় রেখে দেয়, কারণ বিশ্বস্ত সূত্রে ও জানতে পেরেছে, শীঘ্রই তাদের দলে একটা ভাঙন ধরবে। যাই হোক, কাগজগুলো অতঃপর সন্তোষ রেখে দেয়। কিন্তু সেদিন সেই কাগজগুলো নিজের কাছে রেখে বেচারী সন্তোষ নিজের অগোচরে যে কত বড় বিপদ ও দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছিল তাও সে বুঝতে পারে নি ঘুণাক্ষরে। যখন জানতে পারলে, তখন অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি পরে জানতে পারি, ঐ শয়তান শঙ্করনারায়ণ কাগজের বাণ্ডিলটা সন্তোষের হাতে দেবার আগেই নাকি একটা কপি করে সরকারের হাতে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোপনে অর্থ-লোভে পৌঁছে দিয়েছিল।

সর্বনাশ! তবে কি—

কিরীটীর কথায় বাধা দিয়ে মৃণালিনী বললেন, হ্যাঁ তাই, সন্তোষকে ফাঁসাবার একটা চক্রান্ত মাত্র আগাগোড়া শঙ্করনারায়ণের সমস্ত ব্যাপারটা। নিজে সাধু সেজে সন্তোষের ঘাড়ে সমস্ত দোষটা চাপিয়ে দেবার ফন্দি। আমার যতদূর ধারণা ঐ শঙ্করনারায়ণই বিহারের সেই অধিবেশনের সংবাদটা বোধ হয় পুলিসের গোচরীভূত করেছিল আগে হতেই। কারণ সে ছাড়া মিটিংয়ের যে পূর্ব পরিকল্পনা হয়েছিল, জানবার আর কারও সাধ্য ছিল না। যেহেতু শঙ্করনারায়ণই ছিল সমিতির সেক্রেটারী—অথচ সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, শঙ্করনারায়ণ যে কোনদিনও ঐভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে এ যেন সকলের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শঙ্করনারায়ণ যে কেবল দুঃসাহসী ও অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিল তাই নয়, তার দেশপ্রীতিরও তুলনা ছিল না বুঝি। দেশকে সে সত্যিকারেরই ভালবাসত। আজ পর্যন্ত ব্যাপারটা তাই আমার কাছে প্রহেলিকার মতই হয়ে আছে। যাহোক আমার ধারণা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, শঙ্করনারায়ণই সন্তোষকে ফাঁসাবার জন্য ঐ হীন চক্রান্ত করেছিল। পরে সন্তোষ যখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারল, তখন

দলিলগুলো হাতছাড়া করবার আর উপায় ছিল না। তার কারণ দলের অর্থাৎ সমিতির সভ্যরা ছাড়াও বাইরের জগতে গণ্যমান্য ও সমাজের প্রতিপত্তি-শালী এমন অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ঐ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যাতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে কারুরই আর দুর্দশার অন্ত থাকত না। একবার ঐ দলিল সরকারের হাতে পৌঁছলেই সকলের সর্বনাশ হত। তাই হয়তো সমস্ত দিক বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত সন্তোষ দলিলগুলো নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। এদিকে দীর্ঘকাল পরে অরিন্দম অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে পূর্বের সন্দেহের বশেই সন্তোষের উপরে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। সন্তোষকে সে গোপনে পত্র দিল একদিন শীঘ্রই সে দেখা করবে জানিয়ে এবং ঐসব দলিলের কথা উল্লেখ করে এও লিখেছিল, ঐ সময় দলিলগুলো সম্পর্কে সে নাকি একটা শেষ মীমাংসা করতে চায়। এই তো গেল সন্তোষের কথা। কিন্তু আমার উপরেও অরিন্দমের যে আক্রোশ থাকতে পারে তা বুঝি নি। একদিন একখানা পত্র পেয়ে বুঝলাম, আমার প্রতিও তার আক্রোশের অন্ত নেই। কারণ আমিও নাকি সন্তোষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করেছিলাম। দেশের প্রতি ও সমিতির প্রতি আমিও সেই কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ঐসময় হঠাৎ সন্তোষের একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিতে সে অনুরোধ জানিয়েছিল আমাকে তার সঙ্গে একবার এলাহাবাদ যাবার জন্য এবং লিখেছিল শঙ্করনারায়ণ নাকি ঐ সময় এলাহাবাদে আছে। সন্তোষ আমাকে অনুরোধ জানায়, এই ব্যাপারের একটা শেষ মীমাংসা করতেই সে আমাকে নিয়ে শঙ্করনারায়ণের সঙ্গে এলাহাবাদে গিয়ে একবার দেখা করতে চায়। বোধ হয় একা একা শঙ্কর-নারায়ণের কাছে এলাহাবাদ যেতে তার সাহস হয় নি। যাই হোক, আমি তার চিঠি পেয়ে জানিয়ে দিই, নির্দিষ্ট সময়েই আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি—এলাহাবাদ আমি যাব তার সঙ্গে। পরে আবার তার চিঠি পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে আমি এলাহাবাদে রওনা হয়ে গেলাম। এদিকে যেদিন ভোররাত্রের ট্রেনে সন্তোষের মধুপুর থেকে এলাহাবাদ রওনা হবার কথা, সেই মধ্যরাত্রেই সে নিহত হল অতর্কিত ভাবে। আমি এলাহাবাদে পৌঁছে নির্দিষ্ট হোটেলে সন্তোষের অপেক্ষায় হাঁ করে বসে আছি। সন্তোষ একা আসতে পারবে না, কারণ আমি জানতাম সে ইদানীং হেমিপ্লিজিয়ার জন্যে একা একা হাঁটা-চলা করতে পারত না। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে তার পক্ষে আসা অসম্ভব। সন্তোষ এল না। রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলাম আমি। পরের দিন সকালের 'লীডার' কাগজে সন্তোষের নিহত হবার সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যাই হোক, ঐদিনই রাত্রের গাড়িতে আমি ফিরে এলাম। এসব কথা তোমাকে আমার বলা প্রয়োজন হত না, যদি না সন্তোষের এমন অতর্কিত রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হত। আর—আর যদি না আমি জানতাম সন্তোষের ছেলে নির্মলকে তুমি ভালবাস। সন্তোষের আর সুমিত্রার জীবন তো ব্যর্থ হয়েছেই, তোমার ও নির্মলের

জীবনও যাতে ব্যর্থ না হয়ে যায় শুধু এইজন্যই আজ রাত্রে এ কথাগুলো তোমাকে আমায় বলতে হল। জানি না—কেন জানি না সন্তোষের অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদটা জানা অবধিই আমার মনে হচ্ছে, আমারও দিন বুঝি শেষ হয়ে এসেছে। হয়তো শীঘ্রই আমারও ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে। চোখ বুজলেই দেখতে পাই একটা আশঙ্কা আমার চারপাশে ধোঁয়ার মত আমাকে যেন বেষ্টন করে ধরেছে।

মৃণালিনীর কথা শেষ হল।

ঘরের মধ্যে কারও মুখে কোন কথা নেই। মৃত্যুর মত একটা হিমশীতল অখণ্ড স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্‌ করছে ঘরের মধ্যে।

কিরীটীই প্রথমে কথা বলে, কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না মৃণালিনী দেবী। এসব কথা আপনি যদি সর্বপ্রথম আপনার পিতার মৃত্যুর রাত্রেই শুনে থাকেন, তা হলে সেরাত্রে মাঠের মধ্যে এ কাহিনীর কিছুটা আমাকে কি করে বলেছিলেন!

কথার জবাব দিলেন মৃণালিনী নয়, নির্মল চৌধুরী। তিনি বললেন, সবটা না হলেও মিনু কিছুটা ওর বাবার মুখে সব কথা শোনবার আগে থাকতেই জানত মিঃ রায়, কারণ মিনুকে আমিই একদিন গোপনে মা'র ডাইরী পড়ে যেটুকু জানতে পারি বলেছিলাম।

তাহলে এবারে বলুন মিঃ চৌধুরী, আপনার বাবার হত্যার সংবাদ পাওয়ার আগেই কেন আপনি হঠাৎ মধুপুরে গিয়েছিলেন?

কিরীটীর প্রশ্নে নির্মল চৌধুরী মাথা নিচু করে থাকেন, কোন জবাবই দেন না।

বলুন, চুপ করে রইলেন কেন?

একটা চিঠি পেয়ে গিয়েছিলাম। ধীর শান্ত কণ্ঠে মৃদুভাবে জবাব দেন নির্মল চৌধুরী।

চিঠি পেয়ে! কার চিঠি?

জানি না। এক অজ্ঞাতনামা অপরিচিত লোকের।

সে চিঠিখানা আছে, না নষ্ট করে ফেলেছেন মিঃ চৌধুরী?

আছে। আমার সঙ্গেই আছে।

সঙ্গেই আছে? দেখতে পারি কি একবার?

হ্যাঁ। নির্মল চৌধুরী জামার বুকপকেট থেকে খামের মধ্যে রাখা একখানা চিঠি বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে ধরেন, এই যে সেই চিঠি!

কিরীটী চিঠিখানা খাম থেকে খুলে আলোর সামনে মেলে ধরল।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ যে ঠিক সেই হাতেরই লেখা—অবিকল হুবহু। একেবারে এক।

সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা।

নির্মলবাবু,

যদি আপনি আপনার জীবনকে একেবারে শেষ না করে ফেলতে চান, তবে নিশ্চয়ই এই পত্র পাওয়া মাত্রই মধুপুরে চলে আসবেন। সাক্ষাতে সব কথা হবে। জানবেন আপনার মধুপুর যাওয়া না-যাওয়ার উপরেই আপনার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ইতি—

আপনার কশ্চিৎ হিতাকাঙ্ক্ষী

চিঠিখানা বার দুই আগাগোড়া পড়ে নির্মল চৌধুরীর হাতে ফেরত দিতে দিতে কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, এ চিঠির কথা আপনি প্রথমে গোপন করেছিলেন কেন এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি, মিঃ চৌধুরী।

নির্মল চৌধুরী বোধ হয় কিরীটীর কথা শুনে শিউরে ওঠেন নিজের অজ্ঞাতেই এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ মুখখানা নিচু করেন।

কিরীটীর তীক্ষ্ন দৃষ্টিকে কিন্তু এড়াতে পারেন না নির্মল চৌধুরী। কিরীটী দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় না করে অন্যমনে কি যেন চিন্তা করতে থাকে। তারপর একসময় আবার নির্মল চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে, তা হলে আপনি মিঃ চৌধুরী মধুপুর স্টেশন ওয়েটিংরুমে ঐ অজ্ঞাত-নামা পত্রপ্রেরকের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন বাড়িতে না গিয়ে, কেমন?

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেন নির্মল চৌধুরী।

দেখা নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে আপনার হয় নি?

না।

হঠাৎ আবার কিরীটী মৃণালিনীর দিকে ফিরে বলে, মিস্ ব্যানার্জী, যদি এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করেন!

নিশ্চয়ই। আসছি আমি—

মৃণালিনী কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ক্রম-অপসৃয়মাণ মৃণালিনীর দেহের দিকে তাকিয়ে এবারে কিরীটী পুনরায় নির্মল চৌধুরীকে বলে, আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, এখনও কি আপনার স্থির ধারণা, এ দুটো চিঠিই অর্থাৎ যেখানা আমি পেয়েছি ও আপনি যেটা পেয়েছেন—আপনার মা'রই হাতের লেখা?

কিরীটী প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নির্মল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নির্মল চৌধুরী কিন্তু কিরীটীর প্রশ্নের কোন জবাব দেন না।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আমার একটা প্রশ্নের সত্য জবাব দেবেন?

নির্মল চৌধুরী নীরবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকান।

সত্যিই যদি আপনার ধারণা হয়েছিল যে, এই চিঠির হাতের লেখাটা আপনার মা'র হাতের লেখার মতই, তাহলে মধুপুরে সেরাত্রে পৌঁছেও আপনার মা'র সঙ্গে দেখা করেন নি কেন? সর্বপ্রথমে ওই দিক থেকেই তো আপনার মীমাংসায় পৌঁছানো উচিত ছিল?

প্রথমে অতটা ভাল করে লক্ষ্য করি নি বলেই হয়তো ও কথাটা আমার মনে হয় নি, পরে আপনার সেরাত্রে, হাতের লেখাটা আমি চিনি কিনা, প্রশ্ন করায় ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে সন্দেহ হয়। আমার নিজের চিঠিটাও তার পর আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

হুঁ। আচ্ছা এ সম্পর্কে আপনার ও আপনার মায়ের মধ্যে কোন কথা হয়েছিল কি ?

না। মাকে আমার সন্দেহের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করি নি।

কেন ?

কারণ চিঠি দুটিই আমার মা'র হাতের লেখা বলে সন্দেহ করলেও এখনও কেন যেন আমার স্থির বিশ্বাস এ হাতের লেখা মা'র না। মা এ চিঠিগুলোর সঙ্গে আদপেই জড়িত নন। কোন সংস্পর্শ নেই তাঁর এই চিঠিগুলোর সঙ্গে।

তাহলে আপনি অন্য কাউকে সন্দেহ করেন কি ?

কিরীটীর এ প্রশ্নে আবার নির্মল চৌধুরী কোন জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে চুপ করে বসে থাকেন।

বুঝেছি। আপনি অন্য কাউকে এই চিঠি দুটো সম্পর্কে সন্দেহ করেন, তাই নয় কি ?

এবারে কিরীটীর সোজাসুজি প্রশ্নে ধীরভাবে নির্মল চৌধুরী মুখ তুলে কিরীটীর চোখের দিকে তাকান। তারপর ধীর অথচ শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ করি—শুধু করিই না, বোধ হয় জানিও এ চিঠি কার লেখা ?

জানেন !

হ্যাঁ, জানি। আগে জানতাম না, কিন্তু এখন দিন দুই হল জানতে পেরেছি। কিন্তু—

কিন্তু ?

আপনার প্রশ্নের আমি জবাব দিতে অক্ষম, মিঃ রায়। আমার নিজের হলে কোন কথাই আজ আর ছিল না, কিন্তু—

নির্মল চৌধুরীর কথা শেষ হল না, ভৃত্যের হাতে চায়ের ট্রের ওপরে ধূমায়িত দুই কাপ চা নিয়ে মৃণালিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল ঐসময়। মৃণালিনীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে নির্মল চৌধুরী অর্ধপথেই তাঁর বক্তব্য হঠাৎ থামিয়ে চুপ করে গেলেন।

কিরীটীও আর নির্মল চৌধুরীকে তাঁর অর্ধসমাপ্ত বক্তব্যটুকু শেষ করবার জন্য কোনরূপ অনুরোধ বা উপরোধ না করে মুহূর্তে পূর্ব পরিস্থিতি হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে একেবারে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হল এবং বললে, মৃণালিনী দেবী, সুব্রতর মুখে শুনলাম, আপনার পিসতুত ভাই অনিলবাবু কলকাতায় এসেছেন। তাঁকে দেখছি না, তিনি কোথায় ?

অনিলদা সকালে বর্ধমানে গেছে—কি একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

ও।

উষ্ণ চায়ের কাপে আরাম করে চুমুক দিতে দিতে আবার একসময় কিরীটী নির্মল চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, মানুষের জীবনে অতর্কিত অনেক প্রকার বিপদই আসে মিঃ চৌধুরী। বিপদের সময় নিজেকে দৃঢ় ও আত্মসচেতন না রাখতে পারলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এইটুকুই শুধু আপনাকে মনে রাখতে অনুরোধ করব আজ।

নিঃশেষিত চায়ের কাপটা সামনের ত্রিপয়ের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে নির্মল চৌধুরী বললেন, একটু পূর্বে আমি যে কথাটা বলেছিলাম, হয়তো সবটাই তার আপনি বিশ্বাস করেন নি মিঃ রায়। কিন্তু সত্যিই আপনাকে বলছি একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও আপনার প্রশ্নের জবাবে আমাকে একান্ত বাধ্য হয়েই চুপ করে যেতে হল। এমন একজন লোকের সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত যে, যার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে এতটুকু কটাক্ষপাতও আমার কাছে চরমতম দুঃখের ব্যাপার।

আপনাকে আর কষ্ট করে নিজের অক্ষমতার দুঃখ জানাতে হবে না মিঃ চৌধুরী। যে সন্দেহটা আপনার কথা শুনেই সর্বাগ্রে মনে আমার উদয় হয়েছিল এখন বুঝতে পারছি সেটাই সত্যি। আচ্ছা আজকের মত তা হলে আমি বিদায় নেব, মিঃ চৌধুরী। তারপর মৃণালিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, মৃণালিনী দেবী, আপনার আজকের যে শোক ও তার দুঃখ—মুখের ভাষায় তার সান্ত্বনা দিতে না পারলেও একটা কথা যাবার আগে বলে যাচ্ছি, আপনার পিতার নৃশংস হত্যার ব্যাপারে আমি—আপনি এর জন্য কোনরূপ অনুরোধ না জানালেও সাধ্যমত আমরা চেষ্টা করব যাতে হত্যাকারীকে অন্তত বিচারকের হাতে তুলে দেওয়া যায়। আচ্ছা আজকের মত তা হলে চলি। নমস্কার। কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল নিঃশব্দে।

ঘরের মধ্যে নির্মল ও মৃণালিনী কিছুক্ষণ অতঃপর নীরবে যে যার আসনে বসে রইল চুপচাপ।

হঠাৎ একসময় হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে নির্মল বলে ওঠেন, রাত হল, আজ তা হলে আসি মিনু।

এখুনি যাবে?

হ্যাঁ, মা একলা আছেন। জান তো, বাবার অপঘাতে মৃত্যুর পর থেকে মা কেমন মুষড়ে পড়েছেন। একা একা থাকলেই তিনি যেন কেমন হয়ে যান। মা'র জন্য ইদানীং কিছুদিন হতে বিশেষ চিন্তায় আছি মিনু। মা'র এরকম গম্ভীর শান্ত ভাব পূর্বে কখনও দেখি নি। বরাবর দেখে এসেছি কি অসাধারণ মনোবল তাঁর—কিন্তু ঐ দুর্ঘটনার পর থেকেই যেন তাঁকে দেখলে মনে হয়, হঠাৎ তিনি অনেকটা বয়সে যেন এগিয়ে গিয়েছেন।

খুব স্বাভাবিক।

অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির মানুষ, বুঝবার তো উপায় নেই। তাছাড়া বাবার প্রতি মা'র যে ঠিক কি মনোভাব ছিল তাও কোনদিন বুঝি নি। তবে আগে

যেমন মনে হত, মা বাবার প্রতি বেশ কিছুটা উদাসীন, এখন যেন তার ঠিক উল্টোটাই মনে হচ্ছে। বাবার অতীত জীবনের ব্যাপারে মা'র মনে একটা দুঃসহ কষ্ট ও বেদনা ছিল, যার অদৃশ্য বেদনায় সর্বক্ষণ মা, জ্ঞান হওয়া অবধি আমার মনে হয়েছে, নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছেন। এখন তোমার বাবার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এসব যখন তিনি জানতে পারবেন, তখন যে অনুশোচনা তাঁর মনে আসবে, সে আঘাত তিনি সামলাবেন কি করে ?

মাকে নাই বা এসব কথা বললে নির্মল।

না, তা কি হয় ? মাকে সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। তা যদি না বলি, তা হলে বাবার জীবিতাবস্থায় যে অন্যায় মা ও আমি তাঁর প্রতি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো হবে না। সত্যি আমাদের মানুষের বিচারশক্তি, পর্যবেক্ষণ-শক্তি কত দুর্বল ! দৃষ্টিকোণ আমাদের কত ক্ষুদ্র, কত সঙ্কীর্ণ ! এই সঙ্গে এ কথাও মনে হচ্ছে কতখানি উদার ও স্নেহশীল ছিল বাবার প্রকৃতি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এত বড় মিথ্যা অভিযোগের জন্য এতটুকু অস্থিরতাও তাঁর ছিল না। এখন ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, সব মিথ্যা ও চক্রান্ত জেনেও কেন তিনি চুপ করে ছিলেন এতদিন ? কেন তিনি অন্তত মাকে সব কথা খুলে বলেন নি ?

হয়তো ভাবছিলেন, বললেও তোমরা সহজে বিশ্বাস করবে না, তাই সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক, তবু ভাবছি, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে কত বড় মিথ্যাকেই সত্যি বলে মনে মনে তিনি জেনে গিয়েছেন !

আজ এখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি বল নির্মল ! তারপর একটু থেমে আবার বলে, একটা কথা আমার রাখবে নির্মল ?

বল ?

মাকে সব কথা খুলে বলবার আগে কিরীটীবাবুর সঙ্গে অন্তত পরামর্শ একবার করে—

হ্যাঁ, কালই সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

॥ চৌদ্দ ॥

মানুষ কত অসহায়—কত নিরুপায় ! অদৃশ্য এক মহাশক্তি যে তাকে কি ভাবে চালিত করে, সামান্য এক ক্রীড়নকের মত মানুষের জীবনের প্রতিদিনকার ইতিহাসের খুঁটিনাটিই বুঝি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কয়েক ঘণ্টা আগেরই কথাগুলো ঘরের মধ্যে একাকী বসে বসে নির্মল ভাবছিলেন।

এর পর মাকে সর্বাগ্রে সব কথা খুলে বলা ছাড়া আর সত্যি কোন পথ নেই। আঘাত যত বড় ও যত আকস্মিকই হোক না কেন, এ সত্যকে গোপন করবার তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। বলতে তাঁকে সব হবেই।

ঘরের মধ্যে একাকী সোফাটার ওপর বসে মৃণালিনী ভাবছিল। চার-চারটে জীবন এবং সঙ্গে তার ও নির্মলের জীবনও সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি ভাবে জটিল হয়ে উঠেছে !

কিরীটীও তার বাড়িতে তার ঘরে বসে সেরাত্রে ভাবছিল। খুনী—তার যা প্ল্যান ছিল, নিখুঁত ভাবেই তা শেষ করেছে। কিন্তু তাকে তো ছাড়া যেতে পারে না।

মানুষের সমাজজীবনে যদি প্রতিহিংসা-বৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য মানুষকে এত নীচে নেমে আসিতে হয় তা হলে সমাজজীবনের মধ্যে যে ক্লেদ জমা হয়ে উঠবে, যে পাপ ও ব্যাভিচার অবাধে চলবে—সত্য ও কল্যাণের সমস্ত পথই তা চিরতরে রুদ্ধ করে দেবে। সমাজজীবনের শান্তি যাবে, শৃঙ্খলা যাবে। দুর্নীতির চোরাপথে জীবনযাত্রা হয়ে উঠবে পঙ্কিল ভয়ঙ্কর। পাপকে সমাজ থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা যাবে না, কিন্তু পাপীকে তার পাপ থেকে বিচ্ছেদ করতেই হবে।

সেই রাত্রেই। রাত্রি বারোটা হবে—একটু আগে নির্মল ফিরে এসেছেন। পনের মিনিটও হয় নি তাঁর শোবার ঘরের আলোটা নিবেছে। এই মুহূর্তটির জন্যই সুমিত্রা বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন।

আজই সন্ধ্যার ক্ষণপূর্বে একখানা চিঠি তিনি পেয়েছেন অরিন্দমের কাছ থেকে।

সরকার মশাইয়ের হাতে দিয়ে গেছে চিঠিটা কে একজন সাধারণ পত্রবাহক।

সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা।

সুমিত্রা দেবী,

ভগবানের নামে—তোমার মৃত স্বামীর নামে তোমাকে আজ রাত্রি দেড়টায় ঠিক চাঁপাতলার পাঁচ নম্বর বাড়িতে, যে বাড়িতে ২৬।২৭ বছর আগে আমাদের সমিতির অফিস ছিল, বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আহ্বান জানাচ্ছি। যদি না আস, জীবনভোর অনুতাপ করতে হবে।

এক নম্বর—অরিন্দম।

সরকার মশাই চিঠিখানা মিসেস্ চৌধুরীর হাতে দিয়ে বললেন, একজন চাকর গোছের লোক এসে এই চিঠিটা দিয়ে গেল মা। বলে গেল, চিঠিঠা খুব জরুরী, এখুনি যেন আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সবিস্ময়ে সুমিত্রা সরকার মশাইয়ের হাত হতে চিঠি নিয়ে বলেছিলেন, আমার চিঠি !

তাই তো বললে। চিঠির উপরে ইংরাজীতে টাইপ করে আপনার নামও লেখা।

সত্যিই খামের উপরে টাইপ করে লেখা ছিল সুমিত্রারই নামটা।

চিঠিটা খাম ছিঁড়ে খুলে পড়তেই সুমিত্রা চমকে উঠেছিলেন।

সরকার মশাই প্রশ্ন করেছিলেন, কার চিঠি মা ?

সুমিত্রা জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ—আমারই। আপনি যান।

কিন্তু চিঠিখানা পড়ে সুমিত্রা সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথমটায় তিনি কি করবেন স্থির করে উঠতে পারেন নি।

হাজার চিন্তা মনের মধ্যে এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। অরিন্দম—তাঁর জীবনের আকাশে ধূমকেতু ঐ অরিন্দম। তাঁর সুখের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অরিন্দম—অরিন্দম !

কি করেছিলেন তার তিনি ? কোন ক্ষতিই তো করেন নি !

প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে সুমিত্রা নিজের মনের সঙ্গে নানা যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করেছেন—করেছেন নিজের মনের সঙ্গে সংগ্রাম। কি করবেন তিনি ? যাবেন, না যাবেন না ? শেষ পর্যন্ত স্থির করেছেন, হ্যাঁ, যাবেন।

যাবার আগে কিরীটীবাবুকে একখানা চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিয়ে যাবেন। যদি আর তিনি না ফিরতে পারেন ? কারণ নির্মলের বিপদ এখনও কাটে নি। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে যদি তার বিপদ কাটাবার কোন পথ থাকে! মা হয়ে সে পথ কি তিনি বন্ধ করতে পারেন ? না—না।

রাত বাড়ছে। গভীর কালো অন্ধকার যেন সমস্ত পৃথিবীকে একেবারে চারিদিক থেকে ঢেকে ফেলেছে ; আকাশে মেঘও করেছে। দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যায়। বাইরের বাগানটা—অন্ধকারে গাছপালাগুলোর অস্পষ্ট ছায়া চারিদিকে যেন স্তূপ বেঁধে আছে। অসহ্য গুমোট। কোথায়ও বাতাসের লেশমাত্রও নেই। কি ভয়ংকর স্তব্ধতা! কেউ কি জেগে নেই ? সব—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ?

সুমিত্রা চিঠিটা লিখে ভৃত্যকে দিয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই কিরীটীর ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, কিরীটীবাবুকে যদি না পাওয়া যায়, এমন লোকের হাতে চিঠিটা যেন দিয়ে আসে, যাতে করে কিরীটীবাবু বাড়িতে ফেরামাত্রই চিঠিটা হাতে পান।

কিরীটী চলে যাবার প্রায় আরও ঘণ্টাখানেক পরে নির্মল চৌধুরীও বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। মৃণালিনী তখনও সোফাটার উপরে চুপচাপ বসে। বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। কে আসছে ?

মিনু! বাইরে অনিলবাবুর গলার স্বর শোনা গেল।

কে, অনিলদা ? এস ভেতরে এস। মৃণালিনী আহ্বান জানায়।

মৃণালিনীর ডাকে অনিল এসে কক্ষে প্রবেশ করে, এখনও শুতে যাও নি ? বাড়িতে ফিরে তোমার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে—

না, শুই নি। ঘুম আসবে না এখন বিছানায় শুলেও, তাই বসে আছি।

অনিল মৃণালিনীর পাশেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কি যেন বলতে চায়, কিন্তু তার আগেই মৃণালিনী বলে ওঠে, তোমার না বর্ধমানে যাওয়ার কথা

ছিল! যাও নি নাকি?

না। বর্ধমানে যাওয়া হল না। বিশেষ একটা কাজে—। অনিলবাবুর কথাটা শেষ হল না, নিঃশব্দে করালীচরণ এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কি রে করালী? মিনু প্রশ্ন করে।

একটা চিঠি—

চিঠি? কার?

আপনার। একজন এইমাত্র দিয়ে গেল।

দেখি!

চিঠিটা পড়ে মৃণালিনীর মনটা শক্ত হয়ে ওঠে।

অনিল শুধায়, কার চিঠি?

আমার এক বন্ধুর।

এত রাত্রে বন্ধুর চিঠি?

কোন কথা না বলে মৃণালিনী হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। করালী আগেই চলে গিয়েছিল।

অনিল প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ মিনু? শুতে?

না, মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, স্নান করব একবার।

এত রাত্রে স্নান করবে?

হ্যাঁ, শুধু মাথাই নয়—সমস্ত শরীর দিয়ে আগুন বের হচ্ছে।

মৃণালিনী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রাত্রি পৌনে বারোটা হবে।

বাইরে নিঃসঙ্গ রাত যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। গাড়ি ঘোড়ার শব্দ একেবারে থেমে গিয়েছে। স্নান-সমাপনান্তে ভিজে রুক্ষ চুলের রাশ পিঠের উপরে এলিয়ে দিয়ে শয়নকক্ষের সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা খুলে হঠাৎ মৃণালিনী চমকে ওঠে। শয়নকক্ষ তার অন্ধকার! অথচ স্নান করতে যাওয়ার পূর্বেও সে ঘরের আলোটা জেবলে রেখে গিয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে ভাববার বা বুঝবারও সময় পায় না ও। অতর্কিতে পাশ থেকে কে যেন ওর মুখে কাপড় দিয়ে ওকে বন্দী করে ফেলে।

প্রথমটায় ঘটনার দ্রুত আকস্মিকতায় মৃণালিনী হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মৃণালিনীর, মুহূর্তে নিজের অসহায় সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা মনে করে অতি সহজেই অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিজেকে সে সঁপে দেয়।

ঠিক এমনি সময় দপ্ করে ঘরের অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎ-বাতি আবার জ্বলে ওঠে ও সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, একটু ভুল হয়ে গিয়েছে স্যার আপনার ক্যালকুলেশনে! এ ব্যাপারটা আগে হতে অনুমান করেই আমি এত রাত্রে এখানে এসেছি—আগেই এসেছিলাম ও করালীর হাত দিয়ে চিঠি

দিয়ে মৃণালিনী দেবীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

চকিতে মৃণালিনীও তার আততায়ীর দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু আততায়ীকে চেনবার বা জানবার উপায় নেই। সর্বাঙ্গ তার কালো একটা আলখাল্লায় ঢাকা, মুখেও কালো মুখোশ, কেবল মুখোশের ছিদ্রপথে দুটি ক্রূর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির ভয়াবহ আভাস পাওয়া যায়।

আততায়ীর দুই হাত কিরীটী ততক্ষণে সবলে পিছনদিকে মুড়ে আঁকড়ে ধরেছে দেহের সমগ্র শক্তি দিয়ে।

সুব্রত, শ্রীমানকে বেঁধে ফেল চট্‌পট্‌!

ঘরের মধ্যে সুব্রতও ছিল, চট্‌পট্‌ সে কিরীটীর নির্দেশমত আততায়ীকে একটা সিল্ক-কর্ড দিয়ে শক্ত ও মজবুত করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে।

মহাশয় ব্যক্তি—দে সুব্রত ঐ সোফাটার ওপরেই ওঁকে বসিয়ে দে!

সুব্রত টেনে এনে বন্ধাবস্থাতেই আততায়ীকে সোফাটার উপরে বসিয়ে দেয়।

মৃণালিনী যেন বিস্ময়ে একেবারে থ বনে গেছে। মুখে একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত নেই। হতবাক—বিমূঢ়!

মহাশয় ব্যক্তিটিকে চিনতে পারছেন না, মৃণালিনী দেবী! উনি যে আপনার—। কিরীটীর কথাটা শেষ হল না—পাশের কক্ষে অকস্মাৎ ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোন বেজে ওঠে।

কে, দেখ তো সুব্রত!

সুব্রত পাশের কক্ষে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো! কে? নির্মলবাবু! য়্যাঁ—মা নেই!

সব কথাই কিরীটীর কানে যায় পাশের কক্ষের খোলা দরজাপথে। কিরীটী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা সুব্রতর হাত হতে একপ্রকার ছিনিয়ে নেয়, কে, নির্মলবাবু? কি ব্যাপার! য়্যাঁ, মিসেস্‌ চৌধুরী নেই? একটা চিঠি - হ্যাঁ, আমি জানি। এখুনি যাচ্ছিলাম সেখানে। আসছি।

ফোনটা নামিয়ে রেখে কিরীটী সুব্রতকে বলে, আপাততঃ আমাদের মাননীয় অতিথি এই ঘরেই বন্ধাবস্থায় থাকুক—বাইরে চাক্‌লাদার সাহেবের লোক আছে, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। তার জিম্মাতেই আপাততঃ একে এখানে রেখে এখুনি একবার আমাদের চাঁপাতলায় যেতে হবে। মৃণালিনী দেবী, আপনিও চলুন।

একটু পরেই একজন তরুণ পুলিস অফিসারকে সুব্রত ঘরে ডেকে নিয়ে এল। তাঁর জিম্মায় হাত-পা-বাঁধা অবস্থাতেই ঘরের মধ্যে আততায়ীকে রেখে কিরীটী, সুব্রত ও মৃণালিনী তখুনি কিরীটীর গাড়িতে বের হয়ে পড়ে।

নির্দিষ্ট বাড়িতে এসেছেন আজ আবার বহুকাল পরে সুমিত্রা।

আজ তাঁর অঙ্গে পরিচিত নারী-বেশ আর নেই। চব্বিশ বৎসর আগেকার সেই বিপ্লবীর বেশ। মুখে ক্রমিক নম্বর দেওয়া মুখোশ। বহুকালের দোতলা পুরাতন বাড়িটা।

অন্ধকারে যেন মনে হয় নিঃশব্দ একটা কবরখানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান

সুমিত্রা দৃঢ় পদবিক্ষেপে, সঙ্কোচের কোন বালাই নেই। দোতলায় শেষ সিঁড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল সামনের খোলা দরজাপথে কক্ষ হতে আলোর খানিকটা রশ্মি বাইরে এসে পড়েছে। কক্ষ হতে ভারী গলায় প্রশ্ন আসে, কে ?

এ কণ্ঠস্বর সুমিত্রা চেনেন, ভুল হবার নয়. দৃঢ় পদক্ষেপে সুমিত্রা সোজা কক্ষমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেন, আমি !

ঘরের মধ্যে ছোট একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসেছিল একজন লোক। তারও সর্বাঙ্গে চব্বিশ বছর আগেকার বিপ্লবীর বেশ, মুখে মুখোশ, তাতে ক্রমিক নম্বর এক।

অরিন্দম, আমি এসেছি !

এস, সুমিত্রা। আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার পথ চেয়েই বসেছিলাম।

কিন্তু আর অপেক্ষা করতে হবে না অরিন্দম, অপেক্ষার আজই তোমার শেষ !

সুমিত্রা !

শোন অরিন্দম, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তুমি আমার পিছনে মূর্তিমান শনির মত আমাকে অনুসরণ করে ফিরেছ। তোমার নিঃশ্বাসে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেছে। নিশিদিন তোমার দুঃস্বপ্নে আমি আঁতকে উঠেছি। আজ সেই ঋণশোধের পালা।

শোন সুমিত্রা, অধীর হয়ো না। তোমার দীর্ঘদিনের এ ভুল ভেঙে দিতেই তোমাকে আজ আমি এখানে ডেকেছি। আগে আমার সব কথা শোন, তারপর বিচার করো।

বিচার ! তোমার বিচার করবেন যিনি তিনি ভগবান। আমি শুধু তোমার উন্মাদ স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটাতে এসেছি আজ।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সুমিত্রা ক্ষিপ্রগতিতে কোমর থেকে লোডেড্ রিভলভারটা টেনে বের করলেন।

সুমিত্রা ! শোন—শোন ! তুমি কি ক্ষেপে গেলে ?

হাঃ হাঃ করে পাগলের মত সুমিত্রা হেসে উঠে বলেন, ক্ষেপে ! না, এখনও যাই নি। অন্তত তোমার শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ পাওয়া গেল ঐসময়।

অরিন্দম চমকে ওঠে, ও কি !

কিছু না। বোধ হয় কিরীটীবাবু দলবল নিয়ে এসে পড়লেন, এখানে আসার আগেই তাঁর কাছে চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে এসেছিলাম।

বিশ্বাসঘাতক ! Traitor ! চিৎকার করে ওঠে অরিন্দম। বিদ্যুৎগতিতে কোমর থেকে পিস্তল টেনে বের করে।

সঙ্গে-সঙ্গে সুমিত্রার হাতের পিস্তল গর্জে ওঠে।

একটা অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে অরিন্দম। তার হাত থেকে পিস্তলটা খসে মাটিতে পড়ে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুমিত্রা তার বুকের ওপরে

পিস্তলটা দ্বিতীয়বার বসিয়ে ট্রিগার টেপেন। আবার একটা দুম্ করে শব্দ—সেই সঙ্গে সুমিত্রার রক্তাপ্লুত দেহটা মাটিতে এলিয়ে পড়ে।

নিজের যন্ত্রণা ভুলেও অরিন্দম চিৎকার করে ওঠে, সুমিত্রা! সুমিত্রা!

কিরীটী, সুব্রত, মৃণালিনী তিনজনে এসে কক্ষে প্রবেশ করে ঐ মুহূর্তে।

অরিন্দম বলে, এসেছেন মিঃ রায়! আজ না এলেও—অবিশ্যি আজ বা কাল হোক, আমিই আপনার কাছে যেতাম, কিন্তু সুমিত্রা—সুমিত্রা আমাকে ভুল বুঝে গেল। তাকে বোঝাবার সময়টুকুও আমাকে সে দিল না।

শোকের বেদনার কালো ছায়া নেমে এসেছে। নির্মল চৌধুরী পাষাণের মত স্থির হয়ে বসে। সামনে তাঁর মা'র রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ।

মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। এক নম্বরের মুখোশ খুলতে অরিন্দম ওরফে সুধাকান্তর পরিচয় পেয়ে সকলেই যেন স্তম্ভিত, অভিভূত।

কিরীটী একসময়ে বলে, কিন্তু আর এখানে কালক্ষেপ করা নয়, এবারে আমাদের আসল অর্থাৎ সন্তোষবাবু ও মিঃ ব্যানার্জীর হত্যাকারীর কাছে যেতে হবে। মৃণালিনী দেবীর শয়নকক্ষে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। যা বলবার সব সেখানে গিয়েই বলব চল। কিন্তু তার আগে সুমিত্রা দেবীর মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি আমাদের গাড়িতে করে মাকে বাসায় নিয়ে যাই কিরীটীবাবু। মা আমার অনেক দুঃখ পেয়েছেন। একটু আগেও যদি মা'র চিঠিটার প্রতি আমার নজর পড়ত! হঠাৎ শুতে যাবার পর পিপাসা পাওয়ায় উঠে আলো জেবলে জল খেতে গিয়ে টেবিলের ওপরে চিঠিটা দেখতে পাই। চিঠিটা পড়ে মা'র ঘরে ছুটে গেলাম, কিন্তু তখন ঘর খালি। বলতে বলতে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যায় বুঝি নির্মলের গলার স্বর।

অনিবার্যকে তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না নির্মলবাবু। আজকের ঘটনার পর বেঁচে থাকাটা আপনার মা'র পক্ষে আরও মর্মান্তিক হত, তাই হয়তো তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁকে দিয়ে এইভাবে সব কিছুর মীমাংসা করে দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছিলেন, এক দিক দিয়ে হয়তো এ ভালই হল। যাক্ সেই ভালো—মাকে নিয়ে আপনি বাড়িতেই চলে যান।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সকলে এসে আবার মৃণালিনীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। কিরীটী, সুব্রত ও অরিন্দম।

আততায়ী তখনও ঠিক তেমনিভাবে বন্ধাবস্থায় সোফাটার উপর বসে তরুণ সেই পুলিস অফিসারটির প্রহরায়।

বসুন আপনারা সকলে। আমাদের মাননীয় সম্মানিত অতিথির রহস্যাবগুণ্ঠন উন্মোচনের আগে, বর্তমান রহস্যের যবনিকা উত্তোলন করে সব কথা আগে আপনাদের বুঝিয়ে বলতে চাই।

অরিন্দমবাবু, এবারে আমি যে কাহিনী বিবৃত করব—কোন ভুল করলে কিন্তু আপনি শুধরিয়ে দেবেন, বলে কিরীটী শুরু করে, অরিন্দম বা সুধাকান্ত, সত্যেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ চৌধুরী এঁরা তিনজনেই ছিলেন সমিতির অর্থের ট্রাস্টি। এঁদের জিম্মাতেই সমিতির সংগৃহীত অর্থ প্রায় লক্ষাধিক টাকা কোন একটি গোপন স্থানে সুরক্ষিত ছিল। শঙ্করনারায়ণের বিশ্বাসঘাতকতায় যখন আচমকা দলে ভাঙন ধরল, সমস্ত পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দলের কতকগুলো বিশেষ জরুরী ও একান্ত প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় দলিলপত্র শঙ্করনারায়ণ ছল করে সন্তোষ চৌধুরীর হাতে গিয়ে তুলে দেয়। সন্তোষ চৌধুরী জানতে পারেন নি ঘূণাক্ষরেও যে বাণ্ডিলটার মধ্যে আসলে কি আছে। কিন্তু সে তো গেল রহস্যের একটা দিক, অন্য একটা দিক যেটা মিসেস্ চৌধুরীর আজকের চিঠি পাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে অন্ধকারাবৃত ছিল, যে রহসের মীমাংসা না করতে পারার জন্য আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আসল রহস্যটির কোন কিনারাই করতে পারছিলাম না—এবারে সেই রহস্যেই আসব। সে রহস্যের সন্ধান পেয়েছি মিসেস্ চৌধুরীর চিঠিতে। বলতে বলতে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে কিরীটী। এবারে আপনাদের আজ রাত্রে পাওয়া মিসেস্ চৌধুরীর চিঠিটা পড়ে শোনাই—

কিরীটীবাবু,

সম্ভবত এই চিঠি যখন পাবেন এ দুনিয়ায় তখন আমার সমস্ত সম্পর্কের শেষ এবং জীবনে যাঁর প্রতি সব চাইতে বড় অবিচার করেছি, যাঁর কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই, আজ তাঁরই কাছে তাঁরই পায়ের তলায় গিয়ে ক্ষমাভিক্ষার জন্য দাঁড়াব। কারণ আমি জানি আজও তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। যাক্ যা বলছিলাম, চাঁপাতলায় যাব আমাদের সমিতির পুরাতন বাড়িতে, অরিন্দম আমাকে ডেকেছে। যাব তার ওখানে, কারণ শেষ বিদায়ের পূর্বে অরিন্দমের সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করে যদি না যাই তবে আমার বিবেকের কাছে যে আমি শেষ পর্যন্ত অপরাধীই থেকে যাব। অরিন্দম আমার জীবনের কুগ্রহ। শুধু আমার জীবনেই বা বলি কেন, আমার একমাত্র পুত্র নির্মলের জীবনে কুগ্রহ, তাই যাবার আগে সেই কুগ্রহের শেষ করে যেতেই হবে আমাকে। হ্যাঁ, যেজন্য এ চিঠি লিখছি—সেদিন আপনি যখন আমাকে বলেছিলেন, সব কথা আপনার নিকট আমি অকপটে খুলে বলি নি, আমি নীরব ছিলাম। আজ আর কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা নেই—আজ বলব। মাসকয়েক আগে একদিন আমার স্বামী আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, ওঁদের সমিতির লক্ষাধিক কাঁচা মুদ্রা বাংলাদেশের একটা গণ্ডগ্রামে ঐকটা পড়ো বাড়ির উঠানে মাটির তলায় পোঁতা আছে। যার নিশানা ছিল—আমার স্বামীর কাছে সমিতির যে গোপন দলিলপত্র ছিল তারই মধ্যে লেখা। আমাদের দলের যতীন চট্টোপাধ্যায় ছিল পাটনায়। আমার স্বামীর বিশ্বাস যতীন আর শঙ্করনারায়ণ দুজনে পরামর্শ করে সমিতির ঐ অর্থটা পাওয়ার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

তাদের পরিকল্পনা ছিল সমিতি ভেঙে দিয়ে ঐ অর্থটা দুজনে ভাগবাটোয়ারা করে নেবে। যতীন চাটুয্যে আজও বেঁচে আছে কিন্তু শঙ্করনারায়ণ মৃত। সেরাত্রে যারা আমার স্বামীকে হত্যা করতে এসেছিল মুখে মুখোশ এঁটে, যারা আমাকে বেঁধে রেখে আমার চোখের সামনে দিয়ে একঅঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামীকে আমার চোখের সামনে দিয়ে অতীব নিষ্ঠুরের মত হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনকে ছাড়া বাকী দুজন—আমার মনে হয়, তাদের চিনতে পেরেছিলাম, মুখে মুখোশ থাকলেও। একজন এক নম্বর অরিন্দম, অন্যজন শঙ্করনারায়ণ। তৃতীয় ব্যক্তিকে না চিনতে পারলেও আমার সন্দেহ হয় যতীন চাটুয্যে বলে, কিন্তু যতীন চাটুয্যেও শুনেছিলাম পক্ষাঘাতে পঙ্গু। ব্যাপারটা তাই আজও আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গিয়েছে। তবু শেষ বিদায়ের আগে শেষ কর্তব্য মনে করে সব কথাই অকপটে আপনার কাছে জানিয়ে গেলাম। এই সঙ্গে আমার শেষ ভিক্ষাটুকুও জানিয়ে যাই, নির্মলকে আমার দেখবেন। আর —আর আমি জানি মিনুকে সে ভালবাসে, পারেন তো তাদের মিলনের গ্রন্থিটুকু আপনি বেঁধে দেবেন। বিদায়—নমস্কার। ইতি—

চিরশুভাকাঙ্ক্ষিণী, হতভাগিনী—

সুমিত্রা চৌধুরী

কিরীটী নাতিদীর্ঘ চিঠিখানা পড়ে শেষ করবার পরও, অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক হতভাগিনী নারীর শেষ বিদায়ের দীর্ঘশ্বাস হাহাকার করে ফিরতে লাগল।

সহসা একসময় আবার কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুমিত্রা দেবী তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপ বা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন, কিন্তু আসল রহস্যের যবনিকা উত্তোলন এখনও হয় নি। তোমরা হয়তো এখনও বুঝতে পারছ না, বন্দী অবস্থায় অতি শিষ্ট ও শান্তভাবে মুখোশের অন্তরালে যে রক্তলোলুপ শয়তানটি বসে আছে, তিন-তিনটি নৃশংস হত্যা করেও যার রক্তপিপাসা মেটে নি—ওর আসল ও অকৃত্রিম পরিচয়টা কি? কিরীটীর কথায় সকলে একসঙ্গে অদূরে উপবিষ্ট মুখোশধারী বন্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করে।

কিরীটী আবার শুরু করে, কিন্তু ওর পরিচয়টা দেবার পূর্বে অতীত কাহিনী কিছু না বলে নিলে সবটা পরিষ্কার হবে না তোমাদের কাছে। বলতে লাগল কিরীটী, সুমিত্রা দেবীর চিঠিতে বর্ণিত যতীন চাটুয্যে ছিল অরিন্দমদেরই গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন। পাটনায় সে থাকত, খোঁজ নিয়ে জেনেছি যতীন চাটুয্যে এখনও বেঁচে আছে এবং লোকে তার পক্ষাঘাত রোগ হয়েছে জানলেও আসলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ। অসুখটা তার একটা ভান মাত্র। মধ্যবিত্ত এক ব্রাহ্মণবংশে যতীনের জন্ম। প্রখর বুদ্ধি ও শ্রমসাহিষ্ণুতা তার ছিল এবং দেখতে কন্দর্পের মত রূপবান। বাঙালীর ঘরে সাধারণত ওরকম প্রখর রূপ বড় একটা চোখে পড়ে না। লেখাপড়াতেও সে ছিল খুবই ভাল। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র।

সত্যেন ব্যানার্জীর পিতা পরমেশবাবু যতীন চাটুয্যের বাইরের রূপটা দেখেই ভুলেছিলেন এবং একমাত্র মেয়ের বিবাহ দিয়ে যতীনকে জামাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, ঐ অপরূপ রূপের মধ্যে কত বড় নীচ লোভী একটা শয়তান বাস করত। যতীন প্রথম জীবনে সত্যেনের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই বিপ্লবী দলে নাম লেখায়। বিপ্লবী দলে নাম লিখলেও সত্যিকারের দেশপ্রেম তাকে কোন দিনও আকর্ষিত করতে পারে নি। যে বস্তুটি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে বিপ্লবী দলের সংগৃহীত লক্ষাধিক মুদ্রা। বিপ্লবী দলে থেকে আনুগত্যের ছল করে সর্বদা যতীন চিন্তা করত ঐ অর্থ কেমন করে সে নিজে হস্তগত করবে। হঠাৎ একদিন দলে ভাঙন ধরল। দলপতি এক নম্বর ভাবলে সন্তোষের জন্যই অর্থাৎ তারই বিশ্বাস-ঘাতকতায় ঐ সর্বনাশ ঘটেছে, কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা তা নয়—

হঠাৎ জবাব দিল অরিন্দম, তবে? কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?

ঠিকই বলছি অরিন্দমবাবু। এত বড় একটা দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন আপনি, অথচ এ সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি! সন্তোষ মোটেই দোষী নয়। আসল হচ্ছে ঐ যতীন চাটুয্যে। যতীনই ষড়যন্ত্র করে শঙ্করনারায়ণকে হাত করে সামনে শিখণ্ডী শঙ্করনারায়ণকে দাঁড় করিয়ে, আড়াল থেকে নিজে কলকাঠি ঘুরাত। শঙ্করনারায়ণও পাটনার ছাত্র এবং যতীনের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। যতীনই পরামর্শ করে শঙ্করনারায়ণকে দিয়ে জরুরী দলিলপত্রগুলো সন্তোষের জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়ে বেনামীতে চিঠি লিখে আপনাকে জানায় ও পুলিসের কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। টাকার প্রতি লোভ ছিল বটে তার কিন্তু টাকার হদিস সে জানত না। সে শঙ্করনারায়ণ—দলের সেক্রেটারীকে বলেছিল, কতকগুলো জরুরী কাগজপত্র সন্তোষ চৌধুরীর কাছে গিয়ে দিয়ে আসতে কিন্তু সে বুঝতে পারে নি ভুলক্রমে শঙ্করনারায়ণ ঐ কাগজপত্রের সঙ্গে অর্থ যেখানে লুক্কায়িত আছে সেই বাড়ির প্ল্যানটাও দিয়ে আসবে। শঙ্করনারায়ণও অবিশ্যি ঐ প্ল্যানটা সম্পর্কে জানত না, কারণ যতীনের সঙ্গে সেও ঐ প্ল্যানটা হাতাবার চেষ্টায় ছিল। বাংলা দেশের কোন একটা গণ্ডগ্রামে ঐ অর্থ এক পোড়ো বাড়ির মাটির তলায় পোঁতা ছিল। ঐ বাড়ির প্ল্যান ও জায়গার নির্দেশ সামান্য কয়েকটা সাঙ্কেতিক শব্দ ও রেখা দিয়ে একটা কাগজের মধ্যে লেখা ছিল—যেটা সহজে কারও নজরে পড়বারও কথা নয়।

আপনি—আপনি এ কথা কি করে জানলেন, মিঃ রায়? দলের মধ্যে আমি, সন্তোষ ও সত্যেন ছাড়া আর কেউই জানত না। এমন কি সেক্রেটারী শঙ্করনারায়ণও না। সুধাকান্ত বলে ওঠে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তাড়াতাড়িতে খুনী সেটা নির্মল চৌধুরীর ওভারকোটের ভিতরের পকেটে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

সুব্রত চমকে ওঠে, লংকোটের ভিতরের পকেটে?

হ্যাঁ। মাধবী ভিলায় প্রবেশ করে সন্তোষ চৌধুরীকে আক্রমণ করবার পূর্বে

খুনী যে সাবধানতা নিয়েছিল তার তুলনা নেই। একটা বেনামী চিঠি দিয়ে সন্তোষ চৌধুরীর ছেলে নির্মল চৌধুরীকে মধুপুরে এনে কোন এক ফাঁকে ওয়েটিং রুম থেকে নির্মলের লংকোটটি চুরি করে নিয়ে যায়। তারপর সেই কোটটি গায়ে দিয়ে মাধবী ভিলায় সে আসে। লম্বায় সে অনেকটা—অর্থাৎ আমাদের খুনী, নির্মল চৌধুরীর মতই হবে। তাই মতলব ছিল, হঠাৎ বাড়ির মধ্যে যদি কেউ তাকে দেখেও ফেলে, প্রথমে হয়তো নির্মল চৌধুরী বলেই ভুল করবে। যাহোক ঐ কোটটিই সে গায়ে দিয়ে মাধবী ভিলায় যায় এবং সন্তোষ চৌধুরীকে নীচে নিয়ে এসে যখন তার কাছে জানতে পারে, কাগজপত্রগুলো যেগুলো শঙ্করনারায়ণ বহুকাল আগে সন্তোষের কাছে রাখতে দিয়েছিল তা লাইব্রেরী ঘরে আছে, খুনী সর্বাগ্রে সেগুলো গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসে এবং কোটের ভিতরকার পকেটে রাখে। পরে সন্তোষ চৌধুরীকে খুন করে সমস্ত সন্দেহ নির্মল চৌধুরীর উপরে যাতে পড়ে, সেই পরিকল্পনায় মাধবী ভিলায় ফিরে এসে, লংকোটটি সিঁড়ির নীচে স্ট্যাণ্ডে খুলে টাঙিয়ে রেখে যায়। কিন্তু বিধাতার বিচার বড় সূক্ষ্ম এবং বড় অমোঘ। কোটের পকেট হতে কাগজপত্রগুলো নিয়ে যাবার সময় তাড়াতাড়ি ছোট একটি অংশ, যাতে আসল ব্যাপারটা অর্থাৎ গুপ্ত অর্থের প্ল্যানটা লেখা ছিল সেটাই কোটের পকেটে থেকে যায়। পুরাতন কাগজ—পিন থেকে খুলে গিয়েছিল। আমি লংকোটের পকেট হাতড়াতে গিয়ে কাগজটি পাই। ক্রমে সব বুঝতে পারি। খুনী প্রথম থেকে নির্মল চৌধুরীকে তার পিতার হত্যাকারীরূপে দাঁড় করাবার জন্য প্ল্যানমাফিক প্রতিটি কাজ করেছে। খুনী যে নির্মলবাবু হতে পারেন না, মাত্র তিনটি ব্যাপারে তা আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছিল। এক নম্বর হচ্ছে ঐ লংকোটটি, দু নম্বর হচ্ছে একপাটি নতুন নিউকাট জুতো, যেটা আমি মাধবী ভিলার বাগানে কফির চারাগাছের নীচে পরের দিন প্রত্যূষে কুড়িয়ে পাই। তিন নম্বর হচ্ছে ঐ লংকোটের পকেটেই আমি কলকাতা টু মধুপুরের Class I-এর একখানা টিকিট পাই, যে টিকিটের date of issue অনুসারে জানতে পারি সন্তোষ চৌধুরী যে রাত্রে নিহত হন, সেই দিন ভোররাত্রে অর্থাৎ হত্যার পরে নির্মল চৌধুরী মধুপুরে এসে পৌঁছান। তখুনি বুঝতে পারি নির্মলবাবুর বিরুদ্ধে কত বড় চক্রান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আসল খুনী যেই হোক, ব্যাপারটা আগাগোড়াই comedy of errorsয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। অন্যের চক্রান্তে সুধাকান্তবাবু সন্তোষ ও সতোনকে ভুল বুঝেছিলেন। সন্তোষ ও সতোন সুধাকান্তকে ভুল বুঝেছিলেন। সুমিত্রা তাঁর স্বামী সন্তোষকে ভুল বুঝেছিলেন। নির্মল চৌধুরী তাঁর পিতা সন্তোষ চৌধুরীকে ভুল বুঝেছিলেন। ভুল—একটা বিরাট ভুলের গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে অরিন্দম, সুমিত্রা ও সন্তোষের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল।

সবচাইতে মর্মান্তিক কি ভুল জানেন, মিঃ রায়? হঠাৎ সুধাকান্ত বলে ওঠে, সুমিত্রার ভুল! প্রথমে তো সে আমাকেই তার জীবনের কুগ্রহ বলে মনে করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সে জেনে গেছে আমিই সেরাত্রে গিয়ে তার স্বামীকে হত্যা

করেছি! অথচ—

আমি জানি—বাধা দিল কিরীটী, আমি জানি সুধাকান্তবাবু, সেরাত্রে ও দলে আপনি মোটেই ছিলেন না। যতীনই আপনার ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল।

যতীন!

হ্যাঁ, যতীন চাটুয্যে।

তবে কি—তবে কি ঐ বসে যতীন চাটুয্যেই, মিঃ রায়? ব্যগ্রব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুধাকান্ত।

ব্যস্ত হবেন না সুধাকান্তবাবু, এখুনি ঘোমটা খুলব—বাকী বক্তব্যটুকু আমার শেষ করে নিই।

কিরীটী আবার তার অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে শুরু করে, সেরাত্রে সন্তোষ চৌধুরীকে যারা খুন করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল যতীন চাটুয্যে, একজন শঙ্করনারায়ণ আর তৃতীয় ব্যক্তি—তার কথাই এবারে বলব। দূষিত রক্ত হতে জন্ম যার, ব্যাধিগ্রস্ত বীজ হতে যার সৃষ্টি—সে সৃষ্টি তো কখনও ভাল হতে পারে না। এক্ষেত্রে ঐ খুনীও সেই tradition থেকে বিচ্যুত হয় নি। জঘন্য চরিত্রের এক স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রী উন্মাদ হয়ে গেলেন, কিন্তু পুত্র হল ঠিক বিপরীত—পিতার চাইতেও জঘন্য ও হীন চরিত্রের। লেখাপড়া এবং শিক্ষা পেলেও পিতৃগত হীনতাই তাকে দিনের পর দিন অর্থলোলুপ করে তুলতে লাগল। অর্থের লোভে সে ভয়ঙ্কর পথ বেছে নিল। এক্ষেত্রে সে তাব পিতাকেও ডিঙ্গিয়ে গেল। পিতাব পূর্ব জীবনের সব কথা সে পিতার মুখেই শুনেছিল এবং একদিন সে সেই কাহিনীকে সম্বল করেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল—এক নম্বর পরিচয়ে দলের কাছে আর বাইরে কালোপাঞ্জা পরিচয়ে। যতীনের কাছে এক নম্বর পরিচয়-পত্র দিয়ে তার মনেও আবার বহুকালের অর্থলিপ্সা জাগিয়ে তুলল। যতীন এগিয়ে এল নতুন উদ্যমে। সন্তোষকে হত্যা করে কাগজপত্রের মধ্যে যখন সে অর্থের সেই প্ল্যানের কোন হদিস পেল না, সম্ভবত তখুনি শঙ্করনারায়ণকে চেপে ধরে। কিন্তু শঙ্করনারায়ণও যখন কোন সদুত্তর দিতে পারল না তার প্রশ্নের, পরের দিন সন্ধ্যায় সে শঙ্করনারায়ণকেও হত্যা করল। পরে সে ভাবলে কাগজটা আছে সত্যেন ব্যানার্জীর কাছে। সেই আশায় সত্যেন ব্যানার্জীকে সে আক্রমণ করে এবং তাকেও হত্যা করে। নির্মল চৌধুরী মেকসিকো থেকে চারখানা হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা ছুরি এনেছিলেন, যার দুখানা তাঁর কাছে ছিল, বাকী দুখানার একখানা তিনি মাকে অর্থাৎ সুমিত্রা দেবীকে দেন, অন্যখানা দেন মিনুকে—ঐ ছুরি দিয়ে হত্যা করবার মধ্যেও খুনীর পরিকল্পনা ছিল নির্মল চৌধুরীকে ফাঁসানো। নির্মল চৌধুরীর উপরে খুনীর অর্থাৎ ওর এত জাতক্রোধ যে কেন তা ওই জানে! খুনীর পক্ষে সুমিত্রা দেবীর হস্তাক্ষর নকল করাটাও অসম্ভব কিছু ছিল না। কারণ এককালে কলেজ-জীবনে ও যে শুধু ভাল একজন স্পোর্টসম্যানই ছিল তা নয়, ছোটখাটো একজন শিল্পীও ছিল। মহাশয় ব্যক্তি উনি। কেবল খুনীই নয়—

জালিয়াতও! চিঠি লিখে প্ল্যান করে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে করেছিল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে মারাত্মক ভুলটি করেছিল, সেটা হচ্ছে আমাকেও একখানা পত্রাঘাত করে এই ব্যাপারে টেনে এনে। ও জানত না যে ও যেই হোক, আমি কিরীটী রায়।

বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে এসে কিরীটী উপবিষ্ট বন্দীর মুখ হতে মুখোশটি উন্মোচন করতেই সকলে চমকে ওঠে, এ কি!

আর্ত-অস্ফুট চিৎকারে মৃণালিনী দেবী বলে, অনুদা!

হ্যাঁ, আমাদের বর্তমান রহস্যের মেঘনাদ শ্রীমান অনিল চাটুয্যে, স্বনামধন্য যতীন চাটুয্যের একমাত্র পুত্র ও বংশধর।

বলতে বলতে কিরীটী সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলে, মনে পড়ে সুব্রত! সেদিন সন্ধ্যায় মধুপুরে পৌঁছে মাধবী ভিলার পথে যেতে যেতে যখন এই কলির এ্যাপোলোর মত, বাহিরের সুশ্রী চেহারাটা দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলি, আমি বলেছিলাম, চকিতচঞ্চল চাউনি—বিশেষত্ব আছে সে দৃষ্টিতে এবং বলেছিলাম, তোরা যে চোখের মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান পাস সেখানে আমি মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যবশতঃ সৌন্দর্য ছাড়াও অন্য কিছুর ইঙ্গিত পাই। দেখ আমার কথা সত্যি না মিথ্যে! বলতে বলতে অনিলকে সম্বোধন করে বলে কিরীটী, বন্ধু, সেদিন গোধূলি লগ্নে তোমার ও শুভদৃষ্টি আর যাকেই ফাঁকি দিক আমাকে দিতে পারে নি। এখন বুঝতে পেরেছ বোধ হয়? ভাবছ তোমাকে কেমন করে সন্দেহ করলাম, না? একটিমাত্র—একটি কারণেই তোমার প্রতি আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। মনে পড়ে বন্ধু, প্রথম রাত্রে তোমার সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয় তুমি বলেছিলে, মাকে নিয়ে তুমি দিদিমার ওখানে বেড়াতে এসেছ! কিন্তু তোমাদের বাড়িতে গিয়ে যখন জানা গেল মৃণালিনী দেবী নিখোঁজ, তোমার দিদিমা ব্যস্ত হয়ে ঘর-বার করছেন অথচ তোমার মার কোন দেখা নেই, তখনই আমার মনে তোমার প্রতি সন্দেহ জাগে। দ্বিতীয়তঃ, তারপরই বাগানের মধ্যে যে এক পাটি জুতো তুমি ফেলে এসেছিলে সেরাত্রে তাড়াতাড়িতে, তার দ্বিতীয় পাটি উদ্ধার করেছি আমি মধুপুরে তোমারই ঘর থেকে, ছদ্মবেশী পুলিসের সাহায্যে। তারপর পাটনায় লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে তোমার ও তোমার পিতৃদেবের ইতিহাস বাকীটা আমাকে অন্ধকারে আলো দিয়েছে। তোমার যে শেষ ভয় ছিল, মিনু তোমার সব কথা একদিন পাছে জানতে পারে বলে তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করবে, সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাই এখানে এত রাত্রে এসে হানা দিয়েছিলাম।

ঘরের মধ্যে সকলেই স্তম্ভিত।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল।

বড় চাল চেলেছিলে বন্ধু, কালোপাঞ্জার ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে। একটা কথা জানতে না মাথার ওপরে এমন একজন ভানুমতী আছেন আমাদের সকলকার, যাঁর খেলা বড় মর্মান্তিক। সাজানো ঘরে সে হানে বজ্রাঘাত—জ্বালে আগুন।

সুব্রতর ডাইরীর শেষাংশ ঃ

স্তব্ধ বিমূঢ় আমরা সকলে তখনও।

সিঁড়িতে অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় তালুকদার সাহেব সদলবলে পৌঁছে গেলেন।

সত্যি! মানুষ ভুল করে—কিন্তু হঠাৎ একসময় কত বড় মর্মান্তিক বেদনা যে সেই ভুলকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে কালোছায়া ফেলে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। বেচারী সুধাকান্ত, হতভাগিনী সুমিত্রা, হতভাগ্য সন্তোষ চৌধুরী আর হতভাগ্য সত্যেন ব্যানার্জী!

ভুল করলেও সুমিত্রা, সন্তোষ ও সত্যেন আজ আর নেই। কিন্তু সুধাকান্ত? এখনও তাকে কতদিন বাঁচতে হবে কে জানে?

জীবনের কবরখানায় বসে কে জানে এখনও কতকাল তাকে অশ্রু বিসর্জন করতে হবে!

যে ভালবাসা সে জীবনে কোনদিনই ব্যক্ত করলে না, যে ভালবাসা স্বর্গের চেয়েও পবিত্র—সেই ভালবাসা দয়িতের কাছে কত বড় অভিশাপ এনে দিল যার আগুনে দয়িতা মরল পুড়ে—সে রইল জীবনভোর কান্না নিয়ে!

ছায়াকুহেলী

মানুষের মনটাকে যদি কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা যেত তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেত সে বস্তুটি শুধু বিচিত্রই নয় দুর্বোধ্যও বটে। কিন্তু তার চাইতেও বুঝি বিচিত্র ও দুর্বোধ্য সেই মনের মধ্যে যে ভালবাসা নামক বস্তুটি সময় সময় জন্ম নেয় সেই অতনুঘটিত ব্যাপারটি। নইলে যে পুরুষ তাকে শুধু তাচ্ছিল্যই নয়, একপ্রকার ঘৃণাই করেছে, তারই প্রতি শীলার সমস্ত মনটা অমনভাবে ছুটে গিয়েছিল কেন এক দুর্দমনীয় অন্ধ আবেগে! আর কেনই বা সেই ভালবাসার পায়ে মাথা খুঁড়ে নিজের সবটুকু দৈন্য প্রকাশ করে শুধুমাত্র রিক্ততার হাহাকার নিয়ে ফিরে গেল!

বিচিত্র! সবটাই আগাগোড়া যেমন বিচিত্র তেমনি দুর্বোধ্য!

কিন্তু কিরীটী বলেছিল শাশ্বতকে, প্রথমটা দুর্বোধ্য অবিশ্যি আমার মনে হয়েছিল শাশ্বত, কিন্তু শীলার জবানবন্দির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সেই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যেই উত্তর আমি খুঁজে পেয়েছিলাম।

শীলার জবানবন্দি! বিস্মিত শাশ্বত প্রশ্নটা করেছিল কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে, শীলা লিখিত কোন জবানবন্দি দিয়েছিলে নাকি?

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, দিয়েছিল।

কিন্তু কই, আদালতে মামলার সময়—

না, সে জবানবন্দি তার আমি আদালতে পেশ করি নি।

কেন?

কারণ সে জবানবন্দি সে আদালতকে দেয় নি।

তবে?

দিয়েছিল আমাকে। এবং একান্তভাবে আমাকেই তার নিজস্ব জবানবন্দি হিসাবে লিখে দিয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝলাম না কিরীটী!

আসলে আমার কাছে শীলার বলবার কিছু ছিল। কিংবা ঠিক আমার কাছেও হয়তো নয়, কোন একজনের কাছে অন্তত তার নিজের সব কথা না বলে বুঝি সত্যিই কোন উপায় ছিল না। বুকের মধ্যে যে ব্যথাটা তার বিষের মত ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, অন্তত কোন একজনের কাছে সেটা বলে মুক্তিই চেয়েছিল বুঝি সে।

মুক্তি!

হ্যাঁ, চিঠিটা তুমি যদি চাও তো দিতে পারি। তবে একটি শর্তে।

কি শর্ত?

পড়া হয়ে গেলে সেটা আবার তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে।

বেশ।

কথা দিচ্ছ ফিরিয়ে দেবে?

কথা দিলাম।

ছোট বা সংক্ষিপ্ত কোন চিঠি নয়। বিরাট ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ এক চিঠি। সেদিন রাত্রেই কিরীটীর ওখান থেকে ফিরে এসে শয়নের পূর্বে চিঠিটা নিয়ে বসেছিল শাশ্বত।

শ্রদ্ধেয় কিরীটীবাবু,

এই চিঠিটা যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে তখন আমি অনেক দূরে। তবু শেষ পর্যন্ত কেন যে যাবার আগে এই চিঠিটা আপনাকে লিখতে বসেছি তা আমি নিজেই জানি না।

মনকে নানাভাবে আজ দুদিন ধরে প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাই নি।

অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত চিঠিটা আমার ধৈর্য ধরে পড়বেন কিনা আপনি তাও জানি না।

তবু কেন লিখছি, তাই না?

বললাম তো, কেন যে লিখছি, তা নিজেই জানি না আমি।

আপনার জীবনে এ ধরনের কত পুরুষ ও মেয়ে হয়তো এসেছে। কত মেয়ে-পুরুষের জীবনের কত জঘন্যতম গ্লানির উদ্ঘাটনও হয়তো আপনার তীক্ষ্ণ বিচার ও বিশ্লেষণের কাছে হয়েছে। আমার মত কত মেয়ের জীবনের ট্র্যাজেডিই হয়তো আপনাকে দেখতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে।

কিন্তু তবু তাদের সকলের পাশে পাশে যখনই আমার কথা আপনার মনে পড়বে, একটা অনুরোধ শুধু, সেদিন আমাকে ঘৃণা করবার আগে যেন একটি কথা অন্তত মনে করেন, যত পাপ বা যত অন্যায়ই করে থাকি না কেন, তার পিছনে ছিল এক হতভাগিনী নারীর জীবনব্যাপী প্রেম-তৃষ্ণা সেদিন।

এক হতভাগিনী যে জীবনে প্রথম ভালবাসার সত্যিকারের স্বাদ পেয়ে শুধু সমাজের চোখ-রাঙানিতেই সেই ভালবাসার মালা কণ্ঠে তুলে নিতে পারে নি বলেই ভীরু দৃষ্টিতে যাকে সে ভালবেসেছিল তারই মুখের দিকে কেবল চেয়ে ছিল।

ভাবতে পারেন কি আপনি, এক হতভাগিনী নারীর জীবনের সমস্ত সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা যখন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে সেই সময় নতুন করে এলো আবার ঘর বাঁধবার ডাক! আর সেই ডাকে সেদিন যদি সাড়া দিয়েই থাকি, খুব অন্যায়ই কি করেছিলাম!

বিশ্বাস করুন আপনি, বেশী কিছু না, টাকাকড়ি ঐশ্বর্য প্রাচুর্য কোন কিছুই চাই নি আমি সেদিন, চেয়েছিলাম শুধু একখানি ঘর।

একখানি ঘর, যে ঘরের মধ্যে আর কিছু না থাক, থাকুক শুধু একটু ভালবাসা, একটু নিশ্চিন্ত আশ্বাস।

তাই তো যাবার বেলায় আজ ভাবছি, সেটুকু থেকেও ভগবান আমাকে বঞ্চিত করলেন, কেমন এ বিচার তাঁর বলতে পারেন?

দয়াময়ই যদি নাম তাঁর তো এ কেমনধারা দয়া তাঁর?

একজনের সর্বস্ব নিয়েও তাঁর তৃপ্তি হলো না, শেষ সম্ভাবনাটুকু পর্যন্তও তার

কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব একেবারে পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিলেন তাকে !

আমি চোর, আমি জালিয়াত, আমি লোভী, সব—সবই আমি, কিন্তু আজ একবার আমার সৃষ্টিকর্তাকে সামনাসামনি পেলে জিজ্ঞাসা করতাম একটি কথাই, সব অভিযোগই আমার ওপরে মেনে নেবো আমি, কিন্তু তার আগে একটি কথার জবাব দাও, এ সব কিছুর জন্য দায়ী কে ? তুমি যদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তবে আমাকে তো তুমিই করেছ লোভী, চোর, জালিয়াত। তবে সকল অপরাধের ভার কেন একা আমাকেই বা বইতে হবে ? আর তুমিই বা কোন্ যুক্তিতে থাকবে চিরদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে ?

কিন্তু সেও তো সেই পুরাতন প্রশ্ন।

কোন জবাব যার আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তাছাড়া যে কথা বলবার জন্য এই চিঠির অবতারণা সেই কথাই বলি।

নরহরিবাবুর নাম—

নরহরি !

নরহরি সরকার !

অকস্মাৎ যেন নতুন করে আবার মনে পড়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা শাশ্বতর।

মাত্র কয়েকটা দিন আগেকার কথা। ব্যাপারটা শেষ হয়েও যেন শেষ হয় নি।

শেষের সুরটি যেন এখনো কানে লেগে আছে।

॥ এক ॥

প্রথমটায় কিরীটী তার বন্ধু পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার শাশ্বত চৌধুরীর কথায় তেমন যেন কোন মন দেয় নি বা আগ্রহই দেখায় নি। কেমন যেন একটা শিথিল অন্যমনস্ক ভাব।

সোফাটার উপর শিথিল এলায়িত ভঙ্গিতে গা ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানতে টানতে শাশ্বতর কথা শুনছিল কেবল। অকস্মাৎ একসময় যেন কথার মধ্যে সোজা হয়ে উঠে বসল, দু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শরীরের শিথিল এলায়িত ভঙ্গিটা ঋজু, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। একটু যেন গুছিয়ে বসল কিরীটী। এবং মৃদু আগ্রহান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তারপর ?

কিরীটীর প্রশ্নে শাশ্বত যেন এতক্ষণে কিছুটা আশান্বিত হয়ে ওঠে। এবার উৎসাহের সঙ্গে বলে, তারপর যে কি সেটাই তো বর্তমানে বুঝে উঠতে পারছি না এখনো !

কি বুঝে উঠতে পারছ না শাশ্বত ?

সত্যি-সত্যিই ঐ শীলা রায় আসল না নকল ! অর্থাৎ অনিরুদ্ধবাবুর কথাই ঠিক, না সে মিথ্যা বলছে—

মিথ্যা বলবার যখন কারণ এক্ষেত্রে আছে তখন তার পক্ষে মিথ্যা বলাটা খুব একটা বিচিত্র নয় অবিশ্যি—কিন্তু তোমাদের ঐ শীলা রায় যে সত্যিই আসল শীলা রায় নয়, সে সম্পর্কেই বা তোমাদের অনিরুদ্ধবাবু এমনভাবে স্থিরনিশ্চিত হলেন কি করে? উভয়ের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় কিছু ছিল নাকি?

ছিল।

কি রকম? কিরীটী আবার তাকাল সাগ্রহে ওর মুখের দিকে।

এই ঘটনার বছর তিনেক পূর্বে দিল্লীর একটা ইনডাসট্রিয়াল একজিবিশনে ওদের পরস্পরের নাকি দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়েছিল ঘটনাচক্রে। সেই সময় মাস ছয়েকের জন্য অনিরুদ্ধবাবুকে দিল্লীতে থাকতে হয়েছিল তার ইনসুরেন্সের কাজের ব্যাপারে।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই মৃদুকণ্ঠে বললে, তাহলে অনিরুদ্ধবাবুর মতে ঐ শীলা রায় আসল শীলা রায় নন?

না।

হুঁ। তা তোমাদের শীলা রায় কি বলছেন ওই অনিরুদ্ধ সম্পর্কে? তাঁর মতে ওই অনিরুদ্ধবাবুই আসল বা জেনুইন অনিরুদ্ধই তো?

হ্যাঁ, তিনি অবিশ্যি অনিরুদ্ধ সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধই প্রকাশ করছেন না। অনিরুদ্ধবাবুরই ধারণা বৎসর দেড়েক আগে যে ট্রেন-ডিজাস্টার হয়েছিল, তাতেই আসল শীলা রায়ের মৃত্যু হয়েছে, ওই শীলা রায় সাম আদার পার্সন ইন ডিসগাইস।

হ্যাঁ হ্যাঁ—একটু আগে তুমি একটা কি ট্রেন-ডিজাস্টারের কথা বলছিলে বটে! তা—

কেন, তোমার মনে নেই, বছর দেড়েক আগে মোগল-সরাইয়ের কিছু পরে ডাউন তুফান এক্সপ্রেসের বড় রকমের একটা ডিজাস্টার হয়েছিল!

হ্যাঁ হ্যাঁ—তা নয়, বলছিলাম তুমি একটু আগে বলছিলে না, সেই ট্রেনের দুর্ঘটনাতেই মৃত ও অজ্ঞাত যাত্রীদের তালিকাতে তোমার ওই অনিরুদ্ধের নামও ছিল?

হ্যাঁ, শুধু অনিরুদ্ধ কেন, ওই শীলা রায়ের নামও তার মধ্যেই তো ছিল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, তিনিও সেই ট্রেনেরই যাত্রী ছিলেন।

হুঁ, শাশ্বত, গোড়া থেকে তুমি তোমার কাহিনীটা আর একবার বল তো?

গোড়া থেকে বলব?

হ্যাঁ, কারণ ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মনে আছে, আমার এক পরিচিত সহপাঠীও মারা যায় আর নামটাও ছিল তার ওই অনিরুদ্ধ ঘোষই—

বল কি!

হ্যাঁ, মৃতের তালিকার মধ্যে যাদের সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় নি—

তাদের মধ্যেই অনিরুদ্ধও ছিল বলেই আমার ধারণা।

কিরীটীর কথায় শাশ্বত যেন বেশ একটু উদ্‌গ্রীবই হয়ে ওঠে এবং বলে, অনিরুদ্ধ এককালে যখন তোমার সহপাঠী ছিল তখন নিশ্চয়ই তাকে তুমি এককালে বেশ ভালভাবেই চিনতে ?

তা চিনতাম, কারণ কলেজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের সে যে কেবল অন্যতম পাণ্ডা বা সেক্রেটারী ছিল তাই নয়, কলেজ ড্রামাটিক ক্লাবেরও সে ছিল অন্যতম পাণ্ডা বা প্রধান উৎসাহী।

তাই নাকি ?

হুঁ। হি ওয়াজ এ বর্ন অ্যাকটর।

তাকে দেখলে এখন চিনতে পারবে ?

তা দশ-বারো বছরের কথা হলেও চিনতে হয়তো পারব, কিরীটী বললে।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে, খামের ভিতর থেকে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফটো টেনে বের করে শাশ্বত ফটোটা কিরীটীর সামনে এগিয়ে ধরল। বললে, দেখ তো চিনতে পার কিনা ! এটা অবিশ্যি শুনেছি তার কলেজ-জীবনের অব্যবহিত পরেরই ফটো।

সাগ্রহে কিরীটী শাশ্বতর হাত থেকে ফটোটা নিয়ে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফটোটা নিরীক্ষণ করে মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, এ ফটো মনে হচ্ছে তারই।

অনিরুদ্ধ ঘোষেরই ফটো। কিরীটীর চিনতে কষ্ট হয় না। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে তখন অনিরুদ্ধর। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র সে তখন।

পরিধানে সাদা ফ্লানেলের ট্রাউজার ও গায়ে টেনিস কোট। বুকে কলেজ ব্লু এনগ্রেভ করা। ফটোটার পিছনে অনিরুদ্ধর নিজের নাম সই করা ও তার নীচে তারিখ।

ঠিক দশ বছর পূর্বেকার তারিখ।

শাশ্বত আবার কথা বললে, তাহলে তো দেখছি যে শীলা রায় ও অনিরুদ্ধ ঘোষকে নিয়ে আমাদের বর্তমান সমস্যা সেই অনিরুদ্ধ ঘোষ তোমার পূর্বপরিচিত, রায় ?

তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এ তো অনিরুদ্ধর দশ বৎসর আগেকার ফটো, বর্তমান সময়ের তার কোন ফটো নেই তোমার কাছে শাশ্বত ?

আছে।

কই দেখি ?

খাম থেকে আর একটি অনুরূপ সাইজের হাফ্‌ বাস্ট্‌ ফটো টেনে বের করে আবার শাশ্বত কিরীটীর হাতের মধ্যে এগিয়ে দিল।

এবারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে যেন দুখানা ফটো কিরীটী গভীর মনোনিবেশ সহকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও বিচার করে দেখতে থাকে।

একটি দশ বছর আগেকার, অন্যটি দশ বছর পরের। দশ বছর সময় নেহাত

অল্প সময়ের ব্যবধান নয়। রীতিমত দীর্ঘ সময়েরই ব্যবধান। এবং দশ বছর সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে মানুষের চেহারায় অনেক পরিবর্তনই হতে পারে এবং বহু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

তবু মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ চেহারার যে জন্মগত বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব, দশ বৎসর সময়ের ব্যবধানেও কোন বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে খুব বেশী একটা বদলে যায় না। বিশেষ বিশেষ ঢং বা রেখার মধ্যে দিয়েই চেহারার জন্মগত বিশেষত্বটুকু বজায় থেকেই যায়।

তবু কিরীটীর মনে হয়, দুটো ফটোর চেহারাই একই জনের। কোন একই ব্যক্তিবিশেষের।

শাশ্বতই আবার কথা বললে, আমার তো মনে হয় ফটো দুটি একই লোকের। তোমার কি মনে হচ্ছে কিরীটী?

ফটো দুটি পাশাপাশি রেখে পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কিরীটী পুনরায় বলে, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে—

তাই যদি হয় তো ঐ অনিরুদ্ধ তো তোমার দেখছি বন্ধুলোকই হে।

মৃদু হেসে কিরীটী অনিরুদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাই কী!

ওকে তোমার সাহায্য করাও তো কর্তব্য ওই বিপদে।

কিন্তু বিপদটা তার আবার কোথায়?

বিপদ নয়! সেই পাগলা মৃত জমিদার নরহরি সরকারের উইল অনুযায়ী এখন ওই শীলা রায়কে বিবাহ না করলে নরহরির সম্পত্তির কপর্দকও অনিরুদ্ধ যে পাবে না।

কি রকম?

তাহলে আর এতক্ষণ ধরে তোমাকে বললামই বা কি, আর তুমি শুনলেই বা কি?

হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে, মৃত নরহরিবাবুর সঙ্গে অনিরুদ্ধর কি যেন সম্পর্ক একটা আছে বলছিলে!

অনিরুদ্ধ হচ্ছে তার মৃতা বোন শৈবলিনী দেবীর একমাত্র পুত্র।

অর্থাৎ বল মৃত নরহরির ভাগ্নে!

হ্যাঁ, আর নরহরি ছিলেন চিরকুমার—অকৃতদার।

কাজেই তাঁর মৃত্যুতে অন্য কোন ওয়ারিশন যখন নেই, তখন ঐ অনিরুদ্ধই মৃত নরহরির সমস্ত সম্পত্তির ন্যায্যত মালিকানা স্বত্ব পাচ্ছে।

কিন্তু তাতে আবার গোলমালটা কোথায়? কিরীটী বলে।

গোলমাল একটা আছে বৈকি।

কেন, গোলমালটা এর মধ্যে আবার কিসের? আর যখন সম্পত্তির দ্বিতীয় কোন ওয়ারিশন নেই বলছই?

গোলমালটা হচ্ছে মৃত নরহরি সরকারের উইলের শর্তে।

উইলের শর্তে !

তাই তো বলছি। নরহরি বিচিত্র এক উইল করে রেখেছেন তার চিরন্তন পাগলামির ঝোঁকে।

লোকটা পাগল ছিল নাকি ?

তাছাড়া আর কি !

কি রকম ?

পাগলই তো ! নইলে অমন পাগলের মত উইল কে করে বল তো ?

তা কি লেখা আছে উইলে ?

উইলে লেখা আছে দিল্লীর কোন এক বিধবা আশ্রমের বিমলা দেবীর একমাত্র কন্যাকে যদি অনিরুদ্ধ বিবাহ করে তাহলেই মৃত নরহরির সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে। অন্যথায় মাসে মাসে তিনশত টাকা করে মাসোহারা পাবে মাত্র।

বিচিত্র উইল তো ! তা ওই তোমাদের শীলা রায় বোধ হয় ঐ বিমলা দেবীরই কন্যা ?

তাই।

বিমলা দেবী বর্তমানে জীবিতা না মৃতা ?

বছর আষ্টেক হল তার মৃত্যু হয়েছে।

হুঁ। তা তোমাদের ঐ শীলা রায়ের মনোবাঞ্ছাটা কি ? তিনি অনিরুদ্ধকে বিবাহ করতে রাজী, না, না ?

সে রাজী কি অরাজী সে প্রশ্নই তো এখন উঠছে না—অনিরুদ্ধ যতক্ষণ না ঐ শীলা রায়কেই আসল শীলা রায় বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে !

কিরীটী এরপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ফটো দুটো সামনে টেবিলের ওপরে রাখা, সেই দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একসময় আবার কিরীটী শাশ্বতর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা শাশ্বত, বলতে পার তোমার ঐ বর্তমান নাটকের মধ্যে তৃতীয়া কোন নারী আছে কিনা ?

তৃতীয়া নারী !

হ্যাঁ, মানে তোমাদের অনিরুদ্ধর পরিচিত—

কই, সে রকম কিছু আছে বলে তো—

জান না, তাই তো ?

হ্যাঁ, মানে—

তারই সর্বাগ্রে ভাল করে সন্ধান নাও, তারপর—

তারপর ?

তারপর এও তোমায় জানতে হবে, ওই শীলা দেবী সত্যি-সত্যিই তোমাদের অনিরুদ্ধকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক কিনা, এবং—

কী ?

যিনি দেড় বৎসর পূর্বেকার ট্রেন-ডিজাস্টারের ফলে মৃত বলে চিহ্নিতা হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ মাস দুয়েক পূর্বে তাঁর এভাবে পুনরাবির্ভাব সম্ভবপর হল কি করে ? এই দেড় বৎসর সময় তিনি কোথায় কি ভাবে ছিলেন ?

ট্রেন-ডিজাস্টারের ফলে মাথায় গুরুতর চোট খেয়ে তার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল।

স্মৃতিভ্রংশ !

ঠিক ওই সময় ঢং ঢং করে দেয়ালঘড়িতে রাত্রি এগারটা ঘোষিত হল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন ভৃত্য জংলীর আবির্ভাব ঘরের মধ্যে, বাবু !

কী ?

মা বলছেন খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে !

সত্যিই রাত এগারটা—নাঃ, অনেক রাত হয়ে গেছে। বলতে বলতে ওঠে শাশ্বত।

চললে নাকি ?

হ্যাঁ, কাল আসছি আবার—আসব তো ?

এস।

কিরীটীর শেষের কথায় শাশ্বত যেন একটু আনন্দিত মনেই ঘর ত্যাগ করে।

॥ দুই ॥

ঘটনাটা বিচিত্রই সন্দেহ নেই।

শাশ্বত যে ইতিহাস পরের দিন এসে দ্বিপ্রহরে শোনাল পুনরায় কিরীটীকে, যদি সবটাই তার সত্য হয় তো বিচিত্র নিঃসন্দেহে।

রায়বাহাদুর নরহরি সরকার, স্বোপার্জিত নয়, পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত বিরাট সম্পত্তি ও শাঁসালো ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের দৌলতে মৃত্যুকালে যা রেখে গিয়েছেন সেটা রীতিমত লোভনীয়ই নিঃসন্দেহে। এবং তার একমাত্র ওয়ারিশন বর্তমানে অনিরুদ্ধ ঘোষ। নরহরির একমাত্র সহোদরা শৈবলিনী দেবীর একমাত্র পুত্র ওই অনিরুদ্ধ।

ভাই-বোন নরহরি ও শৈবলিনী, বলাই বাহুল্য, রীতিমত একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিল। অবিশ্যি ওই বিশেষ গুণটি তারা ভাই-বোন তাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব রাখহরির চরিত্র থেকেই পেয়েছিল। নরহরি ও শৈবলিনীর মা—ওদের যখন একজনের বয়স এগার ও অন্যের নয়—তখনই স্বর্গতা হন।

দ্বিতীয়বার আর দারপরিগ্রহ করেন নি রাখহরি।

ছেলেমেয়ে দুটিকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ও মানুষ করে তোলা ব্যাপারটা স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

যদিচ রাখহরির পিতৃদেব একদা কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দিগিরি করে প্রচুর সম্পদ গড়ে তুলেছিলেন, তথাপি একমাত্র পুত্র রাখহরিকে সে সময় সেই কলকাতার নব্যযুগের নতুন শিক্ষার আওতা থেকে দূরে সরিয়ে তো নিয়ে যানই নি বরং সেই দিকেই উৎসাহিত করেছিলেন।

ফলে নতুন শিক্ষা ও সংস্কারের আলোয় রাখহরি নতুন মানুষই গড়ে উঠে-

ছিলেন। তখনকার সময়কার কলকাত্তায়ী বাবুয়ানীতে ভেসে যান নি।

তারই পুত্র নরহরি ও কন্যা শৈবলিনী।

কাজেই পিতার সংস্কৃতির ছাপটা পুত্র ও কন্যা দুজনারই মনের মধ্যে বেশ ভাল ভাবেই পড়েছিল।

পুত্র ও কন্যাকে রাখহরি ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখেন নি।

বাইরের জগৎটাকে চিনবার অবকাশ দিয়ে মানুষের মত মানুষ করেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পুত্রকন্যাদের বিবাহের ব্যাপারেও কোন সামাজিক পচা সংস্কারকে প্রাধান্য দেন নি, ফলে অকস্মাৎ একদিন যখন রাখহরি শুনলেন তাঁর মেয়ের মুখে—মেয়ে তাঁর এক ক্রিশ্চান যুবক অ্যালফ্রেড ঘোষকে ভালবেসে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, রাখহরি মেয়েকে কোনরূপ বাধা দিলেন না বটে তবে স্পষ্টই বলে দিলেন, বিয়ে তুমি করতে পার, বাধা দেব না—কিন্তু বিয়ে যদি কর তো আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই আর থাকল না, এইটুকুই শুধু মনে রেখ।

বাপের স্পষ্ট কথায় মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, বেশ, তাই হবে।

তার চাইতে কোন স্বজাতের ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে কর না কেন! হিন্দুর মেয়ে হয়ে ম্লেচ্ছের সঙ্গে—যে লোক নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য বিদেশীর ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে—

কিন্তু শৈবলিনী ততক্ষণ পর্যন্ত আর দাঁড়ায় নি।

পিতার কথার মাঝখানে সে ঘর ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। শুধু ঘর নয়, পিতৃগৃহই ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল চিরদিনের মত। আর সে পিতৃগৃহে পা দেয় নি।

রাখহরিও জীবনে বাকী ক'টা দিন কোনদিন আর ওই মেয়ের নাম মুখে আনেন নি। এবং ওই ব্যাপারের ঠিক বৎসর দুই পরেই রাখহরি পেলেন দ্বিতীয় আঘাত। আঘাতটা এল একমাত্র পুত্র নরহরির কাছ থেকে এবারে।

প্রথম আঘাত এসেছিল একমাত্র কন্যার দিক থেকে, দ্বিতীয় আঘাত এল একমাত্র পুত্রের কাছ থেকে।

ছেলের বয়স হয়েছে, এবারে তাকে বিয়ে দিয়ে গৃহী করা দরকার। উপযুক্ত মনোমত পুত্রবধূর সন্ধান অনেকদিন থেকেই করছিলেন রাখহরি। কিন্তু তেমন মনের মত একটি বধূও চোখে পড়ছিল না। হঠাৎই ওই সময় শ্রীরামপুরে একটি পাত্রীর সন্ধান পেয়ে পাত্রীটিকে দেখে রাখহরির চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। মেয়েটির বয়স তখন মাত্র পনের, স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

নরহরি তখন বি. এ. পড়ছে—ফোর্থ ইয়ার। মেয়ে দেখে পছন্দ হওয়ায় একপ্রকার পাকা কথা দিয়েই রাখহরি গৃহে ফিরে এলেন। রাত্রে ছেলেকে ঘরে ডেকে কথাটা বললেন রাখহরি।

সঙ্গে সঙ্গে নরহরি জবাব দেয়, তোমার মনোনীতা পাত্রীকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয় বাবা।

বজ্রাহতের মতই যেন কথাটা শুনে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাধহরি। এবং প্রথম ক'টা মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন বাক্যই সরে নি।

পুত্র নরহরি তখন আবার বলে, কথাটা দু-চার দিনের মধ্যেই তোমাকে আমি জানাতাম। আমি যাকে বিয়ে করব তাকে আমি মনোনীত করেছি।

মনোনীত করেছ!

হ্যাঁ, বিমলা তার নাম।

কোথাকার মেয়ে? কার মেয়ে? বয়স কত?

বয়স আমার চাইতে বছর তিনেকের ছোট, তবে—

তবে?

সে—মানে সে বালবিধবা—

বিধবা! যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তখনো রাধহরি।

হ্যাঁ।

তুমি—তুমি বিধবা বিয়ে করবে হরি?

নয় বছর বয়সের সময় তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সে বিধবা হয়েছে। ওই বিয়ে তো বিয়েই নয়।

নরহরি ওই বিধবা বিবাহ করবে বলায় কত বড় আঘাত যে সে তার প্রৌঢ় বাপকে দিয়েছিল, পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলে যে, অকস্মাৎ জ্ঞান হারিয়ে রাধহরি চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

সে জ্ঞান আর রাধহরির ফেরে নি।

চব্বিশ ঘণ্টা পরেই মৃত্যু হয়েছিল।

রাধহরি যতই নব্যযুগের আবহাওয়াকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করুন না কেন, বংশানুক্রমিক যে হিন্দু সংস্কার তাঁর রক্তের মধ্যে মিশেছিল—সেই সংস্কারের দাবীকে অগ্রাহ্য করবার মত মেরুদণ্ডের জোর বুঝি তাঁর ছিল না। তাই মেয়ের দিক থেকে একবার আঘাত পাবার পর একমাত্র পুত্রের দিক থেকে আঘাতের পুনঃসম্ভাবনাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল।

নরহরি কিন্তু সত্যিসত্যিই বিমলাকে প্রাণাপেক্ষাই ভালবেসেছিল এবং বাপ রাধহরি জীবিত থাকলে যে সে বিমলাকে বিবাহ করতই, তাতে বুঝি বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশও ছিল না।

কিন্তু যে প্রেমের স্বীকৃতির মূলেই অকস্মাৎ অত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, পরে সেই প্রেমকেই প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে কি জানি কেন নরহরির মত জেদী একগুঁয়ে মানুষও পারে নি সেদিন। ফলে স্থিরীকৃত বিবাহটা শেষ পর্যন্ত আর ঘটে ওঠে নি।

বিমলা কিন্তু ব্যাপারটা সেদিন বুঝতে চায় নি। বোঝবার চেষ্টাও করে নি। নরহরির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে আর একজনকে বিবাহ করে সংসার পেতে বসল। কিন্তু বিবাহের পর চারটি বছরও গেল না, দেড় মাসের শীলাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার বিধবা হল বিমলা।

নরহরি কিন্তু জীবনে কোনদিনই ভুলতে পারে নি বিমলাকে। আর ভুলতে পারে নি বলেই বোধ হয় জীবনে ও পথই আর মাড়ায় নি সে।

বিমলা ও নরহরির মধ্যে দ্বিতীয়বার আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি জীবনে। তবে দেখাসাক্ষাৎ না হলেও বিমলার সমস্ত সংবাদই নরহরি রাখত।

বিধবা হবার পর দ্বিতীয়বার বিমলা যে তার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে কোন এক বিধবা আশ্রমের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়েছিল নরহরি সংবাদ পেয়েছিল যথাসময়েই। এবং দিল্লীতে ঘটনাচক্রে নরহরির এক পরিচিত ব্যক্তি ছিল, তার মারফতই বিমলার সমস্ত সংবাদই সর্বদা পেয়েছে নরহরি।

বিমলা সম্পর্কে নরহরির মনের দুর্বলতার কথাটা জানা থাকলেও নরহরি সম্পর্কে বিমলার সত্যিকারের মনের কথাটা কিন্তু জানা যায় নি কখনো। এমন কি তার একমাত্র মেয়ে শীলাও কিছু কোনদিন জানতে পাবে নি বা শোনে নি।

শীলার বয়স যখন পনেরো বৎসর সেই সময় বিমলার মৃত্যু হয়।

নরহরি তখন জীবিত। এবং শীলার অসহায় অবস্থার কথা জানতে পেরে নরহরিই তখন তার পড়াশুনা ও জীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয় নিজে অলক্ষ্যে থেকে তার সেই বন্ধুর মারফৎ।

অনন্যোপায় শীলাকেও সে সাহায্য হাত পেতে নিতে হয়েছিল, কারণ সত্যিই সেদিন শীলা দাঁড়াবার মত এতটুকু শক্ত মাটিও দিল্লীর মত শহরে কোথাও খুঁজে পায় নি।

শীলা ছাড়াও আর একজনের উপরে নরহরির নজর ছিল বরাবরই। সে বড় আদরের সহোদরা শৈবলিনীর একমাত্র সন্তান অনিরুদ্ধ।

ভালবেসে পিতার মতের বিরুদ্ধেই বিয়ে করেছিল শৈবলিনী অ্যালফ্রেড ঘোষকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বেচারীর সুখী হতে পারে নি সেও কোনদিন জীবনে স্বামীর চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতার জন্য। অ্যালফ্রেডের চরিত্রে যে কেবল উচ্ছৃংখলতাই ছিল তা নয়, লোকটা ছিল যেমন বেহিসাবী তেমনি বাউণ্ডুলে ও অস্থির চঞ্চল প্রকৃতির।

চঞ্চল প্রকৃতির জন্য কোথাও সে স্থির হয়ে বেশীদিন চাকরি করতে পারে নি একটানা। প্রথমে হয়েছিল পুলিস সার্জন, তারপর কিছুদিন টি. টি. আই., তারপর ব্রোকারি—তারপর একটা বিলেতী ঔষধ কোম্পানীর এজেণ্ট। শেষের দিকে আবার মদও ধরেছিল। এবং অল্প বয়েসে মৃত্যুর কারণও হয়েছিল সেই অতিরিক্ত মদ্যপান।

সারাটা জীবনই বলতে গেলে শৈবলিনীকে ঘোরতর অশান্তি, অভাব আর

অনটনের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে। একমাত্র সান্ত্বনা বুঝি ছিল শৈবলিনীর একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ বরাবর বৃত্তি পেয়েছে। এবং শৈবলিনীর ইচ্ছাতে সে কলকাতায় থেকেই বরাবর পড়াশুনা করেছে মা-বাপের সংসর্গ থেকে দূরে।

পিতার মৃত্যুর পর নরহরি বহুবার বহুভাবে কোন শৈবলিনীকে সাহায্য করতে চেয়েছে কিন্তু শৈবলিনী ভাইয়ের কোন সাহায্যই কোন দিন নিতে রাজী হয় নি। এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পর যে দুই বছর শৈবলিনী বেঁচে ছিল, সে সময় নিদারুণ অর্থাভাবেই দিন কেটেছে—কিন্তু তখনও ভাইয়ের কোন সাহায্য সে নেয় নি।

শৈবলিনী যখন মারা যায় অনিরুদ্ধ তখন বি. এস-সি পাস করে স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ছে। কিন্তু মার মৃত্যুর পর আর সে পড়ে নি। পড়া ছেড়ে এলাহাবাদে চাকরি নিয়ে চলে যায় কোন এক বিলাতি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে।

শীলা আর অনিরুদ্ধর মোটামুটি পূর্ব-কাহিনী হচ্ছে এই।

নরহরির মৃত্যুর পর তার উইলের নির্দেশানুযায়ী তার সলিসিটার শীলা আর অনিরুদ্ধকে দুখানা চিঠি দেন আলাদা আলাদা ভাবে।

নরহরির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে তার মূল্য দশ লক্ষ টাকারও বেশী। এবং সেই সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন হচ্ছে তার ভাগ্নে অনিরুদ্ধ ঘোষ।

কিন্তু সম্পত্তি প্রাপ্তির একটি শর্ত আছে। অনিরুদ্ধ যদি শীলা রায়কে বিবাহ করে তবেই মৃত নরহরির সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা-স্বত্ব সে পাবে, নচেৎ মাসে মাসে তিনশত টাকা করে মাসোহারা পাবে।

সেই মর্মেই মৃত নরহরির সলিসিটার প্রতাপ গুহ ওদের দুজনকে দুখানা চিঠি দিয়ে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে তাঁর কলকাতার অফিসে দেখা করবার জন্য নির্দেশ দেন।

তারপরই ঘটল বিচিত্র এক ঘটনা।

যতদূর জানা যায় একই ট্রেনে দুজনের একজন দিল্লী থেকে ও অন্যজন এলাহাবাদ থেকে কলকাতাভিমুখে রওনা হল—শীলা ও অনিরুদ্ধ।

সেদিন কিন্তু দুজনার একজনাও জানতে পারে নি যে একই ট্রেনে ওরা চলেছে, যদিচ দৈবক্রমে একদিন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অদূর এক ভবিষ্যতে নিকটতম এক সম্পর্ক গড়ে উঠবে কথাটা না জানলেও পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল কোন এক সময়ে ইতিপূর্বেই একের সঙ্গে অন্যের—যে কথাটা অবিশ্যি পরে জানা গিয়েছিল।

যা হোক সে রাতটা ছিল আবার এক প্রচণ্ড দুর্যোগের রাত। যেমনি ঝড় তেমনি মুষলধারায় বৃষ্টি। সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই ট্রেনটা মোগলসরাই ছাড়ল, কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

মাইল আষ্টেকের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা ডিজাস্টারের সম্মুখীন হল।

বহু যাত্রী হতাহত হল সেই আকস্মিক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এবং অনিরুদ্ধ ও

শীলা যে ওই গাড়িতেই আসছিল সলিসিটার মিঃ গুহ পূর্ব হতেই সেটা জানতেন, অথচ তাদের আর কোনরকম সন্ধান না পাওয়ায় স্পষ্টই বোঝা গেল যে সব মৃতদেহকে ভাল করে সনাক্ত করা যায় নি, পরে সেই লিস্টের মধ্যেই ওদের দুজনের নাম ছিল।

অনিরুদ্ধ ঘোষ ও শীলা রায়।

মিঃ গুহর দপ্তরে সম্পত্তির ব্যাপারটা অমীমাংসিতই পড়ে রইল।

তারপর অকস্মাৎ দীর্ঘ চার মাস বাদে একদিন সলিসিটার মিঃ গুহর অফিসে এসে হাজির হল অনিরুদ্ধ ঘোষ।

সে নাকি সে রাত্রের ট্রেন-ডিজাস্টারে মরে নি। দৈবক্রমে দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে নিদারুণ আহত হয়েও কোনমতে বেঁচে গিয়েছে। তার ডান হাতটি অবশ্য কনুই থেকে সিরিয়াস কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অ্যাংকাইলোসিস হয়ে একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে।

যা হোক অনিরুদ্ধর পরিচয় পেয়ে প্রতাপ গুহ তাকে মৃত নরহরির বরাহনগরে বিরাট ভবনে একমাত্র ওয়ারিশন হিসাবে প্রবেশাধিকারও দিয়ে দিলেন।

ওই ঘটনার দেড় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন সলিসিটার মিঃ গুহর লেখা চিঠিখানা নিয়ে শীলা রায় এসে তাঁর অফিসে দেখা করল।

শীলা রায়ের নামটাও ট্রেন-ডিজাস্টারের পর মৃতের তালিকায় ছিল।

কিন্তু দেখা গেল—আশ্চর্য, সেও নাকি মরে নি!

নানাভাবে প্রশ্ন করলেন শীলা রায়কে মিঃ গুহ সকলের সামনে এবং শীলা রায়ের জবাবে তার পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্টই হলেন।

তাহলে এবারে আপনি কি করবেন? মিঃ গুহ প্রশ্ন করলেন।

যেমন আপনি বলবেন।

আমি অনিরুদ্ধবাবুকে ফোন করে দিচ্ছি—

মিঃ গুহর কথায় শীলা যেন কেমন একটু চমকেই ওঠে। বলে, তিনি—মানে মিঃ ঘোষ বেঁচে আছেন নাকি?

মৃদু হেসে মিঃ গুহ বললেন, হ্যাঁ, তিনিও আপনার মতই মিরাকুলাসলি বেঁচে গিয়েছেন। তবে—

তবে?

দুর্ঘটনাটা তাঁর কাছ থেকে একটু বেশী রকমই আদায় করে নিয়েছে।

কি রকম?

তাঁর একটি হাত গিয়েছে।

সে কি!

হ্যাঁ, একটি হাত আজ তাঁর একেবারেই অকর্মণ্য।

অকর্মণ্য?

তাই। দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। যাক তবু যে প্রাণে বেঁচেছেন—দাঁড়ান,

তাঁকে একটা টেলিফোন করে সংবাদটা দিই। কতদিন আক্ষেপ করেছেন একই ট্রেন-এ্যাক্সিডেণ্টে তিনি মরেও বেঁচে গেলেন যেমন তেমনি আপনিও যদি বেঁচে যেতেন—কি আনন্দের ও সুখের ব্যাপারই না হত! তাঁর মামার শেষ ইচ্ছাটাও পালিত হত।

বলতে বলতে মিঃ গুহ ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়েল করলেন।

॥ তিন ॥

বাড়ির ভৃত্য বোধ হয় ফোন ধরেছিল, সে জানাল, অনিরুদ্ধ কলকাতায় নেই, বাইরে গিয়েছে দিনচারেক হল।

কোথায় গিয়েছেন জান?

আজ্ঞে না, যাবার সময় কিছু তো বলে যান নি। ফোনেই জবাব এল।

কবে ফিরবেন জান কিছু?

না। পুনরায় ফোনে জবাব শোনা গেল।

ফোনটা রেখে এবার মিঃ গুহ শীলার মুখের দিকে তাকালেন, তাহলে কি করবেন? আপাততঃ কোন হোটেলে দু-চারদিন থেকে তারপর মিঃ ঘোষ এলে সেখানে গিয়ে উঠবেন, না—

যেমন আপনি বলবেন। শীলা বলে।

আপনি হোটেলে উঠেছেন শুনলে উনি যদি এসে আমার উপরে অসন্তুষ্ট হন। না, তার চাইতে চলুন বরং আপনি সেখানেই থাকবেন—বিশেষ আপনারা যখন পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত।

অতঃপর মিঃ গুহই তাঁর নিজের গাড়িতে করে শীলা রায়কে নিয়ে নরহরির বরাহনগরের বিরাট সরকার ভবনে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

প্রায় এক বিঘে জায়গার উপরে বিরাট প্রাসাদোপম সেকেলে স্ত্রাকচারের দ্বিতল গৃহ। বাড়ির পশ্চাতে বেশ প্রকাণ্ড একটা ফল-ফুলের বাগান, বর্তমানে অযত্নে ও অবহেলায় প্রায় জঙ্গলে পরিণত হয়ে এসেছে।

তারপরই গঙ্গা।

ডাইনে এবং বাঁয়েও আট-নয় কাঠা করে জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান, বিরাট পাখীর খাঁচায় নানাজাতীয় পাখী, অর্কিড হাউস, গ্যারেজ, আস্তাবল, দাসদাসী, মালী, সহিস-সোফার-ড্রাইভার ইত্যাদিদের থাকবার ব্যবস্থা।

সত্যিকারের ধনীগৃহেরই জাঁকজমক ও ব্যবস্থা।

নরহরির আমলের ভৃত্যদের মধ্যে একমাত্র একজন পুরাতন ভৃত্য রামচরণ ও মালী বংশী ছাড়া অনিরুদ্ধ আর সকলকেই বিদায় দিয়ে নতুন লোক সব ইতিমধ্যেই নিযুক্ত করেছিল।

রামচরণকেও হয়তো বিদায় করত, কিন্তু উইলের নির্দেশে সেটা অনিরুদ্ধর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

দোতলা বাড়ির উপরে ও নীচে প্রায় খান-কুড়িক নানা আকারের ঘর। সেকেলে

ধনী অতএব নাচঘর থেকে শুরু করে সব ব্যবস্থাই ছিল ওই বাড়িতে। সেকেলে ধরনের সব ভারী মজবুত দামী আসবাবপত্রে বিরাট সরকার ভবনের প্রতিটি ঘরই বলতে গেলে সেকেলে রুচি অনুযায়ী সাজানো-গোছানো।

তিন-চারজন নতুন ভৃত্যকে অনিরুদ্ধকেও নিযুক্ত করতে হয়েছে সে সব কিছুর সর্বক্ষণ তদ্বির-তদারক করতে।

দোতলার দক্ষিণপ্রান্তের খান দুই ঘর অনিরুদ্ধ আসবার পর অধিকার করেছিল, বাদবাকী সব তালাবন্ধই পড়েছিল পূর্বেকার মত।

মিঃ গুহ শীলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তার পরিচয় দিয়ে, দোতলার উত্তর প্রান্তের দুখানা ঘরে রামচরণকে দিয়ে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

রামচরণ তার কর্তার উইলের ব্যাপারটা জানত, তাই শীলার পরিচয় পেয়ে সাদরেই আহ্বান জানাল।

রামচরণের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বেই হবে। জাতে সদ্‌গোপ। ওই বাড়িতে তার প্রায় ত্রিশ বছরেরও অধিক কেটেছে। ছোটখাটো বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটি। বিয়ে-থা করে নি, সংসারে আপনার জনও কেউ নেই। লোকটা শান্ত, নির্বিরোধী ও মিতবাক প্রকৃতির।

শীলাকেও প্রথম পরিচয়েই যেমন রামচরণের পছন্দ হয়, শীলারও তেমনি রামচরণকে পছন্দ হয়।

অনিরুদ্ধকেও রামচরণের মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল।

শীলা ওই বাড়িতে আসার দিন পনের পরে অনিরুদ্ধ এক সন্ধ্যারাত্রে ফিরে এল এবং তারপরই বর্তমান নাটকের শুরু।

রামচরণের মুখে ওই গৃহে শীলার আগমনসংবাদ ও পরিচয় পেয়ে প্রথমটায় অনিরুদ্ধ যেন থমকে গিয়েছিল, একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল।

কিন্তু রামচরণ যখন বললে, আপনি বিশ্বাস করছেন না ছোটবাবু, দিদিমণিকে ডেকে আনব ?

না, না—তার দরকার নেই। চল, আমিই যাচ্ছি।

তারপর রীতিমত আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিল অনিরুদ্ধ। রামচরণ তাকে অনুসরণ করেছিল।

রামচরণই দেখিয়ে দেয় কোন্ ঘরে শীলা আছে। দরজাটা ভেজানোই ছিল। ভেজানোই থাকত। দিনের বেলা খুব ভোরে স্নানের জন্য বাথরুমে যাবার সময় ব্যতীত সারাটা দিন কখনো বড় একটা শীলাকে কেউ এ কদিন ঘরের বাইরে যেতে দেখে নি।

রামচরণ দু-একবার বলেছে, বাগানে রাত্রে যাবেন না দিদিমণি।

কেন বল তো ?

ওদিককার বাগানটা অনেকদিন ধরে বড় একটা যত্ন নেওয়া হয় না। জঙ্গল

আগাছায় ভরে আছে—দু-চারবার সাপও বের হয়েছে।

মৃদু হেসে শীলা বলেছে, সাপও তাদের ক্ষতি না করলে কখনো দংশায় না রামচরণ।

কিন্তু দিদিমণি—

ভয় নেই তোমার, ওরা আমাকে কিছু বলবে না।

রামচরণের নিষেধ শোনে নি শীলা।

ঘরের দরজাটা ভেজানো দেখে অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রামচরণের মুখের দিকে তাকাতেই সে বললে, দরজা খোলাই আছে, আপনি যান ভিতরে।

কথাটা বলে রামচরণ আর দাঁড়াল না। কাজে অন্যত্র চলে গেল।

কিন্তু অনিরুদ্ধ সোজা ঘরে ঢুকলো না। মুহূর্তকাল যেন কি ভেবে ভেজানো দরজার গায়ে মৃদু টোকা দিল।

বার-দুই টোকা পড়তেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এল, কে?

ভিতরে আসতে পারি?

আসুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অনিরুদ্ধ দেখলো দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা উঁচু ব্যাক রেস্ট্ দেওয়া আরামকেদারায় বসে আছে শীলা। মাথা ও এলো খোঁপাটার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

অনিরুদ্ধর পদশব্দ পেয়েই উঠে দাঁড়ায় শীলা। এবং দু'জোড়া চোখে চোখা-চোখি হল।

বেশ কিছুক্ষণ একটা, তারপরই স্তব্ধতা।

দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ কেবল। পলক পড়ে না দু'জোড়া চোখেরই।

আপনি মানে—তুমি—

অনিরুদ্ধ কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে না। উচ্চারিত শব্দটাকে তৎক্ষণে থামিয়ে দিয়ে মৃদু শান্তকণ্ঠে বলে শীলা, নমস্কার, বস।

তুমি—মানে তুমি শীলা!

হ্যাঁ। বলতে পার একপ্রকার মৃত্যুর হাত থেকেই বেঁচে এসেছি।

কিন্তু—

তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস!

কিন্তু তুমি তো—মানে হ্যাঁ, আপনি-তো শীলা নন?

অনিরুদ্ধর স্পষ্ট তীক্ষ্ণ অস্বীকৃতিতেও কিন্তু এতটুকু কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না শীলার মুখে। বরং মুহূর্ত-পরে নির্মল হাসিতে মুখখানা তার স্নিগ্ধ—আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

এবং পূর্ববৎ মৃদুকণ্ঠেই পুনরায় শীলা বললে, চিনতে পারলে না আমাকে?

চিনতে পারছি বৈকি—আপনি শীলা নন।

কি বলছ তুমি অনিরুদ্ধ ?

ঠিকই বলছি।

ঠিকই বলছ ?

হ্যাঁ, কারণ সত্যিই আপনি শীলা নন।

শীলা নই আমি ?

না, আপনি শীলা নন।

আমিই শীলা, অনিরুদ্ধবাবু।

না—না—না।

বলতে বলতে মুহূর্তকাল আর দাঁড়াল না অনিরুদ্ধ ঘরের মধ্যে, ঝড়ের মতই যেন দরজা ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোজা এসে ঢুকল নিজের ঘরে। তখুনি ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে মিঃ গুহর অফিসে ফোন করল।

গুহ ওই সময় অফিসেই ছিলেন, ফোন ধরলেন।

মিঃ গুহ, আমি অনিরুদ্ধ ঘোষ, বরাহনগর থেকে কথা বলছি—

কি ব্যাপার, মিঃ ঘোষ ?

আপনার একটা মস্ত ভুল হয়েছে।

ভুল !

হ্যাঁ, শীলা রায় পরিচয়ে যাকে আপনি এখানে এনে কিছুদিন হল উঠিয়েছেন সে আদপেই আসল শীলা রায় নয়।

কি বলছেন আপনি ?

হ্যাঁ, কোন ইম্পসটার—প্রতারক আপনার চোখে ধুলো দিয়েছে।

না, না—এ আপনি কি বলছেন! ভাল করে সমস্ত পরিচয় নিয়ে দেখেশুনে স্যাটিস্‌ফায়েড হয়েই তবে ওকে আমি—

না, না—ইউ হ্যাভ্‌ মেড্‌ এ মিস্‌টেক—সি ইজ্‌ নট শীলা রায়। আপনি এখুনি একবার এখানে আসুন।

ফোন পাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিঃ প্রতাপ গুহ তাঁর গাড়িতে চেপে চলে এলেন বরাহনগরে নরহরি ভবনে।

সোজা গিয়ে ঢুকলেন তারপর অনিরুদ্ধর ঘরে।

ঘরটা তাঁর চেনা ছিল ভালই কারণ ইতিপূর্বে অনিরুদ্ধর ওই গৃহে আসা অবধি গত দেড় বৎসরে অন্তত বার-পাঁচ-সাত তাঁকে ওই স্থানে আসতে হয়েছে।

কনুই থেকে প্রায় নিশ্চল অকর্মণ্য ডান হাতটি অসহায়ের মত বুকের কাছে ভাঁজ হয়ে স্থির হয়ে আছে। দ্বিতীয় হাতটি পরিধেয় প্যাণ্টের পকেটে প্রবিষ্ট। অস্থির অশান্ত পায়ে অনিরুদ্ধ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল তখন।

মিঃ গুহর পদশব্দে ঘুরে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ পায়চারি থামিয়ে, মিঃ গুহ !

হ্যাঁ, কি ব্যাপার ? আপনি হঠাৎ—

এ আপনি কি করেছেন মিঃ গুহ, আমার সঙ্গে একটা পরামর্শ না করেই আমার অনুপস্থিতিতে ওই মেয়েটিকে এ বাড়িতে এনে ঢোকালেন কেন ?

মিঃ গুহ অনিরুদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, আপনি ঠিক বলছেন—আপনি স্থিরনিশ্চিত ওই মহিলাটি সত্যিসত্যিই আমাদের শীলা রায় নন ?

আই এ্যাম্ ডেড্‌সিওর সি ইজ নট্ শীলা রায় :

কিন্তু আমিও যে সর্বরকমভাবে পরীক্ষা করে যাচাই করে সন্তুষ্ট হয়ে তবে—

না না মিঃ গুহ, আপনার ভুল হয়েছে। এটা বুঝতে পারছেন না কেন, আপনি তাকে জীবনে ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নি একমাত্র ছবিতে ছাড়া—কিন্তু আমি তাকে দেখেছি এবং মাসছয়েক ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাও করেছি।

আপনার কথা যে সত্য তা আমি অস্বীকার করছি না মিঃ ঘোষ, আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল তাও জানি—কিন্তু সেও তো চার-পাঁচ বছর আগেকার কথা। এই কয় বৎসরে তাঁর চেহারায় পরিবর্তনও তো হতে পারে। মিঃ গুহ পুনরায় বললেন।

হতে পারে স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে যার সঙ্গে একসময় দীর্ঘ ছয় মাস মেলামেশা করেছি—তাকে আজ চিনতে পারব না এও যে হতে পারে না !

কিন্তু কেন আপনার এ কথা মনে হচ্ছে বলুন তো মিঃ ঘোষ ? এঁর চেহারা কি আপনার পূর্ব-পরিচিত শীলা রায় থেকে অন্য রকম ?

না, চেহারা অবিশ্যি হুবহু এক। কিন্তু তবু—

তবু কি ?

তবু—তবু কি যেন নেই ওর মধ্যে, কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য—মানে আপনাকে ঠিক আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না মিঃ গুহ, চেহারা হয়তো হুবহু একই, তবু—তবু আই এ্যাম্ সিওর, এ সেই শীলা রায় নয়।

একটা অস্থিরতা যেন অনিরুদ্ধর কথা ও ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশ্রী একটা অস্বস্তিতে যেন অনিরুদ্ধ ছট্‌ফট করছে মনে হল মিঃ গুহর।

আর কিছু—আপনি ওঁর অন্যান্য পরিচয় যাচাই করে দেখেছেন ? মিঃ গুহ আবার প্রশ্ন করলেন।

না, তা অবিশ্যি করি নি।

কেন করলেন না ?

আঃ, আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না। আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না —সে-সবের কোন-প্রয়োজনই বোধ করি নি বলেই !

মিঃ গুহ অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বেশ চিন্তিত তিনি।

হুঁ, আপনি এ কথা তাঁকে বলেছেন ? এক সময় আবার মিঃ গুহ প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয়ই, বলেছি বৈকি।

উনি কি বললেন ?

কি আবার বলবে—বলবার আছেই বা কি ?

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তুই নেই মিঃ গুহ। সি মাস্ট লিভ দিস হাউস ইমিডিয়েটলি। আর আপনি—হ্যাঁ, আপনি যদি সে ব্যবস্থা না করেন তো—ওয়েল, আমাকে পুলিসে ইনফর্ম করতেই হবে।

মিঃ গুহ এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বেশ। তবে তাই করুন—আমি তাঁর আইডেনটেটি সম্পর্কে ফুললি স্যাটিস্ফায়েড্!

বেশ, তবে যা ব্যবস্থা করবার আমিই করছি।

অনিরুদ্ধ কথা শেষ করেই ফোনের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেল পুলিসে সংবাদ দিতে। মিঃ গুহ ঘর থেকে বের হয়ে শীলার ঘরের দিকে চললেন।

বলাই বাহুল্য সেই দিনই দ্বিপ্রহরে থানা অফিসার অমিয় চক্রবর্তী এলেন সরেজমিনে ব্যাপারটা তদন্ত করতে। অমিয় চক্রবর্তীও হালে পানি পেলেন না তিনিও গিয়ে হেড কোয়ার্টারে ব্যাপারটা রিপোর্ট করলেন।

অবশেষে কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা ভাল করে তদন্ত করবার জন্য পাঠালেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টার শাশ্বত চৌধুরীকে।

শাশ্বত চৌধুরী অবশেষে এলো ব্যাপারটা তদন্ত করতে একদিন।

সলিসিটার মিঃ প্রতাপ গুহ রাজী না হওয়ায় এবং ব্যাপারটা তখনো পুলিসের তদন্তসাপেক্ষ থাকায় শীলা ওই বাড়িতেই থেকে গেল। অনিরুদ্ধ নানাভাবে চেষ্টা করেও শীলাকে বাড়ি থেকে বের করতে পারল না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল বিচিত্র। এক বাড়িতে থাকায় মধ্যে মধ্যে দুজনার দেখাসাক্ষাৎও হতে লাগল; অনিরুদ্ধ দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু শীলা প্রসন্ন হাসিতে ব্যাপারটা উপেক্ষা করে।

এমন কি একদিন শীলা এ কথাও বলেছে, তুমি আমাকে সন্দেহ করছো কেন বুঝতে পারছি না অনিরুদ্ধবাবু! তুমি বিশ্বাস কর সত্যিই আমি সেই শীলা। ছদ্মবেশী কোন প্রতারক সত্যিই আমি নই।

রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছে অনিরুদ্ধ, আপনার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়। এমন কি আপনার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা হয়। দয়া করে যে কদিন আপনি এখানে আছেন আমার সামনে আসবেন না।

ওই ধরনের রূঢ় কথার পরও কিন্তু ব্যাপারটা শীলা প্রসন্ন ভাবেই গ্রহণ করেছে।

॥ চার ॥

শাশ্বত প্রথমে অনিরুদ্ধর ঘরেই প্রবেশ করে।

দুজনের মধ্যে শীলা সম্পর্কে নানা কথাবার্তাও হয়। যথাসাধ্য শাশ্বতকে বুঝাবার চেষ্টা করে অনিরুদ্ধ—ওই শীলা আসল শীলা নয়। নরহরির বিরাট

সম্পত্তির লোভে কোন ছদ্মবেশী প্রতারক এসে জুটেছে।

মৃদুকণ্ঠে শাশ্বত বলে, সবই বুঝলাম মিঃ ঘোষ। কিন্তু যে সমস্ত প্রমাণ পেশ করেছেন উনি তাতে কারো তো ও ধরনের কোন সন্দেহই টেঁকে না। ওঁর মায়ের সব পুরাতন চিঠিপত্র, নরহরিবাবুর যে বন্ধু শীলাকে সাহায্য করতেন তাঁর চিঠি—ওঁর চেহারার অবিকল মিল, ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটের সার্টিফিকেট, ট্রেনের সেদিনকার টিকিট এ সব কিছুই আপনারই মত তাহলে উনি যোগাড় করলেন কি করে?

ওসব যোগাড় করা কি এতই কঠিন! নিশ্চয়ই ওই মেয়েটির পিছনে কোন বড় একদল চক্রান্তকারী আছে যারা সেরাত্রে ট্রেনে পূর্ব হতেই ব্যাপারটা জেনে আসল শীলাকে অনুসরণ করেছিল, তারপর ট্রেন-এ্যাকসিডেন্টের সুযোগে—

শাশ্বত চৌধুরী চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধর মুখের দিকে।

অনিরুদ্ধ তখনও উৎসাহের সঙ্গে বলে চলেছে, এ ধরনের প্রতারণার ব্যাপার যে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি তাও তো নয়!

ঘটে নি যে তা অবিশ্যি আমি বলছি না, তবে—

তবে? তবে আপনাদের বিশ্বাস করতেই বা বাধাটা কোথায়?

তবু বাধা আছে বৈকি মিঃ ঘোষ। এ কথাটা তো ভুললে চলবে না, উনি একজন নারী! একজন নারীর পক্ষে এ ধরনের রিস্ক নেওয়া—

ভুলবেন না মিঃ চৌধুরী, এ জগতে এমন মেয়েমানুষও আছে যারা স্বার্থের লোভে এর চাইতেও জঘন্য কাজে নামতে পারে।

কিন্তু আপনারও তো—আপনাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় চার বৎসর পূর্বেকার ছয় মাসের পরিচয়ের যুক্তিটি ছাড়া, ওকে অস্বীকার করবার অন্য রকম যুক্তি আর নেই!

কিন্তু সেইটে কি যথেষ্ট নয়?

না, নিশ্চয়ই নয়। আর আপনারও কি উচিত ছিল না তাকে আরো নানাভাবে পরীক্ষা করে যাচাই করে দেখা! সে সব কিছু আজ পর্যন্ত আপনি করেছেন কি?

কি বলতে চান আপনি মিঃ চৌধুরী?

আপনাদের একসময় দীর্ঘ ছয় মাস ধরে পরিচয় ছিল পরস্পরের মধ্যে, এটা তো আপনি বলেছেন?

নিশ্চয়ই।

সেই ছয় মাস সময়ে হয়তো এমন কত কথা আপনাদের মধ্যে হয়েছে—এমন হয়তো কত ঘটনা ঘটেছে, সে সব দিয়েও তো ইতিমধ্যে ওকে আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন?

না, তা অবিশ্যি করি নি আমি। তবে এটা ঠিক যে, সে শীলা ও নয়।

মিঃ ঘোষ, কেবলমাত্র আপনার ওই যুক্তিতেই আপনি শীলা দেবীকে এ গৃহ হতে বিতাড়িত করতে পারবেন না। আইনের সামনে যে সমস্ত প্রমাণ উনি—মানে শীলা দেবী উপস্থাপিত করেছেন তার জোরেই তিনি এখানে থাকবার অধিকার তো

প্রাবেনই, আপনি বরং মৃত নরহরিবাবুর উইল অনুযায়ী ওঁকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তাঁর সম্পত্তির এক কপর্দকও পাবেন না।

শাশ্বতর শেষের কথায় অনিরুদ্ধ সহসা চিৎকার করে ওঠে, গায়ের জোর নাকি ?

গায়ের জোর নয়, আইন তাই বলবে, আমরাও তাই বলব।

তার মানে আইন অন্যায়ভাবে জুলুম করবে ?

অন্যায় তো আপনি বলছেন, আইনে তো তা বলছে না !

উঃ, অসহ্য এ জবরদস্তি আপনাদের !

শাশ্বত প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে মাত্র।

কিন্তু আমিও বলে রাখছি মিঃ চৌধুরী, ওকে এখান থেকে যেতে হবেই !

এবারেও শাশ্বত প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে মৃদু হাসল।

শাশ্বত অতঃপর অনিরুদ্ধর ঘর থেকে বের হয়ে শীলা রায়ের কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

শীলা তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে আরামকেদারাটার উপরে বসে একটা টেবিলক্লথে রঙিন সুতোর সাহায্যে গভীর মনোযোগসহকারে ফুল তুলছিল।

নমস্কার। ভিতরে আসতে পারি মিস রয় !

কে ? আসুন—। বলতে বলতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় শীলা।

শাশ্বত বললে, স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি—আমার নাম শাশ্বত চৌধুরী।

ও। নমস্কার—বসুন।

॥ পাঁচ ॥

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল শাশ্বত মেয়েটিকে।

রোগা ছিপছিপে গড়ন। উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ। কিছুটা লম্বাটে হলেও মুখের ডৌলটি সত্যিই ভারি চমৎকার। ছোট কপাল। ঈষৎ টানা ধনুকের মত বাঁকানো ভ্রূ। দীঘল নাসা। সব কিছু মিলিয়ে সমস্ত মুখখানিতে যেন একটি আশ্চর্য কমনীয়তা মেয়েটির। শান্ত, স্নিগ্ধ, নিষ্পাপ, সরল মাধুর্য।

পরিধানে সাধারণ একটি সাদা ব্লাউজ ও অনুরূপ একটি সরু কালাপাড় মিলের পরিচ্ছন্ন শাড়ী। হাতে একগাছি করে মাত্র সরু সোনার বেঁকি রুলি। গলায় একটি সরু মাপচেন। আর দেহের কোথায়ও অলঙ্কারের এতটুকু বাহুল্য নেই।

বসুন ! আবার শীলা রায় অনুরোধ জানাল শাশ্বত চৌধুরীকে।

সামনেই একটা খালি চেয়ার ছিল। শীলা রায়ের অনুরোধে শাশ্বত সেই চেয়ারটাতেই উপবেশন করে।

শাশ্বত কোনরূপ ভণিতা না করেই সোজাসুজিই কথা সুরু করে, এক সময়ে দিল্লীতে আপনার ও অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছিল মিস রয়, তাই না ?

মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল শীলা রায়।

বেশ ঘনিষ্ঠতাই তো হয়েছিল সে সময় আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে, তাই তো?

এবারও নিঃশব্দে মৃদু হেসে সম্মতি জ্ঞাপন করল শীলা।

উনি তো আপনাকে অস্বীকার করছেন, কিন্তু ওঁর সম্পর্কে আপনার মত কি?

এতক্ষণে মৃদুকণ্ঠে শীলা কথা বললে, আমাকে যে কেন উনি চিনতে পারছেন না বুঝতে পারছি না!

আপনি তাহলে ওঁকে ঠিক চিনতে পেরেছেন?

তা পেরেছি বইকি।

আপনার কোন দ্বিধাই নেই ওঁর সম্পর্কে?

কেন থাকবে বলুন তো!

প্রথম সেদিনকার সেই সাক্ষাতের পর আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে আর কোন কথাবার্তাই হয় নি, তাই না?

উনি তো দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেন—তা কথাবার্তা হবে কি!

আচ্ছা একটা কথা মিস রয়—

বলুন?

ট্রেন-এ্যাকসিডেণ্টের পর মাথায় আঘাত লেগে আপনার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল শুনেছি, তাই তো?

হ্যাঁ।

পূর্বস্মৃতি যখন আপনি ফিরে পেলেন, সব অতীতের কথাই কি সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্পষ্ট মনে পড়েছিল?

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, একটু একটু করে সব কথাই মনে পড়েছিল বইকি ক্রমশ।

এখন বোধ হয় সবই স্পষ্টভাবে মনের মধ্যে আবার সমস্ত অতীতটাই আপনার ফিরে এসেছে?

তা এসেছে।

আপনার অতীত জীবনের কতকগুলো কথা আমি স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মানে বুঝতেই পারছেন—আপনার একান্ত ব্যক্তিগত কথা!

করুন, সাধ্যমত আমি জবাব দেবার চেষ্টা করব। তার পরেই মৃদু হেসে শীলা বলল, বুঝতে পারছি অবিশ্যি কি কথা আপনি জিজ্ঞাসা করতে চান—

বুঝতে পেরেছেন?

তা পেরেছি বইকি!

কি বলুন তো? অনিরুদ্ধবাবুর কথা তো?

এতটুকু সংকোচ বা বিকারমাত্রও ছিল না বুঝি ওই সময় শীলার কণ্ঠস্বরে।

ওই মুহূর্তে শাশ্বতর মনে হয়, মেয়েটির আগাগোড়া যদি সত্যিসত্যিই সব কিছুই প্রতারণা হয়ে থাকে তো বলতে হবে, মেয়েটি শুধু চালাকচতুরই নয়, অসাধারণ নার্ভও আছে মেয়েটির। এবং বুদ্ধিমতী তো বটেই। আর তাই বোধ হয় কিছুক্ষণ প্রশংসার দৃষ্টিতে শীলার মুখের দিকে না চেয়ে থেকে পারে না

শাশ্বত।

তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করে, কিন্তু বুঝলেন কি করে যে আমি ওই কথাই জিজ্ঞাসা করব? প্রশ্নটা করে মৃদু হাসল শাশ্বত।

আপনিই বলুন, ওই কথাটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু—

কিন্তু, কী?

ঘটনাচক্রে আমাদের দুজনার মধ্যে একসময় পরিচয় হয়েছিল মিঃ চৌধুরী সত্যিই এবং সে পরিচয়ের মধ্যে সেদিন কিছুটা যে ঘনিষ্ঠতাও গড়ে ওঠে নি, তাও আমি অস্বীকার করব না। তবু—

বলতে বলতে শীলা সহসা থেমে যায়।

থামলেন কেন, বলুন?

বলছিলাম প্রীতির সঙ্গে ভালবাসার যেন ভুল করবেন না।

কিন্তু—

হ্যাঁ, তাই। ঘনিষ্ঠতা সেদিন প্রীতি পর্যন্তই পেঁৗছেছিল—ভালবাসা পর্যন্ত গড়ায় নি হয়তো।

শীলার ঐভাবে স্পষ্ট করে বলবার পর ঠিক কি ভাবে কোন্ কথাটি বলবে শাশ্বত বুঝে উঠতে পারে নি কয়েকটা মুহূর্ত। তাই কিছুটা সময় অতঃপর বুঝি সে চুপ করেই ছিল।

কিন্তু তারপরই সে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা মিস রয়, নরহরিবাবুর উইলের সারমর্মটা নিশ্চয়ই আশা করি আপনি জানেন?

জানি। উইলের সব কথা লিখেই তো মিঃ গুহ আমাকে কলকাতায় আসবার জন্য লিখেছিলেন!

ও, তাহলে আপনি অনিরুদ্ধবাবুকে বিবাহ করতে রাজী আছেন?

তার মানে?

মুহূর্তকাল। আবার যেন শাশ্বত শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর মৃকণ্ঠে বললে, কথাটা আমার না বুঝবার মত তো কিছু নেই মিস্ রয়!

না না, তা নয়। বলছিলাম অপনি ঠিক কি জানতে চান আপনার ওই প্রশ্নের দ্বারা, আর একটু স্পষ্ট করে যদি বলেন—

বলছিলাম অনিরুদ্ধবাবুকে বিবাহ করতে রাজী ছিলেন বলেই তো আপনি সেরাত্রে কলক্যাতা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন?

ঠিক তাই নয় বটে—আবার কিছুটা তাই বইকি!

কি রকম?

দেখুন মিঃ চৌধুরী, আমার কথাটা আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু—

বলুন, থামলেন কেন?

নরহরিবাবুর সঙ্গে আমার কোনদিন আলাপপরিচয় ছিল না। এমন কি মিঃ

গুহর চিঠিতে সব জানবার পূর্বে ওই নামটাও কখনো আমি শুনি নি বা শুনেছি বলেও আমার মনে পড়ে না।

আপনার মায় মুখেও না ?

না। তাই মিঃ গুহর চিঠিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন একজন মানুষের হঠাৎ ওই ধরণের একটা বিচিত্র উইলের ও সেই উইলের ততোধিক বিচিত্র শর্তের কথাটা জেনে সত্যি কথা বলতে কি বিস্ময়ের চাইতে যেন একটু কৌতূহলই বোধ করেছিলাম প্রথমটায়।

কৌতূহল ?

তাই। কারণ ওই ধবনের ব্যাপার গল্প-উপন্যাসেই সম্ভব, নয় কি !

কেন ?

নয় কেন, বলুন ! কারণ পরে মিঃ গুহর মুখে যা শুনেছি, অর্থাৎ আমার মাকে একদা কোন এক ধনী ব্যক্তি—নরহরি সরকার নাকি ভালবেসেছিলেন প্রথম যৌবনে। তা ভালবাসুন এবং সে ভালবাসার জন্য চিরকৌমার্যও নাকি গ্রহণ করেছিলেন—ধরুন না হয় তা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়, কারণ ওই ধরনের সিনিক মানুষ মাঝে মাঝে যে একেবারে দেখা যায় না তা নয়, কিন্তু—

সিনিক আপনি বলছেন কেন ?

তা ছাড়া আর কি বলব বলুন ? কোন একটি নারীকে পেলাম না বলে সারাটা জীবন বিয়েই করব না—এর যা-ই যুক্তি থাক না কেন, আমার কাছে সেটা কিন্তু একটু দুর্বোধ্যই। যাক গে, সে তাঁর ব্যাপার। কিন্তু তারপর সেই তারই মেয়েকে বিচিত্র এক বিবাহবন্ধনের স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে নিজের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে যাওয়া ব্যাপারটা এযুগে বিশেষ করে একটা নাটক ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন ! তাই কতকটা কৌতূহলবশবর্তী হয়েই সেদিন চিঠি পেয়েই কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম।

শুধু কি তাই ?

সবটাই তাই বললে আপনিই বা বিশ্বাস করবেন কেন আর দুনিয়াটাই বা বিশ্বাস করবে কেন ? বলতে বলতে হেসে ফেলে শীলা রায়, হ্যাঁ, সম্পত্তি-প্রাপ্তির লোভটাও ছিল বইকি। এতবড় বিপুল বিরাট সম্পত্তি—এত বড় একটা অনায়াসলব্ধ প্রাপ্তি, আমার মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়ে কেমন করেই বা অস্বীকার করতে পারে বলুন ! তবে এটা নিশ্চয়ই হলফ করে বলতে পারি, বিয়ের কথাটা তেমন ভাবি নি—

একটুও ভাবেন নি ?

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম বৈকি—যদি তেমন মনোমত হয়, তবে ক্ষতিই বা কী !

তারপর এখানে এসে ওঁর সঙ্গে যখন দেখা হল ?

তারপর থেকেই তো এ যুদ্ধ শুরু ! মজা মন্দ নয়—উনিও জানেন আমাকে উনি বিয়ে না করলে সম্পত্তি পাবেন না, আমিও জানি ওঁকে বিয়ে না করলে কিছুই

পাব না। অথচ দেখুন বিয়ে না করলে ক্ষতিটা হচ্ছে ওঁরই বেশী।

কেন ?

নয় ? উইলে যাই থাক, সত্যি বলতে গেলে তো উনিই ন্যায্যত অধিকারী এ সব কিছুর। আমি তো এখানে কেউ নই। তাই বলছিলাম ক্ষতি হলে ওঁরই—আমার আর কি !

তা আপনার এখন ইচ্ছাটা কী ?

বিয়ে আমি ওঁকে কোনদিনই করব না ঠিকই—

সে কি !

হ্যাঁ। তবে ওঁর অন্যায় মিথ্যে জুলুমও মাথা পেতে স্বীকাব করে নিয়ে এখান থেকে চলে যে যাব না এও নিশ্চিত।

অগত্যা ব্যাপারটা সত্যিসত্যিই শেষ পর্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল।

অনিরুদ্ধ ঘোষও স্বীকার করে নেবে না ওই শীলা রায়ই আসল শীলা রায়—শীলা রায়ও সে কথা মেনে নেবে না। আর মেনে নেবেই বা কেন ? যত প্রকার প্রমাণ সম্ভব সব প্রমাণসহই সে তার পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব সে-ই বা যাবে কেন ?

॥ ছয় ॥

সবই তো বুঝলাম শাশ্বত, কিরীটী বলে, তা আমি তোমাকে এক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?

ব্যাপারটা তো বার-দুই তোমাকে সব আমি বলেছি, আসল ব্যাপারটা কি তোমার মনে হয় কিরীটী, সর্বাগ্রে সেইটুকুই তোমার কাছ থেকে আমি জানতে চাই।

সেদিন তো তোমাকে আমি বললাম, এর মধ্যে কোন তৃতীয় নারীর অস্তিত্ব আছে কিনা সর্বাগ্রে খোঁজ করে দেখ। যদি থাকে তুমি নিশ্চয়ই হয়তো তোমার পথ খুঁজে পাবে।

তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কিরীটী।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, এড়িয়ে ঠিক যাচ্ছি তা নয় শাশ্বত—

তবে ?

বরং নাটক যেমন জমে উঠেছে তাতে কিছুটা বেশ কৌতূহলই বোধ করছি। কিন্তু—

তবে আর কিন্তু নয়, তুমি একটু সাহায্য কর আমাকে।

বেসরকারী ভাবে, না সরকারী ভাবে ? মৃদু হেসে কিরীটী পাল্টা প্রশ্ন করে।

যেমন তোমার অভিরুচি।

বেশ, তবে সেই কথাই রইল—দুটো দিন আমাকে একটু ভাববার সময় দাও। কারণ ব্যাপারটা একটা কৌতুকপূর্ণ নাটকে পরিণত হলেও, আসলে ওদের মধ্যে

দুজনের একজন যে প্রতারক সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সত্যিই তাই তোমার ধারণা ?

তাই।

কিন্তু তা যদি হয়ই, তাহলে আমি বলব—

দুজনেই মূর্খ, এই তো ?

হ্যাঁ। কারণ তোমার কথাই যদি সত্যি হত কিরীটী, সত্যিই ওরা বোকা—বেশ তো, ওরা দুজনে পরস্পর যদি পরস্পরকে সত্যিই না চায়, বিয়ে করে উইলের শর্তানুযায়ী সম্পত্তিটা বাগিয়ে নিয়ে একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে অনায়াসেই তো যে যার পথ দেখতে পারত। অন্তত আমি হলে তো তাই করতাম। নরহরির সুবিপুল সম্পত্তির সামান্য অংশও তো কম হবে না নেহাৎ। অথচ এইভাবে পরস্পর ওরা রুখে দাঁড়ালে কারো ভাগ্যেই হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু জুটবে না।

কথাটা তুমি নেহাৎ মিথ্যে বা অযৌক্তিক কিছু বলো নি শাশ্বত, কিন্তু তার মধ্যেও একটা কিন্তু আছে—

কিন্তুটা আবার কি ?

কিন্তুটা হচ্ছে, তুমি যে ওই সুবিপুল সম্পত্তির কথা বললে সেটাই। কি জান ভাই, লোভ বড় বিচিত্র বস্তু। ও যখন কাউকে গ্রাস করে জেনো পূর্ণগ্রাসই করে সেই রাহুর মত। যাক, ইতিমধ্যে তোমাকে যা বললাম—একটু খোঁজ করে দেখ, ওই নাটকের মধ্যে তৃতীয় কোন নারী আছে কিনা !

বেশ, তাই হবে।

সেদিনকার মত শাশ্বত বিদায় নিল।

আরও দুটি দিন কিরীটী শীলা আর অনিরুদ্ধর ব্যাপারটা ভাবে।

ব্যাপারটা রহস্যপূর্ণ যতই হোক, রীতিমত যে কৌতুকপূর্ণ সে বিষয়ে অন্তত কোন সন্দেহ নেই। অনিরুদ্ধর কথা শুনে যাই মনে হোক না কেন, মেয়েটি অর্থাৎ ওই শীলা রায় যে রীতিমত বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

তাই ঠিক কি ভাবে, কোন্ পথে অগ্রসর হলে ওই রহস্যের মীমাংসায় পৌঁছতে পারবে কিরীটী ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না। এবং তৃতীয় দিনে যখন পুনরায় শাশ্বত ওর ওখানে এল, কিরীটী তার একটা ভবিষ্যতের কার্যসূচী মনে মনে ছকে ফেলেছে।

সোফার ওপরে বসতে বসতে শাশ্বত বললে, না কিরীটী, তোমার নির্দেশমত এ দুদিন নানাভাবে চেষ্টা করেছি জানবার, কিন্তু—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, কিন্তু তৃতীয় নারীর কোন সন্ধান করতে পারলে না, এই তো ?

হ্যাঁ। আগে আগে নাকি অনিরুদ্ধ প্রায়ই বিকেলের দিকে বের হয়ে ফিরত রাত দশটা সাড়ে দশটায়, কিন্তু ইদানীং শীলা রায় আসা অবধি ওই বাড়িতে ও

নাকি একদিনও বাড়ি থেকে বের হয় নি।

বল কি!

তাই।

কেউ দেখা করতেও আসে না?

না।

তাহলে তুমি বলতে চাও শাশ্বত, গত দেড় বৎসর সময় কলকাতায় অবস্থানের মধ্যে কারও সঙ্গেই তার বড় একটা আলাপপরিচয় বা হৃদ্যতা হয় নি?

সেই রকমই তো শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু কথাটা তো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না শাশ্বত। স্বাভাবিকও নয় ওর পক্ষে।

বাঃ, এর মধ্যে অবিশ্বাসেরই বা কি থাকতে পারে? আর অস্বাভাবিকই বা হতে যাবে কেন?

তা হচ্ছে বইকি—

কি রকম?

প্রথমতঃ ভদ্রলোক বয়সে তরুণ, অবিবাহিত, এত বড় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, আর—

আর—

যে লোক মাত্র ছয় মাসের জন্য কার্যোপলক্ষে দিল্লীতে গিয়ে কোন এক শীলা রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে, তার এই দেড় বৎসর সময়েও কলকাতায় এসে কারও সঙ্গে পরিচয় হয় নি কথাটা কি অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিকই নয়? তা ছাড়া একটু আগেই তো তুমি বললে যে শীলা রায় ওখানে আসবার আগে প্রত্যহই প্রায় বিকালের দিকে বের হয়ে গিয়ে ফিরত সেই রাত দশটা সাড়ে দশটায়। কোথায় যেত সে? চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় নিশ্চয়ই সে রাস্তার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো না বা তার মত অত বস্তুতান্ত্রিক লোক গঙ্গার ধারে বা গড়ের মাঠে গিয়ে ঘণ্টা-চার-পাঁচ ধরে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করে আত্মসমাহিত থাকত না!

শাশ্বত কিরীটীর কথায় না হেসে পারে না। এবং হাসতে হাসতে বলে, নাঃ, কথাটা তোমার উড়িয়ে দেবার মত নয়। যুক্তি আছে অবশ্যই।

সেই যুক্তি আর বিচারই যে তোমার বর্তমান রহস্য-উদ্ঘাটনের একমাত্র সম্বল। কিন্তু যাক সে কথা, আমি ভেবেছি ওখানে—মানে নরহরি ভবনে গিয়ে কিছুকাল থাকব।

থাকবে!

হ্যাঁ, কারণ পাশাপাশি থেকে কিছুদিন সর্বদা একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

বেশ তো, তাহলে শুভস্য শীঘ্রং। চল—কখন যাবে বল, কালই এসে নিয়ে যাব।

সকালের দিকে এস। কিন্তু একটা কথা আছে—

বল।

আমার সত্যিকারের পরিচয়টা সেখানে তুমি দিতে পারবে না।

তবে কি পরিচয় দেবে?

তোমাদের বড়কর্তার সঙ্গে আমার ফোনে কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমি যাব সেখানে সরকারের পক্ষ থেকেই তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে—ওই মানে কিছুদিন থেকে ব্যাপারটা—মানে উভয়কে যথাসম্ভব স্টাডি করে বুঝবার জন্য।

সে তো খুব ভাল কথা। তাহলে কথাটা আমার পূর্বাহ্নেই অনিরুদ্ধবাবুকে জানানো প্রয়োজন।

হ্যাঁ, সেটা আজই না হয় জানিয়ে দিও।

বেশ, তাই হবে।

বলা বাহুল্য সেই পরিকল্পনামতই পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ একটা সুটকেসে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হল কিরীটী শাশ্বতর সঙ্গে বরাহনগরে নরহরির গৃহে।

আগের দিনে টেলিফোনে শাশ্বতর নির্দেশ অনুযায়ী অনিরুদ্ধ সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল কিরীটীর থাকবার এবং ভৃত্য রামচরণকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল ওঁরা এলে ওঁদের ব্যবস্থা করে দিতে।

রামচরণ বোধ হয় তাই গাড়ির সাড়া পেয়েই এগিয়ে এল।

কিরীটী ওখানে আসবার পূর্বে ইচ্ছা করেই নামের সঙ্গে নিজের চেহারাটারও কিছু অদলবদল করে এসেছিল। পরিধানে পাজামা ও পাঞ্জাবি, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে কালো কাচের চশমা, নাম নিয়েছিল ধূর্জটি সিনহা।

কলকাতাবাসী বাঙালী নয় সে। ইউ. পির লোক। তবে দীর্ঘকাল প্রায় বলতে গেলে শৈশব হতেই কলকাতায় থেকেছে ও মানুষ হয়েছে বলে বাংলা ভাষাটা বেশ ভাল করেই রপ্ত করে নিয়েছে।

শাশ্বত রামচরণের পূর্ব-পরিচিত, অতএব শাশ্বতকেই প্রশ্ন করে রামচরণ, ইনিই কি সিনহা সাহেব?

হ্যাঁ। তোমার বাবু অনিরুদ্ধবাবু কোথায়?

বাবু লাইব্রেরী ঘরে আছেন। চলুন আপনাকে ঘরটা আমি দেখিয়ে দিই।

চল—এসো হে সিনহা।

সুটকেসটা হাতে আগে আগে রামচরণ এগিয়ে চলে, পশ্চাতে অগ্রসর হয় ওরা দুজনে।

কিরীটী চশমার কালো কাচের আড়াল থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

কলকাতা শহরের প্রথম আমলের ধনীর গৃহ। যে সময় নব্য কালচার ক্রমশ

শহরে এসে জাঁকিয়ে বসলেও মধ্যযুগের লবাবী কালচারটা ও ঠাটঠমক একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি তখনও।

যাকে বলে বিরাট চকমিলান বাড়ি তাই। বড় বড় প্রকাণ্ড টানা বারান্দা, মোটা মোটা সেযুগের পাথরের কাজ করা থাম। ছাদের উচ্চতা প্রায় তের চৌদ্দ ফিট হবে। বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা যত্ন-পর্যবেক্ষণের অভাবে, কার্নিশের কোণে কোণে পায়রার নীড় ও তাদের ক্রমবংশবৃদ্ধির দৌরাত্ম্যে, কালি ঝুল ও চামচিকায় কেমন যেন মলিন ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

বিরাট দুটি মহল—বহির্মহল ও অন্দরমহল। বড় বড় সব ঘরে বিরাট বিরাট সব ভারী মেহগনি পালিশ করা সেগুন কাঠের দরজা। দরজাগুলো প্রায়ই বন্ধ, বড় বড় তালা ঝুলছে। সংস্কারের অভাবে বহুস্থানে দেওয়ালের চুনবালি খসে খসে পড়ছে, ফাটল ধরেছে, মেঝের সানেও দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সব ফাটল। সর্পিল লালসায় যেন সময় তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এখানে ওখানে ধুলো আর আবর্জনা। কেমন যেন একটা ধুলোর, পুরাতন বাড়ির গন্ধ বাতাসে।

প্রশস্ত মারবেল পাথরের সিঁড়ি, সাদায় কালোয় যেন মনে হয় কার্পেট বিছানো।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে কিরীটী শাশ্বতর সঙ্গে দ্বিতলে উঠে এল।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি একদা সাদাকালো মারবেল বাঁধানো বারান্দা উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে চলে গিয়েছে পশ্চিমপ্রান্তে। মনে হয় যেন একটা সাদাকালো দাবার ছক কেউ পেতে রেখেছে। সেই বারান্দার গায়ে পর পর সব ঘর। মধ্যে মধ্যে দেওয়ালে টাঙানো চওড়া কারুকার্যমণ্ডিত সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো বিলাতী ছবি।

রাজারাজড়া থেকে শুরু করে স্নানরত উলঙ্গ মেমসাহেব, ঘোড়া, বিলাতী কুকুর, পুরাতন ফ্যাশনের সব ছবি। একসময় ওই সব ছবির প্রচুর কদর ছিল কলকাতা শহরের ধনীদের গৃহে। শহরে বিলাতী সভ্যতা ও কালচারের অন্যতম নিদর্শন ছিল ওইগুলো।

আগে আগে রামচরণ ও তার পশ্চাতে শাশ্বত ও কিরীটী চলেছিল। অবশেষে একটা ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে সকলে দাঁড়াল।

বাবু, এই ঘর আপনার জন্য ঠিক হয়েছে। রামচরণ বললে।

ওরা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

বেশ প্রশস্ত আকারের ঘরখানি। ঘরের মধ্যে আসবাবও রয়েছে। বিরাট একটি পালঙ্কে শয্যা বিস্তৃত। একধারে বড় একটি সেকেলে কাজ করা ভারী আলমারি। তারই একটি পাল্লায় প্রমাণ সাইজের আর্শী বসানো। খান দুই চেয়ার, একটি টেবিল, একটি আলনা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই কিরীটী রামচরণকে নির্দেশ দিল ঘরের জানালাগুলো সব খুলে দিতে।

গরাদহীন বড় বড় জানালা। প্রত্যেকটি জানালায় দুই জোড়া করে পাল্লা। একটি রঙিন কাচের পাল্লা ও অন্যটি ঝিলমিলির পাল্লা। পশ্চিমদিকের জানালা

খুলতেই কিরীটীর নজর পড়ল পশ্চাৎভাগের বাগান ও তার পরেই দূরে ওই গঙ্গা।

ঘরেব জানলাপথেই স্পষ্ট গঙ্গা চোখে পড়ে।

কিরীটী বেশ খুশীই হয়।

বাথরুম ও স্নানের ঘর কোথায় রামচরণ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

এই ঘরের দুখানা ঘর পরেই বাথরুম ও স্নানের ঘর বাবু।

তাহলে একবার তোমার দিদিমণি আর অনিরুদ্ধবাবুকে সংবাদ দাও রামচরণ। ওঁর সঙ্গে তোমাব দিদিমণি আর বাবুর আলাপ করিয়ে দিয়ে যাই। কথাটা বললে শাশ্বত।

আজ্ঞে, এখনি আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে।

রামচরণ চলে গেল।

কেমন লাগছে জায়গাটা কিরীটী?

বেশ নিরিবিলি। শহরের গোলমাল নেই, কটা দিন মন্দ কাটবে না। তবে বাড়ি দেখেই বোঝা যায় নরহরির স্বর্গত পিতৃদেব রাখহরি সরকার সত্যিকারের একজন ধনীই ছিলেন।

।। সাত ।।

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাইরের বারান্দায় চপ্পলের শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল অনিরুদ্ধ আসছে।

অনিরুদ্ধই। সুশ্রী পুরুষ অনিরুদ্ধ। বলিষ্ঠ দেহের গঠন।

কিন্তু ডান হাতটি বিকল ও অকর্মণ্য হওয়ায়, কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে দেহ-সংলগ্ন থাকায়—সেই একটিমাত্র ত্রুটিতেই যেন প্রথম দর্শনেই মনে হয় অনিরুদ্ধ বুঝি অমন সুশ্রী বলিষ্ঠদেহী হওয়া সত্ত্বেও কুৎসিত। বিকলাঙ্গর এমনি অভিশাপ!

প্রথম শীতের মিষ্টি একটা ঠাণ্ডা পড়েছে। পরিধানে ধুতির সঙ্গে ভায়লার প্যাঞ্জাবি ও তদুপরি পাতলা কমলালেবু রঙের একটা শাল গায়ে। পায়ে দামী রবার প্যাড্ দেওয়া চপ্পল। প্রথম দৃষ্টিতেই কিরীটীর অনিরুদ্ধকে মনে হয়, বিলাসের সঙ্গে একটা পরিচ্ছন্ন রুচির সংমিশ্রণও আছে লোকটার চরিত্রে।

মৃদু হেসে অনিরুদ্ধ ওদের অভ্যর্থনা জানাল। মৃদু হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে যেন মুক্তাপংক্তির মত দু'সারি দাঁত মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। কিরীটীর মনে হল সঙ্গে সঙ্গে, লোকটির মুখখানিই শুধু সুশ্রী নয়—হাসিটিও সুন্দর। সুন্দর মুখ হলেই সুন্দর হাসি ফোটে না। এমন অনেক মুখ আছে, সুশ্রী আদপেই নয়, অথচ সুন্দর হাসিটুকুর জন্যই যেন মুখখানা সুন্দর হয়ে ওঠে।

শাশ্বতই পরিচয় করিয়ে দিল, ইনিই ধূর্জটি সিনহা।

নমস্কার।

পূর্ববৎ মৃদু হেসে অনিরুদ্ধ নমস্কার জানাল।

বসুন মিঃ ঘোষ। কিরীটী এবারে বললে অনিরুদ্ধকে।

আমাকে এখানে কি জন্য পাঠানো হয়েছে, কিরীটী বলতে লাগল, আপনি হয়ত গতকালই মিঃ চৌধুরীর মারফৎ শুনেছেন!

হ্যাঁ, উনি আমাকে সব কথাই ফোনে বলেছেন। কিন্তু এসবের প্রয়োজনই বা ছিল কি, তাই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। অত্যন্ত সহজ, সরল একটা ব্যাপারকে এভাবে যে কেন ওঁরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোরালো করে তুলছেন!

বলতে বলতে অনিরুদ্ধ অদূরে উপবিষ্ট শাশ্বতর দিকে তাকাল। শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বরে একটা বিরক্তির ভাব যেন বেশ স্পষ্টই হয়ে ওঠে।

তা যদি বলেন তো, ব্যাপারটাকে জোরালো তো আপনিই করে তুলেছেন অনিরুদ্ধবাবু! সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে কিরীটী কথাটা বলে ওঠে।

আমি? যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনিরুদ্ধ কিরীটীর মুখের দিকে।

তাই নয় কি? আপনিই তো ব্যাপারটার মধ্যে গোলমাল আছে বলে ওদের—অর্থাৎ থানায় সংবাদ দিয়েছিলেন!

কি আশ্চর্য মশাই, সংবাদ দেবো না? কোথাকার একটা cheat এসে জুড়ে বসলো, তার একটা প্রতিকার চাওয়াটাও কি আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে বলতে চান? ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে কথাগুলো বলে অনিরুদ্ধ।

অন্যায় নিশ্চয়ই করেন নি। কিন্তু আপনার কথাই ঠিক, শীলা দেবীর কথাটা মিথ্যে, তারই বা প্রমাণ কি?

কি বলছেন আপনি মিঃ সিনহা! যে লোকের সঙ্গে ছয় মাস পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছে, তাকে আজ আমি চিনতে পারবো না, এটাই বা আপনারা ভাবছেন কেন?

ভাবছি না আমরা কিছুই অনিরুদ্ধবাবু, তবে কথা হচ্ছে কি জানেন—

কী?

আপনি বললেন উনি আসল শীলা দেবী নন, অথচ উনি বলছেন উনিই আসল আদি ও অকৃত্রিম শীলা দেবী তো বটেই—আপনিও নাকি আসল ও অকৃত্রিম অনিরুদ্ধবাবু ওঁর মতে।

তা বলবেন না উনি, সেই কথা বলবার জন্যই তো এসেছেন! কোথাকার কে এক জোচ্চোর; দিব্যি জাঁকিয়ে বসে—

কথাটা অনিরুদ্ধর শেষ হলো না, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়েই সে থেমে গেল।

ব্যাপারটা কিরীটীর নজর এড়ায় নি। শীলা এসে ঘরে প্রবেশ করেশ করল। কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির একটা নিঃশব্দ চকিত বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল মুহূর্তে।

আসুন মিস রয়, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি মিঃ সিনহা—

নমস্কার।

দুটি হাত তুলে সুন্দর স্মিতহাস্যে শীলা নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীকে সাদর সম্ভাষণ জানাল, নমস্কার।

শীলাকে প্রত্যুত্তর দিল কিরীটী।

আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, মিঃ চৌধুরী? শীলা শাশ্বতর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে—

স্নান করছিলাম, তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। পূর্ববৎ স্মিত হাস্যে জবাব দিল শীলা।

আমি তাহলে এবারে আসতে পারি?

অনিরুদ্ধর প্রশ্নে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শাশ্বত বললে, হ্যাঁ, আসতে পারেন।

অনিরুদ্ধ যাবার জন্য ইতিমধ্যে পা বাড়িয়েছিল। হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে কিরীটী বলে, আবার কখন দেখা হবে মিঃ ঘোষ?

বাড়িতেই তো সর্বক্ষণ প্রায় আছি। রামচরণকে বললেই সংবাদ পাব। কথাগুলো বলে অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াল না।

একটু যেন দ্রুতপদেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী এবারে শীলার দিকে তাকিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে কেন শীলা দেবী, বসুন!

শীলা খালি সোফাটার উপর এগিয়ে গিয়ে বসল।

ভারী স্নিগ্ধ মেয়েটির চেহারা, প্রথম দৃষ্টিতে কিরীটীর মনে হয়।

কালো রঙ্, ছিপছিপে গড়ন। ঈষৎ লম্বাটে ধরনের মুখখানি। সমস্ত মুখ, চোখ, নাক, কপাল, চিবুক সব কিছু মিলিয়ে সমগ্র মুখে যেন একটা দৃঢ় স্থির প্রতিজ্ঞার স্পষ্টতা। শান্ত কমনীয়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যেন মিশিয়ে আছে একটা কঠিন দৃঢ় অনমনীয়তা। শ্যামলী ওই মেয়েটি অমন নিরীহ শান্ত দেখতে হলে কি হবে, সহজে যে কারও কাছে মাথা নীচু করে না সেটা ওর চোখেমুখেই প্রকাশ। চলার মধ্যে বসবার ভঙ্গিটিতেও যেন একটা সংযত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। পরিধানে সাধারণ একটি কালোপাড় তাঁতের শাড়ি, গায়ে সাধারণ একটি ব্লু রঙের ব্লাউজ। সদ্য স্নানের পর ভেজা চুলের রাশ পৃষ্ঠ ব্যেপে রয়েছে। পায়ে একটি সাধারণ চপ্পল। দু হাতে এক গাছি করে সরু তারের বালা। বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠে একটি রুবি পাথরের আংটি। দেহের আর কোথাও কোন অলঙ্কার নেই।

শাশ্বতই শীলার কাছে কিরীটীর আগমনের হেতুটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করে গেল।

শাশ্বত যখন কিরীটীর আগমনের উদ্দেশ্যটা বিবৃত করছিল, তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিরীটী প্রায় সর্বক্ষণই শীলার মুখের দিকে।

কিন্তু এতটুকু কৌতূহল বা কোনপ্রকার ভাববৈলক্ষণ্যই কিরীটী শীলার

চোখে-মুখে প্রকাশ পেতে দেখল না।

চুপ করে সব শুনে একবার মাত্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। তারপরই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

আচ্ছা মিস্ রয়—

কিরীটীর ডাকে শীলা মুখ তুলে তাকাল। বললে, বলুন!

অনিরুদ্ধবাবুকে তো দেখলাম আপনার প্রতি বিশেষভাবেই বিরূপ, আপনার বোধ হয় এখানে থাকতে একটু অসুবিধাই হচ্ছে?

হচ্ছে না বললে মিথ্যাই বলা হবে মিঃ সিনহা, আর বলবও না আমি তা—

কিন্তু আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে তো এককালে চেনা-পরিচয়ই ছিল শুনেছি, তাই নয় কি?

কিরীটীর প্রশ্নে হঠাৎ যেন কেমন একটু চমকে ওঠে শীলা। কিরীটীর নজরে সেটা এড়ায় না। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্থির শান্তকণ্ঠে শীলা বলে, হ্যাঁ, ছিল।

তবে আপনাকে ওঁর আজ না চিনতে পারার কি কারণ থাকতে পারে?

চিনতে যে উনি পারেন নি তা নয় মিঃ সিনহা, তবে—

তবে?

কি জানি, আমি ঠিক ওঁকে বুঝতে পারছি না। কেন যে উনি আমার সম্পর্কে সন্দিহান—

আপনি বুঝতে পারছেন তাহলে যে উনি সন্দিহান আপনার সম্পর্কে?

তা না বুঝতে পারার তো কোন কারণ নেই!

খুব বিস্মিতই হয়েছেন বোধ হয় ব্যাপারটায়?

তা একটু হয়েছি।

আচ্ছা মিস্ রয়—

বলুন!

আপনি ওঁকে চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ—আবার যেন একটু মুহূর্তের চমক। তারপরই সেটা সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ।

আচ্ছা মিস রয়, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। অবিশ্যি এখন বিরক্ত না করলেও কাজের জন্য—মানে যে কাজের জন্য এসেছি, বুঝতেই পারছেন, মধ্যে মধ্যে হয়তো বিরক্ত করতে হবে।

নিশ্চয়ই, আমি তো সর্বক্ষণই বাড়িতে আছি। এ বাড়িতে একমাত্র রামচরণ ছাড়া তো কেউ আমার সঙ্গে কথাই বলে না। বিরক্ত হব না—বরং খুশীই হব। আচ্ছা এখন তাহলে আসি।

কথাগুলো বলে শীলা আর অপেক্ষা করল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শীলা ঘর থেকে চলে যাবার পর শাশ্বত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে শুধায়, কি মনে হল কিরীটী?

একটি তাতানো লোহা, আর অন্যটি নিঃশব্দ চুম্বক।

না না, আমি তা জিজ্ঞাসা করি নি কিরীটী। তাড়াতাড়ি বলে শাশ্বত।

তবে কি ?

অনিরুদ্ধকে তোমার কি চেনা বলে মনে হল ? মানে এই কি সে-ই, যে অনিরুদ্ধ তোমার একসময় কলেজের সহপাঠী ছিল ?

অনেকদিনকার কথা তো শাশ্বত, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মানুষের চেহারায় কত অদলবদল হয়, তবে এটা ঠিকই, মনের পাতায় আজও যে চেহারাটাকে স্মরণ করতে পারি তার সঙ্গে যথেষ্ট মিল একটা আছে বইকি এই অনিরুদ্ধবাবুর।

মিল আছে ? আই মিন, সিমিলারিটি আছে তাহলে ?

তা আছে।

হুঁ, আর ওই শীলা দেবীকে ?

মৃদু হেসে এবারে কিরীটী বললে, তার সম্পর্কে তো একটা আগেই বললাম হে !

কি বললে ?

কেন, সত্যিকারের চুম্বক একটি।

যাক গে, মরুক গে। চুম্বকই হোক আর লোহাই হোক, মোট কথা আমাদের বড়কর্তা চান ব্যাপারটার একটা ফায়সলা করতে, কারণ তাঁরও মনে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে ওই ভদ্রমহিলা সত্যিই বোধ হয় জেনুইন নন !

কেন—কেন তিনি তো যথেষ্ট প্রমাণ—

হ্যাঁ, প্রমাণ অনেক কিছুই আমরা পেয়েছি বটে। তবু—

তবু কী ?

অনিরুদ্ধবাবুই বা তাকে এভাবে অস্বীকার করছেন কেন ?

হয়তো কোন সত্যিই উদ্দেশ্য আছে বা হয়তো নেই, তাতানো লোহার মতই মানুষটা রাগী তো—সেই রাগের চোটেই হয়তো ঠিক ভদ্রমহিলাকে বরদাস্ত করতে পারছেন না। কিন্তু যাক্ সে কথা, এ বাড়িতে যখন এসে একবার ঢুকেছি তখন কে সত্য, কে মিথ্যা, সেটা হয়তো কিনারা করতে পারব।

তাহলে তোমার ধারণা, সত্যি মিথ্যা একটা কিছু এর মধ্যে আছেই !

তা যে আছে সেটুকু অন্ততঃ আমি এখনই হলফ করে বলে দিতে পারি। এই গোলমালটা একেবারে নিছক অহেতুক নয়।

আচ্ছা তাহলে এবারে আজকের মত আমি বিদায় হই ?

এসো। তবে একটা কথা—

কী ?

আমি নিজে থেকে না ডাকা পর্যন্ত তুমি বা তোমাদের দলের কেউ এ বাড়ির ত্রিসীমানাতে পা দেবে না, এই প্রতিশ্রুতিটুকু আমি তোমাদের কাছ থেকে সর্বাগ্রে চাই।

ক্ষণকাল যেন কি ভেবে শাশ্বত বললে, বেশ। তাই হবে।

হ্যাঁ, সত্যিকারের শিকারের কানুনটা আমি এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করেই একটু মেনে চলি ভাই।

কি রকম ?

শিকারের কানুন জানলে জানতে, সত্যিকারের বাঘের সঠিক সন্ধান পেতে হলে কোনরূপ সোরগোল না তুলে, কোন প্রকার ভিড় না করে সর্বাগ্রে তার চলাচলের রাস্তা ও তৃষ্ণা নিবারণের জায়গাটির খোঁজটা নিতে হয়।

বেশ বেশ, তাই হবে। মৃদু হেসে শাশ্বত আবার আশ্বাস দেয়।

হ্যাঁ, মনে থাকে যেন।

॥ আট ॥

বলাই বাহুল্য, সেদিনকার মত শাশ্বত বিদায় নিল।

শাশ্বতও ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী বড় আরামকেদারাটায় পরম নিশ্চিন্তে বসে পাইপে তামাক ঠেসে তাতে অগ্নিসংযোগ করে আলস্যে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল।

চোখের পাতা বোজা থাকলেও মন কিন্তু তার তখন অত্যন্ত সক্রিয়।

সদ্য দেখা দুখানি মুখ মনের সমস্তটা জুড়ে তখন বারংবার ভেসে উঠছে। কখনও একের পর অন্য, কখনও বা মাত্র একটিই, আবার কখনও বা দুটিই পাশাপাশি।

একটি রাগত, ক্রুদ্ধ, বিরক্তিতে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল; অন্যটি স্থির, শান্ত, অচঞ্চল।

একজন নিষ্ঠুরভাবে ব্যক্ত, অন্যজন অব্যক্ত।

অথচ এরা নাকি একদিন ঘনিষ্ঠভাবেই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিল এবং হয়েছিলও।

তবে কি ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যা ? কিন্তু মিথ্যা বলে মেনে নিতে কিছুতেই যেন কিরীটীর মন সায় দেয় না। তা ছাড়া ওইভাবে একটা মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যই বা কি থাকতে পারে ?

আবার মনে হয়, দুজনাই জাল নয় তো !

শুধু ওই দিনটাই নয়, পরের দিনটাও কিরীটী চিন্তার মধ্যে ডুবে রইল।

পরের দিন রাত্রে।

রাত তখন ন'টা সাড়ে ন'টা হবে।

অন্যমনস্ক-ভাবে কিরীটী বাড়ির পশ্চাৎ দিককার বাগানে অন্ধকারে বিরাট একটা চাঁপাগাছের তলায় সানবাঁধানো চওড়া বেদীটার উপর একাকী বসেছিল।

হঠাৎ একটা রূঢ় পুরুষ কণ্ঠস্বর কিরীটীর কানে আসতেই যেন ও চমকে ওঠে। কণ্ঠস্বরটা চিনতে ওর এতটুকুও দেরি হয় না। অনিরুদ্ধর রূঢ় বিরক্তিপূর্ণ

কর্কশ কণ্ঠস্বর।

আমি জানতে চাই, কেন তুমি এভাবে আমার পিছনে লেগেছ ?

জবাব দিল শীলা, আমি তোমার পিছনে লেগেছি মানে ?

নয় তো কি ?

কিন্তু তোমারই বা আমাকে না চিনতে পারার, ভান করবার কি কারণ থাকতে পারে বলতে পার ?

দেখ শীলা দেবী, এটা কি তোমার সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?

বাড়াবাড়ি !

নিশ্চয়ই।

অনিরুদ্ধ !

থাম, থাম।

আচ্ছা অনিরুদ্ধ, সত্যিই কি তোমার ধারণা, আমি আসল শীলা নই ?

না, কখনই না। তুমি আসল শীলা নও।

আচ্ছা অনিরুদ্ধ, কি হয়েছে তোমার সত্যি সত্যি বল তো ! এভাবে মিথ্যা একটা প্রহসন শুরু করে দিয়েছ কেন ?

থাম, ঢের হয়েছে—আর নেকামি করতে হবে না। উঃ, সত্যিই অসহ্য !

আমায় যে আজ তোমার অসহ্য মনে হচ্ছে, সে কি আর আমি বুঝতে পারছি না ! অথচ সেদিন কত জোর গলাতেই না বলেছিলে, একশো বছর পরে দেখলেও তুমি আমাকে ঠিকই চিনতে পারবে।

চিনতে পারতাম বই কি, যদি সত্যি সে শীলাই তুমি হতে।

আচ্ছা একটা কথা সত্যি করে বল তো, কি হলে তুমি বিশ্বাস করবে যে সত্যিই সেই শীলা আমি ! যে প্রমাণ তুমি চাও অনিরুদ্ধ, আমি দিতে রাজী আছি। একটিবার তোমার খুশিমত আমাকে যাচাই করে দেখ না লক্ষ্মীটি।

না, যা জানে আমি অন্তর থেকে মিথ্যা বলে—তার আবার যাচাই কি ?

তবু তো দেখতে কোন ক্ষতি নেই ?

বেশ। বল তো, সেবারের পূর্ণিমার রাত্রে কুতুবমিনারের তলায় বসে কি তোমাকে বলেছিলাম ?

বলেছিলে তো অনেক কথাই। কিন্তু কোন্ বিশেষ কথাটি তুমি জানতে চাও না বললে বলি কি করে ! তবে—

তবে কি ?

সেই দিনই—

কি ? বল—থামলে কেন ?

সেইদিনই প্রথম তুমি আমাকে চুমো খেয়েছিলে।

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই যেন কথাটি উচ্চারণ করল শীলা।

অপর পক্ষ চুপ।

কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ।

তারপরই আবার শীলার কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা গেল, কি চুপ করে আছ যে? এবারে বিশ্বাস হয়েছে তো?

না।

এখনও বিশ্বাস হয় নি?

না না না।

সত্যিই তুমি পাগল। আচ্ছা আরও বলব সেরাত্রের কথা?

শুনতে চাই না—

শুনতে তোমাকে হবেই। কারণ সেই রাত্রে যে রুবির আংটিটা—রুবি তোমার সবচাইতে প্রিয় স্টোন বলে আমার হাতের আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলে, সেটা দেখ আজও এই আঙুলেই আমার আছে।

ও তুমি চুরি করে এনেছ।

অনিরুদ্ধ! একটা আর্তস্বর যেন বেরিয়ে এল শীলার কণ্ঠ থেকে, এত বড় কথাটা তুমি আজ আমাকে বলতে পারলে?

দোহাই তোমার, এখান থেকে চলে যাও।

আমি গেলে, সত্যিই বলছ, তুমি খুশি হবে?

হব।

কিছুক্ষণ অতঃপর আবার স্তব্ধতা।

তারপর আবার শীলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আচ্ছা এভাবে অনর্থক পীড়ন করে আমাকে কি তোমার লাভ হচ্ছে বলতে পার? কেন আমাকে তুমি চিনতে পারছ না, কি করেছি আমি তোমার? কি করেছি—বলতে বলতে কান্নায় যেন সহসা ভেঙে পড়ল শীলা।

কান্নাঝরা শীলার ওই কথাগুলোর পরেই কিরীটী শুনতে পেল দ্বিতীয় পক্ষ সেখান থেকে প্রস্থান করল।

তার চলে যাবার পায়ের শব্দ বাগানের ইতস্তত ঝরা শুকনো পাতার উপর দিয়ে মচমচিয়ে যেন মিলিয়ে গেল।

তারপরেই একটা স্তব্ধতা।

কিরীটী কিন্তু নড়তে পারে না তার জায়গা থেকে। যেমন বসেছিল চাঁপা-গাছটার তলায় সানবাঁধানো বেদীটার উপর তেমনি বসে রইল।

কতক্ষণ বসেছিল ওইভাবে কিরীটী তার নিজেরই যেন মনে নেই।

ধীরে ধীরে একসময় আকাশে দেখা দেয় বাঁকা চাঁদ। বাগানের অন্ধকার গাছ-পালার উপর সেই চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল যেন পাতলা মসলিনের একখানি চাদরের মত।

যা ছিল এতক্ষণ অন্ধকারে অস্পষ্ট, চাঁদের আলোয় তা বুঝি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। রাতও অনেক হয়েছে।

কিরীটী বেদীর উপর থেকে উঠে পড়ল এবং অন্যমনস্ক ভাবেই যেন কিছুটা এগিয়ে চলল। কয়েক পা এগুতেই চাঁদের আলোয় নজরে পড়ল।

পশ্চিম দিকে একেবারে অদূরে গঙ্গার মুখোমুখি যে পাথরের বেঞ্চটা, সেই বেঞ্চের উপরে গঙ্গার দিকে মুখ করে কে একজন প্রস্তরমূর্তির মতই যেন বসে আছে।

মুহূর্তকাল সেই প্রস্তরমূর্তির মত নিঃশব্দে উপবিষ্টের দিকে চেয়ে থেকে নিঃশব্দেই পায়ে পায়ে সেই দিকে আরও একটু এগিয়ে গেল কিরীটী।

এবারে বুঝতে কষ্ট হয় না কিরীটীর, উপবিষ্টা একজন নারী।

আরও দু'পা এগিয়ে গেল কিরীটী। এবং এবারে বুঝতে বা চিনতে কষ্ট হয় না—সে শীলা।

শীলা তাহলে এখনও যায় নি ঘরে! বাগানেই রয়েছে অনিরুদ্ধর সঙ্গে কিছুক্ষণ পূর্বে কথা-কাটাকাটির পরও!

শীলাকে ডাকবে কি ডাকবে না ইতস্তত করছে কিরীটী, এমন সময় শীলা নিজেই হঠাৎ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এবং মুখ ফেরাতেই অদূরে চাঁদের আলোয় কিরীটীকে দণ্ডায়মান দেখে ভীতচকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে? কে ওখানে?

আমি। আমি শীলা দেবী, ভয় পাবেন না—

ওঃ, মিঃ সিনহা!

হুঁ, কিন্তু আপনি এত রাত্রে বাগানে?

না, এমনিই—মানে ঘুম আসছিল না, তাই একটু—

জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। তা আপনাকে একা দেখছি, মিঃ ঘোষ—অনিরুদ্ধবাবু কোথায় গেলেন?

অনিরুদ্ধ!

কতকটা যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করে শীলা।

হ্যাঁ, অনিরুদ্ধবাবুও তো ছিলেন একটু আগে এখানে, গেলেন কখন? যাক্ সেকথা শীলা দেবী, আপনার যদি অসুবিধা না হয় তো—কয়েকটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে—

কথাটা বলে আহ্বানের কোন অপেক্ষা না রেখেই কিরীটী পাথরের বেঞ্চটার উপরে গিয়ে বসল এবং শীলার দিকে তাকিয়ে আহ্বান জানাল, বসুন মিস রয়!

মুহূর্তকাল শীলা যেন একটু ইতস্তত করল, তারপর ধীরে ধীরে বেঞ্চটার উপর পুনরায় কিরীটীর পাশেই কিছু দূরত্ব রেখে বসে পড়ল।

শীলা দেবী, আপনাকে আটকে রেখে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম না তো!

না না, আমি রাত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে বড় একটা শুই না—

যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আচ্ছা শীলা দেবী—

বলুন!

আমি আপনাকে কিছু আপনার অতীতের কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

অতীতের কথা!

হ্যাঁ, দেড় বৎসর আগে ট্রেন-দুর্ঘটনার পর থেকে আপনার মনে যা আছে, যদি যথাসম্ভব আমাকে একটু বলেন—

কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে কিছুক্ষণ শীলা চুপ করেই বসে থাকে, কোন জবাব দেয় না। তারপর অত্যন্ত যেন ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, ট্রেন দুর্ঘটনার পরে?

হ্যাঁ, ট্রেন দুর্ঘটনার পর!

আমার—আমার তো ঠিক মনে নেই মিঃ সিন্হা তেমন কিছুই—

কিছুই আপনার মনে নেই? যখন আপনি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন; সে সময় আপনি কি ঠিক দেখলেন—আপনার আশেপাশে কে বা কারা ছিল?

॥ নয় ॥

কেউ কোথায়ও তো ছিল না, শুধু অন্ধকার—না, কেউ কোথাও ছিল না। হ্যাঁ—কিছুই তো আমার মনে নেই।

কেমন যেন বিভ্রান্তের মত কথাগুলো থেমে থেমে ভেবে ভেবে বলে শীলা।

কিছুই আপনার মনে নেই? একথাও মনে নেই যে আপনার, ট্রেনে আপনি দিল্লী থেকে কলকাতায় আসছিলেন মিঃ গুহর জরুরী চিঠি পেয়ে? মোগলসরাই ছাড়বার পর হঠাৎ ট্রেনটা আপনার লাইনচ্যুত হয়ে—

সেটুকু মনে আছে। কিরীটীর কথাটা ধরে নিয়ে বলতে থাকে শীলা, ট্রেনে সেদিন খুব ভিড় ছিল। সেকেন্ড ক্লাসের যে কম্পার্টমেন্টে আমি আসছিলাম, তার মধ্যেই আমরা প্রায় দশ-বারোজন যাত্রী ছিলাম—

কারো সঙ্গে সেদিন আপনার ট্রেনে পরিচয়—কোনরকম আলাপ বা কথাবার্তা হয় নি?

শীলা চুপ করে থাকে।

কিরীটী বুঝতে পারে, মনের মধ্যে হাতড়াচ্ছে শীলা। অতীত স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো মনে মনে উল্টেপাল্টে পড়বার চেষ্টা করছে।

মনে করে দেখুন শীলা দেবী, সেরাত্রে ট্রেনে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যাত্রী, যে হয়তো আপনার খুব কাছে এপাশে ওপাশে বসেছিল, কিংবা সামনের বেঞ্চে মুখোমুখি ছিল, দীর্ঘ একটানা ট্রেনযাত্রায় বিশেষ করে কামরায় ভিড় থাকলে এমন তো কতজনের সঙ্গেই আলাপপরিচয় হয়—

শীলা পূর্ববৎ চুপ করেই বসে থাকে।

কিরীটী আবার বলে, মনে পড়ছে না? এমন কারো কথাই কি সে-রাত্রের ট্রেন-জার্নিতে আপনার মনে পড়ছে না?

একজন ইউ. পির স্টুডেন্টের সঙ্গে, ইউ. পির লোক হলেও অনেকদিন তিনি নাকি বাংলাদেশে ছিলেন—

বলুন, থামলেন কেন ?

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম মনে পড়ছে যেন অনেকক্ষণ—

কি নাম তাঁর মনে আছে ?

নাম ? নাম ঠিক—প্রমথ না কি যেন বলেছিলেন, ঠিক মনে নেই—

কি ধরনের কথাবার্তা তাঁর সঙ্গে সেদিন হয়েছিল ?

তিনি অনেক কথা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

কি রকম ?

ছোটবেলায় আমি কোথায় ছিলাম, কোন্ স্কুল-কলেজে পড়েছি—দিল্লীতে কতদিন আছি, আরো কত কথা—

আচ্ছা শীলা দেবী, আপনি কেন কলকাতায় আসছিলেন সে সম্পর্কে কোন আলোচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে ?

না।

তারপর যখন ঠিক দুর্ঘটনাটা ঘটে, তখন আপনি কি করছিলেন মনে আছে ?

বোধ হয় গল্প করতে করতে কেমন একটু ঝিম এসেছিল, আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ আর ধাক্কা খেয়ে যেই পড়ে গেলাম, তারপর সব অন্ধকার—

তারপর ?

তারপর আর কিছু মনে নেই। পরে শুনেছিলাম, এক বছরেরও বেশী সময় আমার নাকি পূর্বস্মৃতি সব একেবারে মন থেকে মুছে গিয়েছিল। আমার পরিচয়, আমি কে, কি আমার নাম—কিছুই নাকি বলতে পারি নি কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু!

হ্যাঁ জগৎবাবু, তাঁর আশ্রয়ে আমি ওই একটা বছর কাশীতে ছিলাম। জগৎবাবুকেই আমি কাকাবাবু বলে ডাকতাম।

তাহলে ওই একটা বছর আপনি কাশীতেই ছিলেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু জগৎবাবুর ওখানে আপনি গেলেম কি করে ?

জগৎবাবু অর্থাৎ কাকাবাবু একজন ডাক্তার, সে সময় মোগলসরাই থেকে কয়েক মাইল দূরে, যে সময় নাকি অ্যাকসিডেণ্টটা হয় তার পরদিন, কাছাকাছি একটা গ্রামে তিনি একজন রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। বিকেলের দিকে গাড়িতে করে যখন ফিরছেন, আমাকে একটা ঝোপের পাশে বসে থাকতে দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে আমাকে তাঁর কাশীর বাসায় নিয়ে আসেন।

ওঃ! তবে যে আমি শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন ?

আপনি নাকি কোন এক হাসপাতালে ছিলেন ?

হাসপাতালে! কই না তো ?

কিন্তু আপনি মিঃ গুহর কাছে তাই বলেছিলেন—

বলেছিলাম নাকি ! আমার তো তা মনে নেই !

সত্যিই আপনি বলেছিলেন—

বলেছিলাম ? তা হয় তো হবে, মাঝে মাঝে কি যে আমি বলি নিজেরই আমার মনে থাকে না—মনে করতে পারি না, কেমন যেন আমার মাঝে মাঝে সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়।

কথাগুলো বলতে বলতে শীলা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বললে, মিস্ রয়, আর বাইরে থাকবেন না, অনেক রাত হল—চলুন, উঠুন।

শীলা অতঃপর বেঞ্চ থেকে উঠে ভিতরের দিকে চলে গেল।

ওই ঘটনার দিন দুই পরে। সন্ধ্যার কিছু পরে।

অনেকদিন পরে সন্ধ্যার মুখে অনিরুদ্ধ বাড়ি থেকে বের হয়েছে।

দোতলার যে ঘরে ফোন ছিল কিরীটী সেই ঘরে এসে ঢুকল।

ফোন করে শাশ্বতকে ডাকল।

কে, শাশ্বত ?

কথা বলছি ! শাশ্বতর কণ্ঠস্বর ফোনে ভেসে এল।

তোমাকে একবার কালই কাশী যেতে হবে—

হঠাৎ কাশী কেন ?

সেখানে গণেশ মহল্লায় জগৎ হাজরা নামে একজন ডাক্তাব আছেন, তিনি শীলা সম্পর্কে কি জানেন সব জেনে এসে আমাকে তুমি জানাবে।

তথাস্তু।

শীলা সেখানে কতদিন ছিল, কি অবস্থায় ছিল, কি অবস্থায় শীলাকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—প্রথম সব জানবে। আর তোমাকে যে বলেছিলাম দুজন ছেলেকে এ বাড়ির আশেপাশে সর্বদা পাহারায় রাখবে—

তোমার কথামত দুজন তো রাখছি—সুশীল আর রজত। তাদের বলাই আছে, শীলা বা অনিরুদ্ধ কখনও বাড়ি থেকে বেরুলে একজন যেন তাদের follow করে।

যাক্ শোন, একটু আগে অনিরুদ্ধ বের হয়ে গিয়েছে—

তাই নাকি ?

হুঁ।

তা তোমার রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপার কতদূর অগ্রসর হল ?

এখনও বিশেষ কিছু অগ্রসর হতে পারি নি।

তারপর সেইদিন রাত্রে।

রাত বোধ করি তখন বারোটা হবে।

অনিরুদ্ধ তখনও ফেরে নি।

রাত ন'টা নাগাদ রামচরণ যখন কিরীটীকে ডিনার পরিবেশন করছিল, শীলার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল কিরীটী রামচরণকে।

তোমার দিদিমণি খেয়েছেন রামচরণ ?

না, তিনি কিছু খাবেন না বলেছেন। শরীরটা ভাল না। মাথায় নাকি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ওরকম মাথার যন্ত্রণা তো হয় দিদিমণির !

মধ্যে মধ্যে ওঁর মাথার যন্ত্রণা হয় বুঝি ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা রামচরণ, এ বাড়িতে আসার পর তোমার দিদিমণি কি কখনও বাড়ির বাইরে যান নি ?

না। একদিনও যেতে কোথাও দেখি নি। ঘরের থেকেই তো বড় একটা বেব হন না ওই রাত্রে বাগানে বেড়ানো ছাড়া !

তোমাব দাদাবাবুব ঘরে কখনও ওঁকে যেতে দেখ নি ?

না।

তোমার দাদাবাবু—তিনিও কখনও ওঁর ঘরে যান না ?

না।

তাহ'লে তোমার দাদাবাবু ও দিদিমণির কখনও কথাবার্তাই হয় না বল !

কথাবার্তা হবে কি, মুখ দেখাদেখিই তো নেই দু'জনার মধ্যে। দাদাবাবু যে কেন এমনধাবা ওঁব সঙ্গে ব্যবহার করছেন, অমন ভাল মেয়ে হয় না বাবু।

॥ দশ ॥

সেরাত্রে শীলা বাগানেও আসে নি।

একা একাই কিরীটী বাগানের মধ্যে ঘুবে বেড়াচ্ছিল। আকাশে সেরাত্রির মতই একফালি চাঁদ। আর তারই ক্ষীণ আলো চারিদিককার গাছপালার উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

বিরাট বাড়িটা যেন নিশিরাতের ঘুমের ঘোরে স্তব্ধ। কোথাও কোন আলো নেই। অনিরুদ্ধ ফিবেছে কি না তাই বা কে জানে !

সহসা শুকনো পাতার উপর একটা মৃদু মচ্ মচ্ শব্দ কিরীটীর সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ কবে। অত্যন্ত সাবধানী লঘুপদে কে যেন হেঁটে চলেছে। যত ক্ষীণতম লঘু পদশব্দই হোক না কেন এবং সে শব্দ মানুষের পায়ের হলে কিরীটীর বুঝতে সেটা কষ্ট হয় না যে সেটা সত্যিই মানুষের পায়ের শব্দ। আজও কিরীটীব সে শব্দ চিনতে ভুল হল না। মানুষের পায়ের শব্দই। কিন্তু এত রাত্রে এই নির্জন বাগানে কে এল ?

এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র শীলাই আসে রাত্রে এই বাগানে। আর তো কিরীটী কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছে, দ্বিতীয় কোন প্রাণীই এ বাগানে পা দেয় না। তাও আবার এত রাত্রে !

শীলা ? শীলা তো আজ অসুস্থ ! ঘর থেকেই বের হয় নি। তবে কে ? কার পায়ের শব্দ ? নিঃশব্দে কিরীটী কান পেতে থাকে।

শব্দটা ক্রমশঃ যেন তারই দিকে এগিয়ে আসছে। মধ্যে মধ্যে থামছে। আবার এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত সাবধানী লঘু সতর্ক কারো পদবিক্ষেপ। ধীরে ধীরে পদশব্দটা ঝরাপাতার ওপরে মচ্ মচ্ শব্দ তুলে কিরীটীর পাশ কাটিয়ে ঠিক যেন বাগানের পূর্বদিককার কামিনী গাছগুলোর পশ্চাতে ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীও এবার কামিনী গাছগুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল।

আট-দশ গজ এগোবার পরই, কামিনী গাছের ঝোপগুলো যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে এসে পেঁছিলেই এবারে কিরীটীর নজরে পড়ল, একটা কালো চাদরে আবৃত ছায়ামূর্তি, সরু টর্চের আলো ফেলে ফেলে বাড়ির পশ্চাতের দিকে বাড়ি ও বাগানের মধ্যে যাতায়াতের যে দ্বারপথটি সেই দিকেই সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে।

কিরীটী আর অগ্রসর হতে পারে না, কারণ আর অগ্রসর হলে একেবারে খোলা জায়গায় গিয়ে তাকে পড়তে হবে, সেখান থেকে অগ্রবর্তী ছায়ামূর্তি কোন মুহূর্তে ফিরে তাকালেই তাকে দেখতে পাবে।

কিন্তু কিরীটী নিজেকে ধরা দিতে ইচ্ছুক নয় বলেই যেখানে ছিল সেখানেই গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

দরজাটা খোলাই ছিল। সেই খোলা দরজাপথে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হল বাড়ির মধ্যে। কিরীটী এবারে আর অপেক্ষা করে না। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই দরজার কবাট দুটো বন্ধ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দিল।

একটা অপ্রশস্ত অন্ধকার অলিন্দপথ। অলিন্দ অতিক্রম করেই একটা বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। মধ্যরাত্রির মৃদু চাঁদের আলো ও অন্ধকারে চত্বরটায় যেন কেমন একটা আলোছায়ার রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে। চত্বরটার পাশ দিয়ে ঘোরা একটা নাতিপ্রশস্ত বারান্দা পূর্ব দিক থেকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে ঘুরে পশ্চিমপ্রান্তে একেবারে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির সামনে শেষ হয়েছে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় একটা কম পাওয়ারের বিদ্যুৎবাতি জ্বলে। সারাটা রাতই প্রায় আলোটা সিঁড়িতে জ্বলে, কিরীটী পূর্বেই লক্ষ্য করেছিল। এবং সে আলোটা আজ যখন রাত দশটার সময় বাগানে গিয়েছিল কিরীটী তখনো জ্বলছিল।

কিন্তু ঐ সময় আলোটা আর জ্বলছিল না। সমস্ত সিঁড়িটাই অন্ধকার।

মুহূর্তের জন্য বুঝি কিরীটী থমকে দাঁড়ায়। তারপর পকেটে তার টর্চবাতি থাকা সত্ত্বেও টর্চের আলোর সাহায্য না নিয়েই অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপের দিকে পা বাড়ালো।

পরিচিত সিঁড়িটা কিরীটীর। গত ক'রাত্রি ধরে ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করায়

অন্ধকারেও সিঁড়ি অতিক্রম করতে কিরীটীর কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।

নিঃশব্দেই কিরীটী ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলার বারান্দায় এসে পৌঁছায়। উপরের বারান্দার আলোটাও নেভানো। সেটাও সারাটা রাত ধরেই জ্বলে বরাবর।

কিন্তু তা হলেও কিরীটীর দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ মৃদু চাঁদের আলোর যেটুকু এসে বারান্দায় পড়েছে, সে আলোতেই কিরীটী সব কিছু দেখতে পায়।

স্তব্ধ নিঝুম যেন সমস্ত বাড়িটা। কোন সাড়াশব্দই কোথাও নেই। বারান্দাটার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কিরীটী ক্ষণেকের জন্য দুদিকে দৃষ্টিপাত করে এধার ওধার যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নিল। খাঁ খাঁ করছে শূন্য বারান্দাটা। জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই।

কিরীটীকে একবার কিছুক্ষণের জন্য ভাবতে হয়, সামনের দিকে যাবে, না পিছনের দিকে যাবে! বাড়িটার উপর ও নীচের তলার যাবতীয় অংশই তার চেনা।

মনের মধ্যে একটা ছক কেটে নিয়েছিল কিরীটী বাড়িটার সর্বাগ্রে এখানে আসার পরদিনই ঘুরে ঘুরে রামচরণকে নিয়ে সব দেখে। পুরাতন ভৃত্য রামচরণ তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়ে চিনিয়ে দিয়েছিল বাড়িটার কোথায় কি আছে। যাতায়াতের কোথায় কোন্ পথ, কোথায় কোন্ ঘরে কি আছে—দরজার কোথা দিয়ে কোথায় যাবার সব দেখিয়ে দিয়েছিল।

কিরীটী তাই বোধ হয় মনে মনে চকিতে বাড়ির দোতলাটা একবার ভেবে নেয়। আগে সে দোতলাটাই খোঁজ করে দেখবে, তারপর নীচে যাবে।

কিরীটী সর্বপ্রথম ঘুরে পেছনের দিকেই অগ্রসর হল। দক্ষিণ দিকে।

সিঁড়ির পরে খান-দুই ঘর।

সে ঘর দুটো সাধারণত বন্ধই থাকে। একটা তার মধ্যে যেটা বড়, সেটাই নাকি নরহরির শয়নঘর ছিল। তার পরের ঘরটিতে আলমারি ভরা সব নানা বই। নরহরির প্রিয় বস্তু ছিল নাকি ঐ বইগুলো।

ধনীর একমাত্র পুত্র হিসাবে যে ধরনের বিলাস বা নেশা প্রায়শই দেখা যায়, নরহরির তার কিছুই নাকি বড় একটা ছিল না। তাঁর নেশা ছিল বই পড়া ও দেশবিদেশ ভ্রমণ। প্রথম জীবনে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন নরহরি আর সঙ্গে থেকেছে তাঁর বাক্সভর্তি বই। তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই বই পড়ার নেশাটাই নাকি হয়ে উঠেছিল ক্রমশ আরো প্রবল। দিবারাত্র বই নিয়েই পড়ে থাকতেন। এবং সে বইও নানা দেশবিদেশের যত ইতিহাস। নরহরির মৃত্যুর পর থেকে আলমারি ভরা বইয়ের ঘরটি বন্ধই থাকে। তার পরের ঘরটি অনিরুদ্ধর ঘর। শুধু সেই ঘরটিই নয়, ওই ঘরের পরের ঘরটিও অনিরুদ্ধ অধিকার করেছে এ বাড়িতে আসা অবধি।

তার পরের দুটি ঘর খালিই পড়ে আছে।

এতদিন তালাবন্ধই ছিল, বর্তমানে তারই একখানি কিরীটী দখল করেছে।

সর্বশেষের দুখানি ঘর অধিকার করেছে শীলা।

অনিরুদ্ধর ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।

অনিরুদ্ধ তাহলে ফেরে নি!

কিরীটী আরও এগিয়ে গেল এবং নিজের ঘর ও পরের খালি ঘরটা পার হয়ে শীলার ঘরের দরজার কাছাকাছি আসতেই শীলার ঘরের জানালার বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে নজরে পড়ল কিরীটীর ক্ষীণ একটা আলোর শিখা।

এ কি! এখনও শীলা ঘুমোয় নি!

ঠিক সেই মুহূর্তে শীলার চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল কিরীটীর।

না, এভাবে আবার আসা তোমার-খুব অন্যায় হয়েছে। যদি কেউ দেখে ফেলে তো—

দেখে ফেলবে কেমন করে? নিশ্চিন্ত থাক তুমি শীলা, কেউ আমাকে দেখে নি —দেখতে পাবেও না কেউ!

চাপা পুরুষ-কণ্ঠ।

কিরীটী একেবারে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

কে? কার সঙ্গে কথা বলছে শীলা?

ঘরের ভিতর থেকে আবার পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল, কি রকম বুঝছ তুমি বল?

কি আবার বুঝব, সেই পূর্ববৎ!

তোমাকে যে মেনে নেবে না তা আমি জানতাম। বেশ দেখাই যাক আরও কিছুদিন. সেরকম বুঝলে শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে—

সে কি!

তা ছাড়া আর উপায় কি বল? এভাবে—

না, না—অমন কাজও করো না। তাতে করে জেনো আরও জট পাকিয়ে উঠবে সব।

জট যদি পাকায়ই, খুলতে হবে সে জট—

না, আমাকে আরও কিছুদিন সময় দাও।

বেশ।

কিন্তু আর তুমি এখানে থেকো না।

যাচ্ছি, কিন্তু—

আর একটা কথা—আমি না ডাকলে তুমি আর এসো না।

বেশ।

হ্যাঁ, যা বললাম মনে রেখো। যাও—না না, ওদিক দিয়ে নয়, এদিক দিয়ে এস।

তারপরই শীলার ঘরের আলোটা নিভে গেল।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে।

কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে সোফার উপরে বসে একটা বাংলা উপন্যাস

পড়ছিল, শাশ্বত এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কিরীটী পঠিত পুস্তক থেকে মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলো, এসো শাশ্বত, মনে হচ্ছে নূতন কোন সংবাদ যেন আছে!

কিরীটীর মুখোমুখি অন্য সোফাটার উপর বসতে বসতে শাশ্বত বললে, তোমার কথাই ঠিক।

কি? আর একটি নারী এর মধ্যে আছে, এই তো?

হ্যাঁ, সেই কথাটাই বলতে এসেছি। কিন্তু আশ্চর্য, বুঝলে কি করে?

বইটা বন্ধ করে হাতের মধ্যে ধরে মৃদু হেসে কিরীটী শাশ্বতর মুখের দিকে তাকাল, নারীঘটিত সংবাদ না হলে কি নিজে স্বয়ং এই দুপুর রৌদ্রে এখানে চলে আসতে!

তা নয় হে, ফোনে সব কথা বলা উচিত হবে না, ভাবলাম তাই—

বেশ করেছ। বল এবারে শুনি, সেই ভদ্রমহিলাটির রূপ ও গুণের ব্যাখ্যান কর। দেখতে কেমন, বয়স কত, বাস কোথায়—

তুমি ঠাট্টা করছ কিরীটী!

হাস্-স! সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী শাশ্বতকে সতর্ক করে দেয়, ক্ষেপে গেলে নাকি, বল সিনহা—

য়্যাম সরি! সত্যি ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জান কি, অনিরুদ্ধ কোথায় যায়?

রেসের মাঠে যায় বলেই তো জানি।

গুড্ হেভেন! জানলে কি করে সে কথা?

তার ঘরের ড্রয়ারটা সেদিন তার অনুপস্থিতিতে হাতড়াতে গিয়ে রেসের বই একটা পেয়েছি। অতএব ও তো পূর্বেই জেনেছিলাম, তারপর বোধ হয় সেই ভদ্রমহিলাটির ওখানে যায়—

না হে না!

তবে?

প্রথমে বেলতলায় সেই ভদ্রমহিলাটির ওখানে যায়, তারপর দুজনে ট্যাক্সি করে বের হয়।

বুঝলাম। তা সেই ভদ্রমহিলাটি কে? বর্তমান যুগের অন্যতমা অভিনেত্রী মন্দিরা চ্যাটার্জি তো?

॥ এগারো ॥

শাশ্বত সত্যিই এবারে যেন হাঁ করে কিরীটীর শেষ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী পূর্ববৎ মৃদু হেসে বলে, হাঁ হয়ে গেলে কেন, ভোজবিদ্যা বা কোন যাদুবিদ্যা নয়! স্রেফ ডিডাকসন বাই কমনসেন্স—

বলতে বলতে হাতের বইটার পাতা উল্টে তার ভিতর থেকে বর্তমানের সিনেমা-

স্টার মন্দিরা চ্যাটার্জীর একখানা ফটো বের করে বিহ্বল শাশ্বতর দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে ধরতে কথাটা শেষ করে কিরীটী তার, এই ছবিটিও অনিরুদ্ধর ঘরের ড্রয়ারের মধ্যে আবিষ্কার করেছি। আর ইনি তো বর্তমানে কারও অপরিচিতা নন ফিল্ম-পাবলিসিটির দৌলতে। কাগজ—মানে বর্তমানে পিতৃ-অর্জিত মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের দৌলতে কতকগুলো যৌন বিকৃতিতে ভরা সিনেমা ও সাহিত্যের জগাখিচুড়ি যে হামবড়িয়া কাগজ বেরুচ্ছে, তার পাতায় পাতায় এরা কখন কি করেন, কি খান, কতখানি হাতকাটা ব্লাউজ পরেন, কখন ঘুমান, কখন কাঁদেন, কখন হাসেন—তার সব ছবি দেখে দেখে বেশীর ভাগ যৌনবিকৃতিতে যাঁরা ভুগছেন তাঁরা যেমন এঁদের চেনেন তেমনই এঁদের প্রেমেও পড়েন। কাজেই এই ফটোটি অনিরুদ্ধর ঘরের ড্রয়ারে আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কমনসেন্স্ ওই দিকেই আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি অনুমান আমার মিথ্যে নয় এবং মন্দিরা চ্যাটার্জীই হোক বা অন্য কোন নারীই হোক, কোন এক নারী যে এর মধ্যে আছে সেটাও এখানকার কাহিনী সেরাত্রে আমার বাড়িতে বসে তোমার মুখে শুনেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু যাক সে কথা, মন্দিরার চাইতেও আমাদের বেশী প্রয়োজন এখন—

কী!

কি ভাবে এবং ঠিক কতদিন ধরে ওদের পরস্পরের আলাপ সেটা সর্বপ্রথম জানবার চেষ্টা কর তো শাশ্বত!

সেটুকু জানতে বোধ হয় খুব বেশী কষ্ট পেতে হবে না। ওই অভিনেত্রীটির একজন গুণমুগ্ধ অন্ধ স্তাবক আছে—বারীন, তার কাছ থেকেই সব জানতে পারব আশা করছি।

বেশ, তবে তো ভালই হল। তাহলে জগৎ ডাক্তার ও অভিনেত্রী মন্দিরার ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জেনে জানাবে, কি বল!

জানাব।

কিরীটীর ঘরে কিরীটী ও শাশ্বত যখন পরামর্শ করছে, অনিরুদ্ধ তখন সাজগোজ করছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

সাজগোজ করতে করতে অনিরুদ্ধ ভাবছিল, টাকা—কিছু টাকার একান্ত দরকার।

কোন অসুবিধাই ছিল না টাকার। এখানে আসার মাস দুয়েকের মধ্যেই সলিসিটার মিঃ গুহ টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইচ্ছামতই খরচ করছিল অনিরুদ্ধ।

তারপর হঠাৎ যে মিঃ গুহর মতিগতি কি হলো, মাস কয়েক আগে অনিরুদ্ধর নামে ব্যাঙ্কে নির্দেশ দিয়ে দিল, টাকাকড়ি এখন আর তোলা চলবে না।

অনিরুদ্ধ কারণটা জানতে চাইল, কিন্তু মিঃ গুহ মৃদু হেসে কেবল বললেন, কারণ একটা আছে বৈকি মিঃ ঘোষ। সময় হলেই জানতে পারবেন।

ওই ব্যাপারেই মিঃ গুহর সঙ্গে কয়েক মাস ধরে অনিরুদ্ধর একটা মন-কষাকষি

চলছিল এবং সেটা শীলা এখানে আসবার পর থেকে যেন আরো পাকিয়ে উঠলো। এই এবারে মিঃ গুহ স্পষ্টাস্পষ্টিই অনিরুদ্ধকে জানিয়ে দিলেন যে, ব্যাপারটার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সে নাকি তিনশত টাকা মাসিক খরচা ছাড়া একটা কপর্দকও বেশী পাবে না।

অথচ দু'একদিনের মধ্যেই হাজার চারেক টাকার দরকার অন্তত অনিরুদ্ধর। মন্দিরাকে একটা নেকলেস দিতে হবে।

মন্দিরা গতকাল কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিল। গতবার তেরো মাস ধরে হাতে যখন তার সর্বস্বর চাবিকাঠিটা একপ্রকার ছিল, সে-সময় মোটামত কিছু যদি সে অন্যত্র সরিয়ে রেখে দিত!

কিন্তু বুঝবেই বা সে কি করে? এতদিন পরে যে হঠাৎ একটা এমন বিশ্রী বিভ্রাট বাধবে, এমন একটা জট পাকিয়ে উঠবে, স্বপ্নেই কি সে ভাবতে পেরেছিল?

শীলা—

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে অনিরুদ্ধ।

দর্পণে শীলাব ছায়া পড়ে।

শীলা যে ইতিমধ্যে কখন একসময় তার ঘবেব দরজা ঠেলে ঘরেব মধ্যে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে ও টেরই পায় নি।

চকিতে ফিরে দাঁড়ায় অনিরুদ্ধ।

তুমি!

শীলা ধীরে ধীরে দবজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ আমি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল!

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ক্ষণকাল শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে কঠিন শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অনিরুদ্ধ, কী কথা?

শীলা ধীরে ধীবে এগিয়ে এসে একটা খালি চেয়ারের উপর বসতে বসতে বলে, বসতে তো তুমি আমাকে বলবে না, তাই নিজেই বসলাম।

ভ্রূ দুটো বিরক্তিতে কুঞ্চিত কবেই ছিল অনিরুদ্ধ। মুহূর্তকাল শীলার মুখেব দিকে তাকিযে থেকে বললে, আমি এখুনি বেরুব, তোমার বক্তব্যটা তাড়াতাড়ি একটু শেষ করলেই খুশি হব।

সেই অভ্যস্ত সুন্দর মিষ্টি হাসি হাসল শীলা।

সত্যিই সুন্দর হাসিটি শীলার। সুন্দর মিষ্টি হাসি।

তারপরই মিষ্টি কণ্ঠে বলে, আচ্ছা তোমার না ল্যাভেণ্ডার মাথায় মাথা কোথাও বেরুবার আগে বহুদিনের অভ্যাস ছিল, দিল্লীতে কতদিন আমাকে বলেছ, কিন্তু এবারে তো তোমাকে কখনও সে মিষ্টি গন্ধ ল্যাভেণ্ডার মাথায় মাথতে দেখি না! মাখো না কেন সেই ল্যাভেণ্ডারটা, খুব ভালো লাগত আমার সে গন্ধটা।

দেখুন শীলা দেবী, জানি না অবিশ্যি সত্যিসত্যিই আপনার নাম শীলা কিনা, আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন?

দেব, কি শুনি ?

এভাবে সত্যিই আর চলছে না। তার চাইতে—

কী ?

উভয় পক্ষেরই পোষায় এমন একটা চুক্তিতে এলে বোধ হয় আমরা উভয়েই পরস্পরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

চুক্তি !

হ্যাঁ, চুক্তি। কত টাকা পেলে আপনি আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন বলুন তো ?

টাকা ? কিসের টাকা ?

ন্যাকামি রাখুন। বলুন কত টাকা পেলে এ বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন ?

কিন্তু আমি তো টাকা চাই না।

থামুন, থামুন। আর অভিনয় করবেন না—

অভিনয় যে আমি করছি না তা তুমি খুব ভাল ভাবেই জান। দোহাই তোমার, আমাকে না হয় একবার তোমার ইচ্ছামত পরীক্ষা করেই দেখ।

পরীক্ষা !

হ্যাঁ, পরীক্ষা করে দেখই না একবার যেভাবে খুশি। যে পরীক্ষা করবার ইচ্ছা কর—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, পরীক্ষায় হারলে সেই মুহূর্তে এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব।

শীলার শেষের কথায় সহসা অনিরুদ্ধর চোখের মণি দুটো যেন জ্বলে ওঠে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞায়। ওষ্ঠ দৃঢ়বন্ধ হয়।

এখুনি তুমি চুক্তির কথা বলছিলে, এই চুক্তিই না হয় হোক আমাদের মধ্যে !

বেশ !

তাহলে এখুনি তোমাকে বেরুতে হবে—

তোমার সঙ্গে বেরুতে হবে ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

নাই বা শুনলে। চল—দেখবে'খন।

বেশ, তাহলে আমি প্রস্তুত হয়ে নিই।

হ্যাঁ, তাই এসো।

॥ বারো ॥

মিনিট কুড়ির মধ্যেই শীলা প্রস্তুত হয়ে অনিরুদ্ধর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

ফিকে আকাশনীল রঙের পাতলা একটা শাড়ী, গায়ে গেরুয়া সিল্কের ব্লাউজ, বর্মিজ প্যাটার্নে মাথার কেশ রচিত। হাতে লং কোটটি।

অনিরুদ্ধ বুঝি মুহূর্তের জন্য নিজেকে ভুলেই চেয়ে থাকে শীলার মুখের দিকে।

সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি জেগে ওঠে শীলার ওষ্ঠপ্রান্তে। বলে, কি দেখছ? মনে করে দেখ, ঠিক যে বেশে তুমি আমাকে দেখতে চাইতে ঠিক সেই বেশেই আজ আমি সেজে এসেছি।

অনিরুদ্ধ কোন কথা না বলে হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে বাজে।

শীতের ছোট বেলা ইতিমধ্যেই ঝিমিয়ে এসেছিল। আলোর তেজও কমতে শুরু করেছিল।

চল!

প্রথমে অনিরুদ্ধ ও তার পশ্চাতে শীলা ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা-পথে এগিয়ে চলল।

রামচরণ চায়ের ট্রে হাতে ঠিক ঐসময় বারান্দা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ সামনে ওদের দুজনকে দেখে যেন থেমে যায়।

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওদের দিকে।

ব্যাপারটা রামচরণের কাছে শুধু অভাবিতই নয়, আশ্চর্যেরও!

যাদের মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত নেই, তারা সেজেগুজে পাশাপাশি চলেছে, কি ব্যাপার?

অনিরুদ্ধ রামচরণের বোবাদৃষ্টিতে বুঝি একটু অস্বস্তিই বোধ করে, তাড়াতাড়ি বলে, চা খাব না—নিয়ে যা।

রামচরণকে কথাগুলো বলে অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াল না।

একটু দ্রুতই যেন এগিয়ে গেল।

শীলা তাকে অনুসরণ করে।

কিরীটীও ঠিক ঐসময় শাশ্বতকে বিদায় দেবার জন্য ঘরের দরজাপথে বারান্দায় বের হয়েছে।

তারও চোখে পড়ে যায় ওরা দুজন। কিরীটীও রীতিমত বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়। শাশ্বত তো হয়ই।

কিন্তু শীলা বা অনিরুদ্ধ কেউ ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কতকটা যেন অগ্রাহ্যই করে।

ওদের মোটে দেখতেই পায় নি, এইভাবে ওদের পাশ দিয়ে বারান্দা-পথে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে যায়।

সিঁড়িপথে অনিরুদ্ধ আর শীলা মিলিয়ে যেতেই কিরীটী চাপা কণ্ঠে শাশ্বতকে প্রশ্ন করে, সঙ্গে তোমার গাড়ি আছে, শাশ্বত?

আছে।

পুলিসের জীপ, না তোমার নিজের গাড়ি?

আমার নিজেরই গাড়ি।

ঠিক আছে। এক মিনিট দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি।

কিরীটী চকিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

মিনিট চার-পাঁচের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে কিরীটী পুনরায় বের হয়ে এলো ঘর থেকে। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেশ বদলে নিয়েছিল সে। অ্যাশ কালারের গরম গ্রেট কোট গায়ে উঁচু কলারের এবং ফেল্ট ক্যাপ মাথায়। চোখের চশমাটা ঠিকই ছিল।

এসো।

শাশ্বতকে কোন কথা বলবার আর অবকাশ মাত্র না দিয়ে কিরীটী একটু ব্যস্ত-ভাবেই তাকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

শাশ্বতর গাড়িতে উঠবার সময়েই কিরীটী লক্ষ্য করল, পথের এক পাশে একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে তখনো শীলা আর অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় ট্যাক্সিরই অপেক্ষায়।

ওরা কেউ ওদের লক্ষ্য করে নি।

শাশ্বত গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, কোন্ দিকে যাবো?

আপাতত বাজার পর্যন্ত তো চল।

বাজারের কাছ-বরাবর আসতেই কিরীটী শাশ্বতকে বললে, ঐ রাস্তার বাঁয়ে গাড়িটা পার্ক করো।

কিরীটীর নির্দেশমতো শাশ্বত গাড়িটা রাস্তার ধারে পার্ক করলো।

কিন্তু তুমি যে বলছিলে কোথায় যেতে হবে তাড়াতাড়ি! প্রশ্ন করে শাশ্বত।

কিরীটী তখন শাশ্বতর পাশে বসে টোবাকো পাউচ থেকে টোবাকো নিয়ে হস্তধৃত পাইপের গহ্বরে ঠাসতে ঠাসতে বললে, সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি এলাম।

শাশ্বত কিরীটীর শেষের কথাটা যেন ঠিক বুঝতে পারে না, তাই ওর মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটী আবার বলে, আমি বলা মাত্রই গাড়িতে স্টার্ট দেবে মনে থাকে যেন—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, দেখা গেল একটা ট্যাক্সি পশ্চাৎ দিক থেকে আসছে। তার ভিতরে বসে অনিরুদ্ধ ও শীলা পাশাপাশি।

ট্যাক্সিটা কিছু ব্যবধানে পাশ দিয়ে কলকাতাভিমুখে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী বললে, চল শাশ্বত।

শাশ্বত প্রস্তুত হয়েই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঐ যে WBT 678—ঐ ট্যাক্সিটাকেই ফলো করে চল শাশ্বত। কিরীটী নির্দেশ দিল।

ট্যাক্সির মধ্যে।

শীলা প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

চাপা বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় অনিরুদ্ধ, জাহান্নামে!

শীলা হাসে তার সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি। তারপরই বলে, মনে পড়ে অনু,

সেটা ছিল হোলির দিন—

অনিরুদ্ধ ওর মুখের দিকে তাকাল।

শীলা অনিরুদ্ধর পাশে একটু যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলতে থাকে, আগ্রায় বেড়াতে গিয়েছিলাম দুজনে। তাজের চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে তুমি বলেছিলে, এই তাজের সামনে দাঁড়িয়ে আজ এই মুহূর্তটিতে তোমাকে পাশে নিয়ে কি মনে হচ্ছে জান শীলা?

অনিরুদ্ধ তাকিয়েই থাকে শীলার মুখের দিকে।

যাকে ভালবাসি তার হাত ধরে স্বর্গে প্রবেশের অধিকার যদি নাই পাই, জাহান্নামে যেতে বুঝি এতটুকু দ্বিধাও হবে না। বলে শীলা।

অনিরুদ্ধ চুপ করে বসে থাকে!

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ নজরে পড়ল, বিরাট একটা সোনার থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের দুজনার সামনে এসে যেন দাঁড়িয়েছে!

শ্যামবাজারের চৌমাথায় গাড়ি এসে তখন পৌঁচেছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, কোন্ দিকে যাব?

নয়া রাস্তা ধরে স্ট্যাণ্ড রোডে চল! অনিরুদ্ধ বলে।

রেড সিগন্যালের জন্য গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, আবার গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে চলতে শুরু করেছে তখন। উদ্দেশ্যহীন ভাবেই যেন অনিরুদ্ধ শীলাকে ট্যাকসিতে নিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে এদিক থেকে ওদিক অনেকক্ষণ ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল।

ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। দূরে চৌরঙ্গী আলোর মালা দুলিয়ে যেন লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

শীলা আবার একসময় প্রশ্ন করে, কোথায় যে যাবে যেন বলছিলে—

হ্যাঁ যাবো, আর একটু রাত হোক।

॥ তেরো ॥

ওদিকে আগের ট্যাকসিটাকে ফলো করতে করতে ক্লান্ত শাশ্বত একসময় পাশেই উপবিষ্ট কিরীটীকে বলে, কি ব্যাপার বল তো! ওরা যে তখন থেকে ট্যাকসি নিয়ে কেবল ঘুরছে আর ঘুরছেই—

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে, যাবে কোথাও নিশ্চয়ই—তারই প্রস্তুতি চলেছে।

আমরা যে ওদের ঘণ্টা দুই ধরে অনুসরণ করে চলেছি, ওরা কি তা টের পেয়েছে কিরীটী?

সন্দেহ করবার যখন কোন কারণ নেই, তখন নিশ্চয়ই এদিকে ওদের নজর নেই। স্টার্ট দাও।

গাড়ি ওদের আবার চলতে শুরু করেছে তখন। সত্যিই কিছুক্ষণ ময়দানের ধারে ট্যাকসি গাড়িটা ওদের থেমে থাকবার পর আবার তখন চলতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত অখ্যাতনামা একটা চীনা হোটেলের সামনে এসে ট্যাকসি থামিয়ে শীলা আর অনিরুদ্ধ নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি শাশ্বতকে বলে, চট্ করে নেমে গিয়ে ঐ ট্যাকসিওয়ালাকে তোমার পরিচয় দিয়ে বলে এসো এইখানেই অপেক্ষা করতে, যাতে ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে ওই ট্যাকসিটাই নেয়। আরো বলে দিও, কাল যেন সকালে তোমার কাছে গিয়ে থানায় রিপোর্ট করে।

শাশ্বত তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেল কিরীটীর নির্দেশমত।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুরে ট্যাকসিওয়ালা সেদিন ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিটারের প্রাপ্য ছাড়াও বেশী কিছু পেয়ে মনটা তার শান্ত হয়।

টাকাগুলো বার দুই গুনে পকেটে রেখে সবে গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবে, শাশ্বত এসে ট্যাকসির দরজার সামনে দাঁড়াল।

চীনা হোটেলটা ঠিক বড় রাস্তার উপরে নয়। চৌরঙ্গী অঞ্চলে হলেও একটু ভিতরের দিকে।

কিছুটা নিরিবিলি জায়গায় হোটেলটি হওয়ায় এবং সর্বপ্রকার ড্রিঙ্ক ও আহারের ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ এক শ্রেণীর নারী-পুরুষের প্রতি সন্ধ্যা ও রাত্রিতেই হোটেলটায় ভিড় হয়।

বিশেষ করে রাত্রের দিকে ভিড়টা যেন বেশ জমে ওঠে।

বিরাট একটি হলঘর। একধারে ডায়াসের উপরে বিলেতী গানের সঙ্গে অর্কেস্ট্রা চলেছে। তার গা ঘেঁষে প্যানট্রির মধ্যে যাতায়াতের দরজা-পথ। এবং প্যানট্রির দরজার বাঁদিকে ড্রিঙ্কের কাউন্টার ও ক্যাশ-কাউন্টার।

সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই আছে হোটেলটির মধ্যে।

নিরিবিলি কিউবিকলস চার-পাঁচটি। তার মধ্যে প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ নির্জন ও একক পরিবেশ। সেই রকম একটা কিউবিক্যালের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল শীলাকে নিয়ে অনিরুদ্ধ। ওয়েটার এসে সামনে দাঁড়াল। মেনু কার্ডটা নেয়ে শীলা সুন্দর মিষ্টি হাসি হেসে অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে বললে, আজকের ড্রিঙ্কটা আমি তোমায় পছন্দ করে দিই, অনু!

দাও।

জিন লাইম আর রাম উইথ্ হট্ ওয়াটার। ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বললে শীলা।

তুমি খাবে না? অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করে।

আমি কি ড্রিঙ্ক করি নাকি?

কর না!

না। সে এক রাত্রে হোটেলে তুমি একান্ত পীড়াপীড়ি করেছিলে বলেই ছোট একটা কোল্ড বিয়ার খেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর নয়।

কেন, ক্ষতি কি? খাও না!

বেশ।

ওয়েটার নির্দেশ নিয়ে চলে গেল।

শীলা!

বল।

আগ্রায় যখন গিয়েছিলাম, রাত্রের সেই হোটেলের কথা মনে আছে তোমার?

কোন্ বিশেষ কথাটি বলতে চাইছো, না বললে বুঝব কি করে?

সোডার বোতল খুলতে গিয়ে সেরাত্রে তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা জখম হয়েছিল—

হ্যাঁ, সে দাগ এখনও মেলায় নি। দেখ—, বলতে বলতে শীলা তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি অনিরুদ্ধর সামনে এগিয়ে ধরল।

শীলা তখনো হাসছে অনিরুদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে। সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি।

॥ চোদ্দ ॥

পরে আদালতে জবানবন্দির সময় অনিরুদ্ধ বলেছিল, ওর ওই সর্বনাশা হাসি—ওই হাসি যেন সত্যিই আমাকে পাগল করে দিত। ইচ্ছা করত ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে খিমচে ওর মুখ থেকে ওই হাসি মুছে দিই চিরদিনের জন্য। কতবার মনে হয়েছে, ওকে আমি হত্যা করব—হত্যা করব, কিন্তু পারি নি—পারি নি।

কিন্তু যাক সেকথা।

তবে হ্যাঁ, সেরাত্রেও হোটেলে কিউবিক্যালের ছোট্ট ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে অনিরুদ্ধর মনে হয়েছিল ওর গলাটা ও চেপে ধরে! ইচ্ছা হচ্ছিল চিৎকার করে বলে, বন্ধ কর—বন্ধ কর তোমার ও হাসি!

কিন্তু পারে নি তা অনিরুদ্ধ।

কেবল সুন্দর হাস্যোদ্দীপ্ত শীলার সুন্দর মুখখানির দিকে ও ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়েই রইল।

ওয়েটার ট্রেতে করে নির্দিষ্ট পানীয় ও কাচের জাগে ঈষদুষ্ণ গরম জল নিয়ে এল এবং সঙ্গে প্লেটে কিছু সলটেড নাটস্। ওয়েটার টেবিলের উপরে পানীয় ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে কিউবিক্যাল থেকে বের হয়ে গেল।

অনিরুদ্ধ গ্লাসের পানীয়ে ইচ্ছামত গরম জল মিশিয়ে চুমুক দেয়।

শীলা কিন্তু বাঁ হাতে গ্লাসটা ধরে প্লেট থেকে একটা একটা করে বাদাম তুলে মুখে দিতে থাকে নিশ্চিন্ত আলস্যে।

কই, খাচ্ছো না যে! অনিরুদ্ধ আড়চোখে শীলাব দিকে তাকিয়ে তাকে তাগিদ দেয়।

হ্যাঁ, খাবো। আচ্ছা অনি, সেবারে এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে আমার জন্মদিনে তুমি যে প্রেজেন্টটি আমাকে পাঠিয়েছিলে, নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে!

অনিরুদ্ধ শীলার মুখের দিকে তাকাল।

তুমি লিখেছিলে সেদিন, তুচ্ছ হতেও তুচ্ছতম যা আছে পাঠাচ্ছি তোমায়, কারণ যতই তুচ্ছ হোক না কেন জগতের চোখে, তবু পাঠাতে পারলাম এই ভরসাতেই যে ভালবাসা পরস্পর পরস্পরের কাছে পেয়েছি এর মূল্য জানি সেই নির্ধারণ করে দেবে। সত্যি সেদিনকার প্রেরিত তোমার সেই ছোট্ট চন্দনকাঠের কিউপিডের মূর্তিটি আজো আমার কাছে অমূল্য হয়েই রয়েছে। দেখবে, সেটা আমি এক মুহূর্তের জন্য কাছছাড়া করি না—এখনও আমার সঙ্গে এই বটুয়াতেই রয়েছে!

বলতে বলতে পাশের চেয়ারের উপর থেকে ক্ষণপূর্বে রক্ষিত বটুয়াটা তুলতে উদ্যত হতেই অনিরুদ্ধ তাকে বাধা দিল, থাক। কই, খাচ্ছো না কেন শীলা, খাও!

অনিরুদ্ধর সে কথার জবাব না দিয়ে শীলা বলে, দীর্ঘকাল পরে সেদিন আমাদের প্রথম সাক্ষাতের পর আমার মুখের দিকে তাকিয়েই যে মুহূর্তে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে অস্বীকার করেছিলে, সেদিন সত্যিই আমার যেন বুক ফেটে কান্না এসেছিল।

সত্যি নাকি!

হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো সেদিন দীর্ঘ ব্যবধানের পরও তোমাকে দেখামাত্রই চিনে নিতে কোন কষ্টই হয় নি! তবে তুমি পারলে না কেন আমাকে চিনতে? অ্যাটর্নীর চিঠিতে পরিচয় ও উইলের নির্দেশ জেনে কি আনন্দই যে সেদিন হয়েছিল আমার! ভেবেছিলাম এ নিশ্চয়ই সেই প্রেমের দেবতারই ইঙ্গিত—

কই, খাচ্ছ না তো তুমি? আবার তাগিদ জানায় অনিরুদ্ধ।

এবং নিজের গ্লাস ইতিমধ্যে শূন্য হয়ে যাওয়ায় ওয়েটারকে ডেকে আর এক পাত্র নিয়েছিল। সেই দ্বিতীয় পাত্রে চুমুক দিতে দিতে শীলার মুখের দিকে তাকায় অনিরুদ্ধ।

শীলা তখন বলছে, তুমি বলেছিলে দারিদ্র্যকে তুমি ঘৃণা কর, অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিয়ের কথা তুমি ভাবতেই পার না—তাই তো মিঃ গুহর চিঠি পেয়ে সেদিন মনে হয়েছিল, প্রেমের দেবতা বুঝি এমনি করে ইতিপূর্বে কাউকেই আশীর্বাদ করেন নি!

তারপর?

কত আশা নিয়ে যে সেদিন রওনা হয়েছিলাম—

প্রেমের দেবতার আশীর্বাদই বটে। নচেৎ অমন অকস্মাৎ পথে ট্রেন-দুর্ঘটনায় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়!

অনিরুদ্ধর কণ্ঠস্বরে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গের সুর।

কিন্তু শীলা সেদিকে কোন নজরই দেয় না যেন।

সে বলতে থাকে, দুর্ঘটনা বলে দুর্ঘটনা! এক বছরেরও বেশী একেবারে

বেঁচেও মরে রইলাম। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব একেবারে অন্ধকার। কোথায় আমি, কে আমি—কিছুই মনে রইল না। ভাগ্যে সে দিনগুলো স্মৃতির পৃষ্ঠায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, নচেৎ সত্যিই বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম। তারপর যদিও বা আবার সুস্থ হয়ে এখানে এলাম, তুমি আমার দিক থেকে নিলে মুখ ফিরিয়ে—

কিন্তু এসব কথা কেন বলছ বলতে পাব ?

বলব না! ভাব তো, এই দেড়টা মাস এখানে আসা অবধি তুমি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারটাই না করেছ ? উঃ সত্যি, আজ যেন আমার আবার নতুন করে জন্ম হল মনে হচ্ছে!

নতুন করে জন্ম হল ? তির্যক্ দৃষ্টিতে তাকাল গ্লাসটা হাতে ধবে অনিরুদ্ধ শীলার দিকে যেন।

নয় ? আজ নিশ্চয়ই তোমার সংশয়ের শেষ হয়েছে—

না।

অকস্মাৎ যেন বজ্রপাত হল।

অনিরুদ্ধ !

হ্যাঁ, এতটুকুও নয়। এখনও আমার স্থির বিশ্বাস, আমি যে শীলাকে জানতাম তুমি সে শীলা নও।

অনিরুদ্ধ ! চাপা আর্তকণ্ঠে ডেকে ওঠে শীলা আবার।

হ্যাঁ, তুমি সে শীলা নও—নও। কথাগুলো শান্ত ধীর কণ্ঠে বলে হাতের গ্লাসটা সামনের টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল। যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবেই পরমুহূর্তে অনিরুদ্ধ অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, বোয় !

শীলা যেন কেমন বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধর মুখের দিকে।

মুখে তার আর সত্যিই যেন কোন কথা যোগায় না।

ওয়েটার এসে কিউবিক্যালের মধ্যে ঢুকল।—বিল !

ওয়েটার চলে গেল। এবং অদ্ভুত একটা যেন শ্বাসরোধকারী স্তব্ধতার মধ্যে দুজনে মুখোমুখি বসে রইল।

অতঃ কিম্ !

বেয়ারা একটা কাচের প্লেটে বিল এনে রাখল টেবিলের উপর নামিয়ে।

পকেট থেকে পার্স বের করে বিলটা চুকিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ, তাহলে আমি চললাম !

শীলা কোন জবাবই দিল না সেকথার।

অনিরুদ্ধ সত্যি-সত্যিই পরমুহূর্তে কিউবিক্যালের সুইং-ডোর ঠেলে বের হয়ে গেল

শীলা যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইল।

কতক্ষণ ঐ কিউবিক্যালের মধ্যে স্থাণুর মত বসেছিল শীলা নিজেরই তা মনে নেই। হঠাৎ চমক ভাঙল কিরীটীর মৃদু সম্বোধনে।

মিস্ রয়—শীলা দেবী!

কে? মিঃ সিনহা!

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে শীলা কিরীটীর মুখের দিকে।

ব্যাপারটা যেন তার সমস্ত উপলব্ধি ও বোধগম্যের বাইরে।

চলুন, উঠুন—এখানে আর এভাবে বসে থেকে কি করবেন!

যাব? কোথায়?

কেন, বাড়ি!

কিন্তু—

উঠুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

শীলা উঠে দাঁড়াল।

শাশ্বতকে আগেই বিদায় করে দিয়েছিল কিরীটী।

তার উপরে নির্দেশ দিয়েছিল কিরীটী, অনিরুদ্ধ বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে হোটেল থেকে তাকে অনুসরণ করে।

হোটেলের সামনে থেকে একটা খালি ট্যাকসি ডেকে শীলাকে সঙ্গে করে উঠে বসল কিরীটী।

কোথায় যাব? ট্যাকসি-ড্রাইভার শুধায়।

বরাহনগর।

ট্যাকসি থেকে নেমে কিরীটী শীলাকে সঙ্গে করে সোজা এসে তার ঘরে প্রবেশ করল।

বসুন শীলা দেবী।

পথে ট্যাকসিতে এতক্ষণ সমস্ত পথ দুজনার মধ্যে একটি কথাও হয় নি।

শীলা যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। একেবারে যেন মূক।

পকেট থেকে পাইপটা বের করে তাতে টোবাকো ভরে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী পুনরায় তাকাল শীলার মুখের দিকে।

প্রস্তরমূর্তির মতই যেন নিঃশব্দে বসে আছে শীলা খোলা জানালা-পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে। ঐ মুহূর্তে শীলা যেন এই জগতে আর নেই। দূরে—অনেক দূরে তার মন।

॥ পনেরো ॥

কিরীটী আবার ডাকল।

শীলা দেবী!

কোন সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে কেবল মুখটা ঘুরিয়ে তাকাল শীলা তার ডাকে ওর মুখের দিকে।

একটা কথার-জবাব দেবেন?

কি ?

কেন আপনি এখনও মিথ্যে আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটছেন ?

আলেয়া—

কথাটা বলে কতকটা যেন থতমত খেয়েই শীলা এবারে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

নয় ? কেন এখনও আপনি বুঝতে পা ্ছেন না, অতীতে কোন একদিন আপনাকে ঘিরে ওর কোন মোহ বা ভালবাসা থাকলেও—

মিঃ সিনহা !

হ্যাঁ, আজ আর তার কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যাক গে সেকথা, সত্যিই আপনার ভুল হয় নি তো ?

এবার আর কোন জবাব দেয় না শীলা। কেবল ওর দুটি চক্ষু জলে টলটল করে ওঠে।

হুঁ, আপনি তাহলে স্থিরনিশ্চিত যে উনি আপনার সেই পরিচিত অনিরুদ্ধবাবুই সত্যি !

এবারেও শীলা কোন জবাব দেয় না।

আবার বলছি ভাল করে ভেবে দেখুন, ছয় মাস সময়টা বড় কম সময় নয় ! পরিণত বুদ্ধি ও মনের ছয় মাসের পরিচয়টা সারাজীবন একজনকে আর একজনের মনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট, সত্যিই উনি আপনাব সেই অনিরুদ্ধবাবুই তো ? কোন রকম ভুল হয় নি আপনার ?

তথাপি শীলা নিশ্চুপ।

বেশ, তাই যদি হয় তো উনিই বা আপনাকে চিনতে চাইছেন না কেন ? কেন স্বীকার করছেন না আপনাকে ? কিম্বা আপনাকে স্বীকার না করার পক্ষে ওঁর কি কোন কারণ বা স্বার্থ থাকতে পারে—

স্বার্থ !

এতক্ষণে আবার মুখ খুললো শীলা।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

আমার তো মনে হয়, সত্যিই যদি আপনাকে উনি চিনতে পেরেছেন অথচ স্বীকার করছেন না—তার পিছনে তাহলে নিশ্চয়ই ওঁর কোন স্বার্থ আছে।

কি স্বার্থ থাকতে পারে ?

সেটা জানতে পারলে তো গোলমালই মিটে যায়। কিন্তু যাক সে কথা, সুস্থ হবার পরও চার-পাঁচ মাস সময় প্রায় আপনি কাশীতে জগৎবাবুর ওখানেই ছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা—তা ছিলাম—

কিন্তু কেন বলুন তো ? সুস্থ হয়ে অতীত সব মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কেন

সোজা এখানে চলে এলেন না ?

আসি নি—

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কেন আসেন নি ?

আসতে ইচ্ছা হয়নি—

কেন ?

খবরের কাগজে দেখেছিলাম সেই দুর্ঘটনায় নাকি ওর মৃত্যু হয়েছে—

তারপর মৃত্যু যে হয় নি জানলেন কি করে ?

জেনেছিলাম—

কেমন করে জেনেছিলেন ?

একজন আমাকে সংবাদটা দেয়—

কে সে ?

ক্ষমা করবেন মিঃ সিনহা, তার নাম—তার নাম আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

বেশ, তা যেন হল, কিন্তু অনিরুদ্ধবাবু বেঁচে আছেন জানবার পরই বা তাঁর কাছে সর্বাগ্রে চিঠি দিলেন না কেন আপনার সংবাদ দিয়ে ?

আমি, মানে আমি তখনও জানতাম না—

কি জানতেন না ?

যে আমার পরিচিত অনিরুদ্ধ আর এই অনিরুদ্ধ একই ব্যক্তি—

জানলেন কবে ?

কলকাতায় এসে মিঃ গুহর অফিসে দেখা করবার পর তাঁর কাছে অনিরুদ্ধর ফটো দেখে।

হুঁ। আচ্ছা শীলা দেবী, নীচে হলঘরে নরহরিবাবুর বোন শৈলবালার যে ফটোটা আছে, দেখেছেন ?

না তো !

দেখেন নি ?

না।

কাল একবার ভাল করে দেখবেন।

দেখব।

আর একটা কথা—

বলুন ?

অনিরুদ্ধবাবুকে যতটা পারবেন এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবেন—

এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করব ?

হ্যাঁ, তাতে করে জানবেন আপনার মঙ্গলই হবে। আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন।

শীলা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই রামচরণ এসে ঘরে ঢুকল, বাবু আপনার ফোন—

কে ফোন করছেন বললে কিছু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, গুহবাবু—অ্যাটর্নী !

কিরীটী একটু অবাকই হয়, গুহ হঠাৎ এত রাত্রে কি কারণে ফোন করছেন ?

ফোন ধরে কিরীটী বলে, সিনহা কথা বলছি। কি ব্যাপারে মিঃ গুহ, এত রাত্রে ?

একটা ব্যাপার আপনাকে জানানো উচিত ছিল আমার এতদিন—

কি বলুন তো ?

নরহরির ব্যাঙ্ক্-ব্যালেন্স ও স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও কিছু মূল্যবান জহরৎ ও জুয়েলস্ আছে—

জহরৎ !

হ্যাঁ। সেগুলো আসলে রামহরির স্ত্রীর সম্পত্তি, অর্থাৎ নরহরির মায়ের—হরসুন্দরী দেবীর নিজস্ব সম্পত্তি।

তা সে জহরৎগুলোর কথা নরহরির উইলের মধ্যে কি mention করা নেই ?

না। তাঁর ইচ্ছা ছিল জহরৎগুলোর কথা নূতন আর একটা উইল করে তার মধ্যে বলে যাবেন—

নূতন উইল !

হ্যাঁ, কথাটা অবিশ্যি আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুখ থেকেই সর্বপ্রথম একদিন শুনেছিলাম, নরহরির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে নরহরি-বাবুর নাকি নতুন করে আর একটা উইল করার ইচ্ছা তাঁর মৃত্যুর মাসকয়েক পূর্বেই হয়েছিল।

তারপর ?

তারপর শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি সে উইল করবার আর সময় হয়ে ওঠে নি তাঁর।

আপনার পিতৃদেব কবে স্বর্গত হন ?

নরহরির মৃত্যুর দিন পনেরোর মধ্যেই।

তা এ সব কথা তো আপনি এতদিন আমাকে বলেন নি ?

না, বলি নি, কারণ ঐ প্রসঙ্গের এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নি বলেই বলি নি।

তাহলে আজই বা জানাচ্ছেন কেন ?

আমার পার্টনার আপনাকে জানাতে বললেন আজ—

তাই বলছেন ?

তাই।

Thanks! তা যে জহরৎগুলোর কথা বলছিলেন সে জহরৎগুলো কোথায় ? ব্যাঙ্কে কি ?

তা বলতে পারি না। তবে ব্যাঙ্কে যে নেই সেটা জানি।

কোথায় আছে অনুমান করেন ?

খুব সম্ভবত ওই বাড়িরই কোন সিন্দুক বা কিছুতে আছে বলেই আমার ধারণা।

নরহরির মৃত্যুর পর সিন্দুক খোলা হয়েছিল ?

হ্যাঁ, কিন্তু খোঁজ করে দেখি নি তখন, তা ছাড়া খোঁজ করবার কথা সে সময়ে মনেও হয় নি। অনিরুদ্ধবাবুর সামনেই সিন্দুক থেকে উইলটা শুধু বের করে নিয়ে সিন্দুকে আবার তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সে সিন্দুকটা কোন্ ঘরে আছে ?

নরহরির শয়নঘরে।

সিন্দুকের চাবি কার কাছে ?

নরহরির উইল সংক্রান্ত ব্যাপার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছেই থাকবে—

আচ্ছা নরহরির উইলটা কে লিখেছিলেন ? আপনার বাবা, না আপনি ?

বাবাই লিখেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমিও ছিলাম।

হুঁ। নরহরির দ্বিতীয়বার উইল করবার কথাটা আপনি জানতেন না ?

না, বাবার মুখেই শুনেছিলাম।

আচ্ছা মিঃ গুহ, কেন নরহরিবাবু উইল বদলাতে চেয়েছিলেন বা দ্বিতীয়বারের উইলের সারমর্ম সম্পর্কে আপনি আপনার বাবার কাছে কোন কথা শুনেছিলেন কি ?

শুনেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, ওই জহরৎগুলো নাকি তিনি শীলাকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সেই জন্যই দ্বিতীয়বার উইল করতে চেয়েছিলেন—

কি রকম, কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলুন—

বিবাহ না হলে অনিরুদ্ধ ও শীলা সম্পত্তি পাবে না বটে, তবে অনিরুদ্ধ পাবে মাসিক তিন শত করে টাকা মাসোহারা আর শীলার বিবাহ হোক বা না হোক ওই জহরৎগুলো পাবে।

বিচিত্র প্রেম তো!

কী বললেন ?

বলছিলাম নরহরির বিমলার প্রতি প্রেমটা সত্যিই বিচিত্র সন্দেহ নেই।

ফোনের ওপাশ থেকে একটা মৃদু হাসির অস্ফুট শব্দ ভেসে এলো।

এই কথাটা বলবার জন্যই কি ফোন করছিলেন ?

হ্যাঁ।

ধন্যবাদ।

॥ ষোলো ॥

ঘরে ফিরে এসে সোফাটার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটী ভাবছিল, শীলা কি জহরৎগুলোর কথা জানে ? কথাটা জিজ্ঞাসা করার কথা কিরীটীর মিঃ গুহকে কেন মনে পড়ল না ?

কথাটা কালই একবার ফোনে গুহকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কথাটা জানা দরকার।

শীলা—

বিমলার কন্যা শীলা। যে বিমলাকে একদিন নরহরি সরকার ভালবেসেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে সত্যিকারের। এবং যে ভালবাসার সম্মান দিতে গিয়ে সারাটা জীবন তিনি কৌমার্য রক্ষা করে গিয়েছেন।

যদিচ বিমলা তাঁর সেই ভালবাসার সম্মান রক্ষা করে নি। অক্লেশেই আর একজনের গলায় মালা দিয়েছিল। তথাপি আশ্চর্য, বিমলার প্রতি নরহরির সেই ভালবাসার কোন তারতম্য ঘটেনি। সারাটা জীবন অবিবাহিত তো থেকেই গিয়েছেন, তারপর নিজের সম্পত্তিই নয় শুধু, নিজের গৃহে সেই বিমলারই কন্যার অধিকারটাকে কায়েমী কববার জন্য একমাত্র ভাগ্নের বধূ তাকেই নির্বাচন করে রেখে গিয়েছেন। এবং কেবলমাত্র নির্বাচনই নয়, এমন ভাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছেন, যার ফলে তাঁর সেই সুবিপুল সম্পত্তির লোভকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর নির্বাচনকে অস্বীকার করাও একপ্রকার সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য।

কিন্তু বিমলার কন্যা শীলা কি সত্যিই সৌভাগ্যের ন্যায্য অধিকারিণী ?

প্রশ্নটা কিরীটীর মনের মধ্যে বার বারই আনাগোনা করতে লাগল।

শীলার চরিত্র ও ব্যবহার দুর্বোধ্য নিঃসন্দেহে। প্রথমতঃ সেরাত্রের সেই কালো চাদরে আবৃত রহস্যময় পুরুষটি কে, যে সেরাত্রে নিঃশব্দে চোরের মত লুকিয়ে শীলার শয়নঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল ? যার সঙ্গে কথাবার্তায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে সেই রহস্যময় পুরুষের যে পরিচয়ই থাক, শীলার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে।

তারপর অনিরুদ্ধ—

অনিরুদ্ধর সঙ্গে একদা শীলার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এমন কি বিবাহের কথাবার্তাও হয়েছিল উভয়ের মধ্যে অথচ আজ অনিরুদ্ধ শীলাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না!

কেন ?

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল বারান্দায়।

মুহূর্তকাল কান পেতে থেকেই বুঝতে পারে সে পদশব্দ কার। অনিরুদ্ধর পদশব্দ। তাড়াতাড়ি কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে আসে বারান্দায়। বারান্দার আলোয় দেখতে পায় অনিরুদ্ধই এগিয়ে আসছে।

অনিরুদ্ধও কিরীটীকে তার ঘরের দরজায় দেখতে পেয়েছিল।

সে-ই প্রথমে কথা বলে, মিঃ সিনহা!

অনিরুদ্ধবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। যদি অনুগ্রহ করে আমার ঘরে একটু আসতেন—

মুহূর্তকাল যেন দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধ কি ভাবল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, বেশ, চলুন।

দুজনে এসে ঘরে প্রবেশ করতেই কিরীটী বলে, বসুন!

অনিরুদ্ধ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আপনাকে কয়েকটা পুরানো প্রশ্ন আবার করতে চাই অনিরুদ্ধবাবু!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল অনিরুদ্ধ কিরীটীর মুখের দিকে, কি প্রশ্ন?

শীলা দেবী সম্পর্কে—

ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হল অনিরুদ্ধর।

আচ্ছা অনিরুদ্ধবাবু, আপনি স্থিরনিশ্চিত যে উনি সত্যিকারের শীলা দেবী নন?

নিশ্চয়ই। সেকথা তো অন্তত হাজারবার আপনাদের সকলকে বলেছি, কিন্তু আমার সেকথা তো আপনারা বিশ্বাসই করছেন না!

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, দেখুন কথাটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি অনিরুদ্ধবাবু। আপনার কথাটা বিশ্বাস যে একেবারে করি না তা নয়, তবে—

সত্যি সত্যি আপনার তাহলে বিশ্বাস হয়েছে এতদিনে যে ও আসল শীলা নয়! উৎফুল্ল আগ্রহে প্রশ্নটা করে কিরীটীকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনিরুদ্ধ!

তা কিছুটা করেছি যে তা অস্বীকার করলে সেটা মিথ্যাই বলা হবে, কিন্তু শুধু বিশ্বাস এখন করলেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে তো ব্যাপারটা।

প্রমাণ?

হ্যাঁ, প্রমাণ করতে হবে—

কিন্তু এর মধ্যে প্রমাণ করাকরির কি আছে, বলতে পারেন?

তা বললে কি হয়, আপনি যে **interested party**!

মানে? এতে আমার **interest** কোথায় মশাই? বরং না বিয়ে করলে সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত তো আমিই হব—ও নয়।

তা ঠিকই বলেছেন, তবে—

তবে আবার কি?

তা একটু আছে বইকি—

কী রকম?

আপনি আজ বিবাহ ওকে না করলেও, তেমন কি খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি?

কী বলছেন!

ঠিকই বলছি, কারণ আপনি তো ইতিপূর্বেই প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার শেয়ার কিনে বসে আছেন দুই তিনটি প্রফিটেবল কনসার্নের, যার থেকে বছরে ত্রিশ হাজার টাকা ডিভিডেন্ড অনায়াসেই আপনি পাবেন। তার উপরে ফাউ হিসাবে মাসে তিনশো টাকা করে—

কিরীটীর কথায় মুহূর্তের জন্য যেন অনিরুদ্ধর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, মামার যে

সম্পত্তির পরিমাণ তার কাছে ওই সোয়া দু লক্ষ টাকা তো সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ! অতএব—

মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে কিরীটী বলে, না, এর মধ্যে কোন অতএব নেই অনিরুদ্ধবাবু। মাত্র তিনশো টাকার মাহিনায় যে চাকরি করতেন এতদিন, তার কাছে ওই টাকা তো বলতে পারেন রাজার সম্পত্তি—

রাজার সম্পত্তি!

তা বৈকি—

আপনি দেখছি পাগল!

পাগল আমি নই অনিরুদ্ধবাবু, পাগল আপনিই, কারণ আপনি যে আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখছেন জানবেন সেটা একটা দুঃস্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নয়!

আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখছি?

হ্যাঁ।

কি বলছেন? আপনার কথাটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না!

না বুঝতে পারার মত তো কিছু নেই। শুনুন মিঃ ঘোষ, চিত্রাভিনেত্রী মন্দিরা চ্যাটার্জী আজ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন আপনার রূপের মোহে নয়, নরহরির সুবিপুল সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন আপনি সেই আশাতেই বা বলতে পারেন সেই সম্পত্তিরই মোহে, কিন্তু তিনি কি আপনার মামা নরহরিবাবুর উইলের শর্তগুলো জানেন?

কে—কে বললে আপনাকে এসব গল্প-কথা?

আপনার কথাতেই জবাব দিই, কারণ শেষ পর্যন্ত হয়তো আপনার পক্ষে সবটা গল্প-ব্যাখ্যাতেই দাঁড়াবে। তাঁকে বিয়ে করে তাঁর সম্পত্তি আপনি যে আপনার টাকার সঙ্গে যোগ দেবেন কল্পনা করে রেখেছেন, সে মেয়ে এত বোকা নয় জানবেন। তিনি আসল এবং জাত অভিনেত্রী। তাঁর কাছে প্রেমের চাইতে রূপচাঁদের মূল্য ঢের বেশী।

হঠাৎ যেন স্থান-কাল-পাত্র ভুলে কিরীটীর শেষের কথায় চিৎকার করে ওঠে অনিরুদ্ধ, সে যে আমাকে কথা দিয়েছে—

কি কথা দিয়েছে? বিয়ে করবে আপনাকে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কবে?

এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে গেলেই—

ঠিক বলেছেন, মীমাংসা একটা হয়ে গেলেই! তাহলেই বুঝতে পারছেন, আপনি নিজে থেকে না বললেও তিনি উইলের শর্তের সংবাদ পেয়েছেন এবং রাখেনও। কিন্তু যাক সেকথা, বিয়ে করেন তিনি আপনাকে ভালই, কিন্তু একটা কথা হয়তো এখনও আপনি জানেন না—

কি—কি কথা?

শীলা দেবী কাল বলেছেন—

॥ সতেরো ॥

কী—কী বলেছেন ?

আপনার identity সম্পর্কে আজ তিনিও সন্দিহান—

কী কী বললেন ?

তাই তিনি বলেছেন—

মিথ্যা কথা। তা ছাড়া বললেই অমনি হল ! তার কথা বিশ্বাস করছে কে ?

আপনার কথাও তো পুলিস বিশ্বাস করছে না ! যাক্, আপনাকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখব না, আর কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

কী ?

আপনি যখন প্রেসিডেন্সীতে পড়তেন আপনার একজন সহপাঠী ছিলেন—

কে ?

কিরীটী রায়—

কে ? কি নাম বললেন ?

কিরীটী রায়। মনে পড়ছে নিশ্চয় আপনার সেই বন্ধু ও সহপাঠীর কথা—

হ্যাঁ, মনে পড়ছে বৈকি—

তা তো মনে থাকবারই কথা। তা তিনি যে আজ সন্ধ্যায় আপনার খোঁজে এসেছিলেন !

আমার—আমার খোঁজে ?

হ্যাঁ। এবং বলে গেছেন কাল সন্ধ্যার সময় আবার তিনি আসবেন।

ও ! তা—

আচ্ছা আর আপনাকে ধরে রাখব না, আপনি এবারে যেতে পারেন।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই নয়, একটু পরে যেন ক্লান্ত শ্লথ পদবিক্ষেপে অনিরুদ্ধ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তারপর অনিরুদ্ধর জুতোর শব্দটাও ক্রমশঃ একসময় বাইরের বারান্দায় মিলিয়ে গেল !

কিরীটী এবারে নিঃশব্দে উঠে তার নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কুটিল সন্দেহকে মনের গভীর থেকে টেনে এনে হিংস্র বীভৎস মূর্তিতে সে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অতএব আজকের এই রাতটার জন্য কিরীটী অনিরুদ্ধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। ঘরের আলো নিভিয়ে দিল।

সত্যিই অতঃপর নিশ্চিন্তে কিরীটী এসে শয্যায় আশ্রয় নিল।

শয্যায় শুয়ে রেডিয়াম ডায়েল দেওয়া হাত-ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। রাত্রি সোয়া বারোটা।

মধ্যরাত্রি।

নিশ্চিন্ত হয়ে শয্যায় শুয়েছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুয়ে থাকা তার হলো না। হঠাৎ একটা কথা—একটা সম্ভাবনা মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়ায়

আরো মিনিট পনের পরেই নিঃশব্দে কিরীটী শয্যা থেকে নামল। এবং নিঃশব্দেই ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে গেল।

বারান্দায় বের হয়ে সর্বাগ্রে কিরীটী বারান্দার আলোটা সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার।

কিছুক্ষণ কান পেতে তারপর দাঁড়িয়ে রইলো, কোন শব্দ কোথাও থেকে আসছে কিনা শোনার জন্য। না, কোন শব্দ নেই। এবারে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে কিরীটী অগ্রসর হলো অনিরুদ্ধর ঘরের দিকে।

অনিরুদ্ধর ঘরের দরজা বন্ধ। কান পেতে দরজার গায়ে কোন শব্দ ঘরের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় কিনা শোনবার চেষ্টা করলো।

কোন শব্দ নেই। অগ্রসর হলো এবারে কিরীটী শীলার ঘরের দিকে।

শীলার ঘরের দরজা বরাবর আসতেই অনিরুদ্ধর চাপা কণ্ঠস্বর কানে এলো কিরীটীর ভিতর থেকে।

কিরীটী মনে মনে না হেসে পারল না। বিচিত্র মানুষের ঈর্ষা বস্তুটা, এত তাড়াতাড়ি সেটা কাজ করছে তাহলে! কান পাতল কিরীটী বন্ধ দরজার গায়!

অনিরুদ্ধ বলছে, যেতে তোমাকে হবেই। তুমি যত টাকা চাও শীলা তোমাকে আমি দেবো—

টাকা!

হ্যাঁ, দশ হাজার পনের হাজার বিশ হাজার যা চাও—

টাকা তো আমি চাই না। শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব এলো!

টাকা চাও না!

না।

তবে কিসের আশায় এখানে পড়ে আছ শুনি?

মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল শীলার আবার, সে তুমি বুঝবে না অনিরুদ্ধ। না না, তুমি আমাকে এখান থেকে যেতে অনুরোধ করো না, যেতে আমি পারবো না।

যেতে তোমাকে হবেই।

না না না—

শোন শীলা, এই শেষবারের মতো তোমাকে আমি বলছি, যেতে তোমাকে হবেই—

না, কিছুতেই না।

তুমি যাবে না?

অনিরুদ্ধবাবু, প্লিজ, শোন—

কাকুতি ঝরে পড়ে শীলার কণ্ঠ থেকে।

না, না—

শোন, কেন তুমি বুঝতে পারছ না সব—

শীলা!

তুমি—তুমি অনু—

কান্নায় গলার স্বর বুজে আসে শীলার।

শোন, ন্যাকামি রাখো, আটচল্লিশ ঘণ্টা তোমাকে আমি সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে তোমাকে এখান থেকে জেনো চলে যেতে হবে। যদি না যাও—

কী, থামলে কেন, বল?

যাতে তুমি যেতে বাধ্য হও সেই ব্যবস্থাই জেনো আমি করবো। শোন, কাল আবার এই সময় আমি আসবো তোমার জবাব শুনতে—

কিরীটী আর দাঁড়ায় না দরজার গোড়ায়, চকিতে বারান্দার অপর প্রান্তে সরে যায়।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ কানে এলো।

॥ আঠারো ॥

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ শাশ্বত এসে কিরীটীর ঘরে ঢুকল।

কিরীটী এক জোড়া তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিল।

মুখ না তুলে তাস খেলতে খেলতেই বললে, এসো শাশ্বত, কি খবর?

এলাহাবাদের পুলিস-রিপোর্ট এসেছে—

এসেছে! কি লিখেছে ওরা?

কিছু **interesting** ব্যাপার আছে রিপোর্টের মধ্যে—

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কি রকম?

আজ থেকে প্রায় আঠার মাস আগে এই অনিরুদ্ধ ঘোষ—

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী শাশ্বতর মুখের দিকে উৎসুক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, কী?

'জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া' ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন এজেণ্ট ছিল অনিরুদ্ধ, জান তো?

তা তো জানি।

একজন মৃত্যুপথযাত্রী টি. বি. রোগীর নামে এক লক্ষ টাকার একটা কেস করে অনিরুদ্ধ এবং প্রথম প্রিমিয়াম দেওয়ার পর দ্বিতীয় প্রিমিয়াম **due** হবার দিন কুড়ি আগেই লোকটা মরে যায়—

হুঁ, তারপর? লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাটা **realised** হয়েছিল?

হয়েছিল। যদিচ কোম্পানী সন্দেহ করে যথাসাধ্য **investigation** করে, কিন্তু কোন কিছুরই কিনারা করতে পারে নি সে ব্যাপারের আজও পর্যন্ত।

তারপর?

ব্যাপারটা আপনা থেকেই শেষ পর্যন্ত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু মাস চারেক আগে অনুরূপ আর একটি **life case** হলো কোম্পানীর—

এবারেও অনিরুদ্ধই করেছিল বোধ হয় ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

এবারে আর এলাহাবাদে নয়, কলকাতায়—

বল কি ? তাহলে এখানে আসার পরও অনিরুদ্ধবাবু ইনসিওরেন্সের চাকরিটা চালিয়ে যাচ্ছিল বলতে চাও ?

তাই তো দেখছি—

Funny ! তারপর ?

এবারে দুটো **premium** দেবার পর গতমাসে ভদ্রলোক **railway accident**-এ মারা গিয়েছেন—

Railway accident-এ !

হ্যাঁ, কিন্তু এবারেও **investigation** চলেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন কিনারাই করতে পারেনি বলে ব্যাপারটা আমাদের হাতে এসেছে গতকাল মাত্র—

কথাগুলো বলে শাশ্বত কিরীটীর দিকে তাকাল।

॥ উনিশ ॥

কিরীটী তখন চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করছিল। বর্তমান রহস্যের মধ্যে যে হারানো সূত্রটি কিছুতেই কিরীটী খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই সূত্রটিই যেন কিরীটীর মনের মধ্যে ওই মুহূর্তে উঁকি দেয়।

কি জানি আজ সকালে হঠাৎ মনে হল ব্যাপারটা তোমাকে জানানো দরকার, তাই চলে এলাম।

ভালই করেছ। **It is important**—কিরীটী মৃদু কণ্ঠে কথাটা বলে পুনরায় পায়চারি করতে লাগল।

তোমাকে যেন একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে কিরীটী !

শাশ্বতর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না কিরীটী, যেমন পায়চারি করছিল তেমনিই পায়চারি করতে লাগল।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে কিরীটী শাশ্বতর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকল, চৌধুরী !

বল ?

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—

বল—

এখনি 'জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া'র অফিসে একবার যেতে হবে—

'জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া'র অফিসে !

হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজারকে বলবে আজই বেলা তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে যেন অতি অবিশ্যি অনিরুদ্ধকে অফিসে তিনি ডেকে পাঠান

জরুরী অফিসের কাজের কথা বলে—

কিন্তু—

আঃ, যা বলছি যাও এখুনি গিয়ে কর—আর দেরি করো না। হ্যাঁ, তুমি যাবে সেখানে ঠিক আড়াইটায়—

বেশ।

যাও, আমিও ঠিক আড়াইটায় যাচ্ছি সেখানে—যাও, আর দেরি করো না, ওঠ।

শাশ্বতকে যেন একপ্রকার ঠেলেই কিরীটী ঘর থেকে বের করে দিল।

সেই দিনই ঠিক বেলা দুটোয় গিয়ে হাজির হল কিরীটী 'জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া' ইনসিওরেন্স অফিসের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আয়ারের ঘরে।

মিঃ আয়ার ঘরেই ছিলেন। কিরীটী মিঃ আয়ারের কাছে ডি. সি.র একটি পরিচয়-পত্র তার সম্পর্কে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে—সেটি পেশ করল।

মিঃ আয়ার কিরীটীকে বসতে বলে চিঠিটা খুলে পড়লেন।

আপনিই মিঃ রায় ?

হ্যাঁ।

বলুন কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি! ডি সি. লিখেছেন, আপনি আমাদের কেসটা সম্পর্কে তদন্ত করতেই এসেছেন—

হ্যাঁ, আপনি অনিরুদ্ধবাবুকে আসবার জন্য ফোন করেছিলেন ?

হ্যাঁ, হোটেলে তখন তিনি ছিলেন না অবিশ্যি—

হোটেলে! অনিরুদ্ধবাবু কি হোটেলে থাকেন নাকি ?

হ্যা, সিটাডেল হোটেলেই তো তিনি এলাহাবাদ থেকে আসা অবধি গত দেড় বৎসর আছেন।

I see!

কিরীটীর বুঝতে আর কিছুই বাকী থাকে না। অনিরুদ্ধর উইল সংক্রান্ত ব্যাপারটা তাহলে মিঃ আয়ার কিছুই জানেন না! কিন্তু চোখমুখের কোন রকম হাবভাবে কিছুই কিরীটীর প্রকাশ পায় না! সে কেবল বলে, তাহলে কি মিঃ ঘোষের সঙ্গে **contact** করতে পারেন নি ?

পেরেছি—

পেরেছেন ?

হ্যাঁ, হোটেলের ম্যানেজারকে আমি মেসেজটা মিঃ ঘোষকে দিয়ে দিতে বলেছিলাম, তিনি দিয়েছেন এবং একটু আগেই মিঃ ঘোষ ফোনে আমাকে জানিয়েছেন তিনি আসছেন।

তাহলে আসছেন তিনি ?

হ্যাঁ।

কিরীটী যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

কিরীটী এবারে নিশ্চিন্ত মনে তার প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল মিঃ আয়ারকে, কি করতে হবে না হবে অতঃপর।

ইতিমধ্যে ঘড়িতে আড়াইটা বাজতেই শাশ্বত এসে ঘরে ঢুকল।

শাশ্বতর সঙ্গে মিঃ আয়ারের ওই দিনেই পূর্বে আলাপ হয়েছিল। তিনি শাশ্বতকে সাদরে আহ্বান জানালেন, বসুন মিঃ চৌধুরী!

শাশ্বত বসতেই কিরীটী তাকে বলে, তোমাকে যেমন যেমন বলে এসেছিলাম সব ব্যবস্থাই করেছ তো?

করেছি।

মিঃ আয়ার!

বলুন?

আজ তো শনিবার আপনাদের, অফিস কটায় বন্ধ হচ্ছে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আড়াইটায়।

এমন সময় বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল, হাতে একটা স্লিপ নিয়ে।

স্লিপটার দিকে দৃষ্টি দিয়েই মিঃ আয়ার কিরীটীকে বলেন, অনিরুদ্ধবাবু এসেছেন!

এসেছে? ঠিক আছে, আমরা তাহলে আপনার অ্যান্টিরুমে চললাম—যেমন যেমন আপনাকে বলেছি আপনি করবেন।

ঠিক আছে।

এস শাশ্বত। ওঁকে তাহলে ডেকে পাঠান—

শাশ্বতকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল কিরীটী।

অ্যান্টিরুম ও অফিসরুমের মধ্যবর্তী দরজার গায়ে একটা চৌকো কাচ বসানো।

কিরীটী পাশের ঘরে এসে দরজার সেই কাচ-পথে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

॥ কুড়ি ॥

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অনিরুদ্ধ এসে মিঃ আয়ারের ঘরে ঢুকল।

আমাকে ডেকেছিলেন কেন, মিঃ আয়ার?

অনিরুদ্ধর কণ্ঠস্বরে একটা ঔৎসুক্যই নয়, উত্তেজনাও ছিল বুঝি।

বসুন মিঃ ঘোষ। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনি একটা গুড্ নিউজ তো এতদিন আমাকে দেন নি?

গুড নিউজ! বিস্মিত অনিরুদ্ধ ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, **you are going to be very soon a multimillionaire**। লাখপতি—

লাখপতি! কি বলছেন মিঃ আয়ার?

নিশ্চয়ই, **you have inherited a fortune—**

ও হ্যাঁ, খবরটা অবিশ্যি জানাতামই আপনাকে একদিন, ব্যাপারটার মধ্যে একটা গোলমাল আছে তাই—

গোলমাল! কিসের গোলমাল?

সবই একদিন আপনাকে আমি বলব মিঃ আয়ার, তবে—

অনিরুদ্ধর কথাটা শেষ হল না, পাশের ঘরের দরজা ঠেলে কিরীটী এসে আয়ারের ঘরে ঢুকল অকস্মাৎ।

অনিরুদ্ধ!

কে? চকিতে মুখ ফেরায় কিরীটীর দিকে অনিরুদ্ধ, আপনি—আপনাকে তো আমি—

আপনি নয়, বল তুমি—চিনতে পারছ না আমাকে তুমি কিন্তু আমি তোমাকে দেখেই চিনেছিলাম। প্রেসিডেন্সীতে একসঙ্গে আমরা পড়েছিলাম, আমার নাম কিরীটী রায়—

কিরীটী!

হ্যাঁ, কিরীটী। তোমার বাঁ হাতের কব্জির নীচে ভিতরের দিকে একটা কাটা দাগ আছে দেখ, যেবার আমাদের ইউনিভার্সিটিতে চন্দ্রগুপ্ত প্লে হয়, সেবারে স্টেজে বেরুবার সময় উইংসের একটা পেরেকে খোঁচা লেগে গভীর একটা ক্ষত হয়েছিল—

মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন কিরীটীর কথায় অনিরুদ্ধ নিজের বাঁ হাতটা তুলে দেখল, সত্যিই দাগটা আছে—একটা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষতচিহ্ন।

কিন্তু অনিরুদ্ধ, তোমার ডান হাতে কি হল—ডান হাতটা তোমার অকর্মণ্য হল কি করে? ট্রেন-অ্যাক্সিডেন্টে, তাই না?

হ্যাঁ।

ঠিক ওই সময় বন্ধ দরজাটা খুলে গেল।

বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে তার একটা স্লিপ।

স্লিপটা দেখে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন মিঃ আয়ার।

কিরীটী স্লিপটার ওপর চোখ বুলিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল, চৌধুরী, বের হয়ে এস, সার্জেন্ট স্মিথ এসেছে!

শাশ্বত পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এল।

শাশ্বতর হাতে স্লিপটা তুলে দিল কিরীটী।

স্লিপটা দেখে শাশ্বত বলল, কি করব, এ ঘরেই নিয়ে আসব তো?

হ্যাঁ, নিয়ে এস।

শাশ্বত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী আবার উপবিষ্ট অনিরুদ্ধর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, তাহলে ট্রেন-অ্যাক্সিডেন্টেই তোমার ডান হাতটা জখম হয়েছে?

হ্যাঁ।

কিন্তু সেদিন তুমি সে ট্রেনে আদপেই আসো নি অনিরুদ্ধ!

কি বললে?

বলছিলাম সেই ট্রেনে তুমি চেপেছিলে বটে, তবে—

তবে?

মোগলসরাইতে নেমে গিয়েছিলে।

মিথ্যে কথা।

না, মিথ্যে নয়। নিষ্ঠুর সত্য। আর—

কিরীটীর কথা শেষ হল না। প্রথমে শাশ্বত ও তার পশ্চাতে যে এসে ঘরে প্রবেশ করল তাকে দেখে মিঃ আয়ার ও অনিরুদ্ধ যেন দুজনেই চমকে ওঠে।

মিঃ আয়ার বলে ওঠেন, **what is this**! এ কি ব্যাপার মিঃ রায়?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, দুজনকেই হুবহু একই রকম দেখতে তো! হ্যাঁ, তাই। এবং এদের মধ্যে একজন আসল, আদি ও অকৃত্রিম অনিরুদ্ধ—অন্যজন ছদ্মবেশী অনিরুদ্ধ, আসল নাম তরুণ বসু।

তরুণ বসু! মিঃ আয়ারের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি বুঝি।

হ্যাঁ, তরুণ বসু। উনি একজন শিল্পী—মানে নাট্যকার, নট ও নাট্য-পরিচালক!

আসল ও নকল দুই অনিরুদ্ধ—অর্থাৎ অনিরুদ্ধ ও তরুণ বসু তখন দুজনে দুজনের দিকে নিঃশব্দে ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতই চেয়ে আছে।

আর শুধু তাই নয়, দুজনেরই ডান হাতের ব্যাপারটা ভেক্। ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আবার বলে কিরীটী।

ভেক্! এবারে কথা বললে শাশ্বত।

তাই শাশ্বত, ভেক্—অভিনয়, কারোরই হাত ভাঙা নয়। আসল অনিরুদ্ধর এককালে অভিনয় করত, তাই বোধ হয় তার পক্ষে ঐভাবে অভিনয় করাটা তেমন একটা কিছু দুঃসাধ্য হয় নি। তবে আমাদের ঐ ছদ্মবেশী অর্থাৎ নকল অনিরুদ্ধ—

কিরীটীর মুখের কথা শেষ হল না, হঠাৎ যেন বাঘের মতই অনিরুদ্ধ তরুণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, **You scoundrel**, তুমি—তুমিই সব ফাঁস করে দিয়েছ! **I—I will kill you**!

॥ একুশ ॥

দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিরীটী বুঝি ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওরা জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী সার্জেণ্ট স্মিথের সাহায্যে ওদের পরস্পরকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুজনকে টেনে তুলে দুটো চেয়ারে বসিয়ে দিল।

তারপর শাশ্বতর দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, শাশ্বত, এবারে তোমার গাড়ি

থেকে শীলাকে নিয়ে এস এ ঘরে।

শাশ্বত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তরুণ আর অনিরুদ্ধ তখন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধবিষ সর্পের মতই ভিতরে ভিতরে যেন ফুঁসছে।

কিরীটী মৃদু হেসে তরুণের দিকে তাকিয়ে বললে, তরুণবাবু, আপনিও আমাদের অনিরুদ্ধর মত ভাল একজন অভিনেতা কিনা জানি না বটে, তবে এ কথাটা নিশ্চয়ই স্বীকার করব—You also done your job perfectly well! হ্যাঁ, আপনার অনিরুদ্ধর অভিনয়ও সত্যিই চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আপনি সকলের চোখে ধুলো দিতে পারলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারেন নি, কারণ আপনি হয়তো জানেন না, দুর্ভাগ্যই বলুন আর সৌভাগ্যই বলুন, আসল অনিরুদ্ধ ছিল এককালে আমার ছাত্রজীবনের সহপাঠী। এবং আমি কিছুদিন একবার কাউকে দেখলে জীবনে কখনও তাকে চিনতে ভুল করি না। হ্যাঁ, প্রথম দিনেই বুঝেছিলাম তাই—আপনি আসল অনিরুদ্ধ নন। শুধু আমি কেন—তা ছাড়া শাশ্বত, তোমারও ব্যাপারটা বুঝতে হয়তো কষ্ট হত না যদি একটু চোখ মেলে তুমি থাকতে!

শাশ্বত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী বলতে লাগল, তাই। নরহরিবাবুর বাড়িতে তাঁর শয়নঘরে একটা ফটো আছে। নরহরিরবাবু ও তাঁর বোন শৈলবালা দেবী, ওঁদের বাবা ও মার। সেই ফটোয় শৈলবালা দেবীর যে চেহারা আছে সেটা ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতে, ফটোর সেই শৈলবালার মুখের সঙ্গে আমাদের নকল অনিরুদ্ধবাবুর মুখের সামঞ্জস্য নেই।

সত্যি নাকি! প্রশ্ন করে শাশ্বত।

হ্যাঁ। তরুণবাবু ও অনিরুদ্ধবাবুর চেহারার সঙ্গে যতই মিল থাক, সে মিলের মধ্যেও সত্য ও মিথ্যার মত কিছু গরমিলও আছে বৈকি—

কী বল তো?

উভয়ের কপাল, নাক ও চিবুকের গঠন। অনিরুদ্ধবাবুর মুখের গঠন অবিকল তাঁর মায়ের মত। অর্থাৎ শৈলবালা দেবীর মত। ছোট কপাল, ছড়ানো নাক ও ধারালো চিবুক। আর বিশেষ ও অনন্য যে মিলটি মা ও ছেলের মুখের সঙ্গে সেটা হচ্ছে একটি কালো তিল মা ও ছেলের উভয়েরই নাকের ডান পাশে। চেয়ে দেখ অনিরুদ্ধবাবুর মুখে অবিকল তেমনি একটি তিল আছে, কিন্তু তরুণবাবুর মুখে নেই। জন্মগত ছোট একটি তিল—ব্যাপারটা যেমন সকলের নজরে পড়বে না, তেমনি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণও বটে। ঐ তিলটির কথা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মনে ছিল বিশেষ একটি কারণে—

সকলেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

কিরীটী বলতে লাগল, ওই তিলটির উল্লেখ করলেই অনিরুদ্ধ বরাবর আমাদের

বলেছে, ওটা নাকি ওর জন্মগত—ওর মায়ের নাকের পাশে নাকি অমনি একটি তিল আছে এবং কথাটা বহুবার হয়েছে, বহুবার ও বলেছে। তাই অনিরুদ্ধর কথায় আমার প্রথম দিনই ওই তিলটির কথা মনে পড়েছিল এবং তরুণবাবুর মুখে ওই তিলটি না দেখতে পেয়ে আমি ওঁর identity সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়েছিলাম।

কথাটা বলেই কিরীটী অনিরুদ্ধর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, অনিরুদ্ধ, সবই করেছিলে তুমি কিন্তু তিলটির কথা তোমার মনে হয় নি একবারও। একেই বলে ভগবানের মার!

শাশ্বত কিরীটীর কথায় অনিরুদ্ধ ও তরুণের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে কথাটা মিথ্যা নয়।

কিরীটী আবার বলে, কিন্তু সামান্য ও তুচ্ছ ওই তিলের পার্থক্য অনিরুদ্ধর দুর্ভাগ্যক্রমে ও ঘটনাচক্রে আমি এখানে না এসে পড়লে হয়তো কারোর দৃষ্টিই আকর্ষণ করত না ও তরুণ যে আসল অনিরুদ্ধ নয় সেকথাও এত সহজে হয়তো জানতে পারত না, মাত্র একজন ছাড়া—

একজন ছাড়া! শাশ্বতই পুনরায় প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আমাদের শীলা দেবী। কারণ তাঁর চোখে ব্যাপারটা ধুলো দেওয়া সম্ভবপর ছিল না—আর সম্ভবপরও হয় নি—

শীলা! শীলা দেবী তাহলে ব্যাপারটা জানতেন?

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, জানতেন। কিন্তু তোমার প্রশ্ন হচ্ছে শাশ্বত, জেনেও তবে শীলা দেবী ব্যাপারটা disclose করেন নি কেন, তাই না?

হ্যাঁ, মানে—

সেটাই তো শীলা দেবীর সবচাইতে বড় tragedy!

Tragedy?

হ্যাঁ। অবিশ্যি ও ছাড়া আর বোধ হয় শীলা দেবীর দ্বিতীয় পথও ছিল না এক্ষেত্রে—

কেন?

কারণ মানুষ যখন মাঝদরিয়ায় পড়ে এবং সাঁতার যদি না জানা থাকে, তাহলে হাতের কাছে যে কুটোটা পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করে স্বাভাবিক জৈবিক ধর্মে, শীলা দেবীও তাই করেছিলেন। কিন্তু যাক সে কথা, আজকের এই মর্মান্তিক দৃশ্যের মধ্যে আমার শীলা দেবীকে টেনে আনবার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন দেখছি তা আর বুঝি হবার উপায় নেই—

বাইরে এই সময় একজোড়া পদশব্দ শোনা গেল।

কিরীটী বলে, Now here she is coming—

ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, শাশ্বতর সঙ্গে শীলা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কিন্তু প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে যেন ভূত দেখার

মতই থমকে দাঁড়িয়ে গেল শীলা। নির্বাক, স্তব্ধ—যেন পাথর!

আসুন শীলা দেবী, আপনাকে এভাবে কষ্ট দিতে হল বলে আমরা দুঃখিত। বসুন—ওই চেয়ারটায় বসুন।

কিন্তু কিরীটীর বলা সত্ত্বেও শীলা বসে না, যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল পূর্ববৎ স্তব্ধ হয়েই যেন।

দেখুন তো মিস রয়, এঁদের মধ্যে আসল ও সত্যিকারের অনিরুদ্ধটি কে?

চমৎকার এক নাটকীয় মুহূর্ত যেন।

নিঃশব্দে শীলা তাকিয়ে রয়েছে অদূরে দুটি চেয়ারে কিছু ব্যবধানে উপবিষ্ট প্রায় একই চেহারার দুই ব্যক্তি—অনিরুদ্ধ ও তরুণের দিকে, আর অনিরুদ্ধ ও তরুণও দুজনে নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছে শীলার মুখের দিকে।

তিন জোড়া চক্ষু পরস্পর পরস্পরকে যেন সাপের দৃষ্টিতে নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করছে।

কি মিস রয়, চিনতে পারছেন না আপনি এখনও আসল সত্যিকারের আপনার পূর্ব-পরিচিত অনিরুদ্ধকে! কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

শীলা নির্বাক।

কিরীটী মুহূর্তকাল তারপর চুপ করে থেকে পুনরায় প্রশ্ন আরম্ভ করল।

এবারে বলবেন কি শীলা দেবী, কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করল, সেরাত্রে আপনার ঘরে কালো চাদরে নিজেকে আবৃত করে কে গিয়েছিল?

শীলা তথাপি নির্বাক।

বুঝতেই পারছেন মুখ বন্ধ করে রেখে আর কোন লাভ হবে না! Cat is already out of the bag—

হঠাৎ যেন উন্মাদিনীর মতই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠে দু হাতে মুখ ঢাকল শীলা, না না না, আমি কিছু জানি না—আমি কিছু জানি না!

কথাগুলো বলতে বলতে টলে শীলা পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে কিরীটী শীলাকে ধরে ফেলল এবং একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিল।

চেয়ারের উপর বসতেই অসহায়ভাবে শীলার মাথাটা টলে পড়ল।

শাশ্বত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে এবং বলে, ফেইন্ট হয়ে গিয়েছেন দেখছি, কিরীটী!

কিরীটী মৃদু হাসল।

কিন্তু—

এখুনি উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, ভয় নেই শাশ্বত।

হলোও তাই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুনরায় শীলা চোখ মেলে

বাড়ি যাবেন শীলা দেবী? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

বাড়ি—

হ্যাঁ, যান তো পাঠাবার এখুনি ব্যবস্থা করতে পারি।

যাব।

কিরীটীর নির্দেশে তখুনি পুলিসের জীপে করে সার্জেণ্ট স্মিথের সঙ্গে শীলাকে বরাহনগরের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শীলা যাবার সময় অনিরুদ্ধ বা তরুণ কারোর মুখের দিকেই আর তাকাল না। নিঃশব্দে মাথাটা নীচু করে ঘর থেকে শ্লথ মন্থর পদে বের হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে সকলেই স্তব্ধ। কেবল কিরীটীর মৃদু কণ্ঠোচ্চারিত একটি কথা শোনা গেল, Poor girl!

।। বাইশ ।।

মুহূর্তকাল পরে কিরীটী পুনরায় মুহ্যমানের মত উপবিষ্ট অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে ডাকল, অনিরুদ্ধ!

বোবা দৃষ্টিতে সে ডাকে অনিরুদ্ধ মুখ তুলে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

আজকে শীলার ওই অবস্থার জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তো তুমিই!

অনিরুদ্ধ নির্বাক।

যদিও পুওর শীলা তার স্বর্গতা জননী বিমলা দেবীরই দুঃসময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছে, তবু এ নাটকে তোমার হৃদয়হীনতাও কম ছিল না। যদি জানতেই ওকে কোন দিন বিয়ে করতে পারবে না, কেন তবে ওকে নিয়ে দিল্লীতে সেদিন ভালবাসার খেলা খেলেছিলে? এক হতভাগিনী নারীর মনে স্বামী, ঘরবাড়ির প্রলোভন জাগিয়ে তুলেছিলে? কেন তুমি ওকে সেদিন জানতে দাও নি বা জানাও নি বিবাহিত?

বাঃ, চমৎকার! আমি বিবাহিত এ খবরটা কোথায় পেলে জানতে পারি কি?

তোমার স্ত্রী রুমা দেবী এখনও বেঁচে আছেন, তিনিই তার সত্যতা প্রমাণ করবেন।

শাশ্বতই এবারে কথা বলে, সে কি!

হ্যাঁ শাশ্বত, এই দেখ রুমা দেবীর চিঠি—রুমা দেবী ও অনিরুদ্ধর যুগলে ফটো। বলতে বলতে কিরীটী তার পকেট থেকে একখানা চিঠি ও একটা ফটো বের করে শাশ্বতর হাতে তুলে দিল।

সকলেই দেখল কথাটা মিথ্যা নয়।

এই রুমা দেবী হচ্ছে ওই তরুণবাবুরও আপন ভগ্নী—সহোদরা। কি তরুণবাবু, তাই ঠিক না?

তরুণ কোন জবাব দিল না কিরীটীর সে প্রশ্নের।

এখন বুঝতে পারছ অনিরুদ্ধ, এলাহাবাদ থেকে তোমার সমস্ত অতীত কাহিনীই আমি উদ্ধার করেছি। আর এও এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে গিয়েছে। তোমার কল্পনার বালুর প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

অনিরুদ্ধ নির্বাক।

তরুণও নির্বাক।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে অনিরুদ্ধ, পাপ আর পারা কখনও নাকি চাপা থাকে না—চাপা দেওয়া যায় না। তোমার সমস্ত পাপ, অন্যায় আর দুষ্কৃতি তোমাকে আজ শত বাহু মেলে গ্রাস করেছে। You are doomed! তোমার প্রতি যে গুরুতর অভিযোগের দণ্ডকে এড়িয়ে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি যে ভেবেছিলে মৃত নরহরির তোমার মামার সম্পত্তিকে গ্রাস করে নিঃশব্দে একদিন সকলের নাগালের বাইরে সরে পড়বে, তোমার তিনটি মারাত্মক ভুলের জন্য তুমি নিজেই তা ভেস্তে দিয়েছ। প্রথম ভুল তোমারই পরিচয়ে তরুণকে—তোমার শ্যালককে এখানে পাঠানো। দ্বিতীয় ভুল তোমার শীলাকে প্রতারণা করা। অবিশ্যি তরুণকে যদি তুমি এখানে তোমারই পরিচয়ে না পাঠাতে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির লোভে এখানে না এসে হাজির হতে—তা হলে হয়তো আমারও এখানে আসার প্রয়োজন হত না আর তুমিও এত তাড়াতাড়ি exposed হতে না। কিন্তু তা না হলেও তোমার তৃতীয় মারাত্মক ভুলের জন্যই অবিশ্যি তুমি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছো তোমার তৃতীয় ও শেষ মারাত্মক ভুলটা কি! অবিশ্যি এও বলবো, প্রচণ্ড লোভই তোমাকে তোমার তৃতীয় মারাত্মক ভুলের পথে অন্ধ নিয়তির মতই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর সেই শেষ ও চরম ভুলটির জন্য You have been caught red-handed! বাঘে ছুঁলে যেমন আঠার ঘা, তেমনি লোভে থাবা বসালেও আঠার ঘা। একবার তুমি এলাহাবাদে ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে ভেবেছিলে এবারে এখানকার কেসটাতেও বুঝি বেঁচে যাবে। কিন্তু দেখছো তো, তা হলো না! তোমার প্রচণ্ড অর্থলোভই তোমাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিল। আমার মনে হয় Railway accident-য়ে লোকটা মরে নি—তুমিই তাকে হত্যা করেছো।

মিঃ আয়ার এবারে কথা বললেন, সত্যি বলছেন মিঃ রায়!

সত্যি মিথ্যা একমাত্র আপনার ঐ এজেন্ট মিঃ ঘোষই বলতে পারে, তবে আমার অনুমান তাই।

মোটেই তা নয়। বিজনবাবু স্বাভাবিক ভাবেই রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন, তার প্রমাণ আছে। অনিরুদ্ধ এতক্ষণে বলে।

সে দায়িত্ব আমার নয় অনিরুদ্ধ। পুলিসের প্রয়োজনে পুলিসই তা প্রমাণ করবে। কিন্তু আর নয়, রাত সাড়ে আটটা প্রায় বাজে। ঐ দৃশ্যের এখানেই আমি ইতি করতে চাই। তোমাকে শাশ্বতর হাতেই তুলে দিচ্ছি, শাশ্বতই তোমার ব্যবস্থা করবে। আর তরুণবাবু, আপনাকে আর কি বলবো—I just pity you!

অনিরুদ্ধকে নিয়ে পুলিসের ভ্যান চলে গেল।

তরুণকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিরীটী মুক্তিই দিল।

তরুণ চলে যাবার পর শাশ্বত বললে, ও লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হল কিরীটী ?

ভয় নেই তোমার শাশ্বত, প্রয়োজন বোধেই আপাতত ছেড়ে দিলাম—

কিন্তু—

এই জটিল মামলায় শীলা দেবীর ব্যাপারটা এখনও সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় নি—

তার মানে ?

শীলা, অনিরুদ্ধ ও তরুণের রহস্যের মধ্যে এখনও একটি ব্যাপার অনুদ্ঘাটিত আছে—

সে কি ?

হ্যাঁ, শুধু শীলা অনিরুদ্ধ ও তরুণই নয়, আর একটি অদৃশ্য কালো হাত এ ব্যাপারে আছে। ভুলে যাচ্ছ কেন, মৃত নরহরির সম্পত্তিটা তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার নয়!

মানে, তুমি—

হ্যাঁ, ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন অনেক শকুন উড়ে এসে বসে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল এবং যতক্ষণ না সেই দৃশ্যে অর্থাৎ এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা পৌঁচচ্ছি ততক্ষণ একটা ব্যাপার যে দুর্বোধ্যই থেকে যাবে—

কোন্ ব্যাপার ?

শীলা সব জেনেশুনেও এ গহ্বরে পা বাড়িয়েছিল কেন শেষ পর্যন্ত—

শীলা !

হ্যাঁ, শীলা। কিন্তু আর নয়, সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আমাদের, এবারে আমাদের উঠতে হবে—চল।

অতঃপর মিঃ আয়ারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে কিরীটী তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গাড়িতে উঠে বসে শাশ্বত বলে, কোন্ দিকে যাব ?

আমি যাব বরাহনগরেই—

বরাহনগরে !

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ?

কারণ আশা করছি, আজ রাত্রে বা কাল রাত্রেই বর্তমান এই রহস্য নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা উপনীত হতে পারব।

শেষ দৃশ্যে !

হ্যাঁ, শেষ দৃশ্যে।

অগত্যা কিরীটীর নির্দেশমত শাশ্বত রাত ন'টা নাগাদ কিরীটীকে নরহরি ভবনেই বরাহনগরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবং যাবার আগে অতঃপর শাশ্বতর যা করণীয় তাকে তা বলে দিয়ে গেল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিরীটী।

॥ তেইশ ॥

সেই রাত্রেই।

নরহরির বিরাট বাড়িটা ইতিমধ্যেই নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

কিরীটী বাড়িতে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকতেই রামচরণ এসে ঘরে ঢুকল, বাবু, খাবার কি আপনার এই ঘরেই দেব ?

না রামচরণ, আজ রাতে আর কিছু খাব না। তুমি বরং যদি এক কাপ চা করে দিতে পার—

কেন পারব না বাবু, এখুনি এনে দিচ্ছি !

রামচরণ বের হয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, পশ্চাৎ থেকে কিরীটী ডাকল, রামচরণ !

কিছু বলছিলেন বাবু ?

তোমার দিদিমণি আর বাবুর খাওয়া হয়েছে ?

দাদাবাবু তো এখনও ফেরেন নি !

দাদাবাবু ফেরেন নি ?

না। আর দিদিমণি ফিরে এসে সেই যে ঘরে খিল দিয়েছেন, ডাকাডাকি করেও আর তাঁর সাড়া পাই নি।

ও, আচ্ছা তুমি যাও।

রামচরণ চলে গেল।

তরুণ রায় তাহলে ফেরে নি !

তার কি চালে ভুল হল তরুণ রায়কে যেতে দিয়ে ?

কিন্তু কিরীটীর মন সাড়া দেয় না কথাটায়।

ফিরতেই হবে তরুণ রায়কে। আজ হোক কাল হোক পরশু হোক ফিরে একবার সে আসবেই নিশ্চয় এ বাড়িতে। এত বড় হতাশাকে সে এত সহজে মেনে নেবে না। অনিরুদ্ধ তরুণ রায়কে তার পরিচয়ে এখানে পাঠিয়েছিল তার স্বার্থেই। আর সে স্বার্থটাও রুমা-সংবাদ পাওয়ার পর তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রুমা—তরুণের বোনকে সে বছর তিনেক পূর্বে বিবাহ করেছিল, আর সে বিবাহ নাকি ভালবেসেই। কাজেই নরহরির উইলমত তার পক্ষে আর শীলাকে দ্বিতীয়বার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সম্পত্তিলাভ সম্ভব ছিল না। এবং সেক্ষেত্রে সে মাত্র তিনশত টাকা করে মাসোহারা পেত।

কিন্তু অনিরুদ্ধর মত এক অর্থপিশাচের পক্ষে অত বড় সম্পত্তির প্রলোভনটা এড়ানো সম্ভবপর ছিল না। তাই সে নিশ্চয়ই কৌশলে তরুণকে অনিরুদ্ধ সাজিয়ে তার সঙ্গে শীলার বিবাহটা দিয়ে সম্পত্তিটা বাগাবার পরিকল্পনা করেছিল। এবং সেই কারণেই নিশ্চয় অনিরুদ্ধর সঙ্গে একটা প্যাক্ট বা চুক্তি হয়েছিল।

সে চুক্তিটা কী ?

সাধারণ চুক্তি নিশ্চয়ই নয়, কারণ তাহলে তরুণ এত বড় risk নিত না !

উভয়ের মধ্যে কি চুক্তি হয়েছিল, সেটা জানতে হবেই কিরীটীকে।

কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সেই চিন্তাটাই করতে থাকে।

রামচরণ চা নিয়ে এল।

চায়ের কাপটা রামচরণ কিরীটীর হাতে দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়।

কিছু বলবে রামচরণ ?

দিদিমণিব ঘবের পাশ দিয়ে আসছিলাম—

কী ?

মনে হল ঘরের মধ্যে যেন দিদিমণি কাঁদছেন !

রামচরণ ?

বলুন !

আচ্ছা দিদিমণি ফেরবার পর কেউ তাঁর সঙ্গে কি দেখা করতে এসেছিল ?

না তো ! তবে—

কী ?

দিদিমণির একটা ফোন এসেছিল।

ফোন ?

হ্যাঁ।

কখন ?

আপনি আসার কিছুক্ষণ আগে—

দিদিমণি ফোন ধবেছিলেন ?

হ্যাঁ।

কী কথা তিনি ফোনে বলেছেন শুনেছ কিছু ?

না। আমি ডেকে দিয়েই নীচে চলে গিয়েছিলাম।

ও। আচ্ছা তুমি যেতে পার।

রামচরণ চলে গেল। কিরীটী তার পূর্ব পরিকল্পনা মত পশ্চাতের বাগানের দ্বারপথেই বাড়ির মধ্যে এসে প্রবেশ করে তার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এবং ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়েছে।

কিরীটীকে যখন নরহরি ভবনে শাশ্বত নামিয়ে দিয়ে যায়, কিরীটী তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিল রাত এগারটা নাগাদ যেন সে নরহরি-ভবনে পিছন দিয়ে এসে প্রবেশ করে বাগানের মধ্যে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে। শাশ্বত কিরীটীর সেই নির্দেশমত রাত এগারোটার কিছু পূর্বে নরহরি ভবনের পশ্চাতের দ্বারপথে এসে প্রবেশ করেছিল।

শাশ্বতকে যেমন বাড়ির পিছনের বাগানে আত্মগোপন করে থাকতে বলেছিল

কিরীটী, সে তেমনই রয়েছে তখন। কিরীটী শাশ্বতকে কেবল বাগানের মধ্যে একটি জায়গার কথা বলে সেইখানেই অপেক্ষা করতে বলেছিল।

চোখ সজাগ রেখে এইখানেই থাকো শাশ্বত, কেবল একটু সতর্ক থেকো!

রামচরণ চলে গেলে কিরীটী বাগানে গেল এবং নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মৃদু-কণ্ঠে ডাকল, শাশ্বত, আছ?

হ্যাঁ, এই যে।

শাশ্বত এগিয়ে এলে কিরীটী বললে, ঠিক আছে। এইখানেই থাক আমার সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত। কথাটা বলেই কিরীটী ফিরতে উদ্যত হয়।

কিন্তু তুমি চললে কোথায়? শাশ্বত শুধায়।

কাজ আছে, ঠিক সময়ে আসব।

কিরীটী চলে যাবার পর থেকে শাশ্বত একা-একাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে বাগানের মধ্যে। শীতের অন্ধকার রাত। গঙ্গার বুক থেকে হাওয়া আসছে। যেন কনকনে হাড়-কাঁপানো হাওয়া।

ক্রমশ রাত বাড়ে। এগারটা বাজল। তারপর আরও পনের মিনিট অতিবাহিত হল। কিরীটী তখনও ঘরের মধ্যে অধীর অপেক্ষায় যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

তবে কি আজ সে এল না? তার অনুমান কি ভুল হল?

ধীরে ধীরে কিরীটী দরজাটা খুলল।

নিঃশব্দে, অতি সাবধানে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বারান্দার ওদিক থেকে কানে এল মৃদু সাবধানী একটা পদশব্দ। কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটী সেই মৃদু সাবধানী পদশব্দটা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, তার শুনতে ভুল হয় নি। সাবধানী পদশব্দই বটে। এইদিকেই আসছে পদশব্দটা এগিয়ে।

অন্ধকারে কিরীটী একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে নিজেকে যেন মিশিয়ে দিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় তার তীক্ষ্ণ সজাগ।

পদশব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

॥ চৌত্রিশ ॥

বেড়ালের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিরীটী অন্ধকারে।

পাশ দিয়েই যেন অতি মৃদু, অতীব সাবধানী পদবিক্ষেপে কে একজন চলে গেল। পায়ের শব্দটা ক্রমশ মিলিয়ে গেল। কিরীটী এবারে অগ্রসর হল যেদিকে ক্ষণপূর্বে পদশব্দটা মিলিয়ে গিয়েছে সেই দিকেই।

অগ্রগামী পদশব্দটা শোনা যায় আবার।

বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ি। সিঁড়ির আলোও নিবানো।

সহসা সেই অন্ধকারে দেখা দেয় অগ্রবর্তী একটা টর্চের সরু আলোর রশ্মি।

আলোর রশ্মিটা এগিয়ে চলেছে ধাপের পর ধাপ। সিঁড়ি শেষ করে অপ্রশস্ত অলিন্দ অতিক্রম করে অগ্রবর্তী মনুষ্যমূর্তি চত্বরে গিয়ে পড়ল।

তারপরেই বাগান। কিরীটী অনুসরণ করে চলে।

ওদিকে বাগানের মধ্যে শাশ্বতও শুনতে পেয়েছে, কিসের যেন একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দ। সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

এতক্ষণ মশার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল শাশ্বত, সেই মৃদু খস্ খস্ শব্দ শোনার সঙ্গেই সব কিছু যেন সে ভুলে যায়।

প্রথমটায় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শাশ্বত যে শব্দটা কিসের।

মুচ্ মুচ্ শুকনো ঝরাপাতার উপর যেন একটা সাবধানী সতর্ক পদশব্দ, পরে মনে হল। শীতের কৃষ্ণপক্ষের রাত হলেও আকাশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে ছিল তারার আলোয়।

কিরীটীর অগ্রবর্তী ছায়ামূর্তি চলতে চলতে এসে দাঁড়াল সেই পাথরের বেঞ্চটার সামনে।

ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁঝিঁ শব্দ রাত্রির অন্ধকারে কেবল শোনা যাচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে রাত্রির চোরা হাওয়ায় পাতার একটা মৃদু ক্ষীণ সিপ্ সিপ্ শব্দ।

কিরীটীর হাত-পাঁচ-ছয় ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সেই ছায়ামূর্তি তখন। দুজনের মধ্যে আড়াল করে রেখেছে পরস্পর থেকে পরস্পরকে কতকগুলো বনতুলসীর ঝোপ। বাতাসে বনতুলসীর তীব্র গন্ধটা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ঝোপের আড়াল থেকে মৃদু তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সামান্য ব্যবধানে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তিকে কিরীটী ও শাশ্বত দুজনেই। অকস্মাৎ যেন প্রথম ছায়ামূর্তির সামনে অন্ধকার ভেদ করে দ্বিতীয় এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল।

শীলা! চাপা পুরুষ কণ্ঠস্বর।

কে?

অনিরুদ্ধ ফিরেছে? মানে আমি তরুণের কথা বলছি—

জানি না।

জানো না মানে! ফিরেছে কিনা জানো না?

না। কিন্তু এবারে আমাকে রেহাই দাও—

কি হল আবার তোমার?

কিছু হয় নি—কিছু হয় নি, শুধু তুমি আমাকে এবারে রেহাই দাও—

কিন্তু রেহাই চাইলেই তো আজ আর রেহাই তোমার মিলবে না শীলা। আজ যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, সেখানে জেনো আমাদের সামনে একটা মাত্র পথই খোলা আছে, এখান থেকে সরে পড়া সকলের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে—

তাই—তাই আমি চাই। আমাকে তুমি যেতে দাও।

যাবই তো, কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে যাব বলে তো এতদূর এগিয়ে আসি নি!

এখনও—এখনও তুমি ভাঁওতা দেবে ?

ভাঁওতা নয় আর সেই কথাটা বলবার জন্যই এসেছি, শোন—

না না, আর আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না।

বোকামি করো না শীলা, শোন—

না না, তুমি মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রতারক—

হাঁপাতে থাকে শীলা যেন একটা অবরুদ্ধ আক্রোশে আর যন্ত্রণায়।

শোন শীলা, যা আমি বলছি—

শুনবো না, শুনবো না—তোমার কোন কথাই আমি আর শুনবো না।

শুনবে না ?

না, না।

শুনতে তোমাকে হবেই, নচেৎ জেনো কাল সকালেই তোমার সব সত্য কথা আমি প্রকাশ করে দেব—

দাও, দাও। যা খুশি তোমার করো।

শীলা ! গর্জন করে ওঠে যেন সেই পুরুষকণ্ঠ এবার।

কেন—কেন তুমি আমাকে এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছ ? কি করেছি তোমার আমি ?

কি করেছ তুমি জান না ? নরহরিবাবুকে তুমি হত্যা করো নি ?

তীক্ষ্ণ অথচ চাপা একটা আর্তনাদ ফুটে বেরোয় শীলার অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ থেকে, না না, তাকে আমি হত্যা করি নি ঈশ্বর জানেন—

ঈশ্বর ! ঈশ্বর তোমাকে আদালতের আইন থেকে বাঁচাতে পারবে না—

মিথ্যা—সব মিথ্যা, সব তোমার বানানো—

নার্স মালতী দেবীর পরিচয়টা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয় ! সব—সব আমি প্রকাশ করে দেব।

শীলা সত্যিসত্যিই এবারে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ে।

শীলা কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তার চাইতে আমি যা বলছি শোন, তুমি যা চাও সব পাবে—

কিছু আমি চাই না আর, কিছু আমি চাই না—

চাও তুমি—সব চাও, শোন, এই নাও চাবি। নরহরির শয়নঘরের মধ্যে যে বড় সিন্দুকটা আছে, নিশ্চয়ই তারই মধ্যে জহরতগুলো আছে, চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলে সেইগুলো নিয়ে সোজা বের হয়ে এসো রাস্তায়। রাস্তায় আমি অপেক্ষা করছি আমার গাড়ি নিয়ে—

না না, ওসব আমি পারব না।

শীলা !

না না,—পারব না।

পারবে না ?

না, না।

পারতে তোমাকে হবেই।

না, না, পারব না—আমি কিছুতেই পারব না। ক্ষমা কর তুমি আমাকে, ক্ষমা কর—

কান্নায় শীলা যেন ভেঙে পড়ে আবার।

কিরীটী শাশ্বতর কাঁধে চাপ দিয়ে এবারে ইঙ্গিত করে।

সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত শীলার সামনে আবছা আলো-আঁধারে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তির পশ্চাতে গিয়ে পিস্তল হাতে কঠিন নির্দেশের স্বরে বলে ওঠে, পালাবার চেষ্টা করবেন না মিঃ গুহ, আমার হাতের পিস্তলের ছয়টি চেম্বারই গুলিভর্তি—

এবং সেই মুহূর্তেই কিরীটীর হাতের হাণ্টিং টর্চের জোরালো আলো গিয়ে পড়ল মিঃ গুহর মুখের উপরে।

শীলা বিদীর্ণ কণ্ঠে একটা আর্ত চিৎকার করে উঠে ঐখানেই লুটিয়ে পড়ল।

পরক্ষণেই শাশ্বত হুইসেল বাজাতেই আশপাশের অন্ধকার থেকে চার-পাঁচজন লাল পাগড়ীর আবির্ভাব ঘটল। প্রতাপ গুহকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে লৌহবলয় পরিয়ে দেওয়া হল।

শীলাকেও স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা হল বাড়ির মধ্যে তার ঘরে। এবং কিরীটী সকলকে এবারে বললে, চলুন, ভিতরে যাওয়া যাক।

॥ পঁচিশ ॥

মিঃ প্রতাপ গুহ!

সলিসিটার প্রতাপ গুহ!

শাশ্বত যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায়।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, মিঃ গুহই শাশ্বত। প্রথম রাত্রে শীলা দেবীর ঘরের মধ্যে প্রতাপবাবুর কণ্ঠস্বর শুনেই কেমন যেন আমার চেনা-চেনা মনে হয়েছিল গলাটা। হ্যাঁ, মনে হয়েছিল কণ্ঠস্বরটা যেন আমার চেনা-চেনা। কিন্তু মনের মধ্যে তখন আমার সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই চিনেও চিনতে পারি নি সঠিকভাবে সেরাত্রে ওঁর কণ্ঠস্বরটা। কিন্তু সমস্ত সংশয় আমার মিটে গেল ফোনে সেদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলবার সময়। দুঃসাহসী উনি বলব নিঃসন্দেহে। তবু বলতে আমার দ্বিধা নেই, সেরাতে জুয়েলগুলোর কথা আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যদি না উনি বলতেন তবে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সন্দেহটা ওঁর উপরে গিয়ে একেবারে নিশ্চিতভাবে পড়ত কিনা আমার সন্দেহ।

লোকটা অসাধারণ চতুর তো! শাশ্বত বলে।

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু ওর ওপরে সন্দেহ তোমার কি করে এলো প্রথমে?

জগৎবাবুর চিঠি পড়ে—

জগৎবাবু!

হ্যাঁ, কাশীর ডাঃ জগৎ হাজরা। তাঁকে আমি লিখেছিলাম, সুস্থ হবার পরও মাস দু-তিন দেরি করে কেন শীলা দেবী কলকাতায় এসেছিলেন সে কথাটা আমাকে লিখে জানাবার জন্য। তার জবাবে তিনি জানান, মিঃ গুহর পরামর্শমতই নাকি তিনি দেরি করে কলকাতায় আসেন।

বল কি!

হ্যাঁ। এবং সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ হাজরার পরামর্শমত মিঃ গুহকে উনি চিঠি দেন—

তারপর?

সেই চিঠি পেয়েই মিঃ গুহ কাশী যান এবং শুধু সেবারই নয়, তারপর থেকে ঘন ঘন মিঃ গুহ কাশীতে ডাঃ হাজরার ওখানে যেতে শুরু করেন, যার ফলে ক্রমশঃ দুজনের মধ্যে একটা ভালবাসা বল ভালবাসা, প্রীতি বল প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং তখন তাঁরই পরামর্শমতই নিশ্চয় কলকাতা আসার ব্যাপারে শীলা বিলম্ব করে।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না কিরীটী, যদি সত্যিই অনিরুদ্ধর সঙ্গে শীলার পরিচয় ছিল, তখন—

মিঃ গুহর ফাঁদে শীলা পা দিলেন কেন, এই তো? তারও কারণ ছিল বৈকি—

কারণ?

হ্যাঁ, সে আর এক ইতিহাস—

আর এক ইতিহাস?

তাই। প্রতাপ গুহর ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতে হলে সেই ইতিহাসের পাতায় আমাদের উঁকি দিতেই হবে। যার সামান্য ইঙ্গিত মাত্র কিছুক্ষণ আগে বাগানে শীলা ও প্রতাপ গুহর তর্ক-বিতর্কের মধ্যে শীলা দেবীর ও প্রতাপ গুহর উভয়েরই মুখ থেকে বের হয়ে এসেছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কি সব নার্সিংহোমের কথা নরহরিকে বলছিল বটে ওরা, সেই কথাই কি?

হ্যাঁ, যে বিচিত্র উইলের ব্যাপার নিয়ে বর্তমান রহস্য জমাট বেঁধে উঠেছে সেই উইলটা নরহরির মৃত্যুর ঠিক আড়াই বছর আগে আজ থেকে লেখা হয়—

তারপর?

এবং যেদিন উইল তৈরী হয় সেদিন থেকেই প্রতাপ ঐ ব্যাপারে যেন বেশ একটু interested হয়ে ওঠে। বিচিত্র উইলটা! সঙ্গে সঙ্গে সে অনিরুদ্ধ ও শীলার খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু অনিরুদ্ধর খবর পেলেও, শীলার কোন সন্ধান করতে পারে না দিল্লীতে গিয়ে, কারণ সে সময় শীলা দিল্লীতে ছিল না—

তবে কোথায় ছিল সে?

সে তখন স্বামীর ঘর করছিল—

সে আবার কি ! শীলা বিবাহিত নাকি ?

হ্যাঁ, বিবাহিত। তবে আজ আর সে স্বামী নেই—

মানে ?

সে আজ বিধবা—

বিধবা !

হ্যাঁ, বিধবা। যা বলছিলাম, সে সময় সে পাটনাতে ছিল তার স্বামীর সঙ্গে। স্বামী তার পাটনার এক স্কুলের টীচার ছিল।

টীচার !

হ্যাঁ, বছর দুই আগে পাটনাতেই তার মৃত্যু হয়—

কিন্তু এ সব খবর পেলে কোথায় ?

জগৎবাবুর কাছে।

জগৎবাবুর কাছে !

হ্যাঁ, কারণ জগৎবাবুরই এক পরিচিত বন্ধুর ছেলে ছিল শীলার স্বামী—

জগৎবাবু নরহরির উইলের ব্যাপার জানেন ?

না।

জানেন না ?

না, কারণ শীলা বা প্রতাপ কোনদিন তাঁকে সেকথা জানায় নি। যাক্ যা বলছিলাম, শীলার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয় ম্যালিগনেন্ট্ ম্যালেরিয়ায়। স্বামীর মৃত্যুর পর শীলা তার এক বান্ধবী নার্সের উপদেশে কলকাতায় নার্সিং পড়তে আসে। বছরখানেক সে নার্সিং পড়েছিল। সেই সময় কলকাতায় থাকাকালীন অবস্থাতেই হাসপাতালে ঘটনাচক্রে প্রতাপের সঙ্গে শীলার প্রথম পরিচয়। এবং শীলাকে দেখেই প্রতাপ চমকে ওঠে, কারণ নরহরির কাছে শীলার যে ফটো ছিল তার সঙ্গে শীলার প্রতিকৃতির হুবহু মিল দেখেই প্রতাপ শীলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ক্রমে তার সকল পরিচয় জানতে পারে।

অদ্ভুত যোগাযোগ তো !

অদ্ভুতই বটে। যাহোক শীলার সত্য পরিচয় পেয়ে প্রতাপ ঘনিষ্ঠতা করে তার সঙ্গে। আগেই বলেছি, প্রতাপের বাবা নরহরির শুধু সলিসিটারই ছিলেন না, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন এবং পরামর্শদাতাও ছিলেন সর্ব ব্যাপারে। নরহরির ছিল এনজাইনা পেকটোরিস্। মধ্যে মধ্যে ওই রোগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। একবার একটা অ্যাটাক অ্যাকিউট্ হওয়ায় তাঁর জন্য একজন নার্সের প্রয়োজন হয়। সেই সুযোগটি গ্রহণ করে প্রতাপ। শীলাকে এনে হাজির করে নরহরির রোগশয্যার পাশে, অন্য নামে অর্থাৎ মালতী সেন নামে।

অসুস্থ নরহরির তখন যদিও কাউকে চেনবার উপায় ছিল না, কারণ সে ছিল যেন ঔষধের ঘোরে আচ্ছন্ন ও রোগযন্ত্রণায় কাতর। এবং যে রাত্রে শীলা নার্সিং করতে আসে নরহরিকে, সেই রাত্রেই শেষের দিকে আর একটা অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়।

একথা তুমি জানলে কি করে?

এবারে কিরীটী তার পকেট থেকে একখানা চিঠির খাম বের করে শাশ্বতকে দেখাল।

বিস্মিত শাশ্বত শুধায়, কি ওটা?

একটা চিঠি।

কার?

আজ দ্বিপ্রহরে এই চিঠিখানা আমি পেয়েছি।

কিন্তু চিঠিটা কার?

প্রতাপ গুহর পার্টনার সমীরণ দত্তর।

তাহলে প্রতাপের পার্টনার সমীরণ দত্তও কিছু কিছু জানত শীলা ও প্রতাপের ব্যাপারটা?

জানতো যে তা এখন তো বোঝাই যাচ্ছে—

কিন্তু জানতোই যদি তো এতদিন ব্যাপারটা জানায় নি কেন?

কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটা উহ্য। এবং সেটা নিজে না সে প্রকাশ করলে আমাদের পক্ষে জানাও সম্ভব নয়।

তা কি লিখেছে সে তার চিঠিতে?

সেও ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের চিঠি। অর্থাৎ যতটুকু লিখে জানালে আমাদের কাজ হবে অথচ তাকে ধরাছোঁয়া যাবে না ঠিক ততটুকুই—

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, সে তার চিঠিতে মাত্র এইটুকুই লিখেছে—শীলার সঙ্গে সম্ভবত তার পার্টনার প্রতাপের পূর্বপরিচয় কোন এক সময় হয়েছিল এবং শীলা কিছুদিন কলকাতায় কোন এক হাসপাতালে নার্সিং শিক্ষা করেছিল। বাকিটা অবিশ্যি আমি কিছুক্ষণ পূর্বে শীলা ও প্রতাপের কথোপকথন থেকে অনুমান করে নিয়েছি। যাক তারপর যা ঘটেছে, আমার মনে হয়, ট্রেন-অ্যাকসিডেন্টের পর শীলার কোন সংবাদ না পাওয়ায় দীর্ঘদিন প্রতাপ অনন্যোপায় হয়েই বোধ হয় চুপচাপ ছিল।

তারপর?

তারপর তো ব্যাপারটা খুবই সহজ। কাশী থেকে শীলার চিঠি পেয়েই প্রতাপ সেখানে ছুটে যায়। এবং শীলার পূর্ব বিবাহের কথাটা হয়তো তখনই সেই প্রথম প্রতাপ জানতে পারে। কিন্তু—

কী?

তার পরের ব্যাপারটাই ঠিক আমি এখনও অনুমান করতে পারি নি—কেননা শীলা তার পরেও কিছুদিন নিজেকে গোপন রেখে ট্রেন-দুর্ঘটনার ঠিক দেড় বৎসর পরে এখানে আবির্ভূত হলো, হয়তো—

কী?

অনিরুদ্ধকে যে এককালে সে ভালবেসেছিল সে কথাটা সে ভুলতে পারে নি।

এবং সেই কথাটা অনুমান করতে পেরেই শীলার সেই গোপন দুর্বলতার সুযোগেই ধূর্ত প্রতাপ তাকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে পায়, অর্থাৎ নিজের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে শীলাকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে কখন একসময় ভোর হয়ে গিয়েছে ওরা টেরও পায় নি।

ভোরের প্রথম আলোর আভাস খোলা জানালাপথে দেখা দিতেই কিরীটী বলে ওঠে, চল তো শাশ্বত, একবার শীলা দেবীর খোঁজটা নেওয়া যাক, সুস্থ হয়ে থাকেন যদি ইতিমধ্যে তো তাঁর কাছ থেকেই বাকীটা এবারে আদায় করে নেওয়া যাবে।

চল।

দুজনে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে শীলার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরের দরজা বন্ধ। দরজার কপাটে টুক্ টুক্ করে নক্ করে মৃদুকণ্ঠে ডাকল কিরীটী, শীলা দেবী!

কিন্তু কোন সাড়া নেই।

আরও বার-দুই ডাকল শীলাকে, তবু কোন সাড়া নেই।

কিরীটী এবারে দরজাটায় একটু ঠেলা দিতেই দরজার কবাট দুটো খুলে গেল।

শীলা দেবী?

শীলা ঘরে নেই। কোথায় গেল শীলা!

সারা বাড়িতেও আর শীলার খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাতারাতি একসময় সকলের অলক্ষ্যে শীলা কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে?

॥ ছাব্বিশ ॥

তরুণ রায়েরও আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না অনেকদিন।

অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে ইনসিওরেন্সের মামলাটা তখনো চলছে আদালতে এবং প্রতাপ গুহও রয়েছে তখনও বিচারের অপেক্ষায় হাজতে বন্দী।

ঠিক ওই সময় একদিন কিরীটীর হাতে এসে পৌঁছাল শীলার দীর্ঘ চিঠিটা।

শ্রদ্ধেয় কিরীটীবাবু,

এই চিঠিটা যখন আপনার হাতে পৌঁছবে তখন আমি অনেক দূরে।

আমি চোর, আমি জালিয়াত, আমি লোভী—আপনাদের চোখে হয়তো আজ আমি সব কিছুই। আর আপনারাই বা সকলে আমার গায়ে ধুলো ছিটাবেন না কেন, আমার সৃষ্টিকর্তা বিধাতাই যখন গায়ে আমার ধুলো ছিটিয়ে দিয়েছেন!

কিন্তু আমি ভাবছি আমার সৃষ্টিকর্তার কথাই। আর সেই সঙ্গে বলতে ইচ্ছা করছে, তুমি সত্যিই অতুলনীয়! তুলনা সত্যিই তোমার নেই!

যাক্, যে কথাটা বলবার জন্য এই চিঠির অবতারণা আমার সেই কথাতেই আসি।

বলছিলাম নরহরিবাবুর কথা। আপনারা হয়তো খুব অবাক হয়েছিলেন নরহরিবাবুর বিচিত্র উইলটা পড়ে, কিন্তু আমি অবাক হই নি। কারণ নরহরিবাবু সত্যিই আমার মাকে ভালবাসতেন। এবং আপনারা যে জেনেছেন—জীবনে বিয়ে হল না বলে সেদিন ছাড়াছাড়ি হবার পর আমার মার সঙ্গে নরহরিবাবুর দ্বিতীয়বার আর কোনদিনের জন্যই সাক্ষাৎ হয় নি সেটা কিন্তু সত্য নয়।

আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকেই যদিচ মা দিল্লীর সরোজিনী বিধবা আশ্রমে ছিলেন, তথাপি যতদিন মা বেঁচেছিলেন নরহরিবাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, মধ্যে মধ্যে দেখাও হত এবং মধ্যে মধ্যে দূর দূর কোন নির্জন জায়গায় দুজনে একত্রে গিয়ে কিছুদিন থাকতেনও।

অবিশ্যি বিধবা আশ্রমের কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকেও মা যে কি করে ওই সব ম্যানেজ করতেন তা আজও আমি জানতে পারি নি।

মার মৃত্যুর পর ওঁরই অর্থাৎ নরহরিবাবুর অর্থসাহায্যেই আমি মানুষ হয়েছি। তারপর বড় হলাম একদিন এবং সেই সময়েই অকস্মাৎ দিল্লীর এক ইনডাস্ট্রিয়াল একজিবিশনে অনিরুদ্ধর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়।

কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও যে হয় নি সে সময় তা অস্বীকার করব না। এমন কি আমাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তাও হয়। তারপর একদিন অনিরুদ্ধ ফিরে গেল এলাহাবাদে। আমাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কেবল তখন কিছুদিন ধরে উভয়কে উভয়ের পত্র দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়েই রইল বেঁচে। তারপরই হঠাৎ একদিন সে সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেল।

রমা—অনিরুদ্ধর স্ত্রীর এক চিঠিতে অনিরুদ্ধ বিবাহিত কথাটা জানবার পরই।

অথচ সে আগাগোড়াই কথাটা আমার কাছে গোপন করে গিয়েছিল।

ভাগ্য আবার আমার সঙ্গে যেন বিদ্রূপ করল।

দুঃখ সেদিন আমার হয় নি এত বড় মিথ্যে কথাটা বলব না কিরীটীবাবু তার জন্যে। কিন্তু জন্মাবধিই অমনিধারা বিদ্রূপ করছে আমার ভাগ্য আমার সঙ্গে, তাই আশ্চর্য খুব একটা হই নি।

দুঃখটাকেও মেনে নিয়েছিলাম।

ঐ ঘটনারই পর আকস্মিক ভাবে পরিচয় হল আমার প্রদ্যুতের সঙ্গে। প্রদ্যুতই একদিন বিয়ের প্রস্তাব জানাল আমাকে। ভাবলাম, ক্ষতি কি! কতকাল আর এমনি করে ভেসে বেড়াব? ঘর বাঁধলাম বিয়ে করে প্রদ্যুৎকে নিয়ে।

কিন্তু আবার ভাগ্য বিদ্রূপ করল আমার সঙ্গে। আকস্মিকভাবে মাত্র চারদিনের জ্বরে প্রদ্যুতের মৃত্যু হল।

কি করি, কোথায় যাই—ভাবতে ভাবতে যখন কোন আর কূলকিনারা পাচ্ছি না, আমার এক নার্স বান্ধবী আমাকে নার্সিং পড়বার জন্য উপদেশ দিল।

একটা কিছু করতেই হবে, এভাবে বসে থাকলে চলবে না তো—তাছাড়া বিয়ের পর থেকেই নরহরিবাবুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াতে তাঁর কাছ থেকে অর্থসাহায্যটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঐ সময়, অতএব কলকাতায় চলে এলাম নার্সিং পড়ার জন্য।

আদালতে ঐ পর্যন্ত চিঠিটা পড়তে পড়তে শাশ্বতর মনে পড়ল—সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতাপ গুহকে সরকার পক্ষের উকীল যে প্রশ্ন করেছিল ঃ

শীলা দেবীর সঙ্গে কতদিনকার আপনার পরিচয় প্রতাপবাবু ?

প্রথম পরিচয় হয় তার সঙ্গে আমার নরহরিবাবুর রোগশয্যার পাশে—

তাই কি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা যত দূর জানি আপনি সত্য কথা বলছেন না—

সত্যটা যদি জানেনই আপনারা, তবে মিথ্যেই বা আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন ?

প্রশ্ন করছি এই কারণে যে, আদালত জানতে চায় কতখানি ঘনিষ্ঠতা শীলা দেবীর সঙ্গে আপনার হয়েছিল ?

প্রশ্নটা আদালতের একান্তই ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না কি ?

তা যদি বলেন তো তাই—

যেমন খুশি আপনারা তাহলে ভেবে নিন—

অর্থাৎ প্রশ্নটার জবাব আপনি দেবেন না ?

না।

বেশ, আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি ?

দেবার মত হলে পাবেন—

শীলা দেবী যে বিধবা তা আপনি জানতেন ?

জানতাম না।

জানতেন না ?

না।

শীলা দেবীকে তখন কি আপনি বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

অবান্তর প্রশ্ন।

শাশ্বত আবার শীলার চিঠির মধ্যে মনোনিবেশ করল।

হাসপাতালে যখন নার্সিংয়ের-ট্রেনিং নিচ্ছি সেই সময়ই একদিন আকস্মিক ভাবে প্রতাপের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। প্রতাপের এক বন্ধু ছিল হাসপাতালে সে সময় রোগী। তাকে একদিন সে দেখতে আসে হাসপাতালে।

সেখানেই সে আমাকে দেখে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, কিছু যদি মনে না করেন তো কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই—

কী বলুন তো?

আপনার মুখের সঙ্গে আমার একটি জানা মহিলার মুখের আশ্চর্য রকম মিল!

তা অনেকের মুখের সঙ্গে অনেকের কোন কোন সময় সে রকম মিল তো দেখা যায়ই—

তা অবিশ্যি যে যায় না তা আমি বলছি না, তবে অনেকদিন হল তিনি নিরুদ্দেশ। আর—

আর?

কিছু যদি মনে না করেন আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

শীলা রায়।

আশ্চর্য! তাঁর নামও তাই, তিনি দিল্লীতে একসময় দীর্ঘকাল ছিলেন—

সত্যি?

হ্যাঁ।

কিন্তু তাঁর মায়ের নাম ছিল বিমলা—

আশ্চর্য তো! আমার মায়ের নামও যে ছিল বিমলা!

কি আশ্চর্য! তবে তো যাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সে আপনি—আমি যে আপনাকেই এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—

আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন?

হ্যাঁ। আপনি এখানে কোথায় থাকেন?

নার্সের কোয়ার্টারে।

কাল বা পরশু যখন হোক একবার আমার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?

কেন বলুন তো? আপনাকে তো আদপেই আমি চিনতে পারছি না, জীবনে কখনও দেখেছি বলেও মনে করতে পারছি না—

না, তা দেখেন নি, চেনেনও না সত্যি আপনি আমাকে, তবে—

তবে কি?

না থাক, এখন না—বলব, সব কথাই আপনাকে আমি বলব—

কী কথা বলবেন?

এমন সংবাদ আপনাকে আমি দেব, যা জানার পর—

কী?

জীবনধারণের জন্য এই নার্সিং শেখার ব্যাপারটা আপনার কাছে যেন মনে হবে তুচ্ছ, হাস্যকর—

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

॥ সাতাশ ॥

বুঝতেই পারছেন কিরীটীবাবু, প্রতাপের ওই ধরনের কথা শোনার পর কৌতূহলটা হওয়া আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু এখন ভাবি, কি কুক্ষণেই যে সে কৌতূহল আমার জেগেছিল—কি কুক্ষণেই যে ওর সঙ্গে পরের দিনই আমি দেখা করতে স্বীকৃত হয়েছিলাম—

তা যদি না হত তবে হয়তো আজ—আজ এই অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে এমনই ভাবে চোরের মত আমাকে পালিয়ে দূরদূরান্তে চলে যেতে হত না।

যাক্ সে কথা, যা বলছিলাম বলি।

পরের দিনই দেখা হল আমাদের লেকের ধারে সন্ধ্যেবেলা।

সেই মত নিরিবিলি ব্যবস্থাই আমরা করেছিলাম আগের দিন।

কী কথা আমার সঙ্গে ছিল আপনি বলেছিলেন কাল ?

নরহরিবাবুকে চেনেন ? শুনেছেন তাঁর নাম ?

চমকে উঠেছিলাম ঐ নামটা শুনেই।

বললাম, কোন্ নরহরির কথা বলছেন ?

নরহরি সরকার। বরাহনগরে থাকেন।

চিনি।

কে তিনি আপনার ?

কেউ নন।

তা জানি। তবে তাঁর আপনার মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল—

তা ছিল।

নরহরিবাবু আপনাকে খুঁজছেন, তা জানেন ?

না। কিন্তু কেন ?

তিনি তাঁর উইলে আপনাকে তাঁর বিরাট সম্পত্তির মালিক করেছেন।

সে কি !

তাই। তবে একটা শর্ত আছে—

শর্ত ?

হ্যাঁ। যদি আপনি তাঁর ভাগ্নে অনিরুদ্ধ ঘোষকে বিবাহ করেন, তবেই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আপনারা দুজনে পাবেন।

কথাটা বলে প্রতাপ সেই সম্পত্তির পরিমাণটা আমাকে জানাল।

সেদিন সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারি নি কিরীটীবাবু।

কারণ পরে অনিরুদ্ধর যে পরিচয় সে আমাকে দিয়েছিল, তাতেই জানতে পেরেছিলাম—অনিরুদ্ধ আমার পূর্ব-পরিচিত অনিরুদ্ধই। বিধাতার কত বড় নির্মম পরিহাস একবার ভাবুন তো, অনিরুদ্ধর সঙ্গে যদি আমার বিবাহ হত, তাহলে তো আজ অনায়াসেই আমরা ঐ বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতাম।

অথচ আজ আর তার কোন উপায়ই নেই।

অনিরুদ্ধ বিবাহিত।

আর আমি বিধবা।

এত বড় সম্পত্তি হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও মরীচিকার মত মিলিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন আবার আমাদের দেখা হল।

বললাম, সম্পত্তি তো আমরা পাব না!

কেন? অনিরুদ্ধকে খুঁজে আনব আমি। বিবাহ করুন আপনারা—

কোন লাভ হবে না।

কেন?

কারণ অনিরুদ্ধ বিবাহিত।

সে কি!

শুধু তাই নয়, আমিও বিবাহিতা। তবে—

তবে?

আমি বিধবা।

কথাটা শুনে প্রতাপ কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, তা হলে আর কি হবে!

দিন-দুই বাদে প্রতাপ গুহ আমাকে নার্সেস্ কোয়ার্টারে ফোন করল।

আজ একবার দেখা করতে পারেন আমার সঙ্গে?

কেন?

বিশেষ প্রয়োজন আছে, দেখা হলে বলব।

আবার দেখা হল আমাদের।

প্রতাপ বললে, শুনুন শীলা দেবী, আপনি কি সত্যি-সত্যিই সম্পত্তিটা চান?

প্রতাপের কথাটার যেন কোন মানেই বুঝতে পারলাম না।

বললাম, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না!

চান কিনা আগে বলুন, বুঝবেন পরে। তবে আপনি যদি সম্পত্তিটা চান তো আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি—

কী করে?

মৃদু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে প্রতাপ বললে, বললাম তো সেটা আমার ভাববার কথা। আপনি শুধু সহযোগিতা করে যাবেন আর চুপ করে যা বলব তাই করে যাবেন।

লোভের আগুন জ্বলে উঠল বুকের মধ্যে।

একদিকে লোভ, অন্যদিকে সন্দেহ। কেমন করে কি হবে বুঝতে পারছি না!

বললাম, বুঝতে সত্যিই পারছি না আপনার কথাটা। বিয়ে না হলে ঐ সম্পত্তি

তো পাব না।

বিয়ে হবে।

বিয়ে হবে !

হ্যাঁ।

কিন্তু—

শুধু সম্পত্তির জন্যই লোক-দেখানো বিয়েটা হবে।

সে কি করে সম্ভব ? তাছাড়া অনিরুদ্ধই বা রাজী হবে কেন ?

রাজী হবে। নরহরির মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর যা করবার আমিই করব।

আশ্চর্য !

তখন একবারও মনে হয় নি প্রতাপ গুহ এত বড় উপকারটা আমার কেন করতে চাইছে ?

সত্যি লোকটার তুলনা খুঁজে পাই নি সেদিন।

মূর্খ—মূর্খই ছিলাম তাই বুঝতে পারি নি—বুঝতে চাই নি যে বিনা স্বার্থে এত বড় উপকার কেউ করতে পারে না !

লোকটার মহত্ত্ব যেন অন্ধের মতই সেদিন তার প্রতি আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তা নয়—মহত্ত্বের আকর্ষণ নয়—আকর্ষণ করেছিল সেদিন তার প্রতি আমারই লোভ, আমার অর্থলোলুপ মনটা। ভালবাসা সেটা নয়—কুৎসিত অর্থের উলঙ্গ লোভ সেটা আমার মনের। আজ অস্বীকার করব না, সত্যি-সত্যিই সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। এবং একবারও মনে হয় নি সেদিন, ব্যাপারটা কি করে আদৌ সম্ভব ! আর এও বুঝতে পারি নি, আসল মতলবটা প্রতাপের মনে কি ছিল !

বুঝতে যেদিন পারলাম সেদিন আর ফিরবার আমার কোন উপায়ই ছিল না। সামনে পিছনে সমস্ত রাস্তাই তখন আমার কাছে বন্ধ। রুদ্ধ।

কিন্তু যাক সে কথা, যা বলছিলাম তাই বলি।

ঐ ব্যাপার নিয়ে প্রতাপের সঙ্গে ঘন ঘন আমার দেখা হতে লাগল। আর সেই দেখাশোনার মধ্যে দিয়েই ক্রমশঃ মনটা আমার প্রতাপের দিকে ঝুঁকতে লাগল একটু একটু করে। প্রতাপ যেন আমাকে এক স্বপ্নের রাজ্যে হাত ধরে নিয়ে চলেছিল।

এমনি করে মাস-দুই কাটার পর হঠাৎ একদিন প্রতাপ এসে বললে, এখুনি আপনাকে বেরুতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ?

আগে চল, সব পরে জানতে পারবে।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে এলাম, কিন্তু প্রতাপ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

উঁহু, ও বেশে নয়—নার্সের পোশাক পরে এস।

কেন ?

একজনকে নার্সিং করতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হয়েই তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে এলাম আবার।

রাত আটটা নাগাদ সে আমাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় হাজির হল জানেন ?

নরহরির বরাহনগরের বাড়িতে। এবং সোজা নিয়ে গেল নরহরির শয়নঘরে আমাকে।

সকালবেলা থেকে নরহরির এনজাইনার অ্যাটাক চলেছে। রোগের যন্ত্রণায় তখন তিনি আচ্ছন্ন।

বাড়িতে একটি বুড়ী ঝি ছিল ও জনকয়েক ভৃত্য ছিল।

পুরাতন ভৃত্য রামচরণ সে-সময় এক মাসের ছুটি নিয়ে তার এক ভাইপোর বিয়েতে দেশে বর্ধমানে গিয়েছিল।

একজন ডাক্তার কিছুক্ষণ পরে এলেন।

প্রতাপ আমাকে সেখানে রোগীকে নার্সিংয়ের জন্য এনেছে বললে। ডাক্তার রাজেন ধরও দেখলাম প্রতাপের পূর্বপরিচিত।

ডাক্তার যথাযথ নির্দেশ দিয়ে একসময় চলে গেলেন। এবং প্রতাপও চলে গেল তার কিছুক্ষণ পরে।

আমি তখন সেই মৃত্যু-আচ্ছন্ন রোগীর শয্যার পাশে বসে রইলাম। রাত যত বাড়তে লাগল রোগী যেন ততই নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল।

সেরাত্রে দুবার আরও এসেছিল প্রতাপ। একবার কি ঔষধও যেন খাওয়াতে গেল। শেষের বার এসে নরহরিবাবুর শিয়রের বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে কি যেন কাগজপত্র বের করে নিয়ে গেল।

তারপর সেই রাত্রেই নরহরিবাবুর মৃত্যু হয়।

সরকারপক্ষের উকিল আদালতে প্রতাপ গুহকে প্রশ্ন করেছিলেন, নরহরির মৃত্যুর সময় আপনি সেখানে ছিলেন ?

না। জবাব দেয় প্রতাপ গুহ।

কিন্তু নার্স মালতী রায় ছিল, আপনি আপনার স্টেটমেণ্টে বলেছেন।

ছিল।

শীলা দেবীই বোধ হয় মালতী নামে সেখানে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন বলুন তো ?

সে যে হাসপাতালে ঐ নামেই পরিচয় দিয়েছিল—

কিন্তু কেন ?

জানি না।

কথাটা আপনি জানতেন ?

জানতাম।

আর একটা কথা প্রতাপবাবু, শীলা সে-সময়ে নার্সিংএর ট্রেনিংএ ছিল, তাই না ?

হ্যাঁ।

সে কথাও আপনি জানতেন তাহলে ?

জানতাম।

কথাটা জানা সত্ত্বেও আপনি অমন একজন রোগীর সেবার জন্য একজন পিউপিল নার্সকে নরহরিবাবুর নার্সিংয়ের জন্য নিযুক্ত করলেন কি করে ?

হাতের কাছে তাড়াতাড়িতে সে-সময় অন্য কোন নার্স পাওয়া গেল না।

কলকাতার মত শহরে আপনি একজন নার্স পেলেন না, কথাটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রতাপবাবু ?

মৃদু হেসে প্রশ্নটা করলেন পাবলিক প্রসিকিউটার।

যা ঘটেছিল, তাই আমি বলেছি।

আচ্ছা এ কথা কি সত্যি, নরহরিবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন আগে থাকতেই শীলা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল ?

হ্যাঁ, হাসপাতালে ঘটনাচক্রে হয়েছিল।

শীলা দেবীর সত্যিকারের পরিচয়টা আপনি নিশ্চয়ই জানতেন ?

না।

জানতেন না ?

না।

নরহরিবাবুর মৃত্যুর পর ?

তখন জেনেছিলাম।

তখন কেন শীলা দেবীকে উইলের কথাটা বলেন নি ?

বলবার সুযোগ পাই নি—

সুযোগ পান নি ! কেন ?

কারণ নরহরিবাবুর মৃত্যুর দিনচারেক বাদে নার্সেস্ কোয়ার্টারে শীলা দেবীর খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম—

কি শুনলেন ?

সে দিল্লীতে চলে গিয়েছে তখন।

তা শীলা দেবী নার্সিং পড়তে এসে হঠাৎ নার্সিংয়ের কোর্স শেষ না করেই যে শেষ পর্যন্ত আবার দিল্লীতে ফিরে গেলেন, বিরাট সম্পত্তির মালিকানার স্বত্ব পাচ্ছেন কথাটা জানতে পেরেই বোধ হয় !

তা কি করে হবে ? তিনি তো সেকথা তখন জানতেনই না !

অথচ জানত কথাটা শীলা। প্রতাপই তাকে বলেছিল। আদালতে সে কথাটা প্রমাণ করতে না পারলেও, আজ শাশ্বত তার প্রমাণ পেলে কিরীটীকে লেখা শীলার সুদীর্ঘ চিঠিটার মধ্যেই।

শীলা তার চিঠিতে লিখেছে।

নরহরিবাবুর মৃত্যুর পরদিনই প্রতাপের পরামর্শমত আমি রাত্রের ট্রেনে দিল্লী চলে গেলাম। প্রতাপ যাবার সময় আমাকে বলে দিয়েছিল, তার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত যেন আমি দিল্লীতেই অপেক্ষা করি।

সেই পরামর্শমতই আমি দিল্লীতে পৌঁছে প্রতাপের চিঠির অপেক্ষায় বসে রইলাম। নরহরিবাবুর মৃত্যুর এক মাস পরে প্রতাপ আমাকে উইলের সারমর্ম জানিয়ে দিল্লীতে চিঠি দিল।

বোধ হয় সেই সঙ্গে অনিরুদ্ধকে চিঠি দিয়েছিল তাকে তার এলাহাবাদের ঠিকানায় ঐ একই কথা জানিয়ে।

যা হোক, চিঠি পেয়েই কলকাতায় আমি রওনা হলাম।

উইল-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে চিঠিটা ছাড়াও আর একখানা পৃথক চিঠি দিয়েছিল আমাকে প্রতাপ।

সে চিঠিতে লেখা ছিল, আমি যেন কলকাতায় গিয়ে সোজা টাওয়ার হোটেলে উঠি। সেখানে আমার নামে একটা রুম রিজার্ভ করে রেখেছে প্রতাপ আগে থাকতেই। এবং তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বে যেন তার অফিসে কোনমতেই আমি না যাই।

প্রতাপ তার চিঠিতে বিশেষভাবে একটা কথা লিখেছিল। আমার বিবাহ ও স্বামীর মৃত্যুর কথা অনিরুদ্ধ যখন জানে না এবং জানবার কোন কারণই নেই—তখন যেন সে কথাটা আমি না প্রকাশ করি তার কাছে দেখা হলেও।

কিন্তু প্রতাপের চক্রান্ত যাই থাক না কেন, বিধাতার ইচ্ছা যে ছিল অন্যরূপ তা তো আপনি বুঝতেই পেরেছেন।

বলতে পারেন আমার নিয়তিরই নির্দেশ ছিল বুঝি অনুরূপ। এবং সেই নিয়তিরই অলঙ্ঘ্য নির্দেশে শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়েই এক ট্রেনে কলকাতাভিমুখে চলতে চলতে পথে ঘটল সেই ভয়াবহ ট্রেন-ডিজাস্টার।

একটা কথা বিশ্বাস করেছেন কিনা জানি না, নকল অনিরুদ্ধ—মানে অনিরুদ্ধ-রূপী তার শ্যালক তরুণ, আমার সঙ্গে ঐ একই ট্রেনে চলেছিল, তা সত্যিই সেদিন কিন্তু আমি জানতাম না।

পরে কথাটা শুনেছিলাম।

॥ আটাশ ॥

এবং এ কথাটাও সত্যি, ট্রেনের দুর্ঘটনায় সত্যিই আমার কিছুদিনের জন্য স্মৃতিলোপ হয়েছিল।

এখন ভাবি সে স্মৃতি যদি চিরদিনের মতই লোপ পেয়ে যেতো, তবে হয়তো আজকের এই মর্মান্তিক লজ্জা আর গ্লানির বোঝাটা বাকী জীবনের মত আমাকে বয়ে বেড়াতে হত না।

কিন্তু বললাম তো, নিয়তি—নিয়তিই আমাকে এখানে আবার টেনে এনেছিল স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার পরেও।

নিয়তি কপালে আমার লিখে রেখেছে ঐ লজ্জা আর গ্লানি, নিষ্কৃতি পাব কেমন করে?

তাই বোধ হয় স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার পরই আমি সব কথা জানিয়ে কলকাতায় প্রতাপকে চিঠি দিয়েছিলাম।

প্রতাপ আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই কাশীতে এসে জগৎকাকার ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করল।

সেদিন তার মুখেই প্রথম শুনলাম একই ট্রেনে নাকি অনিরুদ্ধও আসছিল এবং সেও আমার মত দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছে। তবে তার একখানা হাত চিরদিনের মতই অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে সেই দুর্ঘটনায়।

কাশীতে আমার সঙ্গে জগৎকাকার ওখানে দেখা করে প্রতাপ আমাকে পরামর্শ দিল, আমি যেন কিছুদিন পরে তার নির্দেশ পেলে তবে কলকাতায় গিযে তার সঙ্গে দেখা করি।

কিন্তু তখনো বুঝি নি, কেন সে এ কথা আমাকে বলেছিল?

পরে অবিশ্যি বুঝেছিলাম।

অনিরুদ্ধ যে আসল অনিরুদ্ধ নয়, ছদ্মবেশী অনিরুদ্ধ, তা কিন্তু প্রতাপ জানতে পারে নি। তরুণ রায়কে সে সত্যিকারের অনিরুদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছিল। এবং সেই ভেবেই নরহরির সম্পত্তির সত্যিকারের ওয়ারিশন বলেই ধরে নিয়েছিল। এবং সত্যিকার ওয়ারিশন হিসাবে তার সঙ্গে একটা চুক্তিও করেছিল—অনিরুদ্ধ যেহেতু বিবাহিত, সেহেতু সম্পত্তি তার পক্ষে আজ আর পাওয়া সম্ভবপর নয়—ঐ রঙের টেক্কাটি হাতে রেখেই সে অনিরুদ্ধকে তার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে বাধ্য করেছিল অবিশ্যি।

কিন্তু বেচারী প্রতাপ তখনো জানত না, অনিরুদ্ধ-বেশী তরুণ রায় লোকটা চাতুরী ও শয়তানী বুদ্ধিতে তার চাইতে কম তো যায়ই না, বরং বেশীই যায়।

অনিরুদ্ধ-বেশী তরুণ রায় যখন বুঝতে পারলে, প্রতাপ তাকে চিনতে পারে নি বা সন্দেহও করে নি, তখন সে বিবাহিত এই ভয়েই যেন ভীত হয়ে প্রতাপের সঙ্গে চুক্তি করছে, এইভাবে চুক্তি করলে একটা। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো উভয়ের মধ্যে, প্রতাপ অনিরুদ্ধর দাবী ন্যায্য বলে স্বীকার করে নেবে, তবে প্রতি মাসে দশ

হাজার করে টাকা অনিরুদ্ধ তাকে দেবে।

আগেই বলেছি, তরুণ রায় লোকটা ছিল অসাধারণ ধূর্ত। তার ভগ্নীপতি অনিরুদ্ধর সঙ্গে তার যে চুক্তিই থাক, এখনও প্রতাপ তাকে চিনতে পারে নি এবং সেও তাদেরই পথের পথিক ব্যাপারটা জানতে পেরে অনিরুদ্ধর মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার জন্য প্রস্তুত হল। এবং সেই চুক্তি সত্যই আট-নয় মাস চলছিল।

কিন্তু তারপরই তরুণ রায় অর্থাৎ ছদ্মবেশী অনিরুদ্ধ বেঁকে বসলো।

বললে, আর টাকা পাবে না তুমি।

টাকা পাব না?

না।

প্রতাপ বললে, মানে? চুক্তি আমাদের ভুলে গেছ?

ভুলবো কেন, মনে আছে বৈকি।

তবে?

তবে আবার কি? আর পাবে না, তাই জানিয়ে দিলাম।

জানো কালই তোমার সব কথা প্রকাশ করে দিয়ে এখান থেকে তোমাকে তো আমি তাড়াতে পারিই, সেই সঙ্গে প্রতারকও প্রমাণ করতে পারি! তার পরিণাম—

জেল, এই তো?

সেটা কি বুঝতে পারছ না?

পারব না কেন? পারছি বৈকি। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকেও কি ঐ ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদাক বলে জেলে টেনে নিয়ে যাবো না সঙ্গে করে ভেবেছ?

অনিরুদ্ধবাবু! চিৎকার করে ওঠে প্রতাপ।

বলুন প্রতাপবাবু, বান্দা হাজির!

ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে তরুণের কণ্ঠস্বরে।

বেশ! I accept your challenge! শীঘ্রই আমাদের আবার দেখা হবে। বলে প্রতাপ বের হয়ে এলো।

ঐ ঘটনারই মাসখানেক আগে কাশী থেকে আমার চিঠি পেয়েছিল প্রতাপ।

বুঝতেই পারছেন, প্রতাপ এল এবারে আমার কাছে।

এসে বললে, আর সাতদিন পরেই তুমি কলকাতায় আমার অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

প্রতাপের পরামর্শমতই এবারে এলাম আমি কলকাতায়।

সেদিন বুঝতে পারি নি কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, অনিরুদ্ধকে অর্থাৎ অনিরুদ্ধ-বেশী তরুণ রায়কেই জব্দ করবার জন্যই সে সেদিন আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল।

করেছিলও জব্দ আমাকে সামনে খাড়া করে তাকে।

এদিকে আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ অনিরুদ্ধর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার

ক্ষমতা আইনজারী করে বন্ধ করে দিল।

যার ফলে তরুণ রায় একেবারে ক্ষেপে গেল। এবং প্রতাপকে সে নানা ভাবে জব্দ করবার চেষ্টা করতে লাগল তারপর থেকেই।

সে এক বিচিত্র নাটক।

আমাদের দেশে শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি বলে যে একটা কথা আছে, এবারে দুজনের মধ্যে ঠিক তাই চলতে লাগল। এবং উভয়ের মাঝখানে পড়ে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

ওদিকে সবটুকু না বুঝতে পারলেও, আমিও যে প্রতাপের মতলবটা তখন একেবারে বুঝতে পারি নি তা নয়। এবং তাদের দুজনের অভিসন্ধির মধ্যে পড়ে আমার প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল আমি পালাবই।

শেষ পর্যন্ত হয়তো পালাতাম।

কিন্তু পারলাম না—আমার পালানো হল না।

।। উনত্রিশ ।।

তরুণ—এবার থেকে তরুণই বলব তাকে, আর অনিরুদ্ধ বলে ডাকব না।

তরুণ পুলিসকে ফোন করবার পর পুলিস এসে যখন ঐ বাড়িতে হাজির হল, প্রতাপের মুখটা একেবারে চুপসে গেল।

সে ঠিক অতটা ভাবতে পারে নি।

তার মত চতুর মতলববাজ শয়তানের উপরেও যে টেক্কা দিতে পারে, প্রতাপ বোধ হয় কথাটা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, তরুণ ঐভাবে অতর্কিতে পুলিস ডেকে এনে।

পুলিস আসার পরই একদিন গভীর রাত্রে বাগানে যখন একা একা বেড়াচ্ছি, তরুণ এসে আমার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

শীলা!

কে?

আমি—

অনিরুদ্ধ?

হ্যাঁ, বোস। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

কী কথা?

বোসই না—

না, আপনি বলুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনছি।

অনেক কথা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো শেষ হবে না। কিন্তু তুমি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করছ কেন?

তবে কি বলে সম্বোধন করব?

কেন, দিল্লীতে পরিচয় হবার পর যেমন 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে!

কিন্তু আপনি তো আর সত্যি-সত্যিই সেই লোক নন।

কী বললে?

হ্যাঁ, আপনি অনিরুদ্ধর মত দেখতে হলেও অনিরুদ্ধ নন!

তবে—তবে কে?

তা জানি না আপনি কে—তবে অনিরুদ্ধ আপনি নন!

আমি অনিরুদ্ধ নই?

না।

কিছুক্ষণ অতঃপর তরুণ রায় চুপ করে থেকে বললে, তাহলে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ?

পেরেছি বৈকি। প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলাম।

হুঁ, ঠিকই বলেছ, সত্যিই অনিরুদ্ধ আমি নই। আর সেই কথাটা জানাব বলেই আজ এসেছি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, কিন্তু যাক্, তুমি যখন জানই তখন আসল কথাতেই এবার আসা যাক—

আসল কথা?

হ্যাঁ শোন, আমি অনিরুদ্ধ নই—আমার নাম তরুণ রায়। যদিচ আসল অনিরুদ্ধর পরামর্শমতই এখানে আমি এসেছি।

কেন?

বলাই বাহুল্য তার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছে এবং সে চুক্তি অনুযায়ী আমার একটা লাভের ব্যাপার আছে বলেই এখানে এসেছিলাম অনিরুদ্ধ হয়ে।

কি চুক্তি?

তুমি জান না বোধ হয় অনিরুদ্ধ বিবাহিত—

জানি।

জানো?

হ্যাঁ।

ও। শোন—অনিরুদ্ধর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল, যতটা পারি টাকা হাতিয়ে নেবো আমি এবং তার আধাআধি বখরা হবে—

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু মাঝখানে প্রতাপ এসে পড়ে সব ভেস্তে দিল। টাকার অর্ধেক সে নিতে লাগল, বাকী অর্ধেক আমরা দুজনে এতকাল পাচ্ছিলাম। আমার অবিশ্যি তাতে আপত্তি ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিরুদ্ধর পরামর্শেই আমি প্রতাপকে অর্ধেক দিতে অস্বীকার করলে সে তোমাকে এখানে নিয়ে এলো এবং টাকা বন্ধ করে দিল।

তারপর?

সেই তারপরের জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি—

কী রকম ?

অনিরুদ্ধ তার স্ত্রী বর্তমানে কোন দিনই তোমাকে বিয়ে করে আইনত নরহরির সম্পত্তি পেতে পারে না আর তুমিও পাবে না—কারণ তুমিও তাকে বিয়ে না করলে পাবে না। তাই সে—

তাই কি ?

অনিরুদ্ধর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—

কী কথা ?

লোক-দেখানো ভাবে আমরা মানে তুমি ও আমি একটা বিয়ে করবো। কিন্তু—

কিন্তু কি ?

ঐ বিয়ে পর্যন্তই—তারপর এই সম্পত্তি আমাদের হাতে এলে সম্পত্তির তিনটি ভাগ হবে। অর্ধেক ভাগ পাবে অনিরুদ্ধ, বাকী অর্ধেক দুই সমান ভাগে এক ভাগ আমি, এক ভাগ তুমি। অতঃপর আমরা কেউ কারোর পথে দাঁড়াবো না। যে যার পথ দেখে নেবো ইচ্ছামত। তুমি যদি এতে রাজী থাক তো—

আমার কথা ছেড়ে দিন, আপনি রাজী আছেন কি এ প্রস্তাবে ?

হ্যাঁ, তা আছি বৈকি।

আপনি ঠিক বলছেন, ঐ চুক্তিমত নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল হয়ে যাবে ?

তাই তো আশা করি।

হুঁ। তা বেশ, এখন আমাকে কি করতে হবে ?

প্রতাপ যেন ব্যাপারটা না জানতে পারে বা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে—

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ যেমন চলছে তেমনি চলবে। আমরা পরস্পর যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছি, প্রতাপের সন্দেহ যাতে করে উদ্রিক্ত না হয়, সেই ভাবেই ঠিক তাই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

এটাই তা'হলে আপনার মনের কথা ?

এবারে মৃদু হাসলো প্রত্যুত্তরে তরুণ। হেসে বললে, বুদ্ধিমতী তুমি, বুঝতে পেরেছো দেখছি। 'তবে খুলেই বলি, মোটেই তা নয়—

তবে ?

সে কথা সময়ে জানতে পারবে। আগে ব্যাপারটা চুকে যাক তো।

বেশ।

তবে তুমি রাজী ?

রাজী।

ব্যাপারটা হয়তো ঐ ভাবেই চলতো কিন্তু তা হলো না, কারণ তরুণের সত্যিকারের মনের কথা বুঝতেও আমার দেরি হয় নি, যে মুহূর্তে মন্দিরা চ্যাটার্জীর সংবাদটা আমি পেয়েছিলাম। এবং তখুনি বুঝেছিলাম, আমি যে তিমিরে

সেই তিমিরেই আছি। সেই সময় প্রতাপ এলো আবার নতুন প্রস্তাব নিয়ে, জুয়েল-গুলো যদি হাতিয়ে নিতে পারি তাহলে সে আমাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে এই আশ্বাস দিতে।

মূর্খ আমি, তাই তার সে প্রস্তাবে আবার জীবনে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার ঐ সঙ্গে লক্ষ্য করলাম কিছুদিনের মধ্যেই, প্রতাপ জুয়েলসগুলোর কথা আমাকে বললে বটে কিন্তু চাবিটা সে কিছুতেই আমার হাতে তুলে দিচ্ছে না। চাবির কথা বললেই সে নানা অজুহাত দেখিয়ে সময় নিতে লাগল।

এদিকে আমরাও অর্থাৎ আমি ও তরুণ রায় পূর্বের মতই অভিনয় করে যেতে লাগলাম পরস্পরের মধ্যে আমাদের চুক্তি অনুযায়ী।

মামলা চলাকালীন সময়ের মধ্যেই অকস্মাৎ একদিন তরুণ রায় কলকাতায় ফিরে এসে পুলিসের কাছে ধরা দিল।

তাকে আদালতে এনে হাজির করা হল। সে স্পষ্টই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললে, অনিরুদ্ধর পরামর্শমতই সে সবকিছু করছে। সব কিছু দোষ সে অনিরুদ্ধর ঘাড়েই চাপিয়ে দিল।

শাশ্বত আবার শীলার চিঠির শেষাংশে মন দিল।

আপনি হয়তো বলবেন কিরীটীবাবু, পরিস্থিতিটা যখন অমন ঘোলাটে হয়ে উঠল, আমি সব কথা প্রকাশ করে দিলাম না কেন?

নিজের লোভ আর বোকামির জালে পড়ে নিজে জড়িয়েছি, কি করে সব কথা প্রকাশ করি! আমিও যে প্রতারণার দায়ে পড়বো!

তাই তো আজ যাবার আগে মনে হচ্ছে, যা কিছু ঘটলো সবই আমার ভবিতব্য। আমার নিষ্ঠুর ভবিতব্যই এখানে হাত ধরে আমায় নিয়ে এসেছিল, এই কলঙ্ক আর লজ্জা সর্বাঙ্গে আমার মাখিয়ে দেবার জন্য।

শেষে একটা অনুরোধ মাত্র, এ চিঠিটা কাউকে দেখাবেন না। এবং পারেন তো পড়া হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলবেন।

চিঠিটা শেষ করে শাশ্বত সামনের জানালা-পথে তাকাল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। তারই আভাস রাত্রিশেষের আকাশে।

মৃত্যুবিষ

॥ এক ॥

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে গ্রীষ্মতাপটা যে এমন প্রচণ্ড আকারে দেখা দিতে পারে এ যেন সত্যিই ধারণারও অতীত। বাংলা দেশের হাওয়ায় যেন পশ্চিমের লু'র তাপ। ঘরের জানালা-দরজা সব এঁটে পূর্ণ বেগে ফ্যান চালানো হয়েছে, তথাপি মনে হচ্ছে গা যেন ঝলসে যাচ্ছে।

সকালে এসেছিলাম কিরীটীর ওখানে, কিন্তু গল্পে গল্পে বেলা অনেকটা গড়িয়ে যাওয়ায় কিরীটী বাসায় আর ফিরতে দেয় নি। আহারাদির পর আটকে রেখেছে।

দ্বিপ্রহরে নিদ্রাভ্যাস আমার কোন দিনই নেই, তাই ঐদিনকার একটা সংবাদপত্র নিয়ে জানালা-দরজা-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যেই সময় কাটাবার সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত আছি। কিরীটী একটা আরাম-কেদারার উপর গা এলিয়ে দিয়ে সিগার টানছে বাদশাহী মুডে দুটি চক্ষু বুজে।

গরমটা এমন বিশ্রী যে, কথাবার্তা বলতেও ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ কিরীটী কথা বললে, এই প্রচণ্ড গরমে কে আবার এলেন ধন্য করতে!

কি বলছিস?

কেন, জুতোর শব্দ সিঁড়িতে পাচ্ছিস না?

সত্যিই তো! কান পেতে শুনলাম, সত্যি মৃদু ধীর একটা জুতোর শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

ভদ্রলোক শৌখিন ও কেতাদুরস্ত। বিলাতী শিক্ষার আভিজাত্য আছে বলে মনে হয়!—কিরীটী মন্তব্য করে।

কেমন করে বুঝলি?

জুতোর শব্দ থেকেই বোঝা যায়। আমাদের সাধারণ বাঙালীদের মত মচমচ শব্দ তুলে আসছেন না।

জুতোর শব্দ ততক্ষণে থেমেছে। ঘরের বন্ধ দরজায় মৃদু নক্ শোনা গেল।

দরজাটা খুলে দে সুব্রত।

নাঃ, জ্বালালে দেখছি! উঠে আবার জামাটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। একটু সভ্যভব্য হয়েই দরজা খোলা ভাল। কে জানে কোন্ অভিজাত সম্প্রদায়ের মানী লোক!

দরজা খুলে দিতেই যিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন, প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি কিন্তু আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

শুধু তাঁর চেহারার মধ্যেই নয়, তাঁর বেশভূষার মধ্যেও একটা রুচি ও অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা একান্ত ভাবেই যেন সুস্পষ্ট।

মিঃ কিরীটী রায়?—মৃদু ধীর কণ্ঠে আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

আমারই নাম। বসুন।

কিরীটীর আহ্বানে আগন্তুক তার পাশেরই একটা সোফা অধিকার করে বসলেন।

আমার নাম তেজেশ ঘোষ—হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করি।—ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন।

বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার। বয়স পঁয়ত্রিশের ঊর্ধ্বে নয়। সুঠাম লম্বা-চওড়া গৌরবর্ণ চেহারা, পরিধানে দামী সাদা সিল্কের সুট। মেরুণ কালারের টাই। পায়ে দামী চকচকে অক্সফোর্ড সু।

অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত মিঃ রায়। কিন্তু আমার প্রয়োজনটা এত বেশী যে, বিরক্ত না করে আপনাকে পারলাম না।

না, না—তাতে আর কি হয়েছে!—কিরীটী সৌজন্য প্রকাশ করে। অতঃপর ভদ্রলোকের সঙ্গে যে কথাবার্তা হল তাতে করে তাঁরই বিশেষ অনুরোধে জায়গার নামটা আমাদের গোপন করতে হচ্ছে।

ধরুন জায়গার নামটা মোমিনপুর—আসাম অঞ্চলে একটি ছোটখাটো বর্ধিষ্ণু শহর। এবং মোমিনপুরই বর্তমান কাহিনীর ঘটনাস্থল।

মিঃ তেজেশ ঘোষ বললেন, দীননাথ ঝা মোমিনপুরের থানার O. C., তাঁরই বিশেষ অনুরোধে আপনার কাছে আসছি মিঃ রায়।

হ্যাঁ, দীননাথের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ, সে কেমন আছে?

ভালই।

হুঁ, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

আমার বক্তব্য পেশ করবার আগে যদি একটু মুখচন্দ্রিকা করে নিই, আপনার আপত্তি আছে কি মিঃ রায়? কেননা তাতে করে যে জন্য আপনার কাছে আমার আসা সেটা আপনার সহজবোধ্য হবে।

নিশ্চয়ই না, বলুন! মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দেয়।

মোমিনপুর আসামের একটা ছোটখাটো স্টেট। এবং স্টেটের রাজা হচ্ছেন টিকেন্দ্রজিৎ বড়ুয়া। টিকেন্দ্রজিৎ আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়ই হবেন। সম্পর্কে তিনি আমার ভগ্নীপতি হন। অর্থাৎ আমার একমাত্র ভগিনী সুনন্দাকে বিবাহ করেছেন।—ব্যারিস্টার সাহেব বলতে লাগলেন।

তারপর?

বছর দশেক আগে টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আমার বোন সুনন্দার বিবাহ হয়। এবং বিবাহের তিন বৎসর পরে হয় তাদের দুটি যমজ পুত্রসন্তান রুণু আর বেণু। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রুণু ও বেণুর যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন হঠাৎ সুনন্দা অসুস্থ হয়ে পড়ল। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। ফলে তাকে একেবারে শয্যাশায়িনী হতে হল। রুণু ও বেণুর দেখাশোনার জন্য অবিশ্যি একজন দাই ও দুজন ভৃত্য ছিল। কিন্তু সুনন্দার সেটা মনঃপুত না হওয়ায় তারই বিশেষ অনুরোধে একজন গভর্নেসের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। বিজ্ঞাপনের ফলে অনেকগুলো দরখাস্ত আমরা

পাই এবং তার মধ্যে একটি অ্যাংলো ক্রিশ্চান মেয়েকে আমিই interview দিয়ে কলকাতায় বসে সিলেক্ট করে ওখানে পাঠিয়ে দিই। মেয়েটির নাম মিস্ ডরোথি জোন্স। ডরোথির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে এবং মেয়েটি যে কথায়বার্তায়ই শুধু চটপটে তাই নয়, শিক্ষিতা ও মার্জিত রুচিসম্পন্না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অত্যন্ত soft-hearted বলেই মনে হয়। এই পর্যন্ত বলে তেজেশ একটু থামলেন।

বুক-পকেট হতে একটা সাদা হাতীর দাঁতের সুদৃশ্য সিগারেট কেস বের করে প্রথমেই কিরীটীকে অফার করলেন ঘোষ সাহেব।

কিরীটী মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললে, No, thanks! সিগারটাই আমি বেশী পছন্দ করি।

I see! তেজেশ একটা সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে কয়েকটা মৃদু টান দিয়ে বললেন, মিস্ ডরোথিকে পাঠিয়ে দিলাম অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে টিকেনের ওখানে, এবং একমাস পরে রিপোর্ট পেলাম টিকেন নিজে তো বটেই, সুনন্দাও নাকি ডরোথির কাজে ও ব্যবহারে অত্যন্ত মানে highly pleased.

If you don't mind, একটা কথা মিঃ ঘোষ, কত মাইনে ঠিক হয়েছিল মিস্ জোন্সের?—কিরীটী হঠাৎ প্রশ্ন করে।

Oh! It was a handsome salary. মাসে চারশ টাকা ও খাওয়াপরা।

হুঁ, তার পর?

তার পর বছর-চারেক নির্বিবাদেই কেটে গেল। এমন সময় হঠাৎ গত মঙ্গলবার দিনসাতেক আগে টিকেনের এক তার পেলাম, রুণু ও বেণু seriously ill—বড় একজন ডাক্তার নিয়ে সত্বর যাবার জন্য। ডাঃ সান্ন্যালকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু যেদিন পৌঁছালাম বেলা দশটায়—তার ঘণ্টাখানেক আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে। রুণু ও বেণু মারা গিয়েছে—peculiar death. ধীরে ধীরে cyanosis হয়ে মারা গিয়েছে। জ্বর নেই জ্বালা নেই, চার-পাঁচদিন ধরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। Symptoms শুধু cyanosis, ডাক্তার সান্ন্যালই মৃতদেহ দেখে সর্বপ্রথম সন্দেহ করলেন, death was not natural—স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। There must be some foul play! তেজেশ আবার থামলেন।

কিছুক্ষণ আবার একটা স্তব্ধতা।

তার পর ডাঃ সান্ন্যালের কথামতই থানার O. C.-কে সংবাদ দেওয়া হল। গৌহাটি থেকে Civil Surgeonও এলেন। ময়নাতদন্তে প্রকাশ পেল Nitro-benzene বিষে মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু কেমন করে কি ভাবে এবং কার দ্বারা যে ঐ মারাত্মক বিষ ওদের শরীরে সংক্রামিত করা হল সেটা হাজার চেষ্টা করেও জানা গেল না। এই দুর্ঘটনায় টিকেন তো সাংঘাতিক ভাবে মুষড়ে পড়েছেই, বেচারী ডরোথি পর্যন্ত ভয়ানক shocked হয়েছে! Poor girl, নিজের সন্তানের মত করেই ছেলে দুটোকে মানুষ করছিল। ওদের অসুস্থ হওয়ার পর ও পাঁচ দিন এক মিনিটের জন্যও ওদের শয্যার পাশ থেকে উঠে কোথাও যায় নি। এমন কি স্নানাহার পর্যন্ত

তার বন্ধ ছিল বললেও হয়। আর সুনন্দার কথা কি বলব, সে তো সংবাদটা শোনা অবধি এখনো ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছে। তার অবস্থা অবর্ণনীয়। অল্প বয়সেই সুনন্দা শয্যাশায়িনী হয়ে পড়ায় সে নিজে এবং আমরাও সকলেই বহুবার টিকেন্দ্রজিৎকে আবার বিবাহ করতে বহু অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কারো কথাতেই সে কর্ণপাত করে নি, বরাবরই সে বলেছে রুণু ও বেণুই তো তার আছে। তারা বেঁচে থাকলেই তার সব কিছু পাওয়া হবে।

টিকেন্দ্রজিতের স্টেটের আয় বাৎসরিক কত হবে বলে আপনার অনুমান মিঃ ঘোষ ? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

তা ধরুন বৎসরে দেড় লাখ তো হবেই, quite a big state !

আচ্ছা, সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন টিকেন্দ্রজিতের দুই পুত্রই তো আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেল! এখন ন্যায়ত তার সম্পত্তির আর কোন উত্তরাধিকারী আছে কি ?

যত দূর জানি টিকেন যদি কোন উইল না করে যায় তো তার এক দাদা আছেন, বৈমাত্রেয় ভাই রাজেন্দ্র বড়ুয়া—তিনিই সব কিছুর মালিক হবেন।

তিনি কি করেন ?

তাঁরও অবস্থা ভাল, তবে টিকেনের মত নয়। গৌহাটিতে তাঁর মস্ত বড় টিক্‌উডের ব্যবসা আছে।

তিনি টিকেন্দ্রজিতের চাইতে বয়সে বড় না ছোট ?

বড়। বছর সাতেকের বড়।

বরাবরই কি তিনি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আলাদা ?

হ্যাঁ। রাজা রণজিৎ বড়ুয়া, ওদের বাপ বেঁচে থাকতেই দুজনকে সব পৃথক ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ঐ সময় টিকেনের মা, রাজার স্ত্রী, জীবিতা থাকায় টিকেনের shareটাই ভারী হয় ভাগে।

টিকেন্দ্রজিতের দাদা রাজেন্দ্র বড়ুয়ার সংসারে কে কে আছেন ?

তাঁর স্ত্রী ও এক মেয়ে। মেয়েটির বিবাহ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর খরচ করে লণ্ডন ইউনিভারসিটির কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট্ ছেলের সঙ্গে একমাত্র মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র বড়ুয়া, কিন্তু জামাইটি তেমন সুবিধের হয় নি। প্রচণ্ড মাতাল ও জুয়াড়ী। প্রথম দিকটায় প্রশান্ত মানে জামাইকে অনেক শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন রাজেন্দ্র, কিন্তু কিছুই ফল হল না। শেষটায় প্রশান্তকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় রাজেন্দ্র।

আর মেয়ে ?

মেয়ে নীলা বাপের কাছেই আছে।

এখন বলুন আমার কাছে দীননাথ আপনাকে পাঠিয়েছেন কেন ?

পূর্বেই তো বললাম, রুণু ও বেণুর আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা একান্ত রহস্যজনক। কিন্তু দীননাথবাবু রহস্যের কোন কিনারাই করতে পারছেন না। তাই তিনিই আপনার নাম করে আমাকে এখানে আসতে বলেছেন। তাঁরও ইচ্ছা,

আমাদেরও ইচ্ছা এবং বিনীত অনুরোধ, এই ব্যাপারে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনার ফিস্‌ যা লাগে অবশ্যই আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।

কিন্তু—

না মিঃ রায়, আপনার কোন আপত্তিই আমরা শুনব না। যেমন করে হোক এ মৃত্যু-রহস্যের কিনারা আপনাকে করে দিতেই হবে। আপনার সম্মতি না নিয়ে আমি উঠব না।

দেখুন মিঃ ঘোষ, তা হলে আপনাকে আমি খুলেই বলি। কেসটা হাতে নিতে আমার আপত্তি নেই যদি রাজা টিকেন্দ্রজিৎ—একটু থেমে কিরীটী কথাগুলো বললে।

ওঃ নিশ্চয়ই, হাজারবার। টিকেনের সম্মতিক্রমেই তো আমি এখানে এসেছি। এবং আমিই সঙ্গে করে আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেব।

বেশ। তবে আর দেরির প্রয়োজন নেই। আজ রাত্রে যদি যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তো আজই আমি যেতে প্রস্তুত আছি—

না, আজ আর হবে না। কাল আসাম মেলেই আমরা রওনা হব।

বেশ। তাই হবে।

অতঃপর তেজেশ বিদায় নিলেন।

ইতিমধ্যে রৌদ্র পড়ে গিয়েছিল। আমি ঘরের জানালাগুলো খুলে দিলাম।

জংলী ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করল। পশ্চাতে কৃষ্ণা। তার হাতে ট্রের উপরে নিজের হাতে তৈরি প্লাম কেক।

জংলীর হাত হতে ট্রে-টা ত্রিপয়ের উপরে নামিয়ে কাপে চা ঢালতে ঢালতে কৃষ্ণা বললে, কি এমন রাজকার্য নিয়ে মেতে উঠেছিলে বল তো? সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়, অথচ চায়ের তাড়া নেই! অন্যদিন যে সাড়ে তিনটে বাজতে না বাজতেই চায়ের তাগিদ আসে।

রাজকার্যই বটে। কাল আসাম মেলে বাইরে চলেছি। দিন-দশেকের মত বাইরে হয়তো থাকব। ব্যবস্থাটা একটু করে রেখো।—কিরীটী চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে এক টুকরো কেকে কামড় দিতে দিতে জবাব দেয়।

আসাম! হঠাৎ?

হঠাৎই বটে। সত্যান্বেষণের ব্যাপার।

আমিও তবে সঙ্গে যাব।

উঁহু। মনীষীরা বলে গিয়েছেন, পথে নারী বিবর্জিতা। অতএব হে নারী, তোমার তো যাওয়া হতে পারে না।

না, তাই বইকি! একা একা আমি এই কলকাতার গরমে সিদ্ধ হব আর ওনারা যাবেন আসাম—ওসব চলছে না!

ঠিক বলেছ বৌদি ভাই। তা চলবে না। তুমিও যাবে। বললাম আমি।

হ্যাঁ। একে মা মনসা, তার উপর দাও ধুনোর ধোঁয়া। কিরীটী বললে।

॥ দুই ॥

যাহোক শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য-কলহ না ঘটিয়েই এবং আসাম হতে প্রত্যাবর্তন করেই দার্জিলিং যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিরীটী ও আমি মোমিনপুর এসে পৌঁছলাম।

উত্তর ও পশ্চিমে অরণ্য ও দক্ষিণে পর্বত বেষ্টিত সত্যিই ছবির মত শহরটি। শহরটির উন্নতিকল্পে স্টেটের কোন কার্পণ্য নেই দেখলাম। চমৎকার রাস্তাঘাট। বাসিন্দাও কম নয়। আবহাওয়াও কলকাতা হতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। রাত্রের দিকে তো গায়ে কিছু না চাপা দিলে বেশ শীত-শীতই করে।

শহরের একেবারে এক প্রান্তে রাজবাড়ি। পূর্বপুরুষের আমলের সেকেলে প্রাসাদের অল্প দূরেই আধুনিক আমেরিকান স্ট্রাকচারে তৈরী নবনির্মিত রাজপ্রাসাদ। গেট পার হলেই নুড়িঢালা প্রশস্ত পথ একেবারে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দু পাশে মেহেদীর কেয়ারী, তাকে জড়িয়ে উঠেছে লাজনম্র বধূর মত মাধবীলতা।

দু পাশে বাগান। অজস্র দেশী-বিদেশী ফুলের বিচিত্র রঙীন সমাবেশ। এক পাশে টেনিস লন। অন্যদিকে আস্তাবল ও গ্যারেজ। ল্যাণ্ডো গাড়ি ওয়েলার অশ্বযুক্ত এবং দামী আমেরিকান কার দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া রাজা টিকেন্দ্রজিতের অশ্বচালনা-প্রীতির জন্য ভাল ভাল চার-পাঁচটি অশ্বও আছে। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। নিচের তলাতেই একটা প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কক্ষে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

স্টেশনে গাড়ি নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন রাজার পার্সোন্যাল সেক্রেটারী মণিময় গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলী মশাইয়ের বয়স পঞ্চাশের প্রায় কাছাকাছি। বলিষ্ঠ কর্মঠ পুরুষ। গত বারো বৎসর ধরে রাজা টিকেন্দ্রজিতের কাজে নিযুক্ত আছেন।

বেলা এগারটা নাগাদ আমরা প্রাসাদে পৌঁছেছিলাম। তিনি আমাদের বিশ্রামের ও আহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে এবং সর্বদা আমাদের আবশ্যকীয় ফাইফরমাস খাটবার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করে বিদায় নিলেন এবং ব্যারিস্টার ঘোষ সাহেবও ভিতরে চলে গেলেন।

আসবার পথেই ট্রেনে ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জমে ওঠে—চমৎকার অমায়িক সাদাসিধে লোক। মনের মধ্যে কোথাও ঘোর-প্যাঁচ নেই। উচ্চবংশের সন্তান। এবং এককালে অবস্থা খুব ভাল থাকলেও ইদানীং দুই পুরুষে অবস্থাটা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে।

তবে অতীতে অর্থের প্রাচুর্যে টানাটানি পড়লেও রূপের প্রাচুর্যে টানাটানি পড়ে নি। এবং সেই রূপের জোলুসেই তাঁর বোন এ ঘরে স্থান পেয়েছিলেন পুত্রবধূর মর্যাদায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বেশী দিন সেটাও সহ্য হল না। তেজেশের বিলাত যাবার যাবতীয় খরচ থেকে বা তাঁকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সমস্ত

খরচ এখনো ভগ্নীপতি টিকেন্দ্রজিৎই দিয়ে আসছেন।

টিকেন্দ্রজিৎ তেজেশকে নিজের সহোদর ভাইয়ের মতই স্নেহ করেন ও ভালবাসেন।

টিকেন্দ্রজিৎ লোকটি নিজেও উচ্চশিক্ষিত এবং অত্যন্ত আধুনিক মনোভাবাপন্ন। দানধ্যানও তাঁর প্রচুর। তাঁর অমায়িক দিলখোলা স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে যথেষ্ট ভালবাসে এবং তাঁর পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয় সকলেই বিশেষ দুঃখিত।

সমস্ত দ্বিপ্রহরটা একটানা বিশ্রাম নেওয়ার পর দুজন আমরা ঘরে বসে খোশগল্প করছি, রাজা টিকেন্দ্রজিতের খাসভৃত্য রামচন্দ্র এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল, রাজা সাহেব সেলাম দিয়েছেন আপনাদের !

আমরা আর দেরি না করে প্রস্তুত হয়ে নিলাম রাজদর্শনের জন্য।

দামী ইজিপসিয়ান কার্পেটে মোড়া চওড়া সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা ভৃত্যের পিছনে পিছনে দ্বিতলে উঠলাম। দীর্ঘ টানা একটা বারান্দা। বারান্দাটা আগাগোড়া ইটালিয়ান মার্বেল পাথরে মোড়া এবং রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে সুদৃশ্য জয়পুরী টবে টবে নানানজাতীয় পামট্রি বসানো। অন্য একধারে বিরাট এক খাঁচায় একঝাঁক মনুয়া পাখী কিচির-মিচির করছে। দাঁড়ে একটা লালমোহন। আমাদের বারান্দায় দেখেই লালমোহন পাখীটা বলে উঠল, কে রে ? কে ?

মৃদু হেসে আমরা এগিয়ে চললাম।

বারান্দার শেষপ্রান্তে ছাতে কাচের একটা ঘর। ঘরটাব ছাতে ফার্ন লতিয়ে লতিয়ে একটা সবুজের আচ্ছাদন দিয়েছে। সেই কাচের ঘরের দরজার ঝুলন্ত ভারী সবুজ বর্ণের পর্দাটার সামনে এসে রামচন্দ্র বললে, ভিতরে যান। রাজা সাহেব ভিতরেই আছেন।

পর্দা তুলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম।

চকচকে মসৃণ কালো মার্বেল পাথরের মেঝে। চারপাশে টবে নানাজাতীয় ফুলের গাছ ও পামট্রি। বেতের একটা টেবিল একধারে পাতা। এবং তার চারপাশে খান-চার-পাঁচ বেতের চেয়ার। তারই একটা অধিকার করে বসে আছেন মধ্যবয়সী এক পুরুষ। পরিধানে সাদা সিল্কের পায়জামা ও অনুরূপ একটি ঢিলেহাতা পাঞ্জাবি গায়ে। দেহের বর্ণ কালো হলেও কালোর উপরে অমন সুশ্রী নিখুঁত চেহারা সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ে না।

ব্যারিস্টার সাহেবের মুখেই শুনেছিলাম, রাজা টিকেন্দ্রজিতের বয়স চল্লিশের উর্ধ্বেই হবে। কিন্তু চেহারার চমৎকার বাঁধুনি দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশের উপরে নয় বুঝি। খাঁড়ার মত নাক। প্রশস্ত কপাল। চওড়া যুগ্ম রোমশ ভ্রূ। কোঁকড়ানো চুল ব্যাকব্রাশ করা। দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। চাপা ওষ্ঠ। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

রাজা সাহেবের পায়ের নীচে একটা রোমশ ককার-স্প্যানিয়াল পায়ের উপরে

মুখ গুঁজে বসে। এবং ডানপাশে বসে বোধ করি ডরোথি। গায়ের রঙ খুব কটা না হলেও বেশ ফর্সা। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। মুখখানা একটু লম্বাটে ধরনের। টানা পাতলা ভ্রূ। ছোট কপাল। নাকটা সামান্য একটু ভোঁতা। পটল-চেরা না হলেও চোখ দুটি সুন্দর, পিঙ্গল চক্ষুতারকা। ধারালো চিবুকের নীচে কালো একটি তিল। লিপস্টিক্-রঞ্জিত ওষ্ঠ দুটি পাতলা, সমস্ত চোখেমুখে একটা সংযত দৃঢ়বদ্ধ ভাব। পরিধানে বিলাতী বেশভূষা। রাজা সাহেবের অন্যদিকে বসে ব্যারিস্টার সাহেব।

আমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে ব্যারিস্টার সাহেবই আহ্বান জানালেন, আসুন মিঃ রায়।

এবং ব্যারিস্টার সাহেবই আমাদের রাজা টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি মিঃ কিরীটী রায়। মিঃ সুব্রত রায়, ওঁর সহকর্মী ও বন্ধু। রাজা বাহাদুর টিকেন্দ্রজিৎ বড়ুয়া। আর ইনি মিস্ ডরোথি জোন্স।

রাজা সাহেব হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

মিস্ ডরোথি জোন্স হাত বাড়িয়ে দিলেন, How do you do!

পরিচয়াদি, নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পালা সাঙ্গ হবার পর রাজা সাহেবেরই নির্দেশে আমরা দুজনে দুখানা খালি চেয়ার অধিকার করে বসলাম।

ইতিমধ্যে ভৃত্য ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম ও চায়ের আনুষঙ্গিক প্রচুর পরিমাণে এনে সামনের বেতের টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল। মিস্ ডরোথি সঙ্গে সঙ্গে উঠে প্লেটে কাপ সাজিয়ে চা তৈরী করতে লাগলেন। চা পানের সঙ্গে সঙ্গে মামুলী কথাবার্তা চলতে লাগল। দেখলাম রাজা সাহেব যেমন বিনয়ী তেমনি ধীর শান্ত। খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন। চা-পানের পর মিস ডরোথি জোন্স বিদায় নিলেন। রইলাম আমরা চারজন। টেবিলের উপরে সুদৃশ্য হাতির দাঁতের তৈরী একটা সিগারেট কেস ছিল। সেটা হাতে নিয়ে কেসটির ঢাকনা টিপে খুলে রাজা সাহেব সর্বপ্রথমে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন। কেস-ভর্তি ইজিপসিয়ান স্পেশ্যাল-ব্র্যাণ্ড সিগ্রেট।

কিরীটী নিজের সিগার-প্রীতির কথা জানিয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে মৃদু হেসে প্রত্যাখ্যান জানাল ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের সিগার কেসটি বের করল। আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, অভ্যাস নেই। দু-এক সময় কখনো-সখনো শখ করে এক-আধটা খাই।

অতঃপর রাজা সাহেব নিজে একটি নিয়ে শ্যালককে একটি দিলেন।

সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করে কয়েকটা মৃদু টান দিয়ে মৃদু কণ্ঠে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ বললেন, মিঃ রায়, তেজপুর মুখে সবই নিশ্চয় শুনেছেন—unexpected rude shock! কল্পনাতীত। এও বোধ হয় আপনি শুনেছেন, আমার স্ত্রী বহুদিন যাবৎ রুগ্ণা ও একেবারে শয্যাশায়ী। আমার চাইতে এই দুর্ঘটনার আঘাতটা তারই বেশী লেগেছে।

কথাগুলো বলতে বলতে রাজা টিকেন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন ভারী হয়ে এল। অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেন তিনি, মুখের পেশীগুলো ও চোয়ালটা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে ভাবাবেগ সংযত করবার প্রচেষ্টায়। টিকেন্দ্রজিৎ প্রাণপণে নিজেকে দমন করবার প্রয়াস পাচ্ছেন বোঝা গেল।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। ম্লান বিষণ্ণ বৈকালী ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে চারিধারে।

আবার কথা বললেন টিকেন্দ্রজিৎ, তেমনি সংযত মৃদু শান্ত কণ্ঠস্বর, এত বড় দুর্ভাগ্য যে আমার ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে উঠেছে সাতদিন আগেও আমি তা টের পাই নি মিঃ রায়। শিকারে যাবার দিন দুই আগে ওদের গভর্নেস মিস্ জোন্স অবিশ্যি আমায় বলেছিল, কিছুদিন ধরে বাচ্চাদের শরীর নাকি ভাল যাচ্ছে না। তাকে বলে গেলাম, স্টেটের ডাক্তার বংশীধরকে যেন একবার ডেকে ওদের দেখানো হয়।

দেখানো হয়েছিল ডাক্তার? প্রশ্ন করলে কিরীটী।

হ্যাঁ। পরে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, সে নাকি তাদের শরীরে বিশেষ কোন definite organic defects পায় নি, তবে—

কিরীটী প্রশ্ন করল, তবে?

বেশ একটু anaemia—রক্তাল্পতা ছিল। আর তখনই cyanosis-এর লক্ষণ নাকি ওদের দুজনেরই শরীরে একটু একটু প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু শরীরে ওদের cyanosis-এর কোন উপসর্গ খুঁজে না পাওয়ায় তখন ব্যাপারটা তেমন seriously নেয় নি—

আপনি বুঝি ঐ সময়ে শিকারে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। সাধারণতঃ এই সময়ে আমি শিকারে যাই না। কিন্তু কলকাতা হতে আমার এক বন্ধু এসেছিল। সে বিশেষ করে ধরায় শিকারে যেতে হয়েছিল। দিন-চারেক বাইরে ছিলাম। এমন সময়ে কুমাররা অসুস্থ হয়ে পড়ায় মিস্ জোন্স ও মণিময় আমার কাছে স্পেশাল মেসেনজার পাঠিয়ে দেয়। সংবাদ পেয়েই আর আমি দেরি করি নি। ঘোড়ায় চেপে ভোরনাগাদ ফিরে আসি। এসে দেখলাম কুমারদের অবস্থা খুবই খারাপ। সঙ্গে সঙ্গে গৌহাটিতে সিভিল সার্জেনকে কল দিই ও কলকাতায় তেজুকে তার করে দিই একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে অবিলম্বে চলে আসবার জন্য। বলতে বলতে টিকেন্দ্রজিৎ একটু আবার থামলেন। এবং অন্যমনস্ক হয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন কিছু ভাবছেন।

ঘটনাটা রাজা টিকেন্দ্রজিতের মনে বিশেষ দাগ কেটেছে। এবং বুঝতে পারছিলাম বলতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার টিকেন্দ্রজিৎ বলতে লাগলেন, ডাঃ বংশীধর ও সিভিল সার্জেন দুজনে সমস্তটা দিন ও সারাটা রাত ধরে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্ঘটনাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। সকাল নটা নাগাদ সব শেষ হয়ে গেল। তেজু ডাঃ সান্যালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল—তিনিই সব দেখে ও রোগ ও লক্ষণের ইতিহাস

শুনে সর্বপ্রথম মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনিই বললেন, কুমারদের মৃত্যুর ব্যাপারটা নাকি স্বাভাবিক নয়। সিভিল সার্জেনও তখন বললেন, গোড়া থেকে তাঁরও নাকি সেই রকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল মনে। তীব্র কোন বিষের ক্রিয়াতে মৃত্যু ঘটেছে। ডাঃ সান্ন্যাল ও সিভিল সার্জেনের পরামর্শমতই তখন আমি কতকটা বাধ্য হয়েই থানায় সংবাদ পাঠাই। দীননাথ ঝা সংবাদ পেয়েই এলেন। এবং মৃতদেহ দুটির ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হল' এবং শেষ পর্যন্ত ময়না তদন্তের দ্বারাই সব জানা গেল। বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু। Nitrobenzene is responsible for the death ! ময়না তদন্ত ও কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে যখন কুমারদের মৃত্যুর কারণ নাইট্রোবেনজিন বিষই ধার্য হয়েছে, তখন সে সম্পর্কে আর কারোই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না অবিশ্যি। এবং আমারও নেই মিঃ রায়। কিন্তু আমার বোধগম্যের বাইরে যেটা হচ্ছে, কি উপায়ে এবং কার দ্বারাই বা সেই ভয়ানক বিষ কুমারদের দেহে সংক্রামিত হল আর কেনই বা হল ! অথচ ভেবে দেখতে গেলে সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, কুমারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যারা ছিল তারা ছাড়া তো আর কেউই তাদের বিষপ্রয়োগ করতে পারে না। কারণ আমার কঠিন নির্দেশ ছিল কুমাররা যেন কখনো কোন কারণেই প্রাসাদের বাইরে না যায়। বিকালে একবার করে গাড়িতে চাপিয়ে কুমারদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হত—সঙ্গে থাকত ওদের প্রাইভেট টিউটার ধরণীধর চালিহা। তারই হেফাজতে থাকত কুমারেরা। কিন্তু ধরণীধরকে বলাই ছিল, কোথাও গাড়ি থামিয়ে যেন ওদের গাড়ি থেকে না নামতে দেওয়া হয়। এত সতর্ক আমি ছিলাম মিঃ রায়, বিশেষ করে ওদের মা অসুস্থ থাকায় সর্বদা ওদের উপরে আমার খুব বেশী সজাগ দৃষ্টি ছিল। তবু দেখুন, কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল !

ঐ বৈকালিক বেড়াবার সময় ছাড়া কুমাররা কি কখনো অন্দরমহল থেকে বের হত না ? প্রশ্ন করল কিরীটী।

না। ওদের থাকা খাওয়া শোওয়া খেলা পড়াশুনা করবার সমস্ত ব্যবস্থাই প্রাসাদের অন্দরে করে দিয়েছিলাম। ওদের পড়াশুনো খেলা খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা পর পর পাশাপাশি তিনটি ঘরে ছিল, ওদের মা যে ঘরে থাকেন একেবারে তারই পাশে।

কুমারদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিনটা আমাকে একবার বলবেন রাজা সাহেব ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

রাজা টিকেন্দ্রজিৎ ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বললেন, সকালে উঠে বেলা সাতটায় ওরা ধরণীর কাছে পড়তে যেত প্রাতঃস্নাশ শেষ করে। সাড়ে নটায় পড়া শেষ করে ওদের খেলাঘরে যেত খেলতে। ঐ সময় সঙ্গে থাকত মিস জোন্স। সকাল সাড়ে দশটায় স্নান সেরে আহারাদি করে বেলা বারোটা পর্যন্ত বিশ্রাম। বারোটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত, ওদের পড়বার ঘরের পাশেই একটা ছোট ঘরে লাইব্রেরী করে রেখেছিলাম, সেখানে বসে ওদের ইচ্ছামত পড়াশুনা করত বা ছবি আঁকত। দুটো

থেকে তিনটে পর্যন্ত থাকত ওদের মায়ের কাছে মায়ের ঘরে। তিনটে থেকে চারটের মধ্যে ওদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বৈকালিক জলখাবার খাওয়াত মিস্ জোন্স। সাড়ে চারটের সময় গাড়িতে চেপে ওদের টিউটার ধরণীর সঙ্গে বাইরে যেত বেড়াতে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ধরণীর কাছে পড়াশুনা করত। আটটায় খেয়ে শুতে যেত। শয়নের পর যতক্ষণ না তারা ঘুমাত, মিস্ জোন্স ওদের কাছেই থাকত।

আর একটা কথা, কুমারদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ এ বাড়ির মধ্যে কারা কারা ছিল ?

বললাম তো—আমি, আমার স্ত্রী, মিস্ জোন্স, টিউটার ধরণীধর চালিহা, ওদের পার্সোন্যাল চাকর মানিক ও ছোটবেলার দাইমা নলিনী।

কিছু যদি মনে না করেন তো আর একটা প্রশ্ন করি রাজা সাহেব!

বলুন ?

এই ধরণীবাবু, মিস্ জোন্স, মানিক ও নলিনী এরা কে কতদিন ধরে এই প্রাসাদে আছে ?

প্রকৃতপক্ষে নলিনী তো ওদের জন্মাবার সময় থেকেই দেখাশুনা করে আসছে। তা ধরুন ন বছর তো হবেই। মানিকও আছে তা প্রায় বছর সাতেক। আর মিস্ জোন্স এসেছেন আমার স্ত্রীর অসুস্থ হবার মাস কয়েক বাদে, তাও চার বছরের উপরে।

এদের মধ্যে কে কত মাইনে পেত ?

খোরাক পোশাক বাদে যতদূর জানি মানিক পঞ্চাশ টাকা, নলিনী একশ টাকা, ধরণী দেড়শ টাকা ও মিস্ জোন্স সাড়ে চারশ টাকা পান।

কিছু মনে করবেন না রাজা সাহেব, এদের মানে এই মানিক, নলিনী, ধরণীবাবু ও মিস্ ডরোথি জোন্স এদের মধ্যে কাউকে আপনার কোন রকম সন্দেহ হয় ?

কিরীটীর প্রশ্নে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ ওর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন যেন একসঙ্গে ফুটে ওঠে, আপনি কি এদেরই কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করেন মিঃ রায় ?

রাজার প্রশ্নে মৃদু হেসে কিরীটী অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে জবাবে বললে, দেখুন রাজা সাহেব, কথাটা ঠিক তা নয়—রহস্যোদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমাদের মন যতক্ষণ না একটা স্থির মীমাংসায় পৌঁছয়, অকুস্থানের আশেপাশে যারা ছিল বা থাকে তাদের প্রত্যেকের উপরেই ততক্ষণ সন্দেহ আসে, তাদের স্বভাবচরিত্র, গতিবিধি সব কিছুই আমাদের জানবার প্রয়োজন হয়। অবিশ্যি তার মানে এও নয় যে, সন্দেহ কাউকে করছি বলেই সত্যিকারের সে দোষী হবে।

রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, না, আমার কারো উপরেই সন্দেহ হয় না। আর হবেই বা কেন বলুন! কুমারদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করবার ওদের চারজনের কার কি এমন স্বার্থ থাকতে পারে ? আপনারা বলেন

মোটিভ্ ছাড়া হত্যা হয় না, কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, ওদের কারো কোন মোটিভ্ থাকতে পারে!

একদিক দিয়ে অবিশ্যি আপনার কথা আমি অস্বীকার করতে পারছি না। তবে এমন কথাও আপনি জোর করে বলতে পারেন না যে, সত্যি-সত্যিই ওদের চারজনের কারো কোন মোটিভই থাকতে পারে না এ ব্যাপারে। কার স্বার্থ যে কিসে এবং এ জগতে মানুষ কে যে কী জন্য কি করে বা করতে না পারে এ বোঝা সত্যিই কঠিন। কিন্তু সে কথা যাক, এ ব্যাপারে অর্থাৎ এদের মধ্যে চারজনের কাউকে সন্দেহের ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর মানে রাণী সাহেবারও মতামত কি তাই?

একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে অতঃপর রাজা সাহেব বললেন, সুনন্দার কথা আমি বলতে পারি না মিঃ রায়, তবে আমার মনে হয় আমার সঙ্গে সে দ্বিমত হবে না।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে রাখি, যদি আমার প্রয়োজন হয় এবং আপনার স্ত্রীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হয়, তা হলে আপনার কোন অমত হবে না তো?

নিশ্চয়ই না। তা ছাড়া সুনন্দা জানে যে আপনারা এই ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য প্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। তেজুই তাকে জানিয়েছে। রাজা সাহেব বললেন।

কথা বললেন এবারে ব্যারিস্টার তেজেশ, হ্যাঁ, নন্দাকে বলেছি আমি আগেই আপনাদের কথা।

তিনি কি বললেন?

হ্যাঁ বা না কিছু বলে নি বটে, তবে তার যে খুব বেশী অমত নেই তা বোঝা গেল। ব্যারিস্টার তেজেশ জবাব দিলেন।

কিরীটীই এবারে ব্যারিস্টার সাহেবকে প্রশ্নটা করলে, কিসে বুঝলেন সে কথা?

মৃদু হেসে ব্যারিস্টার জবাব দিলেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন মিঃ রায়, নন্দা তাদের মা! এত বড় নৃশংস ব্যাপারকে কি সে অত সহজেই ক্ষমা করতে পারে?

জবাবে কিরীটী মৃদু হাসল মাত্র। কোন জবাব দিল না।

এমন সময় রাজভৃত্য রামচন্দ্র এসে কক্ষের আলো জ্বালিয়ে দিল। প্রাসাদে রাজার নিজস্ব ডায়নামোতে সর্বত্র বিজলী আলোর ব্যবস্থা।

ইতিমধ্যে কখন একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল টেরই পাই নি। আলো আসায় তবে খেয়াল হল।

রামচন্দ্র রাজার সামনে এসে বলল, মহারাজ, মেমসাহেব বললেন আপনার সন্ধ্যা-গোসলের সময় হয়ে গিয়েছে।

রামচন্দ্রের কথায় রাজা উঠে পড়ে বললেন, উঃ, সত্যি! সাড়ে ছটা বেজে গিয়েছে। আপনারা কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম আমার দু বেলাই স্নান করা অভ্যাস।

হ্যাঁ, হ্যাঁ! নিশ্চয়। যান আপনি।

রাজা যেতে যেতে বললেন, তেজু রইল। আপনাদের যা কিছু প্রয়োজন মিঃ রায়, তেজুকে বললেই ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।

টিকেন্দ্রজিৎ অতঃপর কক্ষ হতে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ আবার স্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ কথা বললেন তেজেশ, সত্যি মিঃ রায়, ডরোথির ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারব না। এই এত বড় শোকের সময় ডরোথি যদি টিকেনের পাশে পাশে না থাকত, ও বোধ হয় পাগল হয়ে যেত। শুধু কি টিকেনের দিকেই ওর নজর, নন্দার দিকেও ওর সদা-সতর্কের অভাব নেই।

কিরীটী ওষ্ঠধৃত নিভে-যাওয়া সিগারটায় পুনঃ অগ্নিসংযোগে ব্যস্ত ছিল। মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পেলাম। রাজা টিকেন্দ্রজিতের ব্যাপারে মিস্ জোন্স একটু বিশেষই মনোযোগী।

শেষের কথাগুলো অন্যের অশ্রুতভাবে মৃদুচ্চারিত হলেও আমার কানে প্রবেশ করেছিল। আমি বারেকের জন্য চমকে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু তার পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখের রেখার কোন পরিবর্তনই আমার চোখে পড়ল না।

কথায় কথায় ব্যারিস্টার তেজেশ আবার বলছিলেন, বিবাহের পর বছর পাঁচেক নন্দা আর টিকেনকে দেখে মনে হত পৃথিবীতে টিকেন ও নন্দার মত এমন happy pair বুঝি হয় না। কি আমুদেই না ওরা ছিল! আর কি হইচই-ই না করত! কিন্তু সব কিছু যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ নন্দা অসুস্থ হয়ে পড়ায়। ওর মুখের হাসি যেন একেবারে ব্লটিং পেপার দিয়ে চিরদিনের মত কে শুষে নিল! টিকেনের সে-সময়কার দিনগুলোর কথা এখনো আমার মনে আছে। How wretched he looked! তার পর ডরোথি এসে একটু একটু করে আবার টিকেনের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে।

এতে—মানে রাজা সাহেবের এই পরিবর্তনে আপনার বোন সুনন্দা দেবী নিশ্চয় সুখী হয়েছেন খুব? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করল আচম্‌কা যেন।

অ্যাঁ! হ্যাঁ, তা—তা হয়েছে বৈকি। আগে তো টিকেন সর্বদাই নন্দার কাছে কাছে তার রোগশয্যার আশেপাশে থাকত, এখন তবু আবার কিছুদিন থেকে বাইরে একটু-আধটু বের হয়।

অসুবিধা না হলে চলুন না একবার রাণী সাহেবার সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি, মিঃ ঘোষ!

যাবেন? বেশ তো। একটু তা হলে অপেক্ষা করুন আপনারা। আমি আগে একটা খবর দিয়ে আসি—

তাই যান।

ব্যারিস্টার তেজেশ চলে গেলেন সংবাদ দিতে।

ঘরের মধ্যে আমি আর কিরীটী দুজনে মুখোমুখি।

হঠাৎ কিরীটী আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, বিক্রম-উর্বশী নাটকটা পড়েছিস সুব্রত ? মহাকবি কালিদাসের লেখা ?

হ্যাঁ। জবাব দিলাম।

কিন্তু আমাদের রাণী সাহেবার নিশ্চয়ই পড়া নেই !

না থাকাই সম্ভব । কিন্তু ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পারছিস ?

কিছু কিছু—তবে বিবৃতি-দান মোলাকাতের পর—

তার পর একটু হেসে বললে, চল তো পুরূরবা মহিষীর সঙ্গে আগে একবার সাক্ষাৎকার করে আসা যাক ! তাতে করে উর্বশীর সম্পর্কে মনোভাবটা কি যদি জানা যায় !

আমি হেসে ফেলি।

কিরীটী প্রশ্ন করে, হাসছিস যে ?

কিন্তু এ নাটকে দৈত্যরাজটি কে ? প্রশ্ন করলাম।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। কিন্তু চুপ, ব্যারিস্টার সাহেব ! বোধ হয় এই দিকেই আসছেন !

সত্যিই বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল, এই দিকেই আসছেন।

॥ তিন ॥

কিরীটীর কথাই ঠিক ।

ব্যারিস্টার তেজেশ এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন, চলুন মিঃ রায় !

বিরাট প্রাসাদ। দীর্ঘ টানা দুটি বারান্দা অতিক্রম করে আমরা ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে রাণী সুনন্দার কক্ষের দ্বারে এসে পেঁছিলাম। ভারী দামী ডিপ সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে দ্বারে।

পর্দা তুলে তেজেশ সর্বাগ্রে কক্ষে প্রবেশ করলেন, পশ্চাতে আমরা প্রবেশ করলাম।

বেশ প্রশস্ত কক্ষ। দেওয়াল ডিস্‌টেম্পার করা, ফিকে সবুজ রঙ। কক্ষের মধ্যে আসবাবপত্রের বিশেষ কোন বাহুল্য না থাকলেও সম্পদ, রুচি ও আভিজাত্যের একটা অতীব পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। একটি ডবল খাটের উপরে পরিচ্ছন্ন শ্বেতশুভ্র শয্যায় উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া ও আধবসা অবস্থায় রয়েছেন রাণী সুনন্দা।

কোমর পর্যন্ত দামী মেরুন রঙের পশমের একটা সূচীর কাজ করা চাদরে ঢাকা। খাটের পাশেই পাশাপাশি দুটি শ্বেতপাথরের টেবিল। একটি টেবিলের উপরে সুদৃশ্য একটি টাইমপিস্‌ ও সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। তারই নীচে একটি ফটো-স্ট্যাণ্ডে বাঁধানো দুটি সুকুমার কিশোরের ফটো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

অন্য টেবিলটির উপর খানকয়েক ইংরাজী বাংলা বই। ছোট একটি সুদৃশ্য দামী রেডিও সেট ও কয়েকটি ঔষধের শিশি। ঘরের দেওয়াল সম্পূর্ণ নিরাভরণ।

একটি ক্যালেণ্ডার বা একটি ছবি পর্যন্ত নেই।

ঘরের মেঝেটি সুন্দর। চক্‌চকে মসৃণ সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী। টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলোয় ঘরের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে।

ঘরে ঢুকতেই একটা মৃদু কস্তুরীর সৌরভ নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করেছিল। কোথা হতে আসছে মিষ্টি গন্ধটি? এদিক ওদিক তাকাতে উপরের দিকে নজর পড়ল —সিলিং হতে ঝুলন্ত সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত একটি রৌপ্যনির্মিত ধূপাধার।

কস্তুরী ধূপের গন্ধ সেখান হতেই ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিন-চারটি জানালা ঘরের—যদিও প্রত্যেকটি খোলা। তবে সূক্ষ্ম নেটের পর্দা খাটানো প্রতি জানালায়।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে রাণী সুনন্দাই হাত দুটি তুলে নমস্কার জানালেন ক্লান্ত মৃদু কণ্ঠে, আসুন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভৃত্য তিনটি চেয়ার এনে রাণীর শয্যার পাশে রেখে চলে গেল।

রাণী আবার বললেন, বসুন।

তিনটি চেয়ার অধিকার করে আমরা তিনজনে বসলাম।

রাণী সুনন্দার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

জীবনে বহু সুন্দর রমণী চোখে পড়েছে, কিন্তু এমনটি যেন আর পূর্বে দেখি নি। শুধু সুন্দর নয়, আশ্চর্য—অপূর্ব!

কোমর হতে দেহের ঊর্ধ্বাংশ যতটুকু নিরাবরণ, চাদরে আবৃত নয় এবং চোখে পড়ছিল, সে অংশের সমস্তটুকু অপূর্ব নিখুঁত।

গায়ের রঙ হয়তো এককালে খুবই ফর্সা ছিল, দীর্ঘদিন শয্যাশায়িনী থেকে ও রোগে ভুগে ভুগে একটু ফ্যাকাশে ও রক্তশূন্য মনে হয়।

লম্বাটে ধরনের মুখখানি। সুচারু কপাল। সুচারু যুগ্ম ভ্রূ। যেমন সুন্দর নাক তেমনি সুন্দর চক্ষু দুটি ও পাতলা ফুলের পাপড়ির মত ওষ্ঠ। চূর্ণ কয়েক-গাছি কুন্তল স্থানভ্রষ্ট হয়ে কপোল ও কপালের উপরে লতিয়ে আছে যেন। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় একটা গভীর ক্লান্তি ও যাতনার চিহ্ন যেন মুখের রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্লথ দুটি হাত বুকের কাছে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। চারু মণিবন্ধে দুগাছি করে মাত্র সোনার চুড়ি। গলায় সরু একটি বিছেহার মাত্র। এবং কানে দুটি নীলা পাথর, আলোয় যেন সাপের চোখের মত চিকচিক করছে। শরীরের আর কোথাও অলঙ্কারের কোন বাহুল্য মাত্র নেই।

নন্দা পরিচয় করিয়ে দিই, মিঃ কিরীটী রায় ও ওঁরই বন্ধু সুব্রত রায়।

আমরা পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার জানালাম।

ভাবছিলাম কিরীটী কি ভাবে তার কথারম্ভ করবে!

কিন্তু কিরীটীকে কথা আরম্ভ করতে হল না, শুরু করলেন ব্যারিস্টার

সাহেবই।

যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে নন্দা, ভেবে আর কি হবে? কিন্তু যে এত বড় সর্বনাশ আমাদের করে গেল, তাকে যদি শাস্তি না দিই তো রুণু-বেণুর আত্মা শান্তি পাবে না।

রাণী সুনন্দা চুপ করে রইলেন। ভাইয়ের কথায় কোন জবাব দিলেন না।

দেখুন রাণীসাহেবা, এ ব্যাপারে হাত দেবার আগে আপনার মতামতটাই সর্বাগ্রে আমার প্রয়োজন। অবশ্যই জানবেন, আপনার মত না থাকলে আমি কালই ফিরে যাব।

কিরীটীর কথায় চকিতে মুখ তুলে রাণী সুনন্দা ওর মুখের দিকে তাকালেন।

পারবেন আপনি মিঃ রায়? প্রশ্ন করলেন রাণীসাহেবা যেন হঠাৎই।

পারব আশা করি।

তবে চেষ্টা করুন।

আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি রাণীসাহেবা। তথাপি কয়েকটা প্রশ্ন না করে আমি পারছি না।

এবারে কিরীটী হঠাৎ ব্যারিস্টার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, মিঃ ঘোষ, যদি মনে কিছু না করেন তো আমার ইচ্ছা রাণীসাহেবাকে আলাদা ভাবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

ও নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি বাইরেই আছি নন্দা।

ব্যারিস্টার তেজেস কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সুনন্দা দেবী, সত্যি করে বলুন তো আমায়—এখানে কেউ নেই, আপনার প্রিয়তম পুত্রদের হত্যার ব্যাপারে আপনি কাউকে কি সন্দেহ করেন!

কিরীটীর প্রশ্নে আচমকা রাণী সুনন্দা কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর শান্ত বিষণ্ণ চোখ দুটি যেন সহসা ধারালো ছুরির ফলার মত ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে। সমগ্র মুখখানার মধ্যে একটা রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। স্থির অপলক দৃষ্টিতে রাণী কিছুক্ষণ কিরীটীর চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন।

বলুন কারো উপরে যদি এতটুকুও আপনার সন্দেহ থাকে! যদিও এখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই, তবু জানবেন আমি ও সুব্রত ছাড়া একথা জগতে আর কেউ জানতে পারবে না। এমন কি কথা দিচ্ছি, আপনার স্বামী রাজা টিকেন্দ্রজিৎ জানতে পারবেন না আপনি যদি ইচ্ছা করেন।

কিন্তু রাণী সুনন্দা নির্বাক। স্তব্ধ। স্থিরনিশ্চল যেন একটি পাষাণ-মূর্তি। দেখতে দেখতে রাণী সুনন্দার প্রখর ধারালো ছুরির ফলার মত দৃষ্টি ক্রমে যেন ঝিমিয়ে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে এল। মুখের রক্তোচ্ছ্বাস নিভে গেল। আবার সেই রুগ্ন ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখ।

ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বললেন, কাকে আর সন্দেহ করব মিঃ রায়! সবই আমার দুর্ভাগ্যের দোষ। নইলে এমন অঘটনই বা ঘটবে কেন? রুণু-বেণুকে এমন করেই

বা আমাকে হারাতে হবে কেন ?

বলতে বলতে রাণী সুনন্দার কণ্ঠস্বর কান্নায় জড়িয়ে এল। চোখের কোল বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু নেমে এল।

আচ্ছা আপনার স্বামী নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালবাসেন, না ? অন্তত সেই রকমই শুনেছি। একসময় আবার কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, বোধ হয় ভালবাসেন।

বোধ হয় কেন বলছেন ?

সত্যিই এ অভাগীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট দয়া।

কিরীটীর তো নয়ই—আমারও বুঝতে কষ্ট হয় না, সম্মুখে অর্ধশয়নের ভঙ্গীতে উপবিষ্ট পঙ্গু নারীর বুকে কোথায় ব্যথা।

আচ্ছা একটা কথা, আপনার ইচ্ছাক্রমেই তো আপনার ছেলেদের সর্বদা দেখা-শুনা ও যত্ন নেবার জন্য মিস্ ডরোথি জোন্সকে এখানে আনা হয়েছিল ?

হ্যাঁ। তাই বোধ হয় ডাইনীর নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসেই রুণু-বেণু আমার অকালে ঝরে গেল। বলবেন না—বলবেন না আর ওর কথা ! রাণী সুনন্দা যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ডরোথি জোন্সকে আপনার পছন্দ নয় বুঝতে পারছি—

জানেন মিঃ রায়, ও যাদু জানে ! আমার স্বামীকেও যাদু করেছে। ছেলে দুটোকেও আমার যাদু করেছিল। যে রুণু-বেণু দিনে দশবার করে আগে আমার ঘরে ছুটে ছুটে আসত, গত এক বৎসর ধরে ওরা এ ঘরের ছায়াও মাড়াত না।

সে হয়তো অসুস্থ আপনি, বিরক্ত হবেন, তাই আপনার কাছে ঘন ঘন তারা আসত না !

না না, আমি ঠিক জানি—ঐ ডাইনীই বারণ করে দিয়েছিল নিশ্চয়ই।

মিস ডরোথিকে আপনি সেকথা জিজ্ঞাসা করেন নি কেন ?

জিজ্ঞাসা করব কি, ও শয়তানীকে কোন কথা বলা যায় ! ওই ডাইনী—রাণী সুনন্দার কথা শেষ হল না, আচমকা ঘরের মধ্যে হাতে একটা গ্লাস নিয়ে প্রবেশ করল ডরোথি জোন্স !

রাণীর চোখের দৃষ্টি খোলা দরজা বরাবর ছিল। ডরোথিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই রাণী যেন হঠাৎ বদলে গেলেন। তাঁর মুখের চেহারা, মায় তাঁর কণ্ঠস্বর পর্যন্ত। অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে বললেন, ডরোথি এসো।

তোমার হরলিক্স খাবার সময় হয়েছে রাণী।

পরস্পরের মধ্যে ইংরাজীতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। দেখলাম রাণী চমৎকার ইংরাজী বলতে পারেন।

না, হরলিক্স এখন আমি খেতে পারব না।

তাই কি হয় ? শরীর তা হলে টিকবে কি করে ?

না, না।

খেয়ে নাও দেখি লক্ষ্মী মেয়ের মত। ছিঃ, দুষ্টুমি করে না!

রাণী এবারে হাত বাড়িয়ে ডরোথির কাছ হতে গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে হরলিক্সটা সব খেয়ে নিলেন।

ডরোথি সযত্নে ন্যাপকিন দিয়ে রাণীর মুখ মুছিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই আবার নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। আমরা যে দুটি প্রাণী ঘরের মধ্যে আছি, সেদিকে তাকাবার বা দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন মাত্রও যেন বোধ করলে না।

আশ্চর্য! ডরোথির কক্ষত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাণীর চোখে-মুখে আবার সেই বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা যেন রুক্ষভাবে ফুটে উঠল। অথচ ঐ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব মুহূর্তে যেন উবে গিয়েছিল ডরোথির এই কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কেন?

ডরোথির কক্ষত্যাগের পরও কিছুক্ষণ কারো মুখেই কোন কথা থাকে না। কক্ষের মধ্যে একটা বিশ্রী স্তব্ধতা যেন আমাদের ঘিরে ধরেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙল রাণীর কণ্ঠস্বরে:

দেখলেন তো মিঃ রায়, গায়ে পড়ে কিভাবে স্নেহ জানাতে আসে! দু'চক্ষের বিষ আমার!

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, পছন্দ যখন করেন না মিস্ জোন্সকে, বরখাস্ত করলেই তো পারেন। আর তা ছাড়া যেজন্য ওঁকে এখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারও তো আর কোন প্রয়োজন নেই।

বরখাস্ত! হুঁ, এ হয়েছে আমার যেন সাপের ছুঁচো গেলা। গিলতেও পারছি না, ওগরাতেও পারছি না।

কেন বলুন তো?

আর কেন! বলতে লজ্জায় আমার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার অমন দেবতার মত স্বামী, ডাইনীর খপ্পরে পড়ে একেবারে সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে।

আপনার কথা কি তিনি আর আজকাল শোনেন না?

না না—তা কেন, শোনেন বৈকি—

তবে?

কেমন করে এ কথা তাঁর কাছে বলব বলতে পারেন? আমিও তো মেয়েমানুষ। পাঁচ বছর ধরে এইভাবে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছি। চোখের উপরেই তো দেখেছি কি ভাবে দিনের পর দিন লোকটা তার জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ বাদ দিয়ে আমার শয্যার পাশে পাশে থেকেছে। সদা সতর্ক দৃষ্টি—কেমন করে আমায় সুখে রাখবে, কেমন করে আমাকে প্রফুল্ল রাখবে। অমন আমুদে হাসি-খুশি লোকটা আমার পাশে পাশে সর্বদা থেকে হাসতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। স্ত্রী হয়ে কেমন করে তা সহ্য করি বলুন? মিস্ জোন্স এখানে আসবার পর থেকে

আবার ওর মুখে হাসি ফুটেছে। তাই—তাই মিঃ রায় সব বুঝেও কিছু বলতে আমি পারি না। স্বার্থপরতার এত বড় আঘাত হানতে আমি পারি না। এ যে কি যন্ত্রণা আমার বুঝবেন না, পুরুষ আপনারা বুঝবেন না! বুক ভেঙে যায়, তবু— তবু মুখ বুজে থাকি। কান্নায় রাণী সুনন্দা একেবারে যেন ভেঙে পড়েন।

নির্বাক আমরা দুজনে বসে থাকি। কি-ই বা বলতে পারি! আর বলবার কি-ই বা আছে!

এইটুকুই বুঝতে পারি, কি মর্মান্তিক যাতনায় সম্মুখে উপবিষ্টা এই নারীর বুকের ভিতরটা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে নিশিদিন।

অঞ্চলে চোখের জল মুছে রাণী আবার বলতে লাগলেন, অথচ একথা স্বীকার না করলেও পাপের অবধি থাকবে না যে, ও কি স্নেহে কি যত্নে সর্বক্ষণ আমার রুণু-বেণুকে ঘিরে রাখত! পঙ্গু অসুস্থ মায়ের অভাব কি ভাবে ওদের মিটিয়েছে ও!

আচ্ছা সুনন্দা দেবী, আপনি কি কখনও--ক্ষমা করবেন কথাটার জন্য, মিস্ জোন্সের প্রতি আপনার স্বামীর কোন বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন?

না। সত্যিই বলব, কোন দিন কারো সম্পর্কে কিছু কারো কাছ হতে শুনিও নি দেখিও নি। কিন্তু তা হলে কি হবে! আমার স্বামীর মুখের প্রতিটি রেখার সঙ্গে যে আমি পরিচিত। কোন দিন মুখে কিছু না বললেও এবং কোন দিন হাবেভাবে কিছু প্রকাশ না পেলেও ঐ মুখের দিকে তাকালেই যে আমি সব কিছু টের পাই—

সে তো আপনার মনের ভুলও হতে পারে?

ভুল! আপনি পুরুষমানুষ মিঃ রায়, অন্যথায় নারী হলে বুঝতেন, যেখানে সত্যিকারের ভালবাসা আছে সেখানে নারী বিশেষ করে স্ত্রী তার স্বামীর মুখের দিকে তাকালেই সব কিছু বুঝতে পারে। গোপন কিছুই সেখানে থাকে না। আয়নার মতই সব কিছু সেখানে পরিষ্কার হয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। ফাঁকি সেখানে চলে না।

এবারে কিরীটী সোজাসুজিই একেবারে প্রশ্ন করল, আপনি কি তা হলে আপনার সন্তানদের মৃত্যুর ব্যাপারে মিস্ জোন্সকে সন্দেহ করেন রাণীসাহেবা?

একটা আর্ত চীৎকারে রাণী প্রতিবাদ জানালেন, না, না—মেয়েমানুষ হয়ে সে এ কাজ করতে পারে না!

এইটাই কি আপনার মনের সত্য কথা বলে জানব সুনন্দা দেবী—তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কিরীটীর।

নিশ্চয়ই। হাজার হোক গত চার বছর ধরে সন্তানের মতই তো ডরোথি রুণু ও বেণুকে পালন করেছে। না, না—তা কি করে হবে? তা হতে পারে না। তা হতে পারে না। না, না—। শেষের দিকে মনে হল রাণী সুনন্দা যেন কতকটা নিজেকেই স্তোক দিচ্ছেন।

আচ্ছা। তা হলে আমরা উঠি রাণীসাহেবা—

অতঃপর নমস্কার জানিয়ে আমরা কক্ষ হতে বের হয়ে এলাম।

বাইরের বারান্দায় পা দিতেই দেখি ব্যারিস্টার সাহেব বারান্দায় একটা বেতের হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে ধূমপান করছেন নিঃশব্দে একাকী। আমাদের ফিরতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

নন্দার সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তা হল মিঃ রায় ?

হ্যাঁ। চলুন—আমাদের নীচে পেঁছে দেবেন।

চলুন। এদিকে আবার থানা থেকে সংবাদ পেয়ে আপনার বন্ধু দীননাথ ঝা এসে অপেক্ষা করছেন—

দীননাথ এসেছে ? চলুন ! চলুন !

চেহারায় আদব-কায়দায় ও কথায়বার্তায় শ্রীযুক্ত দীননাথ ঝা একেবারে পুরোপুরি একজন আদি ও অকৃত্রিম পুলিস অফিসার।

মোটাসোটা ভারিক্কী প্যাটার্নের মেদবহুল চেহারা। এবং ওষ্ঠোপরি একজোড়া পাকানো পুরুষ্ট গোঁফই নয়, কানে রোমপ্রাচুর্য দেখেই বোঝা যায় দেহেও রোমের অভাব নেই। ছোট ছোট ক্ষুদে গোল গোল চক্ষু। অত্যধিক ধূমপানের ফলে পুরু ওষ্ঠযুগল কালীবর্ণ ধারণ করেছে এবং তার মধ্যে মধ্যে লিউকোডারমার সাদা দাগ। নাকটা একটু ভোঁতা। দৃঢ়বদ্ধ চৌকো চোয়াল।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই সোল্লাসে আহ্বান জানালেন দীননাথ ঝা, কিরীটী যে, কেমন আছিস ?

ভাল। তার পর, তোর কি সংবাদ বল্ ?

এই কেটে যাচ্ছে একরকম। শালার পুলিসের চাকরির মুখে ঝাঁটা মার—তা এঁকে তো চিনতে পারছি না !

আমার বন্ধু সুব্রত।

নমস্কার সুব্রতবাবু—মনে কিছু করবেন না যেন আমার কথাবার্তা শুনে !

হাসতে হাসতে জবাব দিলাম, না, কি আর মনে করব !

কিরীটীর স্কুল-জীবনের সবটাই ও কলেজে বি. এস-সি পর্যন্ত দীননাথ সহাধ্যায়ী ছিল। বি. এস-সি পাস করে মামার জোরে পুলিস লাইনে ঢুকে পড়ে দীননাথ।

যা হোক প্রাথমিক আলাপাদি সমাপ্ত হবার পর দীননাথ কিরীটীকে বললেন, যাক্, এবারে আসল কথায় আসা যাক্। এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল ?

প্রাথমিকটা হয়েছে। মোটামুটি ব্যাপারটা জানলাম। এখন তোর মুখ থেকে শুনতে চাই। কিরীটী বললে।

There is nothing much to add ! আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড রহস্য। জানিস তো আমার কি খুঁতখুঁতে মন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব

দেখেছি। সব খোঁজ নিয়েছি। যদিও বুঝতে পারছি একেবারে পরিষ্কার ভাবে এটা একটা deliberate murder case—তবু যেন কোন কাউকে ধরতে ছুঁতে পারছি না। বাড়ির প্রত্যেকেরই alibi আছে। জব্বর মার্ডার কেস বাবা! কি ভাবে যে poison করল, ব্যাপারটা যেন সমস্ত বুদ্ধির অগোচর। আর বিষও যোগাড় করেছে বটে মোক্ষম। একেবারে নাইট্রোবেনজিন। পেলেই বা কোথায়, কি ভাবেই বা শরীরে প্রবেশ করালে—আগাগোড়া সবটাই যেন একটা মিস্ট্রি।

স্টম্যাক কনটেন্টের অ্যানালিসিস করা হয়েছিল? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হুঁ! সেখানেও ঢুঁ ঢুঁ। রোগের দু দিন যখন বাড়াবাড়ি তখন তো স্রেফ লিকুইড ডায়েটেই ছিল, so nothing abnormal detected in the stomach content! কেবল রক্তে ও টিসুতে নাইট্রোবেনজিনের absorbtion-এর signs পাওয়া যেতেই না বোঝা গেল—it's a case of nitrobenzene poisoning!

শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন বা স্কার বা অ্যাব্রেসন ছিল?

কিছু না—কিছু না। তবে আর বলছি কি বাবা! স্রেফ একেবারে গোলক-ধাঁধায় ফেলেছে। এই দেখ না, মৃতদেহের আটটা-দশটা ফটোগ্রাফ পর্যন্ত রেখে দিয়েছি—see! পকেট হতে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন কিরীটীর দিকে দীননাথ ঝা কথা বলতে বলতে আগ্রহ সহকারে।

খামটা হাতে নিয়ে খামের ভিতর হতে কিরীটী টেনে বের করলে আট-দশটা postcard size-এর ফটো। একেবারে সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহের নানা ভঙ্গীর ফটো মৃত কুমারদের।

কে তুলেছে রে এই ফটো দীনু? কিরীটী ফটোগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করে একসময়।

কে আবার, এই শর্মা!

একটার পর একটা ফটোগুলো হাতে নিয়ে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে কিরীটী বেশ কিছুক্ষণ ধরে, তার পরেই ওর মধ্যে একটা ফটো আরো মনোযোগ সহকারে চোখের সামনে দেখতে দেখতে বলে, হুঁ, ফটো তুলতে তুই শিখেছিস দেখছি! পায়ের পাতার মার্জিনে চওড়া ওটা কিসের দাগ পড়েছে রে দীনু? যদিও দাগটা খুব faint, মনে হচ্ছে, just a light shade—

কই দেখি! এগিয়ে আসেন দীননাথ।

এই দেখ—, কিরীটী ফটোটা এগিয়ে ধরে দীননাথের সামনে নির্দিষ্ট জায়গাটায় আঙুল দিয়ে দেখাল।

হুঁ, মনে পড়েছে। পায়ে আলতা পরবার মত দুই কুমারেরই পায়ের পাতার মার্জিনে ও আঙুলের উপরে একটা করে ব্রাউন রঙের দাগ ছিল। গায়ের রঙ খুব ফর্সা থাকায় খুব আবছা ছিল যদিও—আমার ক্যামেরার লেন্সটা খুব powerful থাকায় সেটাও দেখছি উঠেছে!

হুঁ, পায়ের পাতার মার্জিনে ও আঙুলের উপরে ব্রাউন রঙের একটা ছোপ। কতকটা আত্মগত ভাবেই কথাটা বলে যেন কিরীটী আপন মনের চিন্তার মধ্যে ডুব দেয়।

এই ফটোগুলো আপাতত আমার কাছে থাক। আপত্তি আছে নাকি তোর ?

আপত্তি ! বিন্দুমাত্র নয়। তোর জন্যেই তো ফটোগুলো তুলে রেখেছি।

খুব বিবেচনার কাজ করেছিস দীনু। এখন বল্ তোর জবানীতে কেসটা সম্পর্কে—in details !

॥ চার ॥

তোকে তো আগেই বলেছি কিরীটী, বলতে শুরু করেন দীননাথ ঝা, কুমারদের মৃত্যুর ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি মিস্টিরিয়াস। মাত্র দিন দুই-তিন ভুগে ছেলে দুটো gradually একটু করে sink করে যেন মারা গেল। রোগী দেখে এখানকার ডাক্তার ও গৌহাটির সিভিল সার্জেন তো ধরতেই পারলে না কি কারণে ঐ ধরনের sign symptoms হচ্ছে ! এদিকে কলকাতা হতে ডাক্তার সান্ন্যাল এসে পৌঁছবার পূর্বেই সব শেষ হয়ে গেল। এবং ডাক্তার সান্ন্যালই মৃতদেহ দেখে first suspected some foul-play ! পড়ল আমার ডাক। আমি এখানে এসে প্রথমেই এখানকার সব লোকগুলোর একটা survey করে ফেললাম—হত্যাকারীর list-এ তাদের মধ্যে কারা কারা পড়তে পারে ! ১নং মিস্ ডুরোথি জোন্স্। ২নং কুমারদের পুরাতন ভৃত্য মানিকলাল। নাম্বার থ্রি—ওদের দাইমা নলিনী। যদিও ফার-ফেচেড—নাম্বার ফোর—ওদের গার্জেন-টিউটার ধরণীধর। রাজা ও রাণী out of question ! তার পরই ভাবলাম হত্যা যে করবে তার নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু motive অর্থাৎ উদ্দেশ্য থাকবে। অতএব এক্ষেত্রে কার কি motive থাকতে পারে ? Next step-এ এলাম—জবানবন্দি ! Now read this file—এর মধ্যেই সকলের জবানবন্দি পাবি। বলতে বলতে সামনের টেবিলের উপরে লাল ফিতে বাঁধা একটা ফাইল তুলে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন দীননাথ ঝা।

জবানবন্দি দেখা গেল প্রত্যেকেরই নেওয়া হয়েছে। বাড়ির কেউই বাদ যায় নি।

রাজা টিকেন্দ্রজিতের জবানবন্দি। উল্টে গেল কিরীটী একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে। বিশেষ কিছু গ্রহণযোগ্য তার মধ্যে নেই।

তার পরই রাণী সুনন্দা দেবীর জবানবন্দি। আমরা ঐ সন্ধ্যায় যতটুকু জেনেছি তার চাইতেও সংক্ষিপ্ত ও বিশেষত্বহীন। ব্যারিস্টার তেজেশচন্দ্রের বক্তব্য। কোন গুরুত্বই দেন নি দীননাথ ঝা, কারণ দুর্ঘটনার সময় তেজেশচন্দ্র অকুস্থান হতে বহু মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর এখানে পৌঁছাবার পূর্বেই কুমারদের মৃত্যু ঘটেছে।

এর পরই জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে দাইমা নলিনীর।

বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। এবং কুমারদের জন্মের সময় থেকেই প্রায় রাজবাড়িতে

অবস্থান করছে।

নলিনী এদেশীয় মেয়ে নয়। পাহাড়ী মেয়ে। দার্জিলিঙ-এর দিকে তার বাড়ি। তার মা আসামের একটি স্টেটে কামিনের কাজ করত। এবং সেখানেই কাজ করতে করতে চা-বাগানের ছোট সাহেবের নজরে পড়ে যায়। এবং তারই ফলে হয় নলিনীর জন্ম। এই হল নলিনীর জন্ম-পরিচয়।

দীননাথ রসিক পুরুষ। পুলিসের কাজে দীর্ঘকাল কাটালেও একদা প্রথম যৌবনে রসাধিক্যে কাব্যচর্চা করতেন, তারই ক্ষীয়মাণ একটা ধারা এখনো যে নিঃশব্দ ফল্গুর মত অন্তরে তাঁর বহে চলেছে, জবানবন্দির ছলে নলিনীর চেহারার বর্ণনার মধ্যেই সেটা বেশ যেন স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে।

নলিনীর দেহে নর্ডিক ও ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণের ফলে রঙ ও চেহারার দিক দিয়ে একটা চমৎকার সামঞ্জস্য থেকে গিয়েছে। মায়ের হলদেটে পাহাড়ী রঙ ও ইউরোপীয়ান পিতার দেহসৌষ্ঠব সে পেয়েছে একত্রে।

তবে মুখের গঠনে একটা পাহাড়ী অনার্য ছাপ থেকে গিয়েছে। চৌকো মুখ, ঈষৎ চ্যাপটা নাক ও ক্ষুদে ক্ষুদে গোলাকার চক্ষু। দীঘল লম্বাটে প্যাটার্নের চেহারা। নলিনীর মায়ের অর্থাভাব ছিল না চা-বাগানের ছোট সাহেবের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের দৌলতে। এবং সাহেবের সাহচর্যে হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, নলিনীকে তার মা সাত বছর বয়স থেকে কনভেণ্টে রেখে দিয়েছিল তার পনের বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু নলিনীকে প্রশ্ন করেও শেষ পর্যন্ত জানা যায় নি কি কারণে কনভেণ্ট ছেড়ে সে চলে আসে। মাঝখানে বছর পাঁচেকের ইতিহাস ধোঁয়াটে। রুণু ও বেণু জন্মাবার মাস-সাতেক আগে ওয়ালটেয়ারের এক হোটেলেই রাণী সুনন্দার সঙ্গে নলিনীর প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। হোটেলের ডাইনিংরুমের ইনচার্জে ছিল ঐ সময় নলিনী।

গর্ভাবস্থায় নিজের দেখাশুনা করবার জন্য ও সন্তান হলে তাদের সর্বক্ষণ দেখাশুনা করবার জন্য সুনন্দা একজন স্ত্রীলোক খুঁজছিলেন।

ঐ সময় হোটেলে নলিনীকে দেখে সুনন্দার ভারী পছন্দ হয়ে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত নলিনী হোটেলের কাজে ইস্তফা দিয়ে, যে কারণেই হোক, রাণী সুনন্দারা যখন মাস দেড়েক বাদে ফিরে আসেন দেশে, ওয়ালটেয়ারের হোটেল থেকে তাঁদের সঙ্গে চলে আসে। এবং সেই সময় হতেই নলিনী রাজপ্রাসাদে আছে। নলিনীর পূর্ব ইতিহাস এইটুকুই। রুণু-বেণুর জন্মের পর হতে নলিনী তাদের সর্বদা দেখাশুনার ভার নেয়। নলিনীকে প্রাসাদের লোকেরা সেই হতে কুমারদের দাইমা বা দাই বলেই জেনে এসেছে। নলিনীর বেশভূষায় বিশেষ কোন বাহুল্য নেই। সরুপাড় সাদা ধুতি ও ব্লাউজ। হাতে এক গাছি করে সোনার চুড়ি। কিন্তু এই সামান্য বেশভূষাতেই তার চেহারার মধ্যে এমন একটা রুচি ও পরিচ্ছন্নতা ফুটে ওঠে যে, সহজেই মনে হয় যেন সে অন্যান্য দশজন থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। এবং তার সম্যক পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত সে যে রাজপরিবারের একজন নয়

বোঝাও সহজ নয়। তার চালচলন কথাবার্তার মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে অন্য দশজনের থেকে।

গভর্নেস ডরোথি জোন্স আসবার পর থেকে যদিও নলিনীর কাজ একটু কমেছিল, তৎসত্ত্বেও সে-ই বেশীর ভাগ সময় কুমারদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকত। এবং তার থাকবার ঘরও প্রাসাদে ঠিক কুমারদের শয়নকক্ষের পাশের ছোট একটি ঘরেই ছিল। গভর্নেস জোন্স এখানে আসবার পর হতে নলিনীর কাজকর্মের মধ্যে ছিল ওদের জামাকাপড় জুতো-মোজা ও আহারাদির ব্যাপারটার উপরে নজর রাখা। বাকী তত্ত্বাবধানের ভার পড়েছিল কুমারদের মিস্ জোন্সের উপরেই।

নলিনীর জবানবন্দিতে জানা যায়, মৃত্যুর আগে এক সপ্তাহ ধরেই কুমারদের শরীরটা যেন তেমন সুবিধার যাচ্ছিল না। কুমারদের স্বাস্থ্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলা-ধুলা ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল মিস্ জোন্সের উপরেই, তাই নলিনী মিস্ জোন্সেরই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু জোন্স নাকি জবাব দিয়েছিল, নলিনীকে সেজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। এবং মৃত্যুর চার দিন আগে সকালবেলায় ঘুম ভাঙাতে গিয়ে নলিনী কুমারদের বিশেষ রকম অসুস্থ দেখেই জোন্সকে সংবাদ দেয়। তারপরই ডাক্তার আসে। পরের দিন রাজা শিকার থেকে ফিরে আসেন বেলা দশটা নাগাদ। মৃত্যুর দিন চার-পাঁচ আগে হতেই কুমারদের আহারের প্রতি তেমন রুচি ছিল না।

মিস্ ডরোথি জোন্সের জবানবন্দি হতে জানা যায়, নলিনীর আগেই নাকি তার কুমারদের স্বাস্থ্যের উপরে নজর পড়ে। এবং তিনি স্টেটের ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। ডাক্তার বংশীধর এসে কুমারদের পরীক্ষা করে রেস্ট নেবার কথাই বলে যান। পরে মৃত্যুর তিন দিন আগে যখন কুমারদের সকালের দিক থেকেই শরীর ক্রমে নীল হয়ে আসতে থাকে, বমি-বমি ভাব ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে শুরু করে, তখন নিজে পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু না বুঝতে পারায় গৌহাটির সিভিল সার্জেনকে সংবাদ দেন। কিন্তু সিভিল সার্জেনও এসে বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারে না। অসুস্থ হবার আগের দিনও বিকাল পর্যন্ত তারা মোটামুটি সুস্থই ছিল। বিকালের রুটিন মাফিক নিয়মিত বেড়াতে বের হয়, রাত্রে অবশ্য পড়াশুনা করে না। সামান্য কিছু খেয়েই বিছানায় শুতে যায়।

দীননাথ ঐ সময় প্রশ্ন করেন, পড়াশুনা করে নি কেন?

ডাঃ বংশীধর দাশ বলেছিলেন, rest নিতে।

রাত্রে কুমাররা কি খেয়েছিল জানেন কিছু?

না। কারণ কুমারদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা নলিনীই দেখাশোনা করত সর্বদা।

॥ পাঁচ ॥

ভৃত্য মানিকলালের জবানবন্দি।

বিশেষ কোন সংবাদ তার কাছ থেকেও পাওয়া যায় নি।

অসুস্থ হবার পর হতে যদিও মানিকলাল ঘরের আশেপাশেই ছিল, তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। অসুস্থ হবার আগের দিন বৈকালে নিত্যকারের মত মাস্টারবাবুকে নিয়ে কুমারদের সঙ্গে গাড়িতে করে বেড়াতে গিয়েছিল সে।

সে-সময় কুমারদের শরীরের অবস্থা কেমন ছিল?

খুব ভাল বলে মনে হয় নি। কেমন যেন চুপচাপ ছিল।

মাস্টার ধরণীধর।

কুমাররা অসুস্থ হবার দিন-পাঁচেক আগে হতেই তাদের পড়াশুনা বন্ধ ছিল মিস্ জোন্সের নির্দেশক্রমে।

অর্থাৎ কারোর জবানবন্দিতেই বিশেষ কিছু জানা যায় না। এবং রহস্য যেখানে ঘনিয়ে উঠেছে সেখানে কোন আলোকসম্পাতই হয় নি। ধোঁয়াটে অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে।

জবানবন্দির ফাইলটা পড়া শেষ করে কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে যখন ফাইলটা গুছিয়ে বাঁধছে দীননাথ বললেন, মোটিফের কথা যদি বলো তবে এক্ষেত্রে কারো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুমারদের জন্যই এরা প্রত্যেকে চাকরিতে মোটা মাইনেয় নিযুক্ত ছিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কুমারদের মৃত্যুতে এরা কেউই ক্ষতিগ্রস্ত ভিন্ন লাভবান হবে না।

কিরীটী এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি, এবারে বললে, তোমার তা হলে মত সন্দেহের তালিকাভুক্ত এদের কাউকেই করা চলে না! কিন্তু বন্ধু, এমনও তো হতে পারে কথামালার সেই একচক্ষু হরিণের গল্পের মত সমস্ত ঘটনাটার একটা দিকেই তোমার নজর পড়েছে এবং যেদিকটায় নজর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করো নি, মৃত্যুবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে সেই দিক থেকেই!

কি বলতে চাও কিরীটী?

বলছিলাম অকুস্থানের আশপাশটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছিলে?

কি রকম!

এই ধর যে ঘরে কুমাররা মারা যায়—যে ঘরে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থাকত তার পর I mean নলিনীর ঘরটা—

হ্যাঁ, তা করেছি বৈকি। এমন কোন কিছুই সেখানে নজরে আসে নি যা সন্দেহ জাগাতে পারে মনে।

হুঁ। আচ্ছা এই যাদের সব জবানবন্দি নিয়েছ, তাদের কারো কাছ থেকে প্রশ্ন করবার সময় এমন কোন ঘটনার উল্লেখ কিছু শুনেছ যেটার কোনরূপ বিশেষ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বা তোমার কাছে কোন গুরুত্ব আছে বলে মে

হয়েছে ?

কই, এমন কিছু মনে তো পড়ছে না !

ভাল করে একটু ভেবে জবাব দাও দীননাথ।

না, মনে পড়ছে না।

যা হোক অতঃপর সেরাত্রের মত দীননাথ বিদায় নিলেন।

দীননাথের বিদায় নেবার কিছুক্ষণ পরেই আমাদেরও রাত্রের আহারের ডাক পড়ল।

॥ ছয় ॥

আহারাদির পর আমি আর কিরীটী বাগানে বেড়াচ্ছিলাম।

রাজা টিকেন্দ্রজিতের উদ্যানটি সত্যিই দেখবার মত। পূর্ণিমার পরের রাত্রি। আকাশে চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল। আর বাতাসে ছিল ফুলের একটা মিশ্র সৌরভ।

অনেকক্ষণ ধরে বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একসময় আমরা দুজনে একটা পাথরের বেঞ্চের উপরে উপবেশন করলাম। কতক্ষণ বেঞ্চিটার উপরে বসে-ছিলাম মনে নেই, উঠতে যাব এমন সময় হঠাৎ কানে এল কোন পুরুষের একটা চাপা কর্কশ কণ্ঠস্বর।

কিরীটী আমার হাতের উপর মৃদু একটা আকর্ষণ করে বসবার ইঙ্গিত করলে। বসে পড়লাম।

পরশু রাত্রের ট্রেনেই—, কথাটা ইংরাজীতেই উচ্চারিত হল।

প্রত্যুত্তরে কোন এক নারীকণ্ঠ ইংরাজীতেই যেন কি বললে ঠিক বোঝা গেল না।

আবার পুরুষকণ্ঠে শোনা গেল, হু ! That's absurd !

এবারেও নারীকণ্ঠের জবাবটা শোনা গেল না। অস্পষ্ট ক্ষীণ।

এর পর ক্ষীণ একটা পদশব্দ পাওয়া গেল। বোঝা গেল কেউ হেঁটে চলে গেল।

আমরা কিন্তু বসেই রইলাম।

আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আরো কেটে গেল। হঠাৎ এমন সময় আবার পদশব্দ। সামনের দিকে তাকাতেই এবারে স্পষ্ট দেখা গেল দীর্ঘকায় এক নারীমূর্তি এই দিকেই আসছে। এবং চাঁদের আলোয় স্পষ্ট এবারে চিনতে এতটুকুও আমাদের কষ্ট হল না—মিস্ ডরোথি জোন্স। একটা ঝোপের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধীর পদবিক্ষেপে। গায়ে একটা সাদা পাতলা স্লিপিং গাউন।

আমরা যে বেঞ্চির উপরে বসেছিলাম, তার পাশ দিয়ে অন্দরে যাবার পথ।

নিঃশব্দে মাথা নীচু করে হেঁটে আসছে মিস্ জোন্স, বেশ যেন একটু অন্য-মনস্ক। আমাদের কাছাকাছি এসে চোখ তুলতেই হঠাৎ মিস্ জোন্সের সঙ্গে আমাদের একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কে ? ইংরাজীতেই প্রশ্ন এল।

তারপরই বোধ হয় আমাদের চিনতে পেরে বললে, ও ! আপনারা ?

আর দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে মিস্ জোন্স এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিরীটী বাধা দিয়ে ডাকলে, **Just a minute please Miss Jonse, if you don't mind !**

মিস্ জোন্স ফিরে দাঁড়াল।

যদি কিছু মনে না করেন তো আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা ছিল! কিরীটী আবার বলে।

বলুন ?

বসুন না।

মিস্ জোন্স বসল বেঞ্চের উপরে। আমরাও পাশাপাশি বসলাম।

আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, কেন রাজাসাহেব এখানে আমাদের ডেকে এনেছেন—

জানি।

বলা বাহুল্য, ইংরাজীতেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

ভেবেছিলাম কাল প্রত্যুষেই আপনার সঙ্গে আলাপ করব, কিন্তু সুযোগ যখন মিলেই গেল, ভাবলাম আলাপটা সেরে নিই। যদিও সময়টা খুব প্রশস্ত নয়—

তাতে কি ? বলুন কি বলতে চান! রাত বারোটার আগে সাধারণত আমার ঘুম আসে না। তাই রাত্রে ঘুমের আগে বাগানে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াই। মিস্ জোন্স বললে।

আচ্ছা রাণী সুনন্দা দেবীকে তো অনেকদিন থেকেই আপনি দেখছেন! তাঁর সম্পর্কে আপনার মতামত কি মিস্ জোন্স ?

কিরীটীর প্রশ্নে মিস্ জোন্স মৃদু হাসল, আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি মিঃ রায়! এবং রাণীর সঙ্গে যখন আপনার আলাপ হয়েছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, তিনি আমাকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন না!

ঠিক এই ধরনের জবাবটা যেন আমরা প্রত্যাশা করি নি। তাই এরপর কিরীটীর প্রশ্নটা কোন্ পথে এগুবে বুঝতে পারছিলাম না।

কেন বলুন তো, যদিও সেই রকম আমাদেরও মনে হল তাঁর কথাবার্তায়! কিরীটী বললে।

বোধ হয় জেলাসি—

জেলাসি!

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি বলুন? তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যায় শুয়ে আছেন, এ সময় স্ত্রীলোক হলে বুঝতেন, স্ত্রী-মনের এটা একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, যে কোন স্ত্রীরই তার স্বামীর আশেপাশে কোন স্ত্রীলোককে দেখলে সেই স্ত্রীলোকের উপরে হিংসা জন্মায়।

কেবল কি তাই বলেই আপনার মনে হয় মিস্ জোন্স ? আর কি কোন কারণই নেই ?

আমার তো তাই মনে হয়—

হুঁ। আচ্ছা রাজা টিকেন্দ্রজিৎকে আপনার কি রকম মনে হয়?

একেবারে perfect gentleman। অমন শিক্ষিত ভদ্র রুচিসম্পন্ন লোক সাধারণত বড় একটা চোখেই পড়ে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা কুমারদের মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয়?

সকলেই তো বলছে—there is something wrong!

আমি আপনার কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম--

ব্যাপারটা যেমন shocking, তেমনি দুঃখের আমার পক্ষে—ও সম্পর্কে কোন কিছু আমাকে না জিজ্ঞাসা করলেই বাধিত হব মিঃ রায়।

হঠাৎ এবারে কিরীটী প্রশ্ন করে, আচ্ছা এখান হতে কলকাতায় ফেরবার লাস্ট ট্রেনটা রাত্রে কটায় ছাড়ে বলতে পারেন?

কিরীটীর প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকাল মিস্ জোন্স তার মুখের দিকে এবং ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ছোট্ট একটিমাত্র শব্দে, না।

একটু আগে আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ঐ ঝোপের ধারে?

আমি! কি বলছেন আপনি?

মিস্ জোন্সের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়।

ঠিকই বলছি।

কিন্তু আমি তো কারো সঙ্গেই কথা বলি নি। আপনি—আপনি বোধ হয় ভুল করছেন! If you don't mind—

ভুল!

হ্যাঁ। আমি—আমি তো কারো সঙ্গেই কথা বলি নি!

তবে বোধ হয় শোনবারই ভুল হয়েছে আমার।

অতঃপর কিরীটী যেন কিছুক্ষণ কি ভাবে মনে মনে। তারপর হঠাৎ আবার কিরীটী একটু থেমে প্রশ্ন করে, আপনি তো কুমারদের গভর্নেস ছিলেন—তারা মারা গিয়েছে, এখনো যান নি কেন?

আশা করি ও প্রশ্নের আপনার কোন অধিকার নেই, এ কথাটা আপনি ভুলবেন না। আচ্ছা Good night! বলে আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মিস্ জোন্স স্থানত্যাগ করল।

পরের দিন প্রত্যুষে। ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গেই আমরা কুমারদের ঘর দেখতে গেলাম।

ধনীর দুলালদের মানুষ হবার জন্য এবং তাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা যা প্রয়োজন দেখলাম তার কোন কিছুরই যেন অভাব সেখানে নেই।

শয়নঘর, পড়ার ঘর, লাইব্রেরী ও সর্বশেষে সাজপোশাকের ঘরে আমরা প্রবেশ

করলাম। একটা কাচের আলমারির মধ্যে থরে থরে সব পোশাক-পরিচ্ছদ সাজানো। এবং একটা র‍্যাকের উপরে সারি সারি অন্তত দশ জোড়া জুতো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মানিক নলিনী দুজনেই যদিও ছিল, নলিনীই কিন্তু সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ মানিকের কণ্ঠস্বরে আমি ও কিরীটী দুজনেই চমকে উঠলাম।

কুমারদের দু'জোড়া জুতো দেখছি না!

কি বলছ মানিক?

হ্যাঁ, দেখুন না। সেদিন যে জুতো পরে কুমাররা বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেই লালজুতো জোড়াই দেখছি না। অথচ নিজে আমি পরশু ঐখানেই দেখেছিলাম। রাজাবাহাদুর বলেছেন, তাদের কোন কিছু যেন না খোয়া যায়।

লাল জুতো? বিস্ময়ের সঙ্গে বলে নলিনী।

হ্যাঁ, দাইমা। সেই যে লাল রঙের জুতো দাদাবাবুরা পরতে সবচাইতে বেশী ভালবাসত, আপনিই তো কিনে দিয়েছিলেন তাদের—

সত্যিই তো! সে জুতো দুজোড়া গেল কোথায়?

কিন্তু—

মানিকের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বললাম, কোথায় আবার যাবে! দেখ কোথাও আছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মানিক বর্ণিত জুতোজোড়া পাওয়া গেল না।

কিরীটী তখন প্রশ্ন করে নলিনীকে, কি রকম জুতো ছিল বলুন তো নলিনী দেবী?

ব্রাউন রঙের সু।

অতঃপর কিরীটী যেন কিছুক্ষণ কি ভাবল মনে মনে।

এ ঘরে এর মধ্যে কে কে প্রবেশ করেছে বলতে পারেন নলিনী দেবী? কিরীটী প্রশ্ন করে।

চাবি তো মানিকের কাছেই ছিল, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না!

এ ঘরের চাবি তোমার কাছে ছিল মানিক?

হ্যাঁ। কুমারদের মৃত্যুর পর হতে চাবি আমার কাছেই আছে। কেবল দিনে একবার করে এসে সব ঝেড়ে-পুঁছে ঠিক করে রেখে যাই।

কাল ঝেড়েছিলে?

হ্যাঁ।

সব ঠিক ছিল তখন, তোমার মনে আছে?

সেই রকম তো মনে পড়ছে—তবে পরশু—

কাল কখন ঘর পরিষ্কার করো?

দুপুরের দিকে।

সঙ্গে আর কেউ ছিল?

না।

ঘর পরিষ্কার করতে করতে তুমি বাইরে গিয়েছিলে ঘর খোলা রেখে ?

হ্যাঁ, মামাবাবু ডেকেছিলেন তাই একবার বাইরে গিয়েছিলাম।

প্রত্যুত্তরে কিরীটী আর বিশেষ কোন কথাই বললে না।

কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছিলাম, মানিকের মুখে কুমারদের ব্যবহৃত ব্রাউন রঙের জুতোজোড়া হারানোর কথাটা শোনা অবধি তার মুখে একটা স্পষ্ট চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

দেখতে বাকী ছিল একমাত্র কুমারদের শয়নঘরটাই।

সেটা দেখে দুজনে নিচে নেমে এলাম।

একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী একটা আরামকেদারার উপরে দেহটা শিথিল করে এলিয়ে দিল।

আমি ঐদিনকার ইংরাজী সংবাদপত্রটা খুলে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিন্তু সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদে যেন মন বসছিল না। এই রাজপ্রাসাদে মাত্র কয়েকদিন আগে দুটি সুকুমার প্রিয়দর্শন নিষ্পাপ বালককে কেন্দ্র করে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছে, সেই ব্যাপারটাই যেন মনের মধ্যে এসে বার বার ঘোরাফেরা করছিল। অবিশ্যি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই নিষ্পাপ দুটি বালককে তীব্র বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এবং সোজাসুজি ভেবে দেখতে গেলেই বোঝা যায় যে, অর্থই এক্ষেত্রে অনর্থের কারণ। বিষপ্রয়োগের ব্যাপারটাও মনে মনে পর্যালোচনা করলে মনে হয়, প্রয়োগকারী বাইরের কোন তৃতীয় পক্ষ নয়। এ বাড়িরই কেউ-না-কেউ। কারণ কুমারদের নির্দিষ্ট গতিবিধি থেকে এও বোঝা যায়, বাইরের কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা এ কাজ কখনই ঘটা সম্ভবপর নয়। তাই যদি হয়, তবে সন্দেহ জাগছে কার কার উপরে ? মিস্ ডরোথি জোন্স, নলিনী, মানিকলাল, ধরণীধর এদের মধ্যেই কেউ-না-কেউ। কিন্তু কে ? দীননাথের কথাটাও আবার একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কুমারদের দেখাশুনার জন্যই এরা মাইনে পাচ্ছিল। সেদিক দিয়ে কুমারদের হত্যা করলে এরা তো প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তা ছাড়া এদের মধ্যে কেউই কুমারদের নিকটাত্মীয় নয় যাতে করে কুমারদের হত্যা করতে পারলে এরা কেউ আর্থিক ব্যাপারে লাভবান হবে !

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল।

দেখ সুব্রত, আমি যতই ভাবছি ততই যেন মনে হচ্ছে জুতোজোড়া নিশ্চয়ই কেউ চুরি করেছে !

জুতোজোড়া ?

হ্যাঁ, কুমারদের সেই ব্রাউন রঙের জুতোজোড়া ?

ও।

আমার চিন্তাধারার সঙ্গে কিরীটীর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় কিরীটীর

কথায় প্রথমটায় আচমকা সত্যি তাই একটু চমকেই উঠেছিলাম।

কিন্তু কেন? But why after all that particular brown pair of shoes should be stolen! কেন চুরি যাবে জুতোজোড়া? এবার মনে হল কথাটা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেও যেন কতকটা সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছে। জুতোজোড়ার ব্যাপারটা এতক্ষণ মনেই ছিল না। কিরীটীর কথায় যেন আবার নতুন করে মনে পড়ল।

ভেবে দেখ, কুমারদের ব্যবহারের সব কয় জোড়া জুতোই রইল, কেবল চুরি গেল সেই জোড়া যে জোড়া তারা মৃত্যুর আগে শেষবার পায়ে দিয়েছিল!

তুই কি—

কথাটা আমাকে শেষ না করতে দিয়েই কিরীটী বলে উঠল, নিশ্চয়ই। এই হত্যা-ব্যাপারের missing link ঐ জুতোর মধ্যে আছে—if I am not wrong—যদি আমার অনুমান না ভুল হয়ে থাকে!

তোর অনুমানই যদি ঠিক হয় তো কে আর চুরি করবে, এ বাড়িরই কেউ করেছে!

তা তো নিশ্চয়ই। রাজাসাহেব থেকে শুরু করে ব্যারিস্টার সাহেব, নলিনী, মিস্ জোন্স, মানিকলাল এদেরই মধ্যে কেউ জুতোজোড়া হাতিয়েছে—

হঠাৎ যেন চমকে উঠলাম কিরীটীর কথায়। তবে কি কিরীটী হত্যাকারীকে ধরতে পেরেছে?

প্রশ্ন করলাম, বুঝতে পেরেছিস্ নাকি definitely কিছু?

না বন্ধু, জুতোর problem solve না হওয়া পর্যন্ত এগোতে পারছি না—কেবলই হোঁচট খাচ্ছি।

॥ সাত ॥

সমস্ত দ্বিপ্রহরটা কিরীটী শুয়ে-শুয়েই কাটিয়ে দিল চোখের উপরে হাত চাপা দিয়ে। এবং বোঝা গেল সে শুয়েই আছে, ঘুমোয় নি।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। সন্ধ্যারাত্রি সাতটা নাগাদ কিরীটী দেখি গায়ে জামাকাপড় চাপাচ্ছে।

কোথাও বেরুবি নাকি?

হ্যাঁ, চল বেড়িয়ে আসি।

গেট দিয়ে বেরুচ্ছি, হঠাৎ দেখি রাজার ক্রাইসলার গাড়িটা পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম গাড়ির মাথায় মালপত্র ও ভিতরে বসে মিস্ ডরোথি জোন্স। হঠাৎ যেন কিরীটীর শরীরে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। সে বললে, ফিরে চল্ সুব্রত।

আবার আমরা ফিরে এলাম। আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের জন্য রাজা অন্য একটা গাড়ি ও ড্রাইভার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন।

গাড়ি পোর্টিকোর নীচেই ছিল। ড্রাইভারও ছিল গাড়িতে। সোজা এসে গাড়িতে উঠে বসে কিরীটী ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, স্টেশন চল।

স্টেশনে এসে যখন পৌঁছালাম রাত তখন পৌনে আটটা। সংবাদ নিয়ে জানা গেল, কলকাতার দিকে যাবার গাড়ি ছাড়তে তখনও মিনিট কুড়ি দেরি। এবং গাড়িটা এইখান থেকেই ছাড়ে।

প্ল্যাটফরমের উপরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। কিরীটী প্রত্যেক কম্পার্টমেণ্টে দৃষ্টি দিতে দিতে এগিয়ে চলল।

কিন্তু কোথায় মিস্ ডরোথি জোন্স? তার পাত্তাই নেই!

চল্ সুব্রত, ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমটা একবার দেখি—

কিন্তু এবারে আর নিরাশ হতে হল না।

সুইংডোর ঠেলে ঘরে পা দিতে গিয়েই আমরা থমকে দাঁড়ালাম। পরস্পর পরস্পরের সামনাসামনি হাত ধরে দাঁড়িয়ে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ ও মিস্ ডরোথি জোন্স।

নিঃশব্দে কিরীটী ও আমি সুইংডোরটা ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম প্ল্যাটফরমের উপরে।

গাড়ি ছাড়তে এখনো মিনিট দশেক বাকী।

প্ল্যাটফরমের উপরে একটা শিরীষ গাছের তলায় দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি ওয়েটিং রুমের দরজার দিকে।

হঠাৎ নজর পড়ল কিরীটীর চাপা কণ্ঠস্বরে, দণ্ডায়মান গাড়িটার একটা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের দরজার সামনে কোট-প্যাণ্ট পরিহিত এক সুশ্রী ভদ্রলোকের উপরে। ভদ্রলোক ঘন ঘন গেটের দিকে তাকাচ্ছেন।

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কারো জন্য অপেক্ষা করছে সুব্রত!

মনে হচ্ছে তাই।

জানি না তখনো যে তার চাইতেও বড় আর একটি বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

গেট দিয়ে নলিনী দেবী এসে প্রবেশ করলেন, হাতে তাঁর একটা লেডিজ হ্যাণ্ডব্যাগ।

নলিনী দেবীকে ঐ সময় স্টেশনে দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। নলিনী দেবী সোজা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের সামনে দণ্ডায়মান ভদ্রলোকের সামনে এসে হাতের ব্যাগটা তার হাতে দিতেই দ্রুতপদে কিরীটী এগিয়ে গেল সামনে এবং কোনরূপ ভূমিকা মাত্র না করে সোজা একেবারে বললে, নলিনী দেবী, ব্যাগটা আমি চাই!

চকিতে নলিনী ফিরে তাকায় কিরীটীর দিকে।

দণ্ডায়মান পুরুষটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে আপনি?

নলিনী দেবী আমায় চেনেন। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ভদ্রলোক এবারে অভদ্র ভাবে খিঁচিয়ে উঠতেই একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল সেখানে। হাতাহাতি হবার যোগাড়।

হঠাৎ সেখানে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ এসে হাজির, এ কি প্রশান্ত! তুমি?

মুহূর্তে যেন সাপের গায়ে মন্ত্র পড়ল। ভূত দেখার মতই চমকে ফিরে তাকাল প্রশান্ত।

এ কি মিঃ রায়, আপনি এখানে এ সময়ে?

একটু সামান্য হিসাবের ভুল হয়ে গিয়েছে রাজাসাহেব। প্রশান্তবাবুর হাতের ব্যাগটা আমরা চাই। মনে হচ্ছে উনি আপনার পরিচিত!

হ্যাঁ, আমাদের জামাই।

মানে রাজেন্দ্রবাবুর মেয়েকে—

হ্যাঁ।

বুঝেছি। নলিনী দেবী কই?

নলিনী!

হ্যাঁ, নলিনী দেবীও তো এখানে ছিলেন!

কিন্তু কোথায় নলিনী, সে তখন ত্রিসীমানায় নেই।

ব্যাগটা দিতে বলুন রাজাসাহেব ওঁকে।

ব্যাগটা!

হ্যাঁ। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে তো ঐ ব্যাগের মধ্যেই কুমারদের হারানো জুতোজোড়া দুটো পাওয়া যাবে—

হারানো জুতোজোড়া, কি বলছেন আপনি?

হ্যাঁ, ব্যাগটা দিতে বলুন, দেখাচ্ছি!

হতভম্ব বিমূঢ় প্রশান্তর হাত হতে এবারে আমিই এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলাম। এবং সত্যিই ব্যাগ খুলতে তার মধ্যে ছোট ছেলেদের দু'জোড়া চক্‌চকে ব্রাউন রঙের জুতো পাওয়া গেল।

চিলের মতই যেন ছোঁ দিয়ে কিরীটী জুতোজোড়া-দুটো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমরা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক।

সদলবলে আমরা আবার রাজার ক্যাডিলাক গাড়িতে চেপেই প্রাসাদে ফিরে এলাম—একমাত্র নলিনী দেবী বাদে। তার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

পরের রাত্রে আমরা ফিরে এলাম—প্রশান্তকে দীননাথের হাতে তুলে দিয়ে।

প্রশান্তই শেষ পর্যন্ত সব কিছু স্বীকার করে কিরীটীর কাছে।

জুতো পালিশের কালির মধ্যে নাইট্রোবেনজিন ব্যবহার হয়—সেইটা বেশী পরিমাণে জুতোর কালিতে মিশিয়ে জুতো পালিশ করবার সময় জুতোর ভিতরেও

প্রচুর পরিমাণে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পায়ের চামড়া দিয়ে নাইট্রোবেনজিন অ্যাবজরব্‌শন হওয়াতেই কুমারদের মৃত্যু ঘটেছে।

প্রশান্ত ভেবেছিল রাজেন্দ্র বড়ুয়া তাকে তাড়িয়ে দিলেও, তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে অর্থাৎ প্রশান্তর স্ত্রীই সমস্ত সম্পত্তি পাবে এবং বেণু ও রেণুকে যদি ও সরিয়ে ফেলতে পারে তা হলে টিকেন্দ্রজিতের যাবতীয় সম্পত্তিও তারই হস্তগত হবে একদিন। তাই সে স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করে নি এবং পূর্বপরিচিত নলিনীকে সে নিযুক্ত করেছিল টিকেন্দ্রজিতের প্রাসাদে। নলিনীর সঙ্গে প্রশান্তর পরিচয় হয় কলকাতায়। তার পর টিকেন্দ্রের ওয়ালটেয়ারে যাবার সব ব্যবস্থা হচ্ছে জেনে পূর্বাহ্নেই নলিনীকে ওয়ালটেয়ারে পাঠিয়ে দেয় প্রশান্ত এবং সহজেই নলিনী সুনন্দার মন জয় করে নিয়ে তার সঙ্গে চলে আসে।

প্রশান্তর প্রথমে ইচ্ছা নলিনীর রূপ-যৌবন দিয়েই রাজা টিকেন্দ্রজিতের কাছ হতে কিছু অর্থ আগে বাগিয়ে নেওয়া, কিন্তু নলিনী তাতে সক্ষম হয় না। ইতি-মধ্যে একটা মার্ডার কেসে জড়িত হয়ে রাতারাতি প্রশান্ত কলকাতা ছেড়ে বর্মায় গিয়ে গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। আট বৎসর বাদে ফিরে এসে প্রশান্ত যখন দেখলে নলিনী তখনও তার পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে পারে নি, তখন সে কুমারদের ধ্বংসের পরিকল্পনা করে নতুন উদ্যমে। কেমিস্ট্রিতে ডক্‌টরেট—তাই সে অপূর্ব পন্থা গ্রহণ করেছিল কুমারদের শেষ করবার জন্য।

কিন্তু ভুল করল সে, কুমারদের মৃত্যুর সাত-আট দিন পরেই এসে নলিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে গিয়ে।

সেরাত্রে উদ্যানে নলিনী ও প্রশান্তর মধ্যেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

কিরীটীর প্রথমে সন্দেহ হয় ফটোতে কুমারদের পায়ে আলতা পরার মত একটা শেড দেখে। অনেক ভেবে সে বুঝতে পারে, একমাত্র ওরকম দাগ হতে পারে জুতো পরা থেকে। এবং জুতোয় কাঁচা রঙ থাকলে। কিন্তু রাজার ছেলের জুতো, কাঁচা রঙের হবে না। অতএব তার মনে হয়, নিশ্চয়ই জুতোর ভিতর রঙ দেওয়া হয়েছিল। এবং নিশ্চয়ই ঐ জুতোর রঙের ভিতর দিয়ে নাইট্রোবেনজিন বিষ দেহে সংক্রামিত করা হয়েছে। কারণ সে নিজে কেমিস্ট্রির ছাত্র, জানত জুতোর কালিতে নাইট্রোবেন-জিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে ingredient হিসাবে।

মনের মধ্যে ব্যাপারটা তার আরো দৃঢ়বদ্ধ হয় মানিকের মুখে জুতো চুরির সংবাদ পেয়ে।

পদ্মিনী

।। এক ।।

টোবাকো পাউচ থেকে খানিকটা টোবাকো তুলে নিয়ে পাইপের মুখবিবরে ঠাসতে ঠাসতে কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলছিল, নেশা তুই করিস নি সুব্রত, বেঁচে গিয়েছিস। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে শান্তশীলের কথা ?

বুঝলাম কিরীটী মুডে আছে।

সেদিনকার মতই আবার কোন কাহিনীর এটা পূর্বাভাস মাত্র।

হেমন্তের অপরাহ্ণ। শীত নেই বটে, কিন্তু বাতাসে একটা শীত-শীত ভাব আছে। গাছে গাছে ঝরা পাতার উৎসব লেগেছে। ঈষৎ শীতোষ্ণ বাতাসে ঝরাপাতাগুলো এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে।

কিরীটীর টালিগঞ্জের বাড়িতে তার দোতলার বসবার ঘরে সবে আমাদের তৃতীয় কাপ চা শেষ হয়েছে।

বয়সে যা হয়, গাঁটে গাঁটে নাকি এবারে শীতে একটা রিউম্যাটিক টেনডেন্সি কিরীটীর দেখা দিয়েছিল। তাই ডাক্তারের কঠিন নির্দেশ, কিছুকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম। সেই সম্পূর্ণ বিশ্রামপর্বই চলেছে কিরীটীর। প্রত্যহ তাই বিকাল থেকে কোনদিন রাত আটটা কোনদিন বা রাত দশটা পর্যন্ত আমাকে হাজিরা দিতে হচ্ছে।

বেশীর ভাগ দিনই ঐ সময়টা আমাদের কাটছিল দাবা খেলে। কিন্তু আজ এসে দেখি দাবার ছক সামনে নেই, রয়েছে চায়ের পাত্র ও ওষ্ঠে পাইপ।

অলস শিথিল ভঙ্গিতে ঘরের খোলা জানালা-পথে পাতাঝরা রিক্ত শূন্য কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে আরামকেদারাটার উপর আধ-বসা আধ-শোওয়া অবস্থায় কিরীটী বেশ কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক।

আমার পদশব্দে না তাকিয়েই বললে কেবল, আয় সুব্রত, বোস।

তার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল। কোন সাড়াশব্দই নেই কিরীটীর। অবশেষে একসময় জংলী চা নিয়ে এল। নিঃশব্দে দুজনে এক এক করে তিন কাপ চা শেষ করলাম।

জংলী চায়ের সরঞ্জাম তুলতে এসেছিল। তাকে বললে, আরো চা নিয়ে আয় জংলী!

জংলী ঘাড় নেড়ে চলে গেল সম্মতি জানিয়ে।

শেষটায় আমাকেই একসময় স্তব্ধতা ভঙ্গ করতে হল। বললাম, কৃষ্ণা বৌদিকে দেখছি না! বাড়ি নেই নাকি ?

না। পাইপ টানতে টানতেই পূর্ববৎ অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল কিরীটী মৃদুকণ্ঠে।

কোথায় গেল ?

সিনেমায়।

কৃষ্ণা বৌদির এ রোগটি কবে থেকে হল আবার ?

দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছুদিন!

তা কোন্ হাউসে ? ভাল ইংরাজি বই কোথাও এখন হচ্ছে বলে তো—

ইংরাজি নয়—

তবে কি হিন্দী ?

উঁহু! বাংলা বই। কে এক মলয়েশকুমার শুনছি নাকি কি একখানা জাংগল বইতে ব্যাটল-ড্রেস ও শিকারী-ড্রেসের জগাখিচুড়ী কি এক পোশাক পরে পা ফাঁক করে পাইপ টানতে টানতে পিকাডেলী থেকে ল্যান্ডিংকাটাল পর্যন্ত যাবতীয় ভাষায় কথা বলেছে আর বাঁদর নেচেছে—সেই বইটা দেখতে।

বৌদির কি মাথা খারাপ হল নাকি! সেই ট্র্যাশ দেখতে—

নেশা! বুঝলি, তামাম্ বাংলা দেশের নাড়ীতে ঐ কুমারের নেশা ধরেছে। আর সে নানা প্রকারের লম্ফঝম্প করে ভাবছে, আহা কি অভিনয়ই না করছি!

বুঝলাম বৌদির সিনেমা দেখার ব্যাপারটি কিরীটীর মনঃপূত নয়। তাই চুপ করেই রইলাম।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। পাইপের নতুন তামাকে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী ধূমপান করতে লাগল। তার পরই একসময় তুলল শান্তশীলের কথা।

শান্তশীলের চিন্তামণি অবিশ্যি আর চিনির যোগান দিলেন না, কিরীটী বলতে লাগল আবার, এবং তার ফলে যে ফলপ্রাপ্তি তার ঘটল, যোধপুর রাজ-পরিবারের পদ্মিনী দেবীরও সেই ফলপ্রাপ্তিই হয়েছিল।

পদ্মিনী দেবী!

হ্যাঁ—অনেকদিন আগেকার কথা। পদ্মিনীর দেশ রাজস্থানটা ঘুরে দেখবার আমার অনেক কালের বাসনা ছিল, তুই তো জানিস!

গিয়েছিলি নাকি তুই রাজস্থানে ?

শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল কই ? তার আগেই তো পদ্মিনী দেবীর বখেড়া দেখা দিল আর সেই বখেড়া মেটাতে গিয়ে পা ভেঙে হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়ে তিন মাস শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পাইপে একটা টান দিয়ে কিরীটী কথাটা শেষ করল, আমার মনে হয় কি জানিস সুব্রত ?

কি ?

এত বছর পরে হলেও এবারে এই গেঁটে বাতের ব্যাপারটার বীজ সেবারেই আমার ডান পায়ের হাঁটুতে রোপিত হয়েছিল।

হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়েছিলি মানে ?

আর বলিস কেন, পদ্মিনী দেবীর হঠাৎ চাগিয়ে ওঠা সিনেমার অভিনেত্রী হবার দায়ে পড়ে—

অতঃপর কিরীটীর নিজস্ব জবানীতে যে কাহিনী শুনেছিলাম সেই কাহিনীর বিবৃতিতেই এবারে আসা যাক।

ক্ষমা করবেন।

কাহিনীর গোড়াতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ সেদিন সন্ধ্যায় কিরীটীর মুখে যা শুনেছিলাম, তার পর আট-নয় বৎসর গত হয়ে গিয়েছে, কাজেই আজকের আমার এই বিবৃতির মধ্যে কিছু ভুলচুক বা অতিরঞ্জনও থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

তবে আপনারা যদি অনুগ্রহ করে এটাকে কোন সত্য কাহিনী বলে না ধরে নিয়ে নিছক একটা রহস্য গল্প শুনছেন বলে গোড়া থেকেই স্বীকৃতি দেন, তা হলে কাহিনীকার হিসাবে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হয় না। কারণ বিশ্বাস করুন আপনারা, গল্পটি লেখবার পর নিজে পড়তে গিয়ে আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না কতটুকু এর মধ্যে সত্যি আর কতটুকু আমার কল্পিত। ঝুড়ি ঝুড়ি কল্পনার মধ্যে আসল সত্যটুকু যদি থেকেও থাকে, তা এমন ভাবেই কল্পনার মাটিতে চাপা পড়েছে যে সত্যকে খুঁজে বের করা এখন আমার পক্ষে সত্যিই দুঃসাধ্য।

অবিশ্যি একটা কথা—

কিরীটী রায়কে সবটা শুনিয়ে এর সত্য-মিথ্যাটা যাচাই করে নিতে পারতাম, কিন্তু তার বর্তমান মেজাজটা এমন বিশ্রীভাবে বিগড়ে আছে যে গল্প শোনার পর যদি সে দেখতে পায় যে তার মুখের সত্য কাহিনীর সঙ্গে আমার কল্পনা এমন বিশ্রীভাবে জট পাকিয়ে সত্য-মিথ্যায় একটা রীতিমত রোমাঞ্চকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা হলে আমার চাইতে কিন্তু আপনাদেরই বেশী ক্ষতি।

কেন জানেন?

অতঃপর যদি কিরীটী মুখ বন্ধ করে, তা হলে আপনারা যাঁরা কিরীটী রায়কে আজও ভুলতে পারেন নি—কিরীটীর কথা জানবার জন্য আজও উদ্‌গ্রীব, তাঁদেরই সব চাইতে বেশী হতাশ হতে হবে। কারণ কিরীটীর কাহিনী আপনাদের শুনতে হলে আমাকেই তা আপনাদের শোনাতে হবে এবং আমাকে তার পূর্বে তার মুখ থেকে শুনেই কাহিনীকে সাজিয়ে তুলতে হবে।

তাই ক্ষমা চেয়ে রাখলাম কাহিনীর প্রারম্ভেই সকলের কাছে।

॥ দুই ॥

সেই কল্পলোকের আরাবল্লীর সুউচ্চ পর্বতবেষ্টিত মরুদেশ রাজস্থান—কিরীটীর অনেকদিনকার ইচ্ছা দেশটা ঘুরে ঘুরে নিজের চোখ মেলে দেখে আসবে। এবং সুযোগের অভাবেই যাওয়াটা আর ঘটে উঠছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সেবারে শীতের মাঝামাঝিই একটা সুযোগ যেন ঘরের দরজায় এসে দেখা দিল।

প্রেসিডেন্সিতে একসঙ্গে পড়ত এক রাজপুত—করণ সিং।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে হঠাৎ একদিন সেই করণ সিং-এর সঙ্গে দেখা।

করণ সিং তাকে দেখে অবিশ্যি প্রথমটা চিনতে না পারলেও কিরীটী কিন্তু তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। দীর্ঘ প্রায় ছয় ফুট লম্বা—যেন কোষমুক্ত তরবারির মতই চেহারাটা। রাজস্থানের মরুতাপে পোড়া তামাটে বর্ণ। মাথায় জরির চুমকি

বসানো পাগড়ি। পরিধানে দামী স্যুট।

করণ সিং না?

অনেকদিন একটানা বাংলা মুলুকে থেকে বাংলার কথ্য ভাষাটা ভালোই রপ্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও কিরীটী প্রথমে ইংরাজীতেই কথা বলেছিল, কি রে, কিরীটী রায়কে চিনতে পারছিস না?

কিরীটী—কিরীটী মানে প্রেসিডেন্সির সেই কিরীটী,—বলেই সোল্লাসে এক চীৎকার, হ্যালো রায়—তুই—, বলেই দুহাতে সাগ্রহে কিরীটীর একটা হাত নিজের শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে দেয় করণ সিং। এবং ঝাঁকাতে ঝাঁকাতেই একসময় বলে, তারপর হে দেবাদিদেব, কহ কিবা বার্তা—

রাজস্থানের ভাষা নাকি রাজকীয় হওয়া উচিত। কলেজ-লাইফে একদা কিরীটীই বলেছিল করণ সিংকে। সেই থেকে ওরা পরস্পরের সঙ্গে নাকি ঐ ভাষাতেই কথা বলত।

কিরীটীও মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর দেয়, কিবা বার্তা তব কহ করণ সিং!

চল, চল—আমার স্যুটে চল। গ্র্যাণ্ডেই আছি আমি। উই মাস্ট সেলিব্রেট আওয়ার মিটিং আফটার সাচ্ এ লং টাইম! বলতে বলতে করণ সিং সোজা তাকে টেনে নিয়ে চলে তার ঐ হোটেলের নিজস্ব স্যুটে।

লিফটে করে তিনতলায় উঠতে উঠতে কিরীটী বলে, কবে কলকাতায় এসেছিস?

কলকাতায়! স্বগতোক্তির মতই যেন প্রশ্ন করে নিজেকেই করণ সিং। সহসা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হঠাৎ যেন চুপ করে যায়।

ব্যাপারটা কিন্তু কিরীটীর দৃষ্টিতে এড়ায় না। সে কারণের মুখের দিকে তাকায়।

কি রে, বললি না কলকাতায় কবে এলি?

তা—তা—দিন দশেক হবে—

লিফ্‌ট্‌টা ঐ সময় থেমে যেতেই দুজনে বের হয়ে পড়ে।

ঘরে এসে দুজনে বসল। করণ সিং ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। ড্রিঙ্ক এল। কিন্তু কিরীটী লক্ষ্য করে, সেই লিফ্‌ট্‌ থেকেই যেন করণ সিং কেমন অন্যমনস্ক।

ক্ষণপূর্বের তার সেই সহজ উচ্ছলতা যেন সহসা দপ করে নিভে গিয়েছে।

দুজনে দুজনকে 'উইশ' করে ড্রিঙ্ক শুরু করে, কিন্তু কারো মুখেই তার পর কোন কথা নেই। করণ সিং চুপচাপ। অগত্যা বাধ্য হয়ে কিরীটীকেও চুপ করেই থাকতে হয় আরো কিছুক্ষণ।

তার পর কিরীটীই একসময় মৃদুকণ্ঠে ডাকে, করণ?

ইয়েস! হঠাৎ যেন কিরীটীর ডাকে তন্দ্রাভঙ্গ হল করণ সিংয়ের।

কি ব্যাপার বল তো? এনিথিং রঙ! তোকে হঠাৎ কেমন একটু চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে—

করণ সিং তাড়াতাড়ি লজ্জিত হাসি হেসে বলে, না না, কিছু না—

উঁহু! নিশ্চয়ই কিছু। অবিশ্যি যদি আপত্তি থাকে তো প্রেস করব না! তবে—

না, বিশেষ তেমন কিছু না—

তুই নিশ্চয়ই আমাকে আজ আর সেই পুরনো দিনের ক্লাস-ফ্রেণ্ড, বন্ধু বলে গ্রহণ কবতে পারছিস না—নচেৎ—

না রায়, ঠিক তা নয়—তুই আমাকে কলকাতায় কেন এসেছি কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই—কথাটা আর শেষ করল না করণ সিং। হঠাৎই যেন আবার থেমে গেল। এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, এককালে তুই ক্লাসে অফ্-পিরিয়ডে বা কমনরুমে বসে বসে ক্রাইম ডিটেকশানের ব্যাপারে নানা কথা বলতিস। আমার অবিশ্যি মনে আছে আজও। এবং সে সময় তোর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণ দেখে কতদিন তোকে আমি বলেছি, মনে আছে, চেষ্টা করলে আর ও-দেশের মত আমাদের ভারতবর্ষে প্রাইভেট ডিটেকটিভের প্রচলন থাকলে তুই একদিন নামকরা একজন ডিটেকটিভ হতে পারতিস!

কিরীটী প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে শুধু হাসল মাত্র।

একমাত্র সেই কারণেই এবং তোর সঙ্গে যখন আকস্মিক ভাবে দেখা হয়েই গেল—কথাটা তোকে বলছি শোন। হয়তো তোর বিচারবুদ্ধি দিয়ে তুইও কোন পথ আমাকে বাতলাতে পারবি—

কি ব্যাপার?

বিশ্রী একটা জটিল ব্যাপারের মধ্যে পড়েছি রায়, আর শুধু জটিলই নয়—আমাদের ফ্যামিলি-প্রেসটিজ পর্যন্ত আজ সেই সঙ্গে বুঝি জড়িয়ে পড়েছে। তোকে তো বলেছিলাম, মনে আছে বোধ হয়, যোধপুরের এক রাজবংশেরই শাখা আমরা—বর্তমান রাজার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ রক্তের সম্পর্ক—

হ্যাঁ, মনে আছে।

পদ্মিনীকে তোর মনে আছে?

পদ্মিনী!

মনে নেই তোর, যার ছবি তোকে আমি কতদিন দেখিয়েছি!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় কিরীটীর।

করণ সিংয়ের বুকপকেটে সুদৃশ্য একটি জয়পুরী চামড়ার পার্সের মধ্যে সযত্নে সর্বদা রক্ষিত থাকত এক অনিন্দ্য রূপবতী কিশোরীর ফটোগ্রাফ। সেদিনের ফটোগ্রাফের কিশোরীর মুখখানার বুঝি সত্যিই কোন তুলনা খুঁজে পায় নি কিরীটী। চাঁদের মত ছোট্ট কপালখানির উপরে একটি টিকলি। কাজলটানা দুটি ভীরু আঁখিপক্ষ্মের নীচে হরিণীর ন্যায় দুটি চক্ষু। নাসা, চিবুক, ওষ্ঠ—কি বা তার চারু গঠন!

শুধিয়েছিল কিরীটী, কে রে, কার ফটো?

কেমন দেখতে আগে বল?

সিম্‌প্ল চার্মিং—

সত্যি বলছিস রায় !

নহে মিথ্যা, সত্য অতীব জেনো মহারাজ—বিশেষ ভাষায় হাসতে হাসতে বলেছিল কিরীটী।

কে জানিস ?

নিশ্চয়ই তোর ভাবী তিনি—

ঠিক। পদ্মিনী আমার এক জ্ঞাতি চাচার কন্যা—আমাদের বাগ্‌দান হয়ে গিয়েছে। তোর কথাই ঠিক রায়, আমার মনোনীতা বাগ্‌দত্তা—বধূ !

লাকি গ্যায়—কিরীটী শুধু বলেছিল, কন্‌গ্র্যাচুলেশান্স—থাউজেণ্ড কন্‌গ্র্যাচুলেশান্স—

মনে পড়ে গেল মুহূর্তে যেন কিরীটীর সেই সব পুরাতন দিনের কথা। বিস্ময়ে এবারে কিরীটী তাকাল করণ সিংয়ের মুখের দিকে। চোখে প্রশ্নের ইঙ্গিত।

পড়া শেষ করে এখান থেকে যোধপুরে ফিরে যাবার পর দিল্লীতে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম সেক্রেটারিয়েটে—আর তারই বৎসরখানেক বাদে পদ্মিনীকে আমি বিয়ে করি।

তার পর ?

তার পর ? একটা যেন চাপা দীর্ঘশ্বাসে বারেকের জন্য করণ সিংয়ের বুকটা কেঁপে উঠল। নিঃশ্বাসটা রোধ করে সে বললে, তার পর আটটা বছর যেন আমাদের স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। আবার একটু চুপ করে থেকে শুরু করল করণ সিং, তার পরই আমাদের সুখের ঘরে আগুন ধরল রায়—

আগুন !

হ্যাঁ—সবই তোকে বলছি শোন। আমাদের কোন সন্তান না হওয়ায় এবং পাছে পদ্মিনী নিজেকে লোনলি ফিল করে—তাকে সব ব্যাপারেই দিয়েছিলাম আমি অবাধ স্বাধীনতা। এখন বুঝতে পারি কত বড় আহাম্মুকিই করেছি। যাক্ যা বলছিলাম, সেই প্রশ্রয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে ক্রমশঃ ক্লাবে, পার্টিতে, সিনেমায়, থিয়েটারে ঘুরে ঘুরে একেবারে সম্পূর্ণভাবে বহির্মুখী হয়ে উঠল পদ্মিনীর মন। রাত করে বাড়ি ফিরতে লাগল, ভুলে গেল তার ঐতিহ্য—তার বংশমর্যাদা, ড্রিঙ্ক করতে শুরু করল—

ড্রিঙ্ক !

হ্যাঁ। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, অনকে বলেছি কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খলতা কমা দূরে থাক, যেন দিন দিন বেড়েই চলল। সংসারে অশান্তি দেখা দিল। ঐ সময় এল দিল্লীতে আমার এক জ্ঞাতিভাই যুদ্ধ-ফেরতা ক্যাপ্টেন রঞ্জিৎ সিং। আমাকে তুই সুপুরুষ বলতিস, কিন্তু রঞ্জিৎকে দেখলে তুই বোবা হয়ে যেতিস। আগুনের মত রূপ তার। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় তার জুড়ি মেলা ভার। যেমন লম্পট তেমনি মদ্যপ—

হুঁ। তার পর ?

তার পর আর কি, দুই উচ্ছৃঙখলে হল যোগাযোগ। দুঃখে, আক্রোশে, লজ্জায় সর্বক্ষণ আমি জ্বলতাম তবু চুপ করেই থাকতে হত—ঘরের কেলেঙ্কারি—এতে আমারই লজ্জা, আমারই অপমান—

আই সুড সে ইউ আর এ ফুল !

ফুলই বটে। তার পর শোন। ঐ রঞ্জিৎই একদিন এক পার্টিতে পদ্মিনীকে নিয়ে গিয়ে এক বোম্বের ফিল্ম-প্রডিউসারের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিল। সেই প্রডিউসার ওদের দুই গর্দভকে তাতিয়ে তুলল তার নেক্সট্ প্রোডাকশনে হিরো এবং হিরোয়িন হয়ে নামবার প্রলোভন দেখিয়ে দিনের পর দিন।

চমৎকার নাটক তো ! তোর স্ত্রীর মাথায় বোধ হয় অতঃপর হিরোয়িন হবার স্বপ্ন বাসা বাঁধল ?

তাই। এতদিন সব অত্যাচার সহ্য করেছি কিন্তু এবারে সত্যি-সত্যিই রুখে দাঁড়ালাম। স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ওসব চলবে না।

তার পর ?

তার পর একদিন রিভলবার হাতে তাড়া করে রঞ্জিৎকে বাড়ি থেকে বের করে দিলাম আর পদ্মিনীকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দিলাম। সত্যি আমি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছি। একটু থেমে আবার করণ সিং তার বক্তব্য শুরু করল, কিন্তু তার দুদিন পরেই ঘটল সেই ঘটনা—

কি ? পালাল বোধ হয় তোর স্ত্রী ?

হ্যাঁ। কিন্তু পালিয়েছে যখন তার যেখানে খুশি সে যাক, তবে—

তবে ?

সেই সঙ্গে সেই কালনাগিনী আমাদের বংশের পরিবারের আশীর্বাদটি পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে ভেগেছে। হ্যাঁ—মনে আছে বোধ হয় তোর, হীরা-চুনি-পান্নাখচিত বহুমূল্যবান এক সোনার রণছোড়জীর মূর্তি ছিল আমাদের ঘরে !

হ্যাঁ, বলেছিলি তুই—

দেশ ছেড়ে চলে আসবার সময় কেউ তো ঘরে আর রইল না। বৎসরখানেক আগে মার মৃত্যু হয়েছে, বাপকে তো সেই ছোটবেলাতেই হারিয়েছিলাম, কার ভরসায় দেশের ঘরের সিন্দুকে ঐ বহুমূল্য মূর্তিটি রেখে আসব ! তাই দিল্লীতেই সঙ্গে করে এনে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। আমারই শোবার ঘরে একটা লোহার সিন্দুকে গোপনে সেই মূর্তিটা রাখা ছিল। যাবার সময় সর্বনাশী সেই মূর্তিটা নিয়ে ভেগেছে। কাজ থেকে ফিরে এসে দেখি—সেও নেই আর শূন্য সিন্দুক, মূর্তিটিও নেই।

পদ্মিনী নিশ্চয়ই জানত সেই মূর্তিটার কথা ?

জানত। দেখেওছে—

সিন্দুকে ছিল, তাও নিশ্চয় জানত ?

জানত। ও হারামজাদী ভেগেছে যাক, কিন্তু মূর্তিটা আমাকে ফিরে পেতেই হবে। আজ দু মাস হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি সেই মূর্তিটার জন্যই রায়!

॥ তিন ॥

পদ্মিনী এখন কোথায় জানিস কিছু?

হ্যাঁ, সুটিংয়ের জন্য এখন দিন দশেক হল কলকাতাতেই এসে আছে—

এই কলকাতায়?

হ্যাঁ, এই গ্র্যাণ্ডেই। আমার সুটটা তিনতলায়, সে থাকে চারতলায় একটা সুট নিয়ে—

আর তোর সেই জ্ঞাতিভাই রঞ্জিৎ?

সে যোধপুরেই প্রথম গিয়েছিল শুনেছিলাম, এখন নাকি আছে লাহোরে। আজকাল অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ছোটখাটো একটা ব্যবসা করেছে।

সে কি! সে তা হলে বইতে নামে নি?

না। কিছুদিন হল শুনেছি সে নাকি বিয়েও করেছে। সংসার পেতে বসেছে।

তা হলে পদ্মিনীর সঙ্গে সে নেই?

না।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ কি যেন আপন মনে ভাবল। পাইপে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল। তারপর একসময় আবার বললে, তোর ধারণা তা হলে ঐ পদ্মিনীই সেই মূর্তিটা চুরি করেছে?

আই অ্যাম ডেড্ সিওর! কারণ সে ও আমি ছাড়া ঐ মূর্তির কথা দ্বিতীয় কোন প্রাণীই যেমন জানত না, তেমনি জানত না কেউ কোথায় সেটা আছে।

আচ্ছা একটা কথা করণ, তোদের ছাড়াছাড়ি হবার পর আর তোর পদ্মিনীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা বা কথাবার্তা কখনো হয়েছে?

হয়েছে। তার খোঁজ পাওয়া অবধি সে যেখানে গেছে আমিও গিয়েছি এবং অন্তত হাজারবার অনুরোধ জানিয়েছি, কাকুতি-মিনতি করেছি—এমন কি প্রাণের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছি। বলেছি সে যা খুশি তার করুক, জাহান্নামে যাক, নরকে যাক কিছু আমার এসে যায় না তাতে—যত টাকা চায় তাও দিতে রাজী আছি—আমার সর্বস্ব দেব, কেবল মূর্তিটা আমার ফিরিয়ে দিক!

কি জবাব দিয়েছে পদ্মিনী তাতে?

এক জবাব—সে মূর্তিটা নেয় নি, জানে না মূর্তি সম্পর্কে কিছু।

আই সি! তা এখন তার চলছে কি করে? কোম্পানী থেকে মোটা টাকা মাইনে পায় বুঝি?

জানি না কি পায়! সে তো এখন অভিনেত্রীই শুধু নয়, বোম্বে সাইন অ্যাণ্ড আর্ট ফিল্ম কোম্পানীর বিরাট চিত্র প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার চুনিলালের রক্ষিতা। ওকে আমি হত্যাই করে ফেলতাম রায় কিন্তু কেবল পারছি না ঐ মূর্তিটা আজও উদ্ধার

করতে পারছি না বলেই। কথাগুলো শেষ করে একটা রুদ্ধ আক্রোশে যেন গর্জাতে লাগলো করণ সিং।

ইতিমধ্যে কথা বলার ফাঁকে প্রায় দশটি বড় পেগ নিঃশেষিত করেছিল করণ সিং। আবার তাকে শূন্য পাত্রে মদ ঢালতে দেখে বলেছিল কিরীটী, কি করছিস করণ সিং—আর খাস না!

কিছু হবে না রায়, সারাটা রাত ধরে এমনি চালাই—তবু এতটুকু মাতাল হই না।

কিন্তু মাতাল হোস বা না হোস, লিভারটা যে একেবারে শেষ হয়ে যাবে এভাবে মদ্যপান চালালে! এভাবে সুইসাইড করে লাভ কি?

বেঁচে থেকেই বা লাভ কি আর বলতে পারিস রায়? মান গেছে ইজ্জৎ গেছে—এত বড় রাজবংশের মুখে এমনি করে কালি লেপে দিল কালনাগিনী—বলতে বলতে আবার ভরা পাত্রটা তুলে নিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে বললে, কি যে আগুন জ্বলছে দিবারাত্র রায় যদি বুঝতিস, কি করে যে এই দুই মাস আমার কাটছে—এক এক সময় আমার এখন কি মনে হয় জানিস?

কি?

ও হারামজাদী নিশ্চয়ই সে মূর্তিটা বিক্রী করে দিয়েছে—

মূর্তিটার সাইজ কি?

বেশী নয়—এই ইঞ্চি-তিনেক লম্বা ও ইঞ্চিখানেক চওড়া হবে।

ভিতরটা মূর্তির ফাঁপা না সলিড—নিরেট?

কিছুটা ফাঁপা আর কিছুটা বোধ হয় সলিড—আমি ঠিক ভাল করে তো কখনো পরীক্ষা করে দেখি নি।

হীরা-জহরতের কথা যা বলছিলি—

ছোটয়-বড়োয় মিশিয়ে প্রায় পাঁচখানা হীরা বসানো আছে মূর্তির গায়ে—যার দ্যুতিতে অন্ধকারেও মূর্তিটা ঝলমল করত।

হীরাগুলো খুলে নেওয়া যেতে পারে?

তা যাবে না কেন? চেষ্টা করলে যায় বৈকি!

তা হলে আমার মনে হয়, হয়তো এখনো মূর্তিটা সে বিক্রী করে নি!

ও শয়তানীকে তুই জানিস না কিরীটী, ও সব পারে।

তা হলেও যদি সে সত্যিই চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে, এত তাড়াতাড়ি বিক্রী করতে সাহস পাবে না।

কিসে তোর এ ধারণা হল রায়?

প্রথমতঃ যার আশ্রয়ে সে বর্তমানে আছে, তুই-ই তো বললি তার অর্থের অভাব নেই—বিরাট ধনী, সে নিশ্চয়ই পদ্মিনীর কোন চাহিদাই এখন মেটাতে পশ্চাদপদ হবে না। দ্বিতীয়তঃ সে জানে সর্বদা তুই সর্বত্র তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিস। এবং তৃতীয়তঃ সে জানে মূর্তির ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করেই তুই তার

পিছু নিয়েছিস।

কিন্তু তাতেই বা কি এসে গেল! মূর্তিটা তো উদ্ধারের কোন আশাই দেখছি না!

একেবারে যে আশা নেই তাই বা বলি কি করে?

সত্যি—সত্যি বলছিস কিরীটী, আশা আছে?

চেষ্টা করব নিশ্চয় আমরা। কিন্তু একটা কথা, পুলিসকে কি একথা জানিয়েছিস?

না, এখনো জানাই নি। তবে ভাবছি—

না, জানাস না। দুটো দিন তুই আমাকে একটু ভাবতে দে। আজ রাত হল, উঠি। বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়ায়।

চললি?

হ্যাঁ—তবে একটা কথা বলে যাই, তোর স্ত্রীর উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেমন সর্বদা রেখে আসছিস রেখে যাবি।

ডোন্‌ট্‌ সে স্ত্রী—একটা ভ্রষ্টা—ও আমাব কাছে আজ মৃত! ডেড!

কিরীটী অতঃপর সেরাত্রের মত বিদায় নিল।

॥ চার ॥

পুওর—বেচারী করণ সিং! বাড়ি ফেরার পথে ঐ একটি কথাই বুঝি বার বার মনে হচ্ছিল কিবীটীর। কিন্তু সেই সঙ্গে পদ্মিনীর চিন্তাটাও মনে তার একটা অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একমাত্র করণ সিং ছাড়া আর বাদবাকি সবাই তাব আপাত অপরিচিত।

রঞ্জিৎ সিং করণের জ্ঞাতিভাই—যে লোকটা যুদ্ধ-ফেরতা, মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল। বোম্বাই সাইন অ্যান্ড আর্ট ফিল্মস-এর প্রডিউসার ডিরেক্টার চুনিলাল। আর অনিন্দ্যসুন্দরী এক নারী শ্রীমতি পদ্মিনী—মরুসুন্দরী পদ্মিনী। তিনটি পুরুষ ও একটি নারী। একটি বহ্নি—আর তিনটি রূপমুগ্ধ পতঙ্গ। নারীকে নিয়ে পুরুষের এই লালসা আজকের নয় এবং নতুন কিছুও নয়। বিশেষ করে সেই নারী যদি আবার রূপবতী হয়। চাক্ষুষ দেখে নি কিরীটী আজও পদ্মিনীকে, তবে তার কৈশোরের যে চিত্র একদা করণ সিংয়ের কাছে দেখেছিল, পূর্ণযৌবনা বিশেষ করে আজও যে নারীদেহে মাতৃত্ব আসে নি, সে যে আজ কতখানি নয়নমন-লোভনীয়া হয়ে উঠেছে, কিরীটী সেটা অনুমান করতে পারে বৈকি। এবং এটাও সে বুঝতে পেরেছে, একদা এদেরই বংশের সেই রাজবধূ সিংহলনন্দিনী পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল—বহুবর্ষ পরে সেই কুলোদ্ভবা আর এক নারীকে কেন্দ্র করেও কয়টি পুরুষের মনে সেই ঝড়ই আজ দেখা দিয়েছে।

তবে সেদিনকার পদ্মিনী ছিল সত্যিই লাজবতী কুলবধূ সতী-সীমন্তিনী।

আর আজকের পদ্মিনী চটুলা 'নৃত্যপটীয়সী বারনারী'।

সেদিন ছিল এক বাদশা আলাউদ্দিন আর আজ তিনটি পুরুষ : করণ সিং, রঞ্জিৎ সিং ও চুনিলাল।

আসল কার্যকারণ পদ্মিনীই—হীরা-জহরতখচিত রণছোড়জীর স্বর্ণমূর্তিটি বর্তমান পদ্মিনী-পর্বের অংশমাত্র।

কিন্তু কে নিতে পারে সেই রণছোড়জীর স্বর্ণমূর্তিটি? কার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধা ছিল করণ সিংয়ের লোহার সিন্দুক থেকে মূর্তিটি চুরি করা? নিঃসন্দেহে পদ্মিনীর পক্ষে সম্ভাবনা দেখা যায়!

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে সে সেই স্বর্ণমূর্তিটি চুরি করতে পারে? অর্থের লোভে সম্ভব নয়। কারণ স্বামীর গৃহ ছেড়ে যার আশ্রয়ে সে গিয়েছিল এবং বর্তমানে যার কাছে আছে—তার তো মানে চুনিলালের অর্থের কোন অভাব নেই। তা ছাড়া রক্ষিতার মনোনয়ন ও তোষণ তো পুরুষের বিলাস ও অহমিকা। সেক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনে কেন পদ্মিনী চুরি করবে মূর্তিটি? তবে হ্যাঁ, অলঙ্কারের জন্য মূল্যবান জহরৎগুলোর লোভে জহরৎখচিত মূর্তিটি সে চুরি করতে পারে।

কিন্তু তার আগে একবার পদ্মিনীর সঙ্গে তাকে আলাপ করতেই হবে।

পদ্মিনীর সঙ্গে আলাপ করতে কিরীটীর খুব অসুবিধা হল না। তার এক বিশিষ্ট পরিচিত চিত্র-পরিচালককে বলতেই সে একটা ব্যবস্থা করবে বললে।

তবু সে বললে, কিন্তু ব্যাপার কি রহস্যভেদী, হঠাৎ চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ!

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, একটা ছবির প্রযোজনা করবো ভাবছি। শোনা যায় এতে রাতারাতি যেমন ফাঁকরী মেলে, তেমনি নাকি রাতারাতি বাদশাহীও হাতের মুঠোর মধ্যে আসতে পারে।

তাই বুঝি তোর ধারণা?

ধারণা নয়—তাই তো দেখছি। কেউ যেমন একদিন ডকের কেরানী ছিল, গোটা দুই ছবিতে নেমে, তেমন চাপা বরাত না থাকলে, পাবলিসিটির দৌলতে এবং প্রেম-পাগল বেকার একদল অল্পবয়সের ছেলেমেয়েদের চোখে ও হৃদয়ে ধাঁধা লাগিয়ে রাতারাতি মানকে বা গোবরা থেকে মলয়েশকুমারে পরিণত হয়, তেমনি কোনমতে হাজার কয়েক টাকা কোন নির্বোধ ধনীর মাথায় হাত বুলিয়ে একটা লাগসই উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ নায়ক-নায়িকা নিয়ে অনুরূপ একটা গল্প দিয়ে ছবি করে ফেলতে পারলেও রাতারাতি মোটা টাকার মুনাফা কামিয়ে নিতে যখন পারে—

রাবিশ!

রাবিশ নয়, সত্যি। দেখ না, পদ্মিনী দেবীটির সঙ্গে একটিবার আলাপ করিয়ে দে—তারপর দেখিস—

থাক আর দেখাতে হবে না। কাল-পরশু একসময় ওর অফ-টাইম দেখে আবার চুনিলাল যখন না থাকে বুঝে এসে ডেকে নিয়ে যাব।

দিন দুই বাদেই সেই সুযোগটা মিলে গেল। কিরীটীর পরিচালক-বন্ধু অনিল

রায় কথাটা মিথ্যা বলে নি। সত্যিই চুনিলালের সদালোলুপ ব্যাঘ্রদৃষ্টিকে এড়িয়ে কারো পক্ষেই পদ্মিনীর সঙ্গে নিভৃত দর্শনটা সম্ভবপর ছিল না। শকুনের মত যেন বিরাট ডানা মেলে আগলে রেখেছে সর্বদা চুনিলাল তার রক্ষিতাকে। স্বাভাবিক।

স্ত্রী নয় রক্ষিতা—তার উপরে আবার গৃহত্যাগিনী, অসামান্যা রূপবতী ভদ্রঘরের স্ত্রী। এবং সেই কারণেই বোধ হয় প্রয়োজনেরও কোন ত্রুটি ছিল না কোন দিকে। বিলাসের উপকরণ, সম্পদের জৌলুসে স্বভাবতই বহির্মুখিনী পদ্মিনীর মনটি যেন সযতনে আষ্টেপৃষ্ঠে আবৃত করে রাখবারই সর্বদা চেষ্টা করছিল চুনিলাল। পাছে না পাখী পালায়! একান্ত প্রয়োজন না হলে চুনিলাল পদ্মিনীকে বড় একটা চোখের বাইরে করত না।

কিন্তু দৈবক্রমে একটা সুযোগ এসে গেল।

সুটিংয়ের পরে স্টুডিও থেকে ফেরবার পথে একটা অ্যাক্সিডেণ্টে পড়ে কয়েক দিনেব জন্য চুনিলালকে একান্ত বাধ্য হয়েই হাসপাতালের কেবিনে গিয়ে ভার্ত হতে হল। চুনিলালের অবশ্য ইচ্ছা ছিল পদ্মিনীও তাব সঙ্গে কেবিনে থাকে, কিন্তু কেবিনের ইন্‌চার্জ সাহেব ডাক্তার মাথা নেড়ে জানালেন তা সম্ভব নয়।

অগত্যা সকালে একবার আহার্য নিয়ে ও বৈকালে একবার করে ঘণ্টা তিনেকের জন্য পদ্মিনী হাসপাতালে যাতায়াত করতে লাগল। চুনিলাল অসুস্থ, কাজেই তার বইয়ের সুটিং বন্ধ। দ্বিপ্রহরটা পদ্মিনীর হোটেলেই কাটে একা একা।

ঐ উপযুক্ত অবসরটিরই সুযোগ নিল অনিল।

কলকাতায় সুটিংয়ে আসবার পর অনিলের সঙ্গে স্টুডিওতেই আলাপ হয়েছিল পদ্মিনীর। অনিল শুধু একজন নামী চিত্রপরিচালক নয়, প্রথম শ্রেণীর একজন ক্যামেরাম্যান ও ব্যবহারে কথাবার্তায় চমৎকার। কাজেই চুনিলাল তেমন আপত্তি করে নি ওদের আলাপে। চুনিলালের নিশ্চিন্ত থাকবার আরো একটা কারণ ছিল অবিশ্যি—অনিলের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে এবং চুলে পাক ধরেছে।

ফোনে পূর্ব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট মতই কিরীটী অনিলের সঙ্গে এক দ্বিপ্রহরে এল চুনিলালের সুটে। পদ্মিনীকে সামনাসামনি চাক্ষুষ দেখে কিরীটীরও বুঝি কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সত্যিই রূপের যেন তুলনা নেই। জ্বলন্ত একখানি অগ্নিশিখা যেন।

প্রাথমিক আলাপটা অনিলই করে দিল।

ঘণ্টা দুই আলাপ-আলোচনার পর কিরীটী যখন পদ্মিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঐ হোটেলেই করণ সিংয়ের ঘরের দিকে চলল, পদ্মিনী সম্পর্কে তিনটি ব্যাপার তখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক, পদ্মিনী ঝোঁকের মাথায় এবং কিছুটা স্বামীর প্রতি অন্ধ আক্রোশে গৃহ ছেড়ে এসে চুনির ঘরে উঠলেও চুনির সঙ্গে ঠিক যেন খুশী হয়ে ঘর করতে পারছে না। দ্বিতীয়, অর্থের চাইতেও তার নাম, প্রতিপত্তি বা গ্লামারের মোহ অনেক বেশী। তার মন পরিপূর্ণ ভাবেই বহির্মুখী।

ঘরের মেয়ে বা বধূ সে কোনদিন হতে পারে নি, আজও নয়। এবং ভবিষ্যতেও মেনে নিতে পারবে না সেই স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেষ্টনী এ জীবনে কোনদিন। করণ সিং সেইখানেই পদ্মিনীর প্রকৃতিকে বুঝতে না পেরে তাকে ঘরে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে মারাত্মক ভুল করেছিল। আর এও ঐ সঙ্গেই কিরীটী বুঝেছিল, চুনির শিকলও ঐ মেয়ে একদিন কেটে বের হবেই।

তৃতীয়তঃ, পদ্মিনীর স্বভাব ও মন যতই চটুল ও বহির্মুখী হোক না কেন আসলে সে ক্রুর বা নীচমনা নয়। একটা শিশুসুলভ সহজ সারল্য এখনো তার মনের মধ্যে কোথায় যেন ঘুমিয়ে আছে, যেটা কথায় কথায় হঠাৎ মেঘে ঢাকা আকাশে বিদ্যুতের চকিত ইশারার মতই বুঝি ঝলকে ঝলকে ওঠে।

·

করণ সিং ঘরেই ছিল। সামনে তার মদের পাত্র। ঘরের ভারী পর্দাগুলো চারদিক থেকে টেনে দিয়ে দ্বিপ্রহরের সূর্যালোককে প্রবেশাধিকার না দিয়ে ঈষৎ ঠাণ্ডা প্রায়ান্ধকারে বসে বসে নির্জলা মদ্যপান করছিল।

বন্ধ দরজার গায়ে নক পড়তেই ঈষৎ বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে আহ্বান জানাল, কম ইন!

কিন্তু পরক্ষণেই কিরীটী ঘরে এসে প্রবেশ করতেই মুখের বিরক্তি অপসারিত হল। সাগ্রহে বললে, কিরীটী! কিবা বার্তা?

কিরীটী বসতে বসতে বললে, পদ্মিনীর সঙ্গে আলাপ করে এলাম করণ!

সে কি?

কেন, আশ্চর্য হবার এতে কি আছে? সে তো আর এখন কুলবধূ নয়?

কিন্তু সেই চুনি জাম্বুবানটা—

সে তো দিন-চারেক হল হাসপাতালে প্লাস্টার করে পড়ে আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম বটে।

একটা কথা বলব করণ, যদি কিছু মনে না করিস্!

নিশ্চয়ই—বল।

সেদিন তোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আর কিছু না হলেও এটা বুঝেছিলাম পদ্মিনীকে আজও তুই ভুলতে পারছিস না—

না, না—তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে ওঠে করণ সিং, ইউ আর রং—অ্যাবসলুটলি রং!

না—বরং তোর কথাই যদি মেনে নিতে হয় তো বলব, তোর মনের সেই গোপন ইচ্ছাটা তুই বোধ হয় নিজেও জানিস না। কিন্তু একটা কথা তোকে বলতে পারি করণ, পদ্মিনী আর কোনদিনই তোর ঘরে ফিরে আসবে না।

আসবে না! একটা ব্যর্থ চাপা কান্নার মতই যেন প্রশ্নটা উচ্চারিত হল সহসা করণের কণ্ঠ থেকে।

না, আসবে না। আর যদি আসেও, সেও থাকবে না আর তুইও তাকে ধরে

রাখতে পারবি না।

কেন ?

কারণ ও মেয়ে ঘরের নয়, বাইরের। ঘরে এনে জোর করে ওকে ধরে রাখবার চেষ্টাটাই হবে ব্যর্থ। তাই ওদিক থেকে তোকে হয়তো কোন সাহায্যই করতে পারব না করণ, কিন্তু তোর স্বর্ণমূর্তিটা হয়তো আমি উদ্ধার করে দিতে পারব।

পারবি ?

পদ্মিনীর সঙ্গে আলাপের পর মনে হচ্ছে পারব।

তোর ধারণা মূর্তিটা তা হলে ওর কাছেই আছে ?

তা জানি না—তবে—

তবে ?

ব্যস্ত হোস না, ফিরে পাবি।

অতঃপর করণ সিং যেন কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাসকে চেপে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, বেশ, তাই তুই যদি পারিস না-হয় উদ্ধার করে দে।

দেব। আমি কিরীটী রায় তোকে কথা দিচ্ছি করণ, দেব—উদ্ধার করে দেব তোর রণছোড়জীব মূর্তি।

॥ পাঁচ ॥

দিন-দুই পরে আবার কিরীটী ও পদ্মিনীর সাক্ষাৎকার হল।

এবারে গ্র্যাণ্ডে নয়, অন্য একটি কুখ্যাত নিশিরাতের পানশালার নিভৃত একটি কিউবিক্‌ল্‌-এর মধ্যে। সামান্য একদিন ঘণ্টা দুয়েকের আলাপেই কিরীটীর চোখে পদ্মিনীর চরিত্র স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

উপযুক্ত প্রলোভনের একটি টোপ ফেলে তাই পদ্মিনীকে ঐখানে আকর্ষণ করে আনতে কিরীটীর এতটুকুও বেগ পেতে হয় নি।

সামনে পরিপূর্ণ মদের সুদৃশ্য বেলোয়ারী পাত্র। বেশ কড়া কয়েকটি পেগ ইতিমধ্যে পদ্মিনীকে কৌশলে কিরীটী উদরসাৎ করিয়েছিল। এবং তার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সেই প্রতিক্রিয়াতেই বিলোলনয়নে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে পদ্মিনী বলছিল, ঠিকই বলেছেন আপনি মিঃ রায়, ঐ শকুনটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি!

আপনি তার বিবাহিতা স্ত্রী নন, এভাবে জবরদস্তি করে আপনাকে আটকে রাখবার কোন এক্তিয়ার নেই তার। এভাবে যে আপনার মত এক প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীকে কেন সে আটকে রেখেছে তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন! আপনাকে এইভাবে এক্সপ্লয়েট করে নিজে সে চিত্রজগতে অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবে বলেই।

সবই বুঝি মিঃ রায়, কিন্তু এই আমার প্রথম ছবি, ওর মত একজন নামী ডিরেক্টারকে বাধ্য হয়েই আমাকে কতকটা বর্তমানে আঁকড়ে ধরে থাকতে হচ্ছে।

জানেন না আপনি, ও আমার যা পাব্লিসিটি করছে—আমাকে প্রথম ছবিতেই এস্টাবলিশ করবে, প্রতিজ্ঞা করেছে। কতকটা তার জন্যই ওর অত্যাচার আমি সহ্য করছি। নইলে—

কিন্তু এখন না সরে গেলে পরে ওর ক্লাচ থেকে নিজেকে আপনার মুক্ত করা আরো কষ্টসাধ্য হবে তাও জানবেন।

তা কেন হবে? ছবিটা একবার রিলিজ হোক না—ওকে আমি, দেখবেন, ঠিক তখন কলা দেখাবো, যদি অবিশ্যি ছবিটা ওর হিট করে! ও তো বলছে, ছবি হিট করবেই—

কোন প্রডিউসার বা ডিরেক্টারই জোর করে আগে থাকতে ও-কথা বলতে পারে না। আপনাদের বিচারে ছবি খুব ভাল হলেও দর্শকরা নাও নিতে পারে!

সে সম্ভাবনাও আছে বৈকি।

তবে? কেন আপনি আপনার অসাধারণ সম্ভাবনাকে নষ্ট করবেন ওর হাতে এভাবে একপ্রকার বন্দিনী থেকে?

কথাটা আপনি মিথ্যা বলেন নি মিঃ রায়, আর তা ছাড়া রঞ্জিৎ—

কিরীটী নামটা শোনামাত্রই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। বলে, রঞ্জিৎ!

কিন্তু পদ্মিনী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। মদে ইদানীং পদ্মিনী এতটা পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল যে চট করে আজকাল তার খুব বেশী আত্মবিস্মৃতি হত না।

প্রচণ্ড নেশার মধ্যেও একেবারে সব কিছু ভুলে বসে থাকত না বা অসংলগ্ন কিছু প্রকাশ করে বসত না।

তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে পদ্মিনী বললে, না—কিছু না।

কিরীটীও আর বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখিয়ে চুপ করে গেল।

কিরীটীর সঙ্গে পদ্মিনীর তৃতীয় সাক্ষাৎ হল আবার দুদিন পরেই। পূর্বোক্ত সেই নিশিরাতের পানশালায় সেই কিউবিক্‌ল্‌-এই। এবং এবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল পদ্মিনীই।

দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর এবং দুটো কড়া পেগ উদরস্থ করবার পরে সহসা পদ্মিনী প্রশ্ন করে বসল, করণের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে মিঃ রায়?

কিরীটী মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আছে এবং আজকের নয়—অনেক দিনের পরিচয়।

হুঁ, তাহলে করণই আপনাকে আমার পিছু লাগিয়েছে?

এই প্রশ্নটির জন্য কিরীটী সত্যিই প্রস্তুত ছিল না। তাই বোধ হয় একটু সময় লাগে তার জবাবটা দিতে। একটু সময় নিয়ে বলে, এ প্রশ্নটা কেন করলেন ঠিক কিন্তু বুঝতে পারছি না!

ওর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল জানেন?

এবারে কিরীটী যেন একটু চমকাবার ভান করেই বলে, সে কি! সত্যি

বলছেন ?

সত্যি। কিন্তু সত্যিই বলতে চান এ খবরটা আপনি জানতেন না মিঃ রায় ?

না তো।

করণ বলে নি ?

না।

কিরীটী চমৎকার অভিনয় করে চলে।

ওব সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। পরশু যখন হোটেলে বিকালের দিকে ও আপনাকে আমাব ঘর থেকে একসঙ্গে বের হতে দেখে ডাকল, তখন কিন্তু সেই আশাই করেছিলাম—ও আপনাকে আমাদের সব কথা নিশ্চয়ই বলেছে।

না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার সম্পর্কে কোন কথাই আজ পর্যন্ত ও আমাকে বলে নি।

আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম—

তবে একটা কথা বলছিল—

কি—কি বলছিল ?

ওর কি একটা স্বর্ণমূর্তি না কি ওর বাড়ির সিন্দুক থেকে চুরি গেছে!

সহসা ঐ সময় কিরীটী লক্ষ্য করে—কথাটা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পদ্মিনীর সমস্ত মুখখানা মুহূর্তে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এবং তার পরই ব্যগ্রকণ্ঠে শুধাল, স্বর্ণমূর্তি—মানে রণছোড়জীর মূর্তিটা ?

হ্যাঁ। সে মূর্তিটার ব্যাপার জানেন নাকি কিছু আপনি ?

অ্যাঁ। পদ্মিনী যেন দ্বিতীয়বাব চমকে উঠে বলে, হ্যাঁ, কিন্তু—

কি ?

সে মূর্তির কথা তো বাইরের কারো পক্ষেই জানবার কথা নয় মিঃ রায়!

তার কারণ সেই মূর্তির কথা একমাত্র করণ ও আমি ছাড়া আর তো কেউ জানত না।

ঠিক বলেছেন আপনি ? আর কেউ জানত না আপনারা দুজন ছাড়া ?

না। তার পরই যেন সহসা কিছুক্ষণের জন্য পদ্মিনী স্তব্ধ হয়ে থাকে। কাজল-টানা ঈষৎ রক্তিমাভ পদ্মিনীর চক্ষু দুটির কিনারে কিনারে যেন মনে হল কিরীটীর অশ্রুর আভাস। হাতে ধরা অর্ধপূর্ণ বেলোয়ারী পাত্রটি নিয়ে কেমন যেন অন্য-মনস্ক একটা ভাব পদ্মিনীর।

বুঝতে পারে কিরীটী কিছু একটা ভাবছে পদ্মিনী।

মিঃ রায়! একসময় আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল পদ্মিনী।

বলুন ?

আপনার বন্ধুকে বলবেন, মূর্তিটা উদ্ধারের ছলে তিনি যেন আর এমন করে পিছনে পিছনে ছায়ার মত না ঘুরে বেড়ান।

কিরীটী স্পষ্ট বুঝতে পারে, পদ্মিনীর গলাটা যেন কেমন ধরা-ধরা। মুখটা

নিচু করে তাকিয়ে ছিল পদ্মিনী তার হস্তধৃত গ্লাসটার দিকে। কিরীটী নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্লাস ধরা হাতটা যেন মৃদু কাঁপছে পদ্মিনীর।

একটা কথা বলব ?

বলুন ! মুখ তুলে তাকাল পদ্মিনী। তার পরই পূর্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বললে, জানি আপনি কি বলবেন মিঃ রায়। কিন্তু সত্যিই তা অসম্ভব। আর এ জীবনে কোনদিন তা হবেও না। তারপর আবার একটু থেমে পদ্মিনী বলে, আপনি হয়তো জানেন না, আর জানবার কথাও আপনার নয়—আপনার বন্ধুটি শুধু নিষ্ঠুর নয়—নীচ ! কিন্তু আর নয় উঠুন—এই কথাগুলো বলবার জন্যই আজ আপনাকে কষ্ট দিয়েছি—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পদ্মিনী।

কিরীটী সেরাত্রে বুঝেছিল মেয়েটি যত জঘন্য চরিত্রের হোক না কেন, বিলাস-উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আজও অন্তর্নিহিত নারীমনটি তার একেবারে শুকিয়ে যায় নি। পঙ্কিলতার পল্বলে আজও বইছে নিঃশব্দে একটি মন্দাকিনীর শাশ্বত স্রোত। এবং সেরাত্রে মেয়েটিকে কেন্দ্র করে নিঃশব্দে একটি বেদনার অনুভূতি যেন কিরীটীর মনেব মধ্যে আলোড়িত হতে থাকে।

॥ ছয় ॥

পরের দিন কিরীটী করণ সিংয়ের সঙ্গে হোটেলে দেখা করে বললে, চল্ একবার লাহোর ঘুরে আসি।

লাহোর হঠাৎ ?

তোর সেই জ্ঞাতিভাই রঞ্জিতের সঙ্গে একটিবার আলাপ করব।

কিন্তু সে তো শুনেছি কখনো লাহোর আবার কখনো যোধপুরে থাকে !

বেশ তো, লাহোরে তাকে না পাই যোধপুরেই যাব। রাজস্থানটা দেখবার একবার বাসনা অনেকদিন থেকেই আছে, এই ফাঁকে সেই বাসনাটা তোর রঞ্জিৎ ভাইয়ের দৌলতে চরিতার্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু করণ সিংয়ের লাহোর যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা গেল না। আপাতত কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল ছেড়ে সে কোথাও নড়তে চায় না।

এই গরমে লাহোর যাবি ! কিছুদিন পরে গেলে হত না ?

না। কালই রওনা হব ভাবছি, আর তুইও যাবি।

লাহোরের আনারকলিতে করণের এক বন্ধু ছিল। সেইখানেই গিয়ে উঠল কিরীটী করণের সঙ্গে। এবং পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানা গেল সৌভাগ্যক্রমে রঞ্জিৎ সিং তখন লাহোরেই আছে। লাহোরের পুরাতন ঘিঞ্জি অংশে থাকে রঞ্জিৎ সিং। এবং কিরীটী করণের সেই পরিচিত ভদ্রলোকের মুখেই শুনল, করণ যে বলেছিল রঞ্জিতের ছোটখাটো অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা তা নয়, ব্যাপারটা জমজমাট—করমচাঁদ নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের একটি অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ছিল এবং সেটা

পড়াতিমুখে চলেছিল, সেটাই কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করেছে রঞ্জিৎ সিং এণ্ড কোম্পানী।

বিরাট একটা তিনতলা বাড়ি। তার একতলায় ও দোতলায় অফিস এবং তিনতলায় থাকে রঞ্জিৎ সিং। ঐদিনই দ্বিপ্রহরে টেলিফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে এক ফার্ম অফিসের রিপ্রেজেনটেটিভের ছদ্মনামে বিক্রম কাপুর পরিচয়ে সন্ধ্যার পর গিয়ে কিরীটী হাজির হল রঞ্জিতের ঘরে।

পূর্বেই কিরীটী খোঁজ নিয়েছিল বৌ কাছে থাকে না তার, একাই থাকে রঞ্জিৎ সিং। চাকরবাকরদের নিয়েই থাকে। তাই সোজা একেবারে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায়।

তিনতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখেও কাউকে দেখতে পেল না কিরীটী। একটু ইতস্তত করে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে থাকে। ঐ সময় একজন ভৃত্যের সঙ্গে মাঝামাঝি সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল।

মিঃ সিং আছেন ?

হ্যাঁ, যান উপরে।

বেশ বড় আকারেব একটা ঘর, মেঝেতে কার্পেট বিছানো। জানালায় জানালায় খসখস—ঘরের মধ্যে পাখা ঘুরছে। ঘরের মধ্যস্থানে টেবিলের উপর কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প। কিরীটীর সাড়া পেয়ে রঞ্জিৎ সিং আহ্বান জানাল।

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকল। চমৎকার মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ঘরটি। দামী একটা সোফার উপরে পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিহিত এক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক বসেছিল। সে-ই বললে, আসুন মিঃ কাপুর!

মিঃ রঞ্জিৎ সিং ?

ইয়েস!

করণ সিং মিথ্যা বলে নি। রঞ্জিতের মত সুপুরুষ কদাচিৎ বড় একটা চোখে পড়ে। রূপকথার রাজপুত্রের মতই চেহারা যেন।

বসুন মিঃ কাপুর।

কিরীটী অদূরবর্তী সোফায় রঞ্জিতের মুখোমুখি উপবেশন করল। এবং দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর কিরীটী একসময় বললে, মিঃ সিং, আপনি শুনেছি একজন যোধপুরের লোকবিশ্রুত রাজ-ফ্যামিলির লোক!

হ্যাঁ—মৃদু হেসে বললে রঞ্জিৎ সিং, আমাদের সেই বংশই বটে। তবে সেসব তো এখন গল্পকথা—অতীত!

অতীত হলেও পুরাতন দিনের সে ঐতিহ্য ও সুবাস যাবে কোথায়? সে যে এখনো আপনাদের চেহারায় চরিত্রে উঁকি দেয়।

বাট্ ইউ উড বি সারপ্রাইজড্ টু হিয়ার দ্যাট্ আই হ্যাভ গট্ নো ফ্যাসিনেশন অর ড্রিম ফর দ্যাট্ পার্ট্ অফ আওয়ারস! কিন্তু যাক সে কথা, আপনার প্রয়োজনের কথাটা এবারে বলুন।

মাফ করবেন মিঃ সিং, আপনাকে তো সে সময় ফোনেই বলেছিলাম, পাঞ্জাবে আমার বাস হলেও কলকাতাতেই জীবনের দীর্ঘকাল আমার কেটেছে এবং কলকাতাতেই আমার ব্যবসা। অবশ্য রিসেণ্টলি লণ্ডনেও একটা ব্রাঞ্চ খুলেছি। আমার ব্যবসা হচ্ছে মূল্যবান সব ওল্ড কিউরিও নিয়ে। ছবি, পট, মূর্তি, মুদ্রা, স্ট্যাম্প ইত্যাদি।

তাই তো সে-সময় আপনাকে ফোনেই আমি বলেছিলাম, আমার ব্যবসা তো তা নয়! আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

পারেন আপনি। এখানে আপনারই এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোকের মুখে আমি শুনেছি আপনি যোধপুরের এক পুরাতন রাজপরিবারের লোক। রাজস্থানে বহু পুরাতন ঐ ধরনের মূল্যবান দ্রব্য আমি পাব জানি। কিন্তু রাজস্থান আমার অপরিচিত জায়গা। তাই আপনার কাছ থেকে কিছু সত্যিকারের ইনফরমেশন আমি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাই।

ইনফরমেশন!

হ্যাঁ—আচ্ছা একটা প্রশ্নের জবাব হয়তো নিশ্চয়ই আপনি দিতে পারবেন। যোধপুরের গিলহোট বংশে একটি স্বর্ণনির্মিত রণছোড়জীর মূর্তি ছিল শুনেছি—

রঞ্জিৎ সিং যেন সহসা ভূত দেখবার মত চমকে ওঠে কথাটা শুনে। এবং জড়িত কণ্ঠে বলে, স্বর্ণনির্মিত রণছোড়জীর মূর্তি?

হ্যাঁ।

আমি—আমি তো কখনো সেকথা শুনি নি!

সত্যি বলছেন শোনেন নি?

না।

সিঁড়িতে ঐ সময় লঘু পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে।

কিন্তু করণ সিং বলেছিল—

কে—কে বলেছিল? উত্তেজনায় রঞ্জিৎ সিং ততক্ষণে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক সূক্ষ্ম সিল্কের কালো 'ভেল' ঢাকা এক নারীমূর্তি এসে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, করণের নামটাও বোধ হয় তুমি শোন নি রঞ্জিৎ!

কে?

নারীমূর্তির মুখের উপর থেকে কালো সিল্কের 'ভেল' অপসারিত হল, চিনতে আশা করি পারছ রঞ্জিৎ—

পদ্মিনী! অস্ফুট কণ্ঠে কোনমতে যেন রঞ্জিৎ উচ্চারণ করল নামটা।

হ্যাঁ, পদ্মিনী। তার পরই কণ্ঠের সুর পাল্টে বললে, দাও, ফিরিয়ে দাও সেই রণছোড়জীর মূর্তি রঞ্জিৎ।

কি আবোল-তাবোল প্রলাপ বকছ পদ্মিনী? কিসের মূর্তি?

রঞ্জিৎ তখন যেন সেই ঘরে ঐ সময় সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি কাপুর ছদ্মনামে কিরীটীর উপস্থিতি পর্যন্ত উত্তেজনায় বিস্মৃত হয়েছিল।

আবোল-তাবোল যে আমি বকছি না তা তুমি খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পারছ রঞ্জিৎ। এখন আমি বুঝতে পারছি ঐ মূর্তিটার লোভেই সেদিন তুমি আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিলে। তারপর সেদিন দুপুরে পালিয়ে গিয়ে যখন তোমার ডেবায় উঠেছিলাম, তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়ে সেই যে বের হয়ে গিয়েছিলে—আর ফিরে এলে না সেও ঐ কারণেই।

পদ্মিনী!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ফাঁকে তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে নিশ্চয়ই সিন্দুক থেকে মূর্তিটা হাতিয়ে নিয়ে ভেগেছিলে। কারণ এখন আমার মনে পড়ছে মদের নেশার ঝোঁকে একদিন মূর্তিটার কথা তোমাকে বলেছিলাম আর এও তুমি জানতে করণের সিন্দুকের চাবি কোথায় থাকত।

পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনল রঞ্জিৎ। তার পর মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বললে, পদ্মিনী, তুমি নিশ্চয় অতিরিক্ত মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছ।

না, নেশাগ্রস্ত উনি হন নি রঞ্জিৎ সাহেব!

এতক্ষণে কিরীটীর কথায় ফিরে তাকাল রঞ্জিৎ তার মুখের দিকে। ঘরে তার উপস্থিতিটা বোধ হয় এতক্ষণে রঞ্জিৎ সিংয়ের মনে পড়ল।

হুঁ, এখানে কৌশল করে আপনারও আগমনটা তা হলে সেই কারণেই ঘটেছে মিঃ কাপুর! তা হলে এইটুকুই বলতে পারি আমি, আপনার ঐ প্রণয়িনী আমার মত আপনাকেও ধোঁকা দিয়েছে।—বলে পদ্মিনীকে দেখাল আঙুল তুলে রঞ্জিৎ।

উনি আমার প্রণয়িনী নন সিং সাহেব। আর ধোঁকাও উনি আমাকে দেন নি।

কিন্তু আপনাদের প্রলাপ অনেকক্ষণ আমি সহ্য করেছি আর নয়—এখান থেকে এক্ষুনি যদি আপনারা না যান তো জানবেন বাধ্য হয়েই অন্য ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। রঞ্জিৎ সিং বলল।

সে আপনার যেমন অভিরুচি। তবে এও জানবেন ওঁদের রণছোড়জীর মূর্তির একটা হদিস না নিয়ে আমরাও এখান থেকে নড়ছি না। জবাব দিল কিরীটী।

নড়বেন না?

না।

রঞ্জিৎ সিংয়ের পিঙ্গল চোখের তারা দুটো রুদ্ধ একটা আক্রোশে ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছিল ঐ সময়।

শুনুন রঞ্জিৎ সাহেব, কেলেঙ্কারি যদি না চান তো ভালয় ভালয় মূর্তিটা ওঁকে ফেরত দিন। আমরা কথা দিচ্ছি, কেউ সে কথা জানবে না। আর কেলেঙ্কারিই যদি চান তো জানবেন শেষ পর্যন্ত আপনাকে গিয়ে জেলখানাতেই ঢুকতে হবে।

আইন আদালত বুঝি আর দেশে নেই!

আছে'বৈকি। সেই আইনই যখন আপনাকে প্রশ্ন করবে, মাত্র দুই মাস সময়ের

মধ্যে আজকের এত বড় ব্যবসাটা আপনি গড়ে তোলবার টাকা পেলেন কোথা থেকে—আশা করি জবাবটা আপনার তৈরিই আছে!

মূর্তি আমি নিই নি।

নিয়েছেন। আর এও বুঝতে পারছি, সেটা বিক্রী করে বা তার গা থেকে জহরতগুলো খুলে বেচেই—

না, না- সেটা ও করে নি মিঃ রায়। ও মূর্তি যার ঘরে থাকবে তার কোনদিন অর্থের অভাব হবে না। পদ্মিনী বলে ওঠে।

ও ঠিকই বলেছে। আমি মানে আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। রঞ্জিৎ তাড়াতাড়ি বলে।

কে? কে সে আত্মীয়? কিরীটী প্রশ্ন করে।

করণ। করণ সিং দিয়েছে।

রঞ্জিতের মুখের কথাটা শেষ হল না, লাফিয়ে এসে ঘরে ঢুকল ঐ সময় করণ সিং।

চিৎকার করে বললে, ড্যাম লায়ার! এবং সঙ্গে সঙ্গে করণ রঞ্জিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চেঁচিয়ে উঠল আর্তকণ্ঠে পদ্মিনী, করণ—করণ!

জড়াজড়ি করে ততক্ষণে করণ ও রঞ্জিৎ সিং মেঝেতে পড়েছে। এবং কিরীটী ওদের বাধা দেবার আগেই রঞ্জিতের কণ্ঠ চিরে একটা আর্ত চিৎকার বের হল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের ধাক্কায় টেবিল-ল্যাম্পটা টেবিলের উপর থেকে ওদের গায়ে পড়ে গেল। এবং কিরীটীও অন্ধকারে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে চেয়ারের ধাক্কা খেয়ে হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল অর্ধস্ফুট যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করে।

ওদিকে তখন রঞ্জিৎ ও করণের গায়ে আগুন ধরে গেছে।

পদ্মিনী গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐ আগুনের মধ্যে বোধ হয় রঞ্জিতের হাত থেকে করণকে বাঁচাতেই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব ঘটে গেল ব্যাপারটা।

রঞ্জিৎকে করণ ছোরা দিয়ে আঘাত করেছিল একেবারে বুকে। রঞ্জিতের মৃত্যু হয়েছিল তাতেই। কিন্তু করণ ও পদ্মিনী পুড়ে গিয়েছিল বিশ্রীভাবে।

কিরীটীকেও প্রায় দিন-দশেক হাঁটুটা নিয়ে ঐ লাহোরেই বসে থাকতে হয়েছিল হোটেলে।

দীর্ঘ এক মাস হাসপাতালে থেকে করণ সুস্থ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু সুস্থ হয়ে আর পদ্মিনীর কোন সন্ধানই সে পায় নি।

॥ সাত ॥

কেন ? প্রশ্ন করলাম আমি।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, পদ্মিনীর দেহের চাইতে মুখটাই বেশী পুড়েছিল। মুখের সমস্ত সৌন্দর্য তার অগ্নিদেবতা একেবারে যেন নিঃশেষে চেটেপুটে নিয়েছিলেন। তাই বোধ হয় আর সে করণকে দেখা দেয় নি।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে কিরীটী আবার বললে, পদ্মিনী ও করণের সংবাদ রোজ আমি নিতে যেতাম হাসপাতালে। একদিন গিয়ে দেখলাম তার বেডটা খালি। নার্স বললে, দুপুর থেকে তাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। সেইদিনই বুঝেছিলাম সুব্রত, মেয়েটা সত্যিই করণকে ভালবাসত। চিত্রাভিনেত্রী হবার নেশায় সেই ভালবাসাকে পর্যন্ত সে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিল। নেশা এমনিই বিচিত্র !

আর সেই মূর্তিটা ?

জানি না।

রঞ্জিৎ-ই তা হলে মূর্তিটা চুরি করেছিল ?

হতে পারে।

কিন্তু তোর কি ধারণা ?

জগতে এমন অনেক কিছু আছে সুব্রত, যা এখনও আমাদের বিচার ও জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে !

কিন্তু—

কিন্তু কিরীটী আর জবাব দেয় নি।

॥ নবম খণ্ড সমাপ্ত ॥